সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—সম্পাদক—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

—একাদশ বর্ষ—

মাঘ ১৩২৯ হইতে পৌষ ১৩৩০
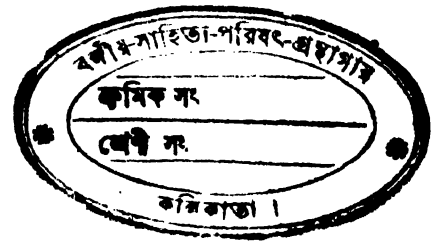
ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য—দুই টাকা।

PUBLISHED FROM
RESEARCH HOUSE—MYMENSINGH.

# বিষয় সূচী।

## রঙ্গিন চিত্র।

মানস-কমল

চিত্রশিল্পী
শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

চিত্র-স্বত্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত কুমারেশ সিকদারের সৌজন্যে

# সৌরভ
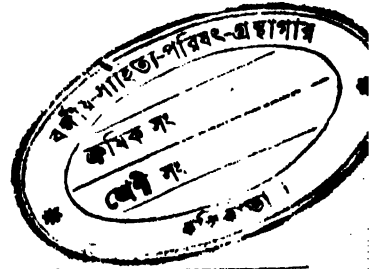
একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩২৯ সন। | প্রথম সংখ্যা।


## ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া যে কত যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে, জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। কিন্তু বিষয়টী অমীমাংসিতই আছে; বোধ হয় থাকিবেও তাহাই।

পৃথিবী হইতে অহঙ্কারের তিরোভাব না হওয়া পর্য্যন্ত আমিত্বটাই পৃথিবীকে গ্রাস করিতে বসিবে—তাহা স্বাভাবিক। আমিত্বের এই 'আমি' শঙ্করের সোহহং পর্য্যন্ত যখন ছড়াইয়াছে, তখন আমাদের ঘট ভাঙ্গুক আর নাই ভাঙ্গুক, ঘটের বেষ্টনি থাকিলেও মধ্যকার ক্ষুদ্রতাটাই যে বড় আকাশ, এই কথাটাই প্রমাণ করিতে চাহিবে। ঘট না ভাঙ্গিয়াও ব্যাপক হওয়ার বাসনার প্রাবল্য হেতুই লড়াই বাঁধিয়া যায়। ঘটে ঘটে লড়াই চলে কিন্তু আকাশ বসিয়া মজা দেখে। ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও এই প্রকারই ঘটে—এ একটা গণ্ডী কাটিয়া বলিতেছে, আমার ধর্ম্মই সব; ও বলিতেছে, আমার ধর্ম্মই বড়, ক্রমে বাক্ বিতণ্ডা; শেষ রক্তপাত। বল ক্ষয় হয় উভয় পক্ষেরই কিন্তু তর্কের মীমাংসা হয় কি?

ধর্ম্ম বলিতে কেবল যে কতকগুলি বাঁধাবাধি নিয়ম বুঝায়, একথা কোনওরূপেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। বোধ হয় সমাজই ধর্ম্ম; অথবা সমাজ ও ধর্ম্মে কোন পার্থক্য নাই—এই ভ্রান্তিমূলক ধারণা হইতেই পূর্ব্বোক্ত ধারণার জন্ম। •সমাজ• ধর্ম্মভাবের সহায়ক এবং পরিপোষক হইলেও সমাজ এবং ধর্ম্ম এক নহে ইহাতে হয়ত কাহারো আপত্তির কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু সম্প্রদায়িক গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া একথা স্বীকার করা যায় না।

কোনও আচারবান সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে—বলিতে শুনিলাম? ব্রাহ্মণপণ্ডিত না হইলে কাহারো মুক্তি নাই, কারণ তাহার পূর্ণ ধর্ম্ম অর্জ্জিত হয় না। বিশদভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াও এই কথাই বুঝা গেল যে অত্যন্ত ধার্ম্মিক হইলেও প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়া অতঃপর তিনি মোক্ষলাভ করিতে পারেন, ইহার পূর্ব্ব নহে; কারণ সেরূপ না হইলে তাহার পূর্ণ-ধর্ম্ম অর্জ্জন হয় না। তিনি বোধ হয় যীশুখৃষ্টকেও বাদ দিতে চাহেন। ধর্ম্মপ্রচার যে সমাজে বহুল পরিমাণে হয়, সে সমাজে এরূপ কথা হইলে কোনও দুঃখের কারণ হয় না, কিন্তু জ্ঞান স্থবির, শুদ্ধ চিত্ত, মহানুভব ব্রাহ্মণের মুখে একথা অশোভন। খৃষ্টান সমাজের সাধারণ প্রচারকগণ প্রায়ই অন্য সমাজের লোককে অনন্ত নরকে না পাঠাইয়া নিজ সমাজের মহত্ত্ব বুঝাইতে পারেন না। তাই তাঁহাদের কথায় কোনও বুদ্ধিমান এবং বিবেচক ব্যক্তি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। ফল কথা যখন ধর্ম্মের উপর এমন হৃদয়হীন কুঠারাঘাত চলিতে থাকে, তখন বোধ হয় ধর্ম্মের ভাব ছাড়িয়া জাতি, বর্ণ, কিম্বা সমাজকে বড় করিয়া তোলার বাসনাটাই প্রবলতর হইয়া উঠে। যাহাহউক এরূপ ঔদ্ধত্য কখনও মাথা তুলিয়া কোথাও অধিক দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। ফলকথা, আমাদের ক্ষুদ্র বিচারে ইহাই মনে হয় যে মানুষ যেখানে স্রষ্টার নিয়ম তুচ্ছ করিয়া নিজের গঠিত নিয়মকেই বড় করিতে চায়, সেখানে প্রকৃত ধর্ম্ম চাপা পড়িয়া যায়।

যখন হিন্দু সমাজে এইরূপ অন্যায় সঙ্কীর্ণতা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল তখনই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকাশের সুযোগ হইয়াছিল। আবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের কারণও এই। পুনরপি হিন্দু ধর্ম্ম যখন গণ্ডিটাকে ভয়ানক বড় করিয়া সঙ্কীর্ণতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিল তখন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং হৃদয় গ্রাহী বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহুল প্রচার। রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আভির্ভাবও এইরূপ একটা বিশেষ সময়ে হইয়াছে যখন ধর্ম্মের নামে মনুষ্যের সত্য ধর্ম্মটার ব্যভিচার হইতেছিল অর্থাৎ স্রষ্টার অভিপ্রায়ই বিনষ্ট হইতেছিল।

যেখানেই মানুষ দেবতার আহ্বানের আভাষ পাইয়াছে, সেইখানেই অন্যায় বন্ধনের শৃঙ্খল সজোরে উপেক্ষা করিয়া মানুষ সেই করুণাময় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নতুবা যীশুখৃষ্টের করুণ আহ্বানে এত লোক অনুপ্রাণিত হইত না।

অনেক সময় আবার মানুষ পাপের পতাকা উড্ডীন করিয়া পৈশাচিক নৃত্য করিতে করিতেও বলিতে থাকে, আমি ধর্ম্মের কার্য্যই করিতেছি। কিন্তু, ধর্ম্মের মূর্ত্তি এমন তাণ্ডব হইলে সে ধর্ম্ম যেন মানুষের না হয়, সে ধর্ম্মের প্রভাব পৃথিবীর উপর যেন কখনও না আইসে।

মানুষ যখন ধর্ম্ম লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ করিতে থাকে, তখন সে ধর্ম্মের অর্থই ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্মের প্রাণহীন দেহটাকে লইয়া ভৌতিক নৃত্য করিতে থাকে। তাই মনে হয়, যত কলহ বিবাদ সমস্তের মূল কারণই ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া যাওয়া।

ধর্ম্মের অর্থ উপলব্ধি করার পূর্ব্বে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি? ইহা জানা প্রয়োজন। মানব হৃদয়ে ভাব জগতে কতকগুলি বিরাট অনুভূতি আছে, যাহার পূর্ণ বিকাশ হইলে সমস্ত বিশ্বই মানবের পরিচিত এবং প্রিয় হইয়া উঠে; তখন বিচ্ছেদ ভুলিতে হয়, বিরোধ থাকে না—ক্ষুদ্রতা দূরে যায়। ধর্ম্মের কার্য্যই এই প্রশারতাকে জাগাইয়া তোলা—সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে, সঙ্কোচকে দূর করা। এই প্রসারণ ক্রিয়াটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং অনেক সময়ই অসাধ্য প্রায়; কতকগুলি চিত্তশোধক ক্রিয়ার মধ্যে দিয়া না গেলে কখনও চিত্তের তাদৃশ সম্প্রসারণ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্তশোধনের ক্রিয়াগুলির মর্ম্ম উপলব্ধি না করিয়া কার্য্য করার ফলে এই ক্রিয়া গুলিই ভগবানের সমুদয় অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ ফল প্রসূ হইয়া উঠে। যাহাতে এরূপ না হয়, তৎপ্রতি মানব হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই চেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

নিরর্থক অনুষ্ঠানগুলি, অনুষ্ঠানের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। স্পর্শদোষের বায়ুটা এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবেই উল্লেখ যোগ্য। হয় ত কোনও সাধনার সোপান হিসাবে কোনও লোককে বিশেষ ভাবে শুদ্ধাচারী হইয়া থাকা প্রয়োজন; সেই ক্ষেত্রে স্পর্শদোষ বিচার অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু যখন বাহ্য আড়ম্বর সম্বল ব্যক্তি নিসিদ্ধ, হেয় এবং জঘন্য কার্য্য করিয়াও—নিকৃষ্ট জাতিয় ব্যক্তি ঘরের চালে উঠিলেই ধর্ম্ম যায়—ভাবিয়া শুচিতার ভান করেন এবং গৃহমধ্যস্থ আহার্য্য ও পানিয় দ্রব্য ফেলাইয়া দেন, তখন এ কপটাচারের প্রশ্রয় দেওয়া সমাজের পক্ষে উচিত কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের সমাজ এখন এইরূপ কপটাচারের প্রশ্রয় দিয়া ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী হইয়া ঘোরতর অন্যায় এবং অধর্ম্মাচরণ করিতেছে। সুতরাং জগৎহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই অনুষ্ঠানগুলি যাহাতে সার্থক হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন; কারণ ইহাতে পৃথিবীর মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। আমাদের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি এক দিকে যেমন হৃদয়গ্রাহী, অন্যদিকে তেমনি চিত্তশোধক এবং চিত্তের বিকার দূরকারক- ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সঙ্কীর্ণতা ধর্ম্মভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। ধর্ম্মের ন্যায় উদার ব্যাপক জিনিসকে ভাতের হাঁড়ির ভিতর পুরিয়া যে কেবল অন্যায় কার্য্য করা হইতেছে তাহা নহে, পক্ষান্তরে ইহা দ্বারা একটা গুরুতর অধর্ম্মাচরণেরও সমর্থন করা হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে! ফলতঃ যেখানে সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেখানে ধর্ম্ম নাই।

সময়ে সময়ে অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত এবং অসভ্য জাতির কোনও কোনও লোককে দেবদুর্লভ চরিত্রের অধিকারী হইতে দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তখন সত্যই মনে হয়, ধর্ম্মলাভের জন্য প্রণালীর মধ্য দিয়া যাওয়ার কোনই আবশ্যকতা নাই। সভ্যতা ও শিক্ষাভিমানী

ব্যক্তির ব্যভিচার দেখিলেও এই মতই যেন প্রবল হইয়া উঠে। ইহার উল্লেখেই কেহ যেন মনে না করেন, আমরা কোনও বন্ধন এবং নিয়মের বিরুদ্ধবাদী। আমদের বক্তব্য এই—অর্থ না বুঝিয়া নিয়ম পালন অনেক সময়ই মারাত্মক হইয়া উঠে এবং মানব হৃদয়ে স্বাভাবিক মঙ্গলময় যে ভাব আছে, তাহা ভগবৎকৃপায় কখনও কখনও বিনা প্রযত্নেও প্রকাশ পায়।

মোট কথা ধর্ম্ম প্রিয় হইতে হইলে উদার হইতে হয়, প্রাণবান হইতে হয়। প্রাণী হৃদয়ের গোপন ভাব বুঝিতে হইবে এবং বুঝিয়া ভাবের মর্য্যদা রক্ষা করিতে হইবে। সর্ব্বজীবে একাত্ম বোধ চাই। সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুপ্রাণতা জাগাইয়া তুলিতে হইবে—বিরাটকে উপলব্ধি করিতে হইবে—ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই এই।

ধর্ম্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—"যাহা ধারণ করিতে পারে।' এ ধারণ কাহাকে? ব্যক্তিকে না বিশ্বসৃষ্টিকে? ইহাই তর্কিত বিষয় একদলের উত্তর, প্রকৃতিকে, অর্থাৎ সৃষ্টিকে; অপরের উত্তর, ব্যক্তি বিশষকে। প্রত্যেক লোকের মধ্যেই কতকগুলি প্রচ্ছন্ন স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা আছে, সেইগুলি জাগাইয়া তোলার নামই ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্ম সকলের পক্ষেই এক হইতে পারে না। আমার পক্ষে যাহা ধর্ম্ম, অপরের পক্ষে তাহা অধর্ম্মও হইতে পারে। অপর দল বলেন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলে গোলযোগের সম্ভাবনা অধিক থাকে। ব্যক্তির স্বরূপ উপলব্ধি না করিলে বৈষম্যের গোলযোগ বড়ই ভয়াবহ হইয়া উঠে।

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট জাগাইয়া তোলাই ধর্ম্ম হইলে বৈষম্য অবশ্যম্ভাবা; পরস্পর বিরোধ হইবেই হইবে। কাজেই বৈষম্যের মধ্যেও যে সাম্যের স্রোত আছে, সেটাই উপলব্ধি করিয়া নিজের মধ্যে সেই সাম্যের প্রসারণকেই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ঘট তাহার ঘটত্ব বোধ করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু ঘট ভাঙ্গিলেই যে আকাশ, এ বোধটা না জাগিলে ঘটে ঘটে লড়াই অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তি নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেই বিশ্বের সহিত তাহার বিরোধ থাকিবে না। সুতরাং আত্ম-বোধই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। বিশ্বের অংশ আমি, এবং আমার ও বিশ্বের মধ্যে প্রাধান্য নাই—এই বোধ উদ্বোধিত করিলেই ধর্ম্মবোধ যথাযথ হইল।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
( মহারাজা সুসঙ্গ )

---

# স্বপন লোকে।

বহু আগের কথা—যেন এক যুগেরও আগে;
স্বপন দেশে দেখার কথা মনের মাঝে জাগে।
বলার শেষে যে সব কথায় লজ্জা আসে ঘিরে;
মনে মনে ভাবি, সে সব বল্‌বনা আর ফিরে।
যত ভাবি বল্‌ব না এর একটু কারো কাছে;
তত-ই দেখি উপ্‌লে উঠে যে সব কথা আছে।
পেটের মাঝে এক্‌খানে সব হয়ে জড় সড়;
সব সময়ে সবাই মিলে দেয় যাতনা বড়।
জমাট বাঁধা মেঘের মত হৃদয়াকাশ ছেয়ে;
কথার রাশি আস্‌ছে যেন বিপুল বেগে ধেয়ে।
বল্‌গা ছাড়া আলগা মুখে কথা যখন কোটে;
গরম বালুর' পরে যেন খৈ গুলি সব ছোটে।
বোলেই ফেলি, করি কি আর, থাক্‌তে নারি চেপে
বোল্‌ব বলে কেমন যেন মন উঠেছে ক্ষেপে।
"রাত্রি তখন একটা হবে, প্রিয়া আমার পাশে;
ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখে' মৃদু মধুর হাসে।
"একটুখানি হেসে আমি দিলাম দিব্বি ঘুম;
সাড়া শব্দের লেশ্‌মাত্র নাই,—নীরব, নিঝুম।
যুদ্ধ দেখি স্বপ্ন রাজ্যে—জর্ম্মণে ও ইংরেজে;
রণ ডঙ্কা গভীর রবে উঠ্‌ছে তখন বেজে।
সেনা নায়ক ছিলাম যেন মস্ত বড় বীর;
যুদ্ধ কার্য্যে সর্ব্বদা তাই রয়েছি অস্থির।
হঠাৎ দেখি গোলাগুলি সকল গেছে ফুরিয়ে;
কাছে পেয়ে ইটের ঢেলা নিলাম তাই কুড়িয়ে।
"খুব জোড়ে তা ছুঁড়তে গিয়ে গেল প্রিয়ার নাক;
কাঁদছে প্রিয়া, শুনছি ঘুমে—লাগ্‌ল যেন তাক।
ঘুমটা ভেঙ্গে ল্যোচ্‌টা জেলে—তার পরেতে দেখি—
রক্ত গঙ্গা শয্যা খানা! প্রিয়ার নাকে এ কি?
"একে একে মনে হল—যুদ্ধ করার কালে
ঢিল ছুঁড়িতে লাগ্‌ল যে হাত, প্রিয়ার নাকে, গালে!
তাই হলো তার এমন দশা, দেখে জাগে ভয়;
প্রিয়া বলে'ই সয়ে' গেল, নৈলে কে তা সয়?"
নাকের 'পরে এখনো তার আছে একটু দাগ;
এই কথাটি বল্‌লে প্রিয়া করেন বেজায় রাগ।
এখনো সেই মনে পড়ে স্বপন লোকের কথা;
প্রিয়ার পানে চাইলে আরো জাগে মনের ব্যথা।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

# স্নেহের দান।

## দ্বিতীয় খণ্ড।

( ১ )

ডহর জমিদার বাড়ীর এলাকায় এক ক্ষৌরকার গৃহে কিছুদিন হয় এক সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে।

একদিন অতি প্রত্যুষে গৃহ স্বামী নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহার গো গৃহের কার্য্য সমাধা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় সে সেই গৃহের পার্শ্বে,বিল্ববৃক্ষ মূলে এক সন্ন্যাসী ঠাকুরকে উপবিষ্ট দেখিতে পায়। ভক্তিমান গৃহস্থ প্রত্যুষে সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া ভক্তি ভরে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া তারপর চক্ষু উন্মিলন করিয়া বলিলেন— "তোমার নাম নরহরি শীল ?"

গৃহস্থ নরহরি শীল স্বীয় করপল্লব যুক্ত করিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিল—"আজ্ঞা প্রভো "

সন্ন্যাসী বলিলেন "তোমার জয় হউক, আজ তোমার শুভদিন—বল, কৃষ্ণ-চৈতন্য-মধুসূদন-রাম-নারায়ণ-হরে।"

গৃহস্থ নরহরি শীল প্রেম গদগদ কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে নাম লইয়া ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর পদমূলে লুটাইয়া পড়িল। তাহার উচ্চ হরিনাম কীর্ত্তন-ধ্বনি শুনিয়া তাহার ভিতরবাড়ী হইতে ছেলে মেয়েরা আসিয়া জমিল, ক্রমে পাড়া প্রতিবাসীরাও আসিল।

সন্ন্যাসী সকলকেই নামগানে উন্মত্ত করিলেন। সেদিন আর নরহরি নিজ শাসনে বাহির হইল না।

তাড়িত গতিতে এ সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই দুটী ভদ্র যুবক আসিয়া সন্ন্যাসীর চরণে দশ দশটী টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী সেই টাকা কুড়িটী নরহরির দিকে অতি তুচ্ছ ভাবে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"টাকায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। এ টাকার মালিক তুমি, এ যজ্ঞের ফলও তোমার ; ইহাদের আহারের ব্যবস্থা কর, আর দরিদ্র নারায়ণের সেবা কর।"

নরহরি ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে বলিল—'প্রভোর ইচ্ছা।"

সেইদিন দ্বিপ্রহরের পরেই নরহরির গাভীটী একটী বকন বাছুর প্রসব করিল। তার খানিক পরই কতিপয় ব্যক্তি সন্ন্যাসীর জন্য কুলির ঘাড়ে চাপাইয়া চাউল, দাইল, ঘৃত, লবন, তৈল, তরকারী, প্রভৃতি সমন্বিত এক উপঢৌকনের পসরা লইয়া উপস্থিত হইল।

নরহরি আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনা করিয়া উপঢৌকন সামগ্রী গুলি বুঝিয়া লইল। তারপর আগন্তুকগণের জন্য আহারের ব্যবস্থায় নিযুক্ত হইল।

সন্ন্যাসী নরহরিকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, তোমার মঙ্গল হইবে। নরহরি সেই বাণী ভুলিয়া যায়নাই। জমিদারের সহিত নরহরির জমি লইয়া এক মোকদ্দমা বাঁধিয়া ছিল ; পরদিন সেই মোকদ্দমা নরহরির পক্ষে ডিক্রি হইয়া গেল. সুতরাং প্রত্যোষে সন্ন্যাসীর মুখ দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া দর্শনীর অর্থপ্রাপ্তি, গাভীর বকন বাছুর প্রসব, উপঢৌকন সামগ্রী লাভ, মোকদ্দমা জয়—এ সকলি নরহরি সন্ন্যাসী দর্শনের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তখন নরহরির মুখে আর সন্ন্যাসীর প্রসংশা ধরে না। তাহার মুখ হইতে প্রত্যেকটি ঘটনা অলৌকিকতার সংস্পর্শে নানারূপে পল্লবিত হইয়া চারিদিকে প্রচার হইতে লাগিল, আর দলে দলে লোক আসিয়া সন্ন্যাসী দর্শন করিতে লাগিল এবং সন্ন্যাসীকে যাহার যাহা শক্তি উপঢৌকন প্রদান করিতে লাগিল।

সেই হইতে নরহরির গৃহ সন্ন্যাসীর আশ্রমে পরিণত হইয়াছে। আশ্রমে অহোরাত্রি নাম সঙ্গীত হয়। দিনান্তে একবার আহারের ব্যবস্থা।

( ২ )

মাখনের প্রস্থানের পর মণিমোহন তাহার অভাব খুব তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিতেছিল। এই সময় তাহার কর্ণে তাহাদের প্রজা নরহরির গৃহে অকস্মাৎ সাধুর আবির্ভাবের কাহিনী নানা বিচিত্র ঘটনার আবরণে চিত্রিত হইয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

নরহরির সহিত যে তাহাদের মোকদ্দমা চলিতেছিল, তাহার সংবাদ মণিমোহন রাখিত না। মোকদ্দমা না থাকিলেও কোন প্রজার বাড়ীতে মণিমোহনের যাওয়ার সম্মতি যে তাহার মাতাপিতা কেহই দিবেন না, তাহা সে জানিত। অথচ সন্ন্যাসী দেখিবার উগ্র উৎসুক্য তাহাকে এতই ব্যগ্র করিয়া তুলিয়াছিল যে সে কিছুতেই তাহার সেই ইচ্ছা দমন করিয়া উঠিতে পারিল না।

একদিন অপরাহ্নে ভ্রমণের ছলে সে সন্যাসী দর্শন উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল

বৃদ্ধ নরহরি মুনিব জমিদারকে নিজ গৃহে দেখিয়া সন্ন্যাসী দর্শন অপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইয়া গেল। এবং ভয়, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় সে মনিমোহনের পদে লুটাইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী মণিমোহনের পরিচয় পাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

নরহরি তাড়াতাড়ি তাহার গৃহকোণে রক্ষিত একখানা জীর্ণ পুরাতন বেতের আসন আনিয়া তাহা সযত্নে নিজ পরিধান বস্ত্রদ্বারা ঝাঁটিয়া-মুছিয়া তাহার উপর নিজ উত্তরিয় খানা বিছাইয়া মণিমোহনকে বসিতে অনুরোধ করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দাঁড়াইয়া রহিল।

মণিমোহন, নত মস্তকে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া মৃত্তিকায় উপবেশন করিল; সন্ন্যাসীর সম্মুখে অপেক্ষাকৃত উচ্চাসন গ্রহণ করিল না।

সেদিন সন্ন্যাসীর আচরণে ও তাঁহার কথাবার্ত্তায় মণিমোহন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সন্নাসীর উপদেশগুলি সারা রাত তাহার মস্তিষ্কে কার্য্য করিয়াছিল।

পরদিন হইতে জমিদার বাড়ীর ঘুড়িগাড়ী মণিমোহনকে লইয়া দিনে দুইবার করিয়া সাধুর আশ্রমে যাতায়াত করিতে লাগিল।

মণি প্রাতে সাধুর নিকট যাইত, দ্বিপ্রহরে আসিত; আবার দুটার যাইত, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিত।

সারাদিন আশ্রমে নামগান হইত। সে কীর্ত্তন এমনি প্রাণোন্মাদক ছিল যে দেখিতে দেখিতে সে অঞ্চলে সাধুর শিষ্যের সংখ্যা অগণিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল

ক্রমে এ কথা মণির পিতার কর্ণে পঁহুছিল। পিতা পুত্রকে ডাকাইয়া আনিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। প্রজার গৃহে জমিদারের পদার্পনে যে সম্মানের হানি হয়—তাহা বুঝাইলেন; তারপর নরহরির স্পর্দ্ধার কথা, বেয়াদপির কথা বুঝাইয়া মণিকে তথায় যাইতে নিষেধ করিলেন।

সন্ন্যাসীর সহবাসে মণির চরিত্রে যে এক ধারার পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলে সে পিতার কথার প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিল না।

সে মায়ের নিকট সন্ন্যাসীর স্থানান্তরে আশ্রম নির্ম্মাণের টাকা চাহিয়া জেদ করিয়া বসিল।

একমাত্র ছেলের জেদ মা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। স্বামীর নিকট সে কথা উত্থাপন করিয়া নিজেও যথেষ্ট ওকালতি করিলেন। অনেক বাক বিতণ্ডা, মান-অভিমান অভিনয়ের পর জমিদার একঢিলে দুই পাখী মারিবার এক ফন্দি স্থির করিলেন।

ছোট হিস্তার সহিত যে পতিত ভূখণ্ড লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই ভূখণ্ডে তিনি মণিকে তাহার সন্ন্যাসী দেবতার আশ্রম নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

গুপ্ত পরামর্শে স্থির হইল, মনিমোহন যদি ঐ ভূমিতে যাইয়া সন্ন্যাসীকে লইয়া আপাততঃ বসে, তবে ছোট হিস্তার কর্ত্রী মণির বিরুদ্ধে নিশ্চয় কোন প্রতিবাদ করিবেন না। ক্রমে মণি তাহাতে বড় হিস্তার ব্যয়ে ঘর তুলিবে এবং এইরূপে সেই বিস্তৃত ভূমি বড় হিস্তার দখলে আনিবার সহজ পন্থা হইবে।

মন্ত্রণা গুপ্ত রহিল। পরদিন জমিদারের আদেশে মণিমোহনকে লইয়া বড় হিস্তার এক কর্ম্মচারী আশ্রমের স্থান নির্ণয় জন্য গেলেন এবং সেই স্থানই মনোনীত করিয়া আসিলেন।

অল্প কাল মধ্যেই সেই নূতন ভূমিতে আশ্রমের জন্য বিশাল আটচালা গৃহ নির্ম্মিত হইল; শিষ্য ও শিষ্যাদিগের বাস গৃহ, উৎসব গৃহ, অন্তঃপুর, রান্নাঘর, পুষ্করিণী বাগান—একে একে সব নির্ম্মিত হইয়া আশ্রমের শ্রী ও পুলক জাগাইয়া তুলিল।

এইবার সন্ন্যাসীর নাম দূরে সহরে বাজারে প্রচারিত হইতে লাগিল লোকে বলিতে লাগিল, জীবানন্দ স্বামী স্বয়ং কল্কি অবতার।

আশ্রমে কীর্ত্তন ও উৎসবের বিরাম নাই বহু দূর দেশ হইতেও অনেকে স্ত্রী পুত্র, কন্যা, লইয়া আসিয়া সপরিবারে জীবানন্দের নাম-গান কীর্ত্তনের শিষ্য হইয়াছেন ও হইতেছেন।

মণিমোহনের মন সন্ন্যাসীর আচরণে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে এখন সন্ন্যাসী ব্যতীত আর কিছুই জানে না, আর কিছুই বলে না মা পুত্রকে এক দণ্ড গৃহে বসাইয়া

রাখিতে পারেন না; পিতা পুত্রে তো সাক্ষাতই হয়ই না।

এইরূপে আর একটি বৎসর ঘুরিয়া আসিল।

টাকা জলের মত অপব্যয় হইতেছে দেখিয়া জমিদার বাবু বিরক্ত হইয়া স্ত্রীর নিকট পুত্রের সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেন। যথা সময়ে মাতা পুত্রের নিকট স্বামীর অভিযোগের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে সব দিক বজায় রাখিয়া কাজ করিতে অনুরোধ করিলেন।

মণি উত্তর করিল—"আমি বিবাহ করিব না; বিবাহ ব্যাপারে যে বিরাট অপব্যয় হইত, আমি তাহারই অতি সামান্য অংশ মাত্র এই সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেছি—তাহাতেও যদি তোমাদের আপত্তি হয়, আমার মাসিক ব্যয় যাহা বরাদ্দ আছে, বন্ধ করিয়া দাও।"

"বিবাহ করিব না"—শুনিয়া মণির মা পুত্রের ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন; তারপর নিরুপায় হইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যা লইলেন।

জমিদার বাবু নিরুপায় হইয়া বলিলেন—"ছেলের বিবাহ করাইতেই হইবে—তাহাকে তাহার ইচ্ছানুরূপ পাত্রি দেখিতে পাঠাও; প্রয়োজন হইলে ঐ মাখনা ছোকরাকেও আনাইয়া নাও।"

মণির হাতে ধরিয়া মা কাঁদিয়া বিবাহ সম্বন্ধে কর্ত্তার মত জানাইলেন। মণি আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল: তারপর বন্ধন ছিন্ন বিহঙ্গের ন্যায় পিঞ্জরের মায়া ত্যাগ করিল।

মণি গৃহত্যাগ করিয়া জীবাশ্রমে স্থায়ী ভাবে বাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। পুত্রের এই অবস্থা ভাবিয়া মায়ের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। স্বামী স্ত্রীতেও এবিষয় লইয়া যথেষ্ট ঝগড়াঝাটি হইল। জমিদার মহাশয়, পুত্র অবাধ্য ও গিন্নির দরবার অসাধ্য দেখিয়া বাগান বাটীতে অকাল বোধন করিয়া সুরাধুনার পূজায় নিযুক্ত হইলেন।

উপায় হীন হইয়া মণির মা ছোট হিস্যার কর্ত্রীর নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন—'ওগো তুমি তোমার বোন-পুত মাখনকে অনুরোধ করিয়া আনাইয়া দাও; মণি আমার গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া গেলে এ রাজ সংসারের উপায় কি হইবে, আমি কোথায় গিয়া প্রাণ জুড়াইব?

ছোট হিস্যার কর্ত্রী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন— দিদি, মাখনের পরীক্ষা উপস্থিত; তা হইলেও আমি তাহাকে আজই সকল কথা লিখিব, তুমিও একখানা অনুরোধ পত্র তাহাকে লিখ; সে ছেলে বড় অভিমানী এবার পূজায় আইসে নাই; কিন্তু বড় পরোপকারী। দেখিও, মণিকে উদ্ধার করিবার জন্য সে প্রাণ দিবে—পরীক্ষা শেষ করিয়া সে নিশ্চয় আসিবে।'

বড় কর্ত্রী, ছোট কর্ত্রী, কনক—সকলেই সে দিন মাখনকে পরীক্ষা শেষ করিয়া ডহরে আসিবার জন্য চিঠি লিখিলেন।

কনক মাখনের নিকট তাহার প্রতি চিঠিতেই মণির অবস্থা সে যখন যেমন শুনিত, তাহা লিখিত। আজ জেঠাই মার নিকট নূতন করিয়া যাহা শুনিয়াছিল তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা লিখিল। শেষটায়—লিখিল জীবানন্দ স্বামীকে আমরাও একদিন যাইয়া দেখিব, তিনি নাকি স্বয়ং কল্কি অবতার।

( ৩ )

ডহর হইতে মাখন রায়পুর হইয়া কলেজ খুলিবার পূর্ব্বেই নৈহাটি গিয়াছিল। তখন সতুর মা তাহাকে আবদ্ধ করিয়া ধরিলেন—"এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যদি তুমি এখানে থাক, এবং এখান হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিয়া কলেজ কর, তবে সতুর পরীক্ষায় পাস হওয়া সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি; তোমার দেখা দেখি সে পড়িবে এবং তোমার নিকট বুঝিয়া লইয়া শিক্ষা করিবে—তারপর পরীক্ষায় পাস অদৃষ্টের কথা।"

মাখন অস্বীকার করিতে পারিল না। অনেক স্থলেই এক জনের যাহাতে উপকার হয়, এমন কার্য্যের ভার সে নিজ হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গ্রহণ করি, আর এতো কত বড় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থল; তারপরও নিতান্ত বন্ধু ব্যক্তির উপকার। সুতরাং গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাখন নৈহাটী থাকিয়াই কলেজ করিতে লাগিল।

এই ব্যবস্থায় সতুর প্রকৃত প্রস্তাবেই উপকার হইয়াছে। সে আশাতীত ফল লাভ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তারপর মাখনের সহিত একত্র আসিয়া কলিকাতায় মাখনের পূর্ব্ব বাসায় ভর্ত্তি হইয়া কলেজে পাঠ করিতেছে।

মাখন গ্রীষ্মের বন্ধে রায়পুর গিয়াছিল এবং তথা

হইতে তাহার জেঠা মহাশয়ের অনুসন্ধানে আরো কয়েকটা স্থানে গিয়াছিল কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

মাসীমার নিকট ও কনকের নিকট মাখন রীতিমত চিঠি লিখিত; মাসীমা এবং কনকও মাখনের নিকট রীতিমত চিঠি লিখিত। এই দেড় বৎসর মধ্যে মাসীমা আরও দুই বারে চারিশত টাকা পাঠাইয়াছেন, তাহা মাখন রাখিয়াছে। আর রাখিবেনা লিখায়, তিনি আর পাঠান নাই।

গোপী ভাণ্ডারা মণি বাবুর মাতাঠাকুরাণীর কর্ণে পুত্রের বৈরাগ্য ভাবের সবিশেষ ব্যাখ্যা করিতে কাল বিলম্ব করিয়াছিল না; জমিদার গৃহিণীও যথা সময়েই জমিদার বাবুর কর্ণে বিষম আপত্তির সহিত সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া পুত্রের কলিকাতায় পাঁচ জাতের সহিত হোটেলবাস ব্যবস্থা খণ্ডনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; মুসাহেববর্গও যে সেসকল কথা শুনিয়াছিল—এ সকলের আভাস পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়া আসিয়াছেন।

এই ত্রয়োস্পর্শের সংস্পর্শে মণিবাবুর কলিকাতা যাইয়া পড়িবার ব্যবস্থা রহিত হইয়া গিয়াছিল এবং নূতন ব্যবস্থার—জমিদারী চালে হচ্ছে হইতেছে' করিয়া—কাল বিলম্ব হইতেছিল।

এই দীর্ঘ সুদীর্ঘতার সুযোগে মণির অবস্থা কি হইয়াছে, পাঠক পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পরিচ্ছেদে তাহা অবগত হইয়াছেন

মণি মাখনকে ভুলিয়া যায় নাই। মাখনও মণিকে ভুলিয়া যায় নাই। মণি যখন যাহা করিতেছে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা মাখনকে পত্র দ্বারা জানাইতেছে।

গত দেড় বৎসরের মধ্যে ইহা অপেক্ষা বিশেষ আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

আজ মাখন ডহর হইতে তিন খানা এবং জীবাশ্রম হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছে। ডহর হইতে মণির মার, মাসীমার ও কনকের পত্র এবং জীবাশ্রম হইতে মণির পত্র। কলেজ হইতে আসিয়া মাখন মণিরমার ও মাসীমার চিঠি দুখানার উত্তর লিখিয়া ফেলিল। আজ আর সময় নাই, সুতরাং লিখা চিঠিগুলি পড়িয়া দেখিতে লাগিল।

মাখন মাসীমার নিকট লিখিয়াছে—

"শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

মাসীমা আজ অনেকগুলি চিঠি একত্র পাইয়াছি। তন্মধ্যে কেবল আপনার চিঠির ও মণির মার চিঠির আজ উত্তর দিলাম; কনক ও মণির চিঠির উত্তর অবসর ক্রমে দিব।

মণি প্রায়ই আমাকে তাহাদের জীবাশ্রমের সংবাদ দেয়; তাহারা যে সাম্বৎসরিক অহোরাত্র কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে আপনাদের সহানুভূতি থাকা উচিত। উহাতে একাধারে সাধু সঙ্গে জীবন পরিচালনা ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা—উভয় কার্য্যই সাধিত হয়। ধনবানের অর্থ যেরূপ অপব্যবহারে যাওয়ার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয়, মণির ব্যাপারে যে ব্যয় হইতেছে ও হইয়াছে, তাহাই আপনাদের রাজ সংসারের একমাত্র সদ্ব্যয়। আমার অনুরোধ, আপনারা একদিন যাইয়া তাহা দেখিয়া আসিবেন; মনে রাখিবেন অবশ্য, যে ধর্ম্মের নামে ও সৎকার্য্যের নামে অনেক ক্ষেত্রেই পাপের অভিনয় হয় এবং কুলোকের কুকার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। দেখিয়া যদি মনে বুঝেন যে মণি প্রকৃতই কুকার্য্য করিতেছে না—যথার্থই জন সেবা—দরিদ্রের—অন্নহীনের সাহায্য করিতেছে, তবে আমার প্রার্থনা আপনিও যথা শক্তি তাহাতে সাহায্য করিবেন।

মণির বিবাহের বয়স যায় নাই। যাহা হউক, তাহার মাতাঠাকুরাণীকে আমি বিবাহ স্থির করিতে লিখিলাম, বৈশাখে-জ্যৈষ্ঠে যাহাতে বিবাহ হইতে পারে, আমি পরীক্ষা শেষ করিয়া আসিয়া তাহার চেষ্টা করিব।

চৈত্র সংক্রান্তিতে মণিদের জীবাশ্রমের অহোরাত্র বার্ষিক উৎসব শেষ হইবে। আমাকে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য সে পূর্ব্বাবধি লিখিতেছে, এসময় পরীক্ষা, সুতরাং কছুতেই আসিতে পারিব না।

মণি গৃহ ছাড়িয়াছে, পিতামাতার আদেশ অগ্রাহ্য করিতেছে, এগুলি সর্ব্বদাই দোষনীয়। নিতান্ত অনোন্যপায় না হইলে মানুষ তাহা করে না। তাহাকে তাহার মতের বিরুদ্ধে বিরক্ত করারই অবশ্যম্ভাবী ফল এগুলি। ধর্ম্মোন্মত্ততা জন্মিলেও লোক এরূপ করিয়া থাকে। উন্মত্ততা—ধর্ম্মেই হউক, কর্ম্মেই হউক, যে কোন বিভাগেই হউক—জীবনের পক্ষে অনিষ্ট কর।

মণির বাবা যদি এক দিন আশ্রমে যান, তবে আশ্রমের

যথেষ্ট উপকার হইবে। স্নেহের প্রতিদান আছে, মণিও নিশ্চয় তাহা হইলে তাঁহার সহিত গৃহে আসিবে। অনুকূল পন্থা অবলম্বন ব্যতীত আজকালকার যুবকদিগকে বাধ্য রাখিবার অন্য উপায় নাই। পিতাকে পুত্রের আদর্শ স্থানীয় হইয়া অতি সাবধানে চলিতে হইবে।

আর টাকা পাঠাইবেন না। এত টাকার আমার মোটেই প্রয়োজন নাই। সময়ে ইহার সদ্ব্যবস্থা করিব বলিয়া রাখিয়াছি। টাকাটা হাতে থাকায় এখন সুস্থমনে পরীক্ষার পড়ায় মন দিতে পারিতেছি। দুইশত টাকার পরিমাণ ব্যয় করিয়াছি আর একশত টাকা পরীক্ষার ফিস ইত্যাদিতে যাইবে। বাকী দুইশত টাকাজন-সেবার ব্যয় করিব মনে করিয়াছি। না চাহিলে আর পাঠাইবেন না।

আপনাদের উকীল বাঁশরী বাবুর পুত্র এবার বি, এ, দিবে। দিব্বি ছেলে, কনকের সহিত প্রস্তাব চলিতে পারে কি না দেখিবেন। লিখিলে আমি পরীক্ষার পর একাই সব কথা শেষ করিয়া আসিব।......

স্নেহের মাখন।

(ক্রমশঃ)

---

# কালির আঁচড়।

## সহরে কেরাণী।

ছ্যাক্‌রা গাড়ীর ঘোড়ার মত
রুগ্ন বেজায়, দৌড়ে রত!
কথায় কথায় বিবেক-বলি!
শুক্‌নো হৃদয়, শূন্য থলি!

—:—

## সাঁওতাল দম্পতী।

ঝড়, বাদল্-ঝড়্-বাত্, মাদল্-সংঘাত,
নাচন এক সাথ লুটি'!
সদা, নেশায় মশ্‌গুল্, মাতাল বিল্‌কুল্,
বনের বুল্‌বুল্ দুটি!

—:—

## সদ্য বিধবা যুবতী।

কোথা আজি সিঁথে সিন্দুর!
ওষ্ঠাধর শুষ্ক উজ্জ্বল!
একা একা আঁখি-বর্ষণ!
শূন্য হাত, অঙ্গ কজ্জল!
নাহি হাসি, নাহি উল্লাস!
শুভ্র বেশ, দীর্ণ অন্তর!
বৃথা বাঁচা, বৃথা যৌবন!
মিথ্যা সব, ঝাঁজরা পঞ্জর!

—:—

## আপিসের বড়বাবু।

চক্‌ চক্‌ শিরের খোল্‌তাই বাহার!
হক্‌ রোজ বাবুর ঘুস খুব আহার!
দুই চোখ রাঙায় দুষমন্ বাঁদর!
জাৎ ভাই খ্যাদায়, কই তার আদর?
চুক্‌লির জোরেই কাজ তার বজায়!
আর লুস্-সাহেব জাৎ কুল মজায়!

—:—

## লাঞ্ছিতা নারী।

একলা রাতদিন কেবল খাট্‌ছে!
কোথা, যশ কই! শুধুই শাসন!
ময়লা বস্ত্রের বিকট গন্ধ!
মাজে এক্‌লাই বাড়ীর বাসন!
রান্না চলছেই; সময় পায় না,
ছেলে দেখবার, ব্যথায় কাঁদার!
অঙ্গে বল নাই, শরীর রুগ্ন,
তবু খাট্‌ছেই! জীবন আঁধার!

—:—

## বামুন পণ্ডিত।

শীর্ষে একগোছ দীর্ঘ কেশ,
পুষ্প ঝুল্‌ছেন—দেখতে বেশ!
গুম্ফ শ্মশ্রুর বংশ লোপ,
ক্ষুদ্র দৃষ্টির রুদ্র কোপ!
বিদ্যা দিগ্‌গজ, মস্ত পেট,
নিত্য মস্তক স্বার্থে হেঁট্!
হিংসা ভর্‌পুর্, ছোট্ট প্রাণ,
হিন্দু শাস্তর মূর্ত্তিমান্!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

# বৃন্দাবনের কথা।

ভারতীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর সর্ব্বপ্রধান তীর্থ, শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রিয় লীলাভূমি বৃন্দাবনের বিবরণ কিছু না কিছু অবগত নহেন এমন হিন্দু অথবা এমন বৈষ্ণব ভারতবর্ষে অতি বিরল। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান হিন্দুস্থান, পঞ্চনদ প্রভৃতি ভারতের সমগ্র প্রদেশে রাধা কৃষ্ণের স্বর্গীয় লীলা সমাজের ভিতর না হউক সাহিত্যের ভিতর অতি বিশদ ভাবেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সে সকল বৈষ্ণব সাহিত্যের আদর কয়জনে করেন বা করিতে জানেন তাহা আমাদের বিদিত না থাকিলেও উল্লিখিত প্রত্যেক প্রদেশেই যে রাধা কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে ইহা আমাদের সম্পূর্ণ বিদিত আছে। পৌরাণিক গণ পুরাণ পাঠ কালে, কথক মহাশয়গণ কথকথার সময় শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের বিচিত্র লীলা শতমুখে শত ভাবে বর্ণনা করেন; বর্ণনা করিতে করিতে রসে প্রেমে ও ভাবে মাতোয়ারা হন। ইহা যে শুধু বঙ্গদেশেরই ঘরোয়া কথা তাহা নহে, বিহার ও হিন্দুস্থানের বটগাছের তলায়, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কুটির প্রাঙ্গনে এমন কি শিখ সম্প্রদায়ের গুরু সমাজে ও কথক এবং পাঠক মহোদয়গণ গুরু-গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট হইয়া - মাথায় পাগড়ী, গায়ে চাঁদর এবং কপালে ও সর্ব্বগাত্রে ভস্ম বা চন্দনের রেখায় বিভূষিত হইয়া—রাধা কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা দ্বারা শত শত শ্রোতায় মনঃ প্রাণ আকর্ষণ করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও পাঠ বৎসরের মধ্যে দুই একবার হয়না তেমন দেশ, অন্ততঃ তেমন হিন্দুর বসতি আমাদের দেশে অতি কমই আছে। সংস্কৃত ভাষার প্রচলন যে সকল দেশে পূর্ব্বে অতি মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ছিল সে সকল দেশ সম্বন্ধেত কোন কথাই হইতে পারেনা পরন্তু অপরাপর দেশে সংস্কৃত ভাষা হইতে অনূদিত হইয়া অপরাপর ভাষায় ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে ভাগবতের দশম স্কন্ধ কৃষ্ণলীলায় পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ এই দশম স্কন্ধেরই সর্ব্বত্র আদর।

বৃন্দাবনের ভৌগলিক কাহিনী বা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত চিত্রিত করা এই ক্ষুদ্র রচনার উদ্দেশ্য নহে। ইহার উদ্দেশ্য বর্ত্তমান সময় বৃন্দাবনের—অথবা বৃন্দাবন সহরের ( ? )—পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিরূপ তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা। বহু বহু গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত তীর্থ বিবরণে, বহু বহু পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বৃন্দাবনের প্রাচীন ও আধুনিক সকল তথ্যই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে এমন কি ভারতের কোন প্রদেশ হইতে বৃন্দাবনে আগমনের রেলওয়ে ভাড়া কত, জিনিষ পত্রের মূল্য কত এই সকল সংবাদ পর্য্যন্ত সেই পুস্তকে অবগত হওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র রচনায় এসকলের বিশেষ কিছুই নাই; আছে শুধু বর্ত্তমান বৃন্দাবনের কয়েকটি কথা। আর আছে প্রাচীন হইতে বর্ত্তমানের বিভিন্নতা জন্য কতিপয় অপ্রাকৃত অসামঞ্জস্য। পুথির-লেখা বৃন্দাবনে এবং আজকাল কা'র চোখের দেখা বৃন্দাবনে কতটুকু পার্থক্য পাঠকগণ এই প্রবন্ধে তাহারই একটু ক্ষীণ আভাস প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান সময়ের অযোধ্যা দর্শনে কবির হৃদয় দুঃখে ও ক্ষোভে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল "হায় অযোধ্যার আর সেই দিন নাই, সে রাম ও নাই, সে অযোধ্যা ও নাই" বৃন্দাবন সম্বন্ধে ও ঠিক সেই আক্ষেপোক্তিই প্রযোজ্য। "নন্দকুল ইন্দু বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।" অহো "কি কথা শোনালে কবি?" বৃন্দাবন আছে! অথচ বৃন্দা ও নাই বন ও নাই! এ তবে কেমন বৃন্দাবন! এ কি তবে বৃন্দাবন সহর! অথবা বহু বহু সুরম্য-হর্ম্ম্য-বিনির্ম্মিত সুদীর্ঘ রাজ পথ পরিবেষ্টিত, ভক্ত অভক্ত, সাধু, পাপী, গৃহী সন্ন্যাসী, হিন্দু অহিন্দু, বৈষ্ণব বৌদ্ধ, মুসলমান খৃষ্টান অধিষ্ঠিত জন বহুল সুসমৃদ্ধ নগর?

সেখানে কি এখনও "যমুনা পুলিনে ব'সে রাধা বিনোদিনী কাঁদেন?" যমুনা এখনও আছে বটে কিন্তু যমুনায় সেই খরতর প্রবাহ নাই। কালিন্দীর কূলে এখন আর "বৃন্দাবনের কাল শশী নিয়ে চূড়া মোহন বাঁশী বামে নিয়ে রাধিকা রূপসী" বিরাজ করেনা। বিরাজ যদি করেও, তথাপি তাহা অভক্তের দৃষ্টি পথে আসেনা। চর্ম্ম-চক্ষের সেই দর্শন শক্তি নাই, জ্ঞান চক্ষুর আছে।

বৃন্দাবনের বর্ত্তমান বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া আমাদের এক প্রিয়তম ছাত্র এক খানা ক্ষুদ্রতমপত্রে যতটুকু লিখিতে পারিয়াছে তাহা পাঠক বর্গের গোচর করিলে অবশ্য ইহাতে একদিন না একদিন কাহারও কিছু উপকারে দর্শিতে পারে। বিশেষতঃ যাহারা বর্ত্তমান সময় তীর্থ উদ্দেশ্যে
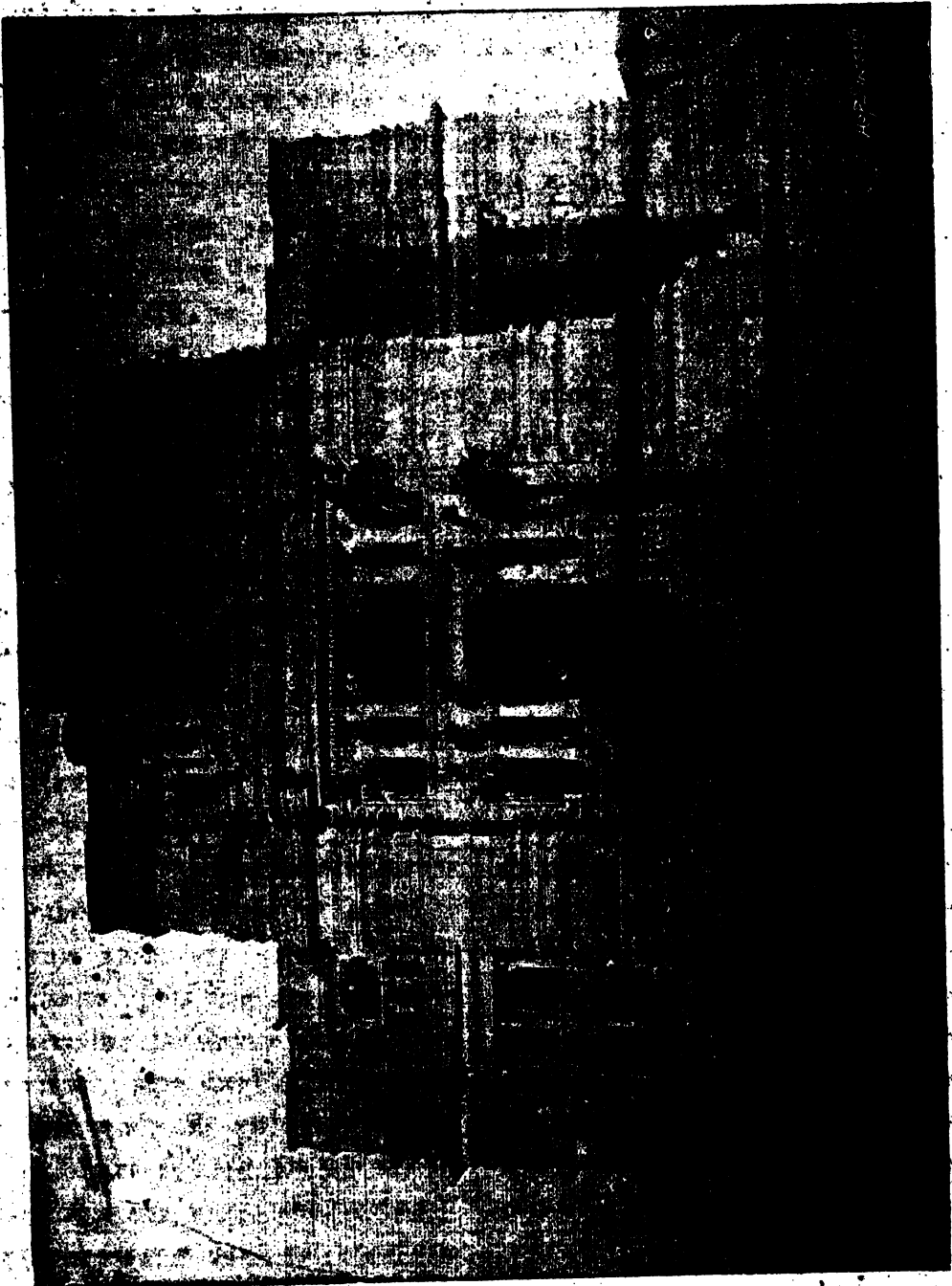
বৃন্দাবন গমনাভিলাষী তাদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে বর্ত্তমানেই ইহা কথঞ্চিৎ প্রয়োজনে আসিবে।

শ্রীশ্রীচরণেষু—

অসংখ্য প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন এই বাস্তবিকই আপনার পত্রখানি পেয়ে আমার মন গরবে ভ'রে উঠছে যে আমি আপনার কত প্রিয়। আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য। আমার এখানে আসার কারণ——

১। এখানে বাঙ্গালা দেশ হইতে খরচ পত্র কম। Messing charge আট টাকা। আমি যে কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি তাহা free institution.

২। এটী জাতীয় বিদ্যালয় বা National college নন্-কো-অপারেশনের উপর অনেকটা ঝোঁক আছে।

৩। বেড়াবার সখও একটু আছে। পড়াশুনা ও বেড়ান দুই যদি হয় মন্দ কি?

যখন এখানে এসেছি, তখন আর শুধুই ফিরে যাবনা। আমাদের পড়াশুনা বেশ হচ্ছে। পূজোর ছুটি এখানে মাত্র তিন দিন (বাঙ্গালা দেশের মত লম্বা নহে) সুতরাং সে সময় বাড়ী যাওয়া হবেনা। আপনার সঙ্গে দেখা হবেনা বলে—বিশেষ দুঃখিত। গ্রীষ্মের ছুটিতে দেখা করতে চেষ্টা করব। সে সময় কোথায় থাকবেন সংবাদ দিবেন। যে-যে বিষয় জানবার দরকার হয় আমায় লিখ্‌লে যথা সাধ্য জানাতে ত্রুটি কর্‌বনা।

আমি থাকতে থাকতে যদি দয়া করে এখানে একবার আসেন তবে বিশেষ কৃতার্থ হই। এখানে—প্লেগ—হয়না। বাড়ীভাড়ার দরকার নাই। সহরের বাহিরে ষ্টেশনের নিকটে একটী বেশ বড় ও সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে, সেখানেই অনেক ভদ্রলোক বাসা নিয়া থাকেন। ওখানে আপনার ও থাকিবার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করব। তা না হয় বাড়ীভাড়া নেওয়া যাবে। এখানে আসিতে দুইটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হ'তে হয়। প্রথম পাণ্ডাদের কবল; দ্বিতীয়তঃ বানরের অত্যাচার। অপর যাহা যাহা জান্‌বার দরকার হয় দয়া করে লিখ্‌বেন।

বৃন্দাবনে অনেক মন্দির আছে, তার মাঝে কয়েকটী বেশ সুন্দর। প্রাচীন মন্দির গুলির মধ্যে গোবিন্দজীর প্রাচীন মন্দির ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সবটা রক্ত প্রস্তরে গঠিত; আওরেঙ্গজেব তাহার ধ্বংশ সাধন করিয়াছিলেন। এখন ও তাহার ধ্বংশাবশেষ বিরাট আকারে অবস্থিত আছে। তাহার এক খানা চিত্র পাঠাইলাম। মদনমোহন এবং গোপীনাথ জীর মন্দিরের ও এই অবস্থা—তাহাতে এখন দেবতার স্থানে চাম চিকার বাস। আসল দেবতা জয়পুরে আছেন নকল দেবতা নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহাও অতি প্রাচীন। ঝুলনের উৎসব এখানকার বড় উৎসব। সে সময় নূতন মন্দির গুলি নানা রূপে সাজান হয়। তবে বৃন্দাবনের সে সৌন্দর্য্য আর নাই। প্রাচীন মন্দির গুলি ক্রমেই ধ্বংস স্তূপে পরিণত হচ্ছে। যমুনা ক্রমেই বৃন্দাবন ছাড়িয়া দূরে যাচ্ছে। ঘাট গুলি সমস্তই শুষ্ক। কেবল কেশী ঘাটে* সামান্য জল আছে, তাও আবার পচা দুর্গন্ধ, ব্যবহারে অযোগ্য; গ্রীষ্মকালে (নাকি) একে বারেই শুকিয়ে যাবে। নদীতে ও বর্ষাছাড়া অন্য সময় অল্পই জল থাকে। এই জন্য এখান কার স্বাস্থ্য ভাল নয়। বাঙ্গালার মতই এখানে ম্যালেরিয়া হয়। এখানে গ্রীষ্মকালে যেমন প্রচণ্ড গরম শীতকালে তেমনই প্রবল শীত। দিনে মাছির অত্যাচার, রাত্রে মশা। জলে কচ্ছপ স্থলে বানর। আর বৈরাগীকুলের অত্যাচারও কম নহে। বৃন্দাবনে ঢুক্‌তেই সর্ব্বাঙ্গে ছাপ কাটা গলায় কুড়োজালি ঝুলান, ঐ সকল জীবের সহিত প্রথম আলাপ হয়। সর্ব্বদাই তাহাদের গলায় হরিনামের ঝোলা; অথচ কি আশ্চর্য্য, যে হাতে খাচ্ছে মালা ঠক ঠক্ করছে। এটো জ্ঞান একেবারে নাই। ইহাদের চেহারা দেখলেই বুঝাযায় যে এদের চরিত্র খুব খারাপ, অথচ ধর্ম্মের ভাণ ক'রে কেবলি শীকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। লোকের আর্থিক অবস্থা সাধারণতঃ গরীব। চরিত্র খারাপ। ঘি টাকায় ছয় ছটাক, দুধ চারসের।

সহরের মধ্যে আমি কোথাও মাধুরী দেখতে পেলেম না। সমস্তই ভণ্ডামী ব'লে বোধ হয়। বৃন্দাবনের প্রাণ সেই প্রেমরস আর নাই; আছে শুধু শুষ্ক কঙ্কাল পড়িয়া। এখন বনের বদলে যে দিকে তাকানো যায় সেই দিকেই শুধু দালান আর দালান। তবে সহরের বাহিরে জঙ্গলের মধ্যে যমুনার ধারে ধারে এবং নদীর পর পারের ক্ষুদ্র গ্রাম গুলিতে

* কেশী নামক দৈত্য বিশেষের নাম অনুসারে কেশীঘাট নাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—কেশী নিসূদন।

এখনও যেন কৃষ্ণের বাঁশীর সুর শুনতে পাওয়া যায়। কে যেন সবকে করুণ মধুর সুরে ডাকে! সেখানে ময়ূরের ডাকে বর্ষা আসে, হরিণের খেলায় সেখানে উষা আসে। আমাদের বাঙ্গলার যেমন কাক, এদিকে তেমনি ময়ূর ও টিয়া পাখী। এখানকার ছাগলগুলি বেশ সুন্দর। কোন সুদূর পুরাতন স্মৃতির স্বপ্নে যেন এই সকল স্থানকে ছেয়ে রেখেছে! বড় মধুর! বড় মনোরম! * *

অধ্যাপকের নিকট শিষ্যের বা শিক্ষকের নিকট ছাত্রের এতাদৃশ সরলভাবে সরলপ্রাণের সকলকথা সরল ভাষায় বর্ণনা করা বড় মধুর বড় পবিত্র। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই তথাপি সে প্রিয়তম শিষ্যেরই মত ভক্তি শ্রদ্ধার মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া অতি বিনীত ভাবে হৃদয়ের ভাব নিবেদন করিয়াছে। তাহাদের কোমল বয়সের কোমল লেখনীতে যে এমন সুন্দর বর্ণনা এক কোমল ভাষার বিকাশ পাইবে তাহা আমাদের পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। মানুষের মানসিকবৃত্তি কখন যে কি ভাবে স্ফুরিত হয় তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের ও জ্ঞানের অতীত। বৃন্দাবনের লুপ্ত গৌরবের স্মৃতিতে বর্ত্তমানকালে সকলের হৃদয় আকুলিত হয় না বটে কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে ভগবানের করুণা প্রচ্ছন্ন ভাবে লুপ্ত বা লুকায়িত থাকে যাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্ম পরিপাকে ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে তিনি অতীতের মধ্যে ও বর্ত্তমানের সনিস্তারীক্ষণ করেন, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ করেন।

জ্ঞানিজনকে বলিয়া দিতে হয় না যে তুমি জ্ঞানচর্চ্চা কর, ভাবুককে বলিয়া দিতে হয় না যে তুমি জাগতিক সকল ব্যাপারের ভাবে অহোরাত্র প্রমত্ত। কবিকে বলিয়া দিতে হয় না যে তুমি কবিত্ব সুধায় জগৎ প্লাবিত কর। তাঁহার স্বভাব-সুন্দর কবিত্ব শক্তি আপনা আপনি বিকসিত হয়, তাই আমাদের পরম ভক্ত যোগী কবি কৃষ্ণানন্দস্বামী গাহিয়াছেন "যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী!" যমুনা লহরীর কবি সেই সুরে সুর মিশাইয়া সমগুণ প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিলেন।

বিমল সলিলে—বহিছ সদা
তট শালিনী সুন্দর যমুনে ও!" * ২

আক্ষেপ শুধু এই নিমিত্ত, নাহি সেই যমুনা, নাই সেই বৃন্দাবন। আছে শুধু অতীতের স্মৃতি।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

# নাগা রাজ্যে কয়বৎসর।

রাজ কার্য্যে আদিষ্ট হইয়া আমাকে কিছু কাল নাগা রাজ্যে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। সেই সময় সেখানকার অধিবাসী সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহার সম্বন্ধে দুই চারটী কথা বলিতে প্রয়াস পাইব।

জগতের যাবতীয় সুসভ্য জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে যেমন মনে আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে তেমনি পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি, আহার বিহার পরিচ্ছদাদি বিষয় অবগত হইলেও মনে যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল অসভ্য জাতিদের হিংসা দ্বেষ ক্রোধ প্রতিহিংসা প্রভৃতি নীচ বৃত্তির সহিত একতা, পরোপকার অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ নিচয়ের একত্র সমাবেশ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

নাগা জাতি আসামের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ ভাগে বস বাস করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় ৬৪০০

আউ নাগা।

বর্গ মাইল অধিকার করিয়া আছে। ইহাদের জন সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক হইবে। বৃটিশ অধিকার ভুক্ত প্রদেশে ইহারা

সেমি নাগা, আঙ্গামি নাগা, লোটা নাগা, কাচা নাগা ও রেঙ্গমি নাগা আউ নাগা মিরিং নাগা এই কয় ভাগে বিভক্ত।

নাগা জাতির উৎপত্তি সংস্কৃত নাগা শব্দ হইতে হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে ইহারা ন্যাংটা (উলঙ্গ) থাকে বলিয়া ইহাদিগকে নাগা বলে।

ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চীনের উত্তর পশ্চীম সীমান্ত হইতে যে সকল আদিম অধিবাসীগণ পলায়ন করে তাহারাই বর্ত্তমান নাগাগণের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।

নাগারা উর্দ্ধে সাধারণতঃ প্রায় চারি হস্তে পরিমিত হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে স্থূলাকৃতি লোকের বড়ই অভাব। তাহারা যখন গৃহে থাকে তখন অধিকাংশ সময় উলঙ্গ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে স্ত্রীলোক বা পুরুষ কেহ কোন রূপ লজ্জা বোধ করেনা। ইহারা বলিষ্ঠ, ইহাদের নাক চেপটা। ইহারা সাহসী যোদ্ধা, কিন্তু বিশ্বাস ঘাতক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই পোষাক ও অলঙ্কার ব্যবহার করিতে ভালবাসে। লোমযুক্ত বস্ত্র নানা বর্ণের প্রস্তরের ও কড়ির মালা তাহাদেব প্রধান অলঙ্কার। মাথার কেশে গাইট বাঁধিয়া তাহেতে অর্দ্ধ গোলাকৃতি কাষ্ঠ নির্ম্মিত চিরুণী সংবদ্ধ করিয়া রাখা তাহাদের প্রথা।

নাগা গণ Indo chinese এর বংশধর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাদের সকলেরই রীতিনীতি সেই আদিম কালের অসভ্যজনোচিত। ইহাদের কথিত ভাষা এত বিভিন্ন যে পরস্পর হইতে দিন মান পথ দূরস্থ দুইটী গ্রামের অধিবাসীগণ অনুবাদক সাহায্যে পরস্পরের কথা বুঝিয়া থাকে।

রেংমা নামক পাহাড়ের অধিবাসীগণ রেংমা বলিয়া পরিচিত। তথায় ইহাদের জন সংখ্যা কম। ইহারা সাধারণতঃ একটু নীরিহ প্রকৃতির। মিকিরদের সহিত একত্র বাস করিতে করিতে রেংমাদের বেশভূষা চাল চলন বর্ত্তমান সময় মিকির দের মত। বাঙ্গালি বণিকগণের সহিত রেংমাগণ লেনবানিজ্য করিয়া থাকে। উহাদের বাণিজ্য পথ যমুনা নদী। কোহিমার ঠিক উত্তরে যে নয়টী গ্রাম তথাকার অধিবাসীগণ রেংমা। এক সময় ভুক্ত হওয়াতে উক্ত নয়টী গ্রামের অধিবাসীগণ অত্যন্ত প্রবল। ইহাদের অত্র যুদ্ধ প্রিয় অংগামি জাতী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দুর্ব্বল লেংটা জাতির প্রতি কোন ও অত্যাচার করিতে পারে নাই। এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে রেংমা গণের আদিম বাসস্থান ছিল ধান্তশ্রী হইতে পূর্ব্বদিকস্থিত পর্ব্বত মালা। কিন্তু আত্মকলহ ও অত্যন্ত অধিক পরাক্রান্ত নাগাজাতি কর্ত্তৃক উপদ্রবে ইহারা ইহাদের পূর্ব্ববাস ভূমি ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান আবাস স্থান পলাইয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহাদের গ্রাম গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, প্রাকৃতিক অবস্থিতি হেতু দুর্গম। লৌহজাত দ্রব্যাদী রেংমাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল প্রস্তুত করিতে পারে।

রেংমাগণ বহু ঈশ্বরবাদী। তাহারা দেবতার উদ্দেশ্যে গরু শূকর এবং পক্ষী বলিদান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিবাহ পারিবারিক চুক্তি। বিবাহে কেবল পাত্রীও তাহার মাতা পিতার সম্মতি আবশ্যক। বরকর্ত্তৃক সমস্ত গ্রামবাসীগণকে ভোজ প্রদান ব্যতীত বিবাহে আর কোনও উৎসব হয় না।

অংগামীও কাছা নাগানণ নাগাহিলস জিলার অগ্নি নৈঋত কোণে অবস্থিত গ্রাম সমূহে বস বাস করিয়া থাকে। উহারা দেখিতে বেশ। বলিষ্ট দেহ, পীতবর্ণ, নাক চেপ্টা, গণ্ডাস্থি উন্নত। উহারা সাহসী ও সমর প্রিয়,—তবে বিশ্বাস ঘাতক ও প্রতিহিংসা পরায়ণ। ইহারা কড়ির মালা নীল বা কৃষ্ণ ছাগলের লোম যুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে, উহারা স্বহস্ত নির্ম্মিত বস্ত্র খণ্ড স্কন্ধ দেশে ঝুলাইয়া রাখে। বন্য শূকরের দন্ত উহাদের কণ্ঠহার। উহাদের মধ্যে যাহারা সৈনিক পুরুষ তাহারা রক্তবর্ণে রঞ্জিত ছাগলের লোমে তৈয়ারী একটা বিশিষ্ট প্রকারের গলা বেষ্টনী আগ্রহ সহকারে পরিধান করিয়া থাকে। ঐ বেষ্টনীটী নিহত শত্রুর চুর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। গলদেশে নানা বর্ণের কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড (মণি) একটী সুতা দিয়া গাঁথা, আর হাতে

সেই সূত্রেই দোলায়মান একটী শঙ্খ। কনুই দেশের উপর বাহুতে উহাদের অলঙ্কার বাহু বলয় হস্তী দন্ত বা লাল পীত-

চুল কাটিতেছে।

বর্ণ বেত্র জাল দ্বারা নির্ম্মিত। হনু ও জঙ্ঘা দেশের মধ্য ভাগে বেত্র নির্ম্মিত বলয়। সম্মুখ ভাগস্থ মাথার কেশ রাশি সাধারণতঃ সমচতুষ্কোণাকারে ছাটান। পশ্চাৎভাগস্থ কেশরাশি উহারা ঈগল পক্ষীর পালক দ্বারা গাইটাকারে বাঁধিয়া রাখে।

নাগা নারীগণ—আকৃতিতে খাট। উহাদের মুখভাব সাত্তিসয় সরলতাপূর্ণ। ইঁহারা উল্কী পরিতে ভাল বাসে। কিন্তু আউ নাগা স্ত্রীলোকেরা উল্কি শরীরে বেশী পরে উল্কির ও প্রণালী আছে। উহা আউ নাগাদের ইতিবৃত্তে বিস্তারিত বলিতে চেষ্টা করিব। পরিবারস্থ সকলের আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করা, গৃহের মধ্যে অন্যান্য কাজ করা, কাষ্ঠ কাটা এবং জলটানা চাউল প্রস্তুত করা নাগা নারীগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীলোকেরা বাশের চোঙ্গায় করিয়া জল বহন করিয়া আনে।

বর্শা ঢাল এবং দাও নাগাদের জাতীয় অস্ত্র। কৃষি কার্য্যের জন্য দাওই উহাদের একমাত্র যন্ত্র। গার্হস্থ্য সকল কার্য্যেই দাও ব্যবহৃত হয়। বর্শার বাঁটটী বেত্রতন্তু এবং রঞ্জিত কেশ দ্বারা আবৃত থাকে। ঢালটী ৫ ফিট লম্বা ১৮ ইঞ্চি প্রশস্ত। ঢালখানা বংশ খণ্ড দ্বারা বেষ্টিত, সম্মুখ ভাগ বাঘ অথবা ভল্লুকের চর্ম্মদ্বারা আবৃত এবং পশ্চাৎ ভাগ একটী কাষ্ঠ ফলাদ্বারা রক্ষিত। যখনই তাহারা কোন যুদ্ধে যাত্রা করে তখনই তাহারা কয়েক ইঞ্চি লম্বা সূক্ষ্মাগ্র বিশিষ্ট অসংখ্য বংশ খণ্ড সঙ্গে লইয়া যায়। ঐ বংশ খণ্ড সমূহের অর্দ্ধাংশ মাটীতে পুতিয়া রাখে যেন তাহাদের অনুসরণ করিতে শত্রু-গণের বিলম্ব হয়।

অল্প কয়েক বৎসর যাবৎ বন্দুক প্রভৃতি লাভ করিতে তাহারা সমর্থ হইয়াছে। সকল নাগারই শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা—আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করা। অস্ত্র

বাঁশের চোঙ্গায় করিয়া জল আনিতেছে।

শস্ত্র ও গোলা বারুদের আমদানী নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও

নাগাগণ মণিপুর হইতে তত্রত্য প্রস্তুত বন্দুক লাভের যোগাড় করিতে নিরস্ত হয় না।

একটী নাগিণী ধান বাঁধিতেছে।

আংগমিদের সমস্ত গ্রাম গুলি পাহাড়ের শিখর দেশে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে প্রস্তরময় প্রাচীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। এবং দূর হইতে সুরক্ষিত দুর্গের ন্যায় দেখায়। তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিবার সমস্ত পথই গুপ্ত। পথগুলি এভাবে নির্ম্মিত যে এক সঙ্গে দুই জন প্রবেশ

খড়ি বহন করিয়া নিয়েছে।

করিতে পারে না। দ্বার দেশে প্রহরী নিযুক্ত আছে। তাহাদের বাসগৃহগুলির ছাদ প্রায় ভূমিস্পর্শী। গৃহে সাধারণতঃ দুটী করিয়া প্রকোষ্ঠ আছে। আকারে সাধারণতঃ ৫০ ফিট লম্বা ৩০ ফিট প্রশস্ত। মরং গৃহ যেখানে অবিবাহিত যুবারা রাত্রি বাস করে। মরং গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী কৌতুহলোদ্দীপক। নাগাদের বিবাহ পদ্ধতিও স্বতন্ত্র।

নাগা গৃহ।

নাগা যুবকদের ২০।২২ বৎসরে ও বালিকাদের ১৬।১৭ বৎসর বয়সে বিবাহ ঘটিয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যুবক যুবতীর প্রণয় সঞ্চার হয় এবং তাহারা স্বচ্ছন্দ বিহার করে। পরস্পর পরস্পরের মনোনীত হইলে আপন আপন পিতামাতাকে বিবাহের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। একাধিক বিবাহের রীতি নাই। কাহারও দুইটী স্ত্রী থাকিতে পারে কিন্তু দুই ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ করা যায় না। অবিবাহিত যুবক যুবতীরা পৃথক পৃথক গৃহে শয়ন করে। ছোট ছেলে মেয়েরা পিতামাতার সঙ্গে থাকে। কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে যুবক যুবতীর একত্র থাকিবার নিয়ম আছে।

যুবতির সম্মতি ঘটিলে যুবকের পিতা এবং পিতৃহীন হইলে, যুবক নিজে তাহার খেলবাসী কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া যুবতীর পিতার নিকট পাঠায়। যুবতীর পিতার অভিপ্রায় থাকিলে, যুবক যুবতী উভয়ে স্বপ্ন চিন্তা করিয়া থাকে। স্বপ্নে ব্যাঘ্র, ধান্য ও জল দর্শন কল্যাণকর এবং মৃত দেহ ও শূকর দৃষ্ট হইলে অমঙ্গল ঘটে। উভয়ের স্বপ্ন শুভজনক হইলে বিবাহের পণ ধার্য্য হয়। মিথুন, গরু, শূকর, ধান মালা এবং শস্য ক্ষেত্র প্রভৃতি যৌতুক সামগ্রী। যুবতীর পিতা যাহা পাইবে, যুবকের পিতাকে তাহার অর্দ্ধেক অন্তত যৌতুক স্বরূপ দিতে হইবে। যৌতুক ধার্য্যের পর বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হয়।

বিবাহের দিন যুবকের মাতা দুই খানা কোদালী সঙ্গে দিয়া আপন খোনর সেই ঘটকী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে কন্যা আহ্বানে প্রেরণ করে। কোদালী দুইখানা কন্যার মাতাকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়। কন্যার সহিত অপর কোন লোক আসিবার নিয়ম নাই। কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বরের গৃহে আগমন করত বর কন্যাকে এক এক খণ্ড কদলীপত্র প্রদান করে। সমাগতা যুবতীদের মধ্যে একজন কন্যার সহিত বরের গৃহে রজনী যাপন করে। সেই রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বর অতন্দ্র শয়ন করে। তারপর নিঃশব্দে নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া উক্ত যুবতীকে জাগ্রত করে এবং তাহাকে আপনার গৃহে রাখিয়া আসে। যুবতীকে রাখিয়া আসিয়া বর নিজ গৃহের সম্মুখে গোলমাল আরম্ভ করে। গোলমাল শুনিয়া কন্যা ব্যতীত গৃহের অন্যান্য সকলে গৃহ হইতে পলায়ন করে। তারপর বর গৃহে প্রবেশ করিয়া কন্যার সহিত শয়ন করে এবং পুনরায় রাত্রিতেই উঠিয়া যায়। বর চলিয়া গেলে, অন্যেরা গৃহে গিয়া রাত্রি যাপন করে। পর দিন প্রাতে বর কন্যা বিবিধ ঝরণাতে স্নান করে এবং কন্যার সহিত পূর্ব্বোক্ত যুবতী শয়ন করিয়া থাকে। সে দিন রাত্রে এবং তৃতীয় দিনে বর কন্যার সাক্ষাৎ ঘটে না। কন্যা বরের পিতার গৃহে এবং বর তাহার বন্ধুর গৃহে বাস করিয়া থাকে। বিবাহের কিছুদিন পর কন্যা পিতৃ গৃহে গমন করে এবং তথা হইতে দুই কলসী মধু ও ১০০ টুকরা শূকরের মাংস লইয়া স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বর শ্বশুর ও বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রন করিয়া প্রীতিভোজ দিয়া থাকে।

নাগাদের ধর্ম্মমতগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট রকমের। কোন কোন নাগা বলে যে তাহাদের এই বিশ্বাস যে যাহারা ইহলোকে সৎ এবং পুণ্যময় জীবন যাপন করে তাহাদের আত্মা আকাশে ছুটিয়া গিয়া নক্ষত্রে পরিণত হয়। কিন্তু যাহারা নানা পাপ করিয়া অসৎ জীবন যাপন করে তাহাদের আত্মা এই দেহ ত্যাগান্তে সপ্ত জন্ম লাভ করিয়া পরে মক্ষিকা জন্ম প্রাপ্ত হয়। আবার কোন কোন নাগাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নাই। তাহাদের ভবিষ্যৎ মৃত্যুর পর কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে [illegible] "আমাদের দেহ কবরের মাটিতে মিশিয়া যায় ইহার পর কি হয় কে জানে।" তবে অনিষ্টকারী অসংখ্য ভূত এবং দৈত্যের ক্রোধের উপশম জন্য তাহারা বলিদান করিয়া থাকে। মঙ্গলময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তির উদ্দেশ্যে উহারা এই সমস্ত কিছুই করে না। আসামী নাগারাই বেশী শপথ করে।

দাঁতের মধ্যে বন্দুকের নল অথবা বর্ষার অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া ইহারা শপথ করিয়া থাকে। উহারা উহাদের মৃত দেহ কোন নির্দ্দিষ্ট সমাধি ভূমিতে প্রোথিত করিয়া থাকে এবং নেতৃদের সমাধির উপর ৩৪ ফিট উচ্চ স্তম্ভ স্থাপন করিয়া থাকে।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মজুমদার।

## চিত্র পরিচয়।

আনমন-কমল—চিত্রে শিল্পী কুমারী জীবনের অজ্ঞাত কামনার একটী কমনীয় মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রকৃতির কোন জিনিষই অপূর্ণ থাকে না; পরিবর্ত্তনশীল কালের স্তরে স্তরে ফুটিতে ফুটিতে চরম লক্ষ্য সেই পূর্ণত্বের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়াই প্রকৃতির ধর্ম্ম। আজ যে শিশু, কাল সে-বালক; তারপর যুবক; শেষে প্রৌঢ় পরিশেষে বৃদ্ধ। এ সময়ের মধ্যে জীবন কত ভাবে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া কত লীলার সৃষ্টি করে কে বলিবে? ইহার আদিও নাই, অন্ত ও নাই; কেবল অনন্ত।

চিত্রে দেখিতে পাই কতকগুলি কুমুদের সঙ্গে একটী কিশোরী দাঁড়াইয়া, যেন সে ও ইহাদের মধ্যে একটী কুমুদ। কুমুদিনী কৌমুদীর স্পর্শে ফোটে, কিশোরী কৈশরের পরশে ফোটে। শিল্পী চিত্রে আংশিক চন্দ্রোদয় দেখাইয়া মিলনের সময় সন্নিকর্ষতা বলিয়া দিতেছেন; কিন্তু তবু ও পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে সামান্য বিলম্ব ঘটাইয়াছেন। তাই কিশোরী এখনও কুমারী সাজিয়া অনির্দ্দিষ্ট প্রিয়তমের আশু মিলনের প্রতীক্ষা করিতেছে!

রূপক ছাড়িয়া দিলে অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরী পাত্রস্থ হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে যে অব্যক্ত অপূর্ণ বাসনা ধারণ করে চিত্র শিল্পী মানস চক্ষে তাহারই একটা রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। আরও সহজ ভাষায় বলা যায়—সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অবিবাহিতা কুমারীদের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা থাকে শিল্পী তাহারই একটা ছায়া অঙ্কিত করিয়াছেন।

# রামায়ণী যুগের কৃষি সম্পদ।

ভারত কৃষকের দেশ এবং ভারতের বেদ কৃষিকের গান সম্মানের কথাই হউক আর অসম্মানের কথাই হউক এই কথাটী সময় সময় শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক হল কর্ষণ প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাঁহারা মানব জাতির জীবিকা পরিচালনের খাদ্য উৎপন্ন করেন, এবং পশু পালন করিয়া যাঁহারা সমাজের উন্নতি বিধান করেন ন্যায়ের দৃষ্টিতে তাহারাই সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সেকালে কৃষিকার্য্য ও পশু পালন এবং বাণিজ্য ব্যবসায়কে বৈশ্যবৃত্তি বলা হইত। এই বৃত্তি বিভাগের পূর্ব্বে আর্য্যগণের সকলেই পৈত্রিক বৃত্তি ব্যবসায়ী কৃষকই ছিলেন। সুতরাং প্রাচীন ভারতে সংসার ত্যাগী মুণি ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্ণ সিংহাসনের অধিকারী রাজ রাজেশ্বরগণ পর্য্যন্ত সকলকেই হল চালনা করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে হইত।। "কৃষি উপার্জ্জিত ধন জীবন স্বরূপ" ছিল তাই বোধ হয় সেই জীবন স্বরূপ ধন উচ্চনীচ, গৃহী বিরাগী সকলকেই স্ব স্ব অবস্থা ভুলিয়া অর্জ্জন করিতে হইত।

ক্রমে দেশে জন বৃদ্ধির সহিত কার্য্য বিভাগ প্রথা বা চাতুর্ব্বর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে বৈশ্য সম্প্রদায়ের উপর কৃষি বাণিজ্য ও পশুরক্ষার ভার ন্যস্ত হয়। তখন ও রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্ব রীতির অনুসরণে নিজ হস্তে হল পরিচালনা করিয়া কৌলিক রীতির সম্মান রক্ষা করিতেন। মিথিলার রাজা জনকের উক্তি হইতে এই কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজা জনক সীতার উৎপত্তি ও সীতানামের কারণ সম্বন্ধে নিজ মুখে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছিলেন :—

"অথমে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ ॥
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।"
(বালকাণ্ড ৬৬সর্গ)

অর্থ—নিজ হস্তে আমি হল কর্ষণ করিতে ছিলাম, এমন সময় এই কন্যা লাঙ্গলের ফলা মুখে ভূমি হইতে উত্থিত হইয়াছিল, সেই জন্য আমি উহার নাম সীতা রাখিয়াছি।

মুণি ঋষিরা যে হল কর্ষণ করিয়া নিজ নিজ আশ্রম ভূমির সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ চাষ আবাদ করিয়া তাহা হইতে ফসল উৎপন্ন করিতেন তাহার উল্লেখ দাক্ষিণাত্যের তপোবন সমূহের বর্ণনায় আছে। ঋষি দিগের শিষ্যেরা যে গুরুর উপদেশে ক্ষেত্র কর্ষন ও ক্ষেত্র রক্ষা করিত মহাভারতের "ধৌম্য আরুনী সংবাদ আখ্যানে তাহা পাওয়া যায়।

ভারত কৃষকের দেশ ও বেদ কৃষকের গান—এই উক্তি ব্যতীত আর একটী অভিনব মত বৈদেশিক পণ্ডিত অধ্যাপক ওয়েবারের লেখায় দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক বলেন—"রাম সীতার ব্যাপারটী হইতেছে—কোশল বংশীয়গণের দক্ষিণভারতে খষিপ্রথা প্রবর্ত্তনের একটী রূপক মাত্র।" (১)

অধ্যাপক প্রবর রামায়ণের ঐতিহাসিকত্বের উপর ইঙ্গিত করিলেও ভারতবর্ষের কৃষি সম্পদের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

রামায়ণী যুগে আর্য্য ভারতে কৃষির অবস্থা খুব উন্নত ছিল। বৃষ্টির সাময়িক অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য তখন কৃষককে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না। "অদেব মাতৃক" ভূমি সমূহের জন্য রাজাকে (state) যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইত।

ভরত রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে গেলে রাম যে প্রশ্নচ্ছলে ভরতকে কতকগুলি রাজনীতি, শিক্ষা দিয়াছেন—আমরা রাজনীতির অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। ঐ উপদেশে রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থার প্রতি রাজার কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত আছে। রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অদেব মাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ।
পরিত্যক্ত ভয়ৈঃ সর্ব্বৈঃ খনিভি শ্চোপ শোভিতঃ ॥
(অযোধ্যা কাণ্ড ১০০ সর্গ)

অদেব মাতৃক ভাগ সমূহ ও ধাতু সমূহের খনি সমূহ দ্বারা যে সকল ভূমি শোভিত সেই সকল ভূমি ভয়ানক মানব ও শ্বাপদ সমূহ হইতে মুক্ত ও সমৃদ্ধ আছে তো? অর্থাৎ সেই সকল ভূমির প্রতি রাজার দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য, তাহা তোমার আছে তো?

সে কালে কৃষি ভূভাগ গুলি সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিশেষিত হইত (১) নদী মাতৃক ভূমি (২) দেব মাতৃক ভূমি, ও (৩) অদেব মাতৃক ভূমি।

নদী মাতৃক ভূমি—যে স্থানের ভূমিতে বহুনদী প্রবাহিত হয়, সুতরাং ফসল উৎপন্ন হইতে বৃষ্টির জলের অপেক্ষা করে না। যেমন আধুনিক নিম্ন বঙ্গের ভূমি।

দেব মাতৃক ভূমি—বৃষ্টির জল যে ভূভাগের কৃষির সহায়তা করে। যেমন বঙ্গ ও বেহারের ভূমি।

অদেব মাতৃক ভূমি—বৃষ্টির জল বা নদীর জলের যে স্থানে অভাব। যেমন রাজপুতনা।

এই অদেব মাতৃক ভূমির কথাই রাম ভরত কে জিজ্ঞসা করিয়া ছিলেন। এইরূপ ভূমির কৃষি রক্ষার ব্যবস্থা সে কালে state হইতে করা হইত। জল শূন্য দেশে শত শত কূপ খনন করিয়া এবং বড় বড় নদী হইতে খাল খনন করিয়া জল প্রবাহিত করিয়া সরকার হইতে কৃষি ব্যবস্থার সাহায্য করা হইত।

গো সেবায় তখন জন সাধারণের প্রবল অনুরাগ ছিল। ফলে দেশে গোধন সংখ্যা এত অপর্য্যাপ্ত ছিল যে, যে কোন কার্য্যে সামান্য ব্যক্তি ও শত শত গো অনায়াসে দান করিত।

দেশের গোধন রক্ষার জন্য রাজা গোচারণের ভূমি রক্ষা করিতেন। গাভীকুলের স্বাস্থ্য উন্নত রাখিবার জন্য বালবৎস যুক্ত গাভী দোহন পাপ বলিয়া নিষিদ্ধ ছিল।

রাম বনে গমন করিয়াছেন শুনিয়া ভরত কৌশল্যার নিকট সে সম্বন্ধে নিজ নির্দ্দোষিতা ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

"বাল বৎসাঞ্চ গাং দোগ্ধু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥"

( অযোধ্যা ৫৭ )

রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন তাহার বাল বৎসযুক্ত গাভী দোহনের যে পাপ তাহা হউক।

গাভীকে পদে স্পর্শ করায় যে পাপ হয়, বলিয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের বিশ্বাস, সে বিশ্বাস সুপ্রাচীন রামায়ণী যুগ হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। ভরত বলিতেছেন

গবাং স্পৃশতু পাদেন গুরূন পরিবদে সঃ। ৩১ অ ৫৭

তখন গো ও অন্যান্য পশু দিগের জল পানের জন্য রাস্তার পার্শ্বে রাজকীয় ব্যবস্থায় প্রতি পান হ্রদ নির্ম্মিত থাকিত। *

রামায়ণী যুগে বৃষ ও মহিষ দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ হইত। তখন দেশের বন প্রদেশ সমূহে বন্য হস্তী ছিল। রাম ভরতকে সেই বন কুঞ্জর সমূহের রক্ষার ব্যবস্থা করেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলন। ( অঃ ১০০ )

নিম্নলিখিত কৃষি ফসল গুলির নাম রামায়ণের প্রথম ছয় খণ্ডে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শালী ধান্য, নিবার ধান্য, ইক্ষু, কর্পূর, গম, নারিকেল।

গাভীর দুগ্ধে তখন, ঘৃত, মিষ্টান্ন, পায়স, তক্র, ( ঘোল ) দধি উৎপন্ন হইত।

ইক্ষু হইতে সর্করা (১) প্রস্তুত হইত। এই সর্করাই পরবর্ত্তী কালে চিনি নামে পরিচিত হয়।

ক্ষুমা ( তিসি ) কার্পাস, কোষ প্রভৃতির চাষ হইত।

লবন তখন ভারতের পার্ব্বত্য ভূমিতে উৎপন্ন হইত। লবন সমুদ্রে লবনের উৎপত্তি কথাও রামায়ণে আছে। (২)

## নূতন অর্ঘ্য।

এ জগতে তোমায় দিতে
নাইত কিছু ধন.
তাই তোমারে ভক্তে করে
আত্ম নিবেদন।
পাপের ভবন এ দেহ মন
দেওয়াত না চলে
সাজায়েছি নূতন অর্ঘ্য
শুধু নয়ন জলে!

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কবিভূষণ।

(১) সুপণ্ডিত গোরেসিও কিন্তু ১০ম খণ্ড রামায়ণে অধ্যাপক ওয়েবারের এই অদ্ভুত মত খণ্ডন করিয়া দিয়া রামায়ণের ঐতিহাসিকত্ব খুব পাণ্ডিত্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন।

* অযোধ্যা কাণ্ড।

(১) অযোধ্যা কাণ্ড ৯১

(২) সুন্দরাকাণ্ড ১১

# বেশ্যার দান

(১)

নিম্ন প্রাইমেরী পরীক্ষা পাশের সঙ্গে সঙ্গে একটী দুগ্ধ-পোষ্য স্ত্রী-লাভ করার প্রাচীন রীতি আজকালকার সোণার বাংলা হইতে একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। এখন দাঁড়ি গোফ চাঁচিয়া মেয়েলি মুখের উপর চশমা পরিয়া কলেজ হইতে রপ্তানি হইয়া নব্য বাংলার বরের দল বিয়ের বাজারে যেরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে নামিতে আরম্ভ করিয়াছে তাতে কন্যা পক্ষের পাইকারগণ নিম্নপ্রাইমেরী ওয়ালাদিগকে বাজার দরের তালিকা হইতে একেবারে নাম খারিজ করিয়া দিয়াছে।

সে যাহোক এ ক্ষেত্রে বিনোদলালের সৌভাগ্যটা ঘটিয়াছিল দুই কারণে। একের নম্বর নিম্ন প্রাইমেরীর সাঁকো পার হইতেই তার মুখে পাকামোর লক্ষণ ও গোঁফের রেখা দুই বিলক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিল? মা ভাবিলেন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধটা তাড়াতাড়ি চুকাইয়া রাখিতে পারিলে ছেলেটা আর বেশী পাকিয়া উঠিতে প্যারিবে না। দুয়ের নম্বর মল পরা একটী কচি বৌ ঘোমটা টানিয়া ঘুর ঘুর করিয়া সারা ঘর ঘুরিয়া বেড়ায় এমনি একটী ক্ষুদ্রাকৃতি চঞ্চলা লক্ষ্মী ঘরে আনিবার অদম্য সখ বিনোদের মাকে একেবারে পাইয়া বসিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এরূপ অনুকুল হইয়া উঠিলে, ফল ফলিতে বেশী বিলম্ব হয় না। তাই অচিরে বিনোদের মার সখ মিটিয়া 'বাসি' হইল, কিন্তু তাতে বিনোদলালের অকাল পক্কতা রোগটা কতখানি আটকাইল, সে সম্বন্ধে পাড়ার লোকের, সন্দেহটা পুরাপুরি থাকিয়াই গেল।

বাস্তবিক সন্দেহটা যতদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায় ততদিন ঘরের লোকে তাকে কিছুতেই আমল দিতে চায় না। অবশেষে একদিন সন্দেহ বৃক্ষের শাখায় ফুলের মুখে সত্যের ফলটী পাকিয়া উঠিয়া ঘরের আঙ্গিনায় দেখা দেয়, তখন ঘরে বাইরে কারো তাকে অস্বীকার করার পথ থাকে না!

বিনোদের মার পক্ষে এইটুকু বলা যায়, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে, গ্যালভেনিক ব্যাটারির মত ক্ষেত্র বুঝিয়া স্ত্রীশক্তির তাড়িত প্রয়োগ করিতে পারিলে, বাংলার পুরুষ জাতির সকল প্রকার পার্থিব ব্যামো সারিতে দেখা যায় বটে। কিন্তু সে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্ন-প্রাইমেরীর থাক ছাড়াইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতরধাপে উঠিতে হয়। এইটুকু তার বুঝিবার ভুল হইয়াছিল।

তাই প্রজাপতি ঠাকুরদ্দার অনুচিত অনুগ্রহেও বিনোদলালের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে উচ্চ প্রাইমেরীর উচ্চ আশা 'সমাজ সলিলে' বিসর্জ্জন দিয়া গুরুমহাশয়ের চক্ষের উপর কড়া তামাক টানিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। এবং গুরু মহাশয়ের সুযুক্তিপূর্ণ আপত্তি সত্বেও সে, তার সাক্ষাতে প্রচুর পরিমাণে নাকে মুখে ধুম উদ্গীরণ করিয়া সৎসাহস দেখাইতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না। বিদ্যামন্দিরের চুতঃসীমার মধ্যেই বিনোদলালের বিদ্রোহবহ্নিটাকে এরূপ অভ্রান্তরূপে প্রধূমিত হইতে দেখিয়া বিনোদের মা তার নাম কাটাইয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়া হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এবং কালক্ষেপ না করিয়া তার এক দূর সম্পর্কীয় কাকার অধীনে পৈত্রিক স্বর্ণকারের কাজে লাগাইয়া দিলেন।

পাঠশালার বিনোদলালের আর শিক্ষা যাই হোক না হোক, কলপ করা ধুতি, ইস্ত্রি করা সার্ট ও বার্ণিশ করা জুতা পরার শিক্ষাটা জন্মান্তরীণ সংস্কারের মতই অতি সহজে আয়ত্ত হইয়া গেল। যে ছেলে মাসে মাসে বেতন দিয়া ইস্কুলের বেঞ্চে বসিয়া মাষ্টারের নিকট আলিবাবা ও অপর চল্লিশ জন চোরের গল্প শিখিয়া আসিয়াছে তাকে হাতুড়ি দিয়া সোণা পিটিয়া স্বর্ণকার গড়ার চাইতে একটা গাধা পিটিয়া ঘোড়াতৈরী করা ঢের সোজা? এসব চাপড়ে কাজ শিখিতে সে যে এখন একেবারেই অশক্ত সেইটাই এখন বিনোদের নিকট হইল অত্যন্ত গৌরবের বিষয়!

কিন্তু গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ এ যৎসামান্য গৌরবটুকুও বিনোদের ভাগ্যে তেমন টেকসই হইল না। এমন কি মা মারা যাওয়ার পরই বিনোদকে কে যেন তার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল এক মা ছাড়া তার অক্ষমতার গৌরবের আব্দারটুকু সহিবার মত আর একটী মানুষের

স্থান অত বড় পৃথিবীতেও নাই। বাস্তবিক এ সরল জগতে অকর্ম্মতার জড়তাকে প্রকৃতিও সহ্য করে না; মানুষতো পরের কথা।

এ জগতে অভ্যাসের দাসত্বই মানুষের জন্মগত স্বাধীনতার সব চেয়ে বড় শত্রু। তার পাশ ছিন্ন করিবার মত পৌরষ যারা অর্জ্জন করিতে শিখিয়াছে তারাইতো যথার্থ মানুষ। বিনোদলাল কিন্তু তার মন্দ অভ্যাসের রং বদলাইতে পারিল না। তাই তার মা মারা যাওয়ার পর তার অচল সংসারের অখণ্ড দৈন্যের সবটুকু টান একা তার অল্প বয়স্কা স্ত্রী মুক্তার কাঁধে চাপাইয়া দিয়া বিনোদ হালকা হইয়া ঘরের বাহিরেই দিন কাটাইত? দুঃখকে এমন করিয়া ফাঁকি দিতেই সে পারিত কিন্তু জীবনের মাঝে গ্রহণ করিবার মত মনের শক্তি সে কখনো অর্জ্জন করে নাই। আশ্চর্য্য! দুঃখকে এমন করিয়া ফাঁকি দিতে গিয়া মানুষ প্রতিদিন দুঃখের ভিতরকার কত বড় সম্পদ না চিনিয়া হারাইয়া বসে কোনো প্রকার ফাঁকি দিবার আগে মানুষযদি সেটা একবার চিন্তা করিয়া দেখিত!

তাই দৈন্যের ভয়ে বিনোদলাল চিরদিন ঘরের বাহিরেই থাকিয়া গেল। কিন্তু ঘরের ভিতর দৈন্য ছাড়া যে মুক্তাও ছিল এবং দরিদ্র ঘরের ঝিনুকের ভিতরে মুক্তা যে তার কতবড় উজ্জ্বল সম্পদ একথাটা বিনোদ কখনো সজ্ঞানে ভাবিতে চেষ্টা করে নাই। কাজেই অনাবশ্যক ঝিনুকের মতই মুক্তাও বিনোদের মনের বাহিরেই পড়িয়া থাকিল।

বিনোদলালের এই আবশ্যকহীনতার অবকাশে সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী নীরবে বসিয়া ছিলেন না। তিনি তাঁর অম্লান সৌন্দর্য্যের ঝাঁপি শূন্য করিয়াই তাঁর উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্য রাশি মুক্তার দেহ মনের উপর মুক্ত হস্তে ছড়াইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দেবতার বরে মুক্তার শ্যামল দেহলতা প্রফুল্ল করিয়া, নব বসন্তের আনন্দ রাশি ফুলে ফুলে হাসিয়া উঠিল। তার হৃদয় কুঞ্জ সরস করিয়া মানসপদ্ম আশাও স্বপ্নে, পুষ্পে ও গন্ধে, ভাবে ও ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিল। মুক্তার সৌন্দর্য্যের আলো বিনোদের ঘর উজ্জ্বল করিয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। এক রং কাণা বিনোদই তার সৌভাগ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ থাকিয়া হেমজা ভূষণের চাটুকারের মজলিসে ব্রিয়ত 'মহলা' দিয়া দিন কাটাইতে লাগিল?

( ২ )

নীলমনি শাহা ছিল রতনপুরের সামান্য সজমসলার খুচরা দোকানদার? ব্যবসা বেশ জমকাইয়া উঠিতেই সে টাকা দাদন আরম্ভ করিয়াছিল। সুদের টাকার মধুর আওয়াজে মা লক্ষ্মী ধরা পড়িয়া গেলেন। এখন সে রূপার টাকার গদির উপর একজন নামজাদা 'মহাজন' হইয়া বসিল। দেখিতে দেখিতে কৃষকদের জোতজমি হইতে সুরু করিয়া ইস্তক জমিদারের জমিদারী রোকর টাকা হইয়া তার মর্চে পরা লোহার সিন্দুকের অতল গহ্বর ভরিয়া উঠিল। নীলমনির মত যাদের বড় লোকের কপাল ছিল না, তারা বলিত, নীলমনি গুপ্তধন পাইয়া একরাত্রে হঠাৎ বড়মানুষ হইয়াছে। এ জনশ্রুতি সত্য হোক বা বাজে হোক, মা লক্ষ্মী যে তার তপে তুষ্ট হইয়াই তাঁর ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের সোনার চাবি তাকে বররূপে দান করিয়া ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই।

নীলমনির মৃত্যুর পর তার দত্তক পুত্র হেমজা ভূষণই এখন তার বিপুল সৌভাগ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। বিনোদলাল এই হেমজাভূষণের মোসাহেব খানায় নাম লেখাইয়া তার বাবুগিরিটুকু কোন মতে বজায় রাখিয়া গোঁকে তা দিয়া বেড়ায়। দোলের সময় কলিকাতা হইতে ইহুদী বাই বায়না করিবার জন্য হেমজাভূষণ তাকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। বাবু যে তার পসন্দের অতটা তাম্বিপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া সে "পলো" সিগারেট টানিতে টানিতে কলিকাতা চলিয়া গেল।

তার খালি বাড়ীতে একা পড়িয়া রহিল মুক্তা। সে বিনোদের এক দূর সম্পর্কীয়া পিসিকে অনেক হাত পা ধরিয়া দুই রাত্রি তার নিকট আনিয়া রাখিয়াছিল। ত্রিরাত্রি পার হইতে না হইতেই সেদিন দুপুর বেলা তিনি আসিয়া মুক্তাকে স্পষ্ট জবাব দিয়া গেলেন যে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া (!) ঘরের খাইয়া পরের বৌএর খবরদারি করা তাঁকে দিয়া পোষাইবে না। পরের বৌএর খবরদারি করা তাঁকে দিয়া না পোষাইবার কারণ এজগতে আপনার বলিতে পিসিমার আর কেউ ছিল না। সে সময় হেমন্ত বেশ্যা সেই দিক দিয়া যাইতে ছিল। বিনোদলালের বাড়ীর কাছেই তার ঘর। পিসিমার বক্তৃতার নমুনাটা তার কাণে

পঁহুছিবা মাত্র তাহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কাণের সঙ্গে আটকাণো সোণার শিকলটা শুদ্ধ নাকের গোলাকার নথটায় একটা প্রলয়ঙ্করী নাড়া দিয়া হেমন্ত বেশ্যা চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল।

"ঘরের স্ত্রীর খবরদারির জন্য যাদের পরের খোসামুদি করে মরতে হয়, তাদের মুখে আগুন! বলি ও মুক্তা! খবরদারির দরকার হয়তো হেমন্ত বেশ্যাকে ডাকিস্। ভদ্দর ঘরের কলজে অতপুরু হয় না যে পরের দরদে ঘর ফেলে আসবে।"

কারো প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া কথাগুলি পিসিমাকে বেশ শুনাইয়া শুনাইয়া হেমন্ত বেশ্যা সদর্পে চলিয়া গেল। হেমন্ত বেশ্যা চলিয়া গেলেও কথাগুলির ঝাঁজে পিশিমার বুক জলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি মুক্তার পানে একটা বিশ্রী রকম ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—

"বেশ্যার মুখ কিনা, মুখে যা এলো তাই বলে চলে গেল। তুই পোড়ার মুখীকে দুকথা শুনিয়ে দিলিনে কেন বৌ?"

মুক্তা চুপ করিয়া থাকিল। পিসিমার কথা শুনিয়া তার বারবার মনে হইতে লাগিল, আজ বেশ্যার মুখ দিয়া যে ঠাকুর কথা কহিলেন, পিসিমার ঠাকুরঘরে তো সে দেবতার আসন পড়ে নাই!

পিসিমা চলিয়া যাওয়ার পর মুক্তা ম্লানমুখে শূন্য কলসী লইয়া স্নানের জন্য বাহির হইল। তখন ভরা দুপুর অনেকক্ষণ গড়াইয়া গিয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতেই এই সময়টা রতনপুরের ভদ্র ইতর স্ত্রীপুরুষদের দিবানিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সময় জানিয়াই মুক্তা প্রত্যহ এই সময় পালচৌধুরীদের বড়োবাড়ীর বড় দীঘির ভাঙ্গাঘাটে স্নানের জন্য হাজির হইত। মুক্তা অসময়ে স্নান করিতে ঘাটে আসার ভিতরে ছোট্ট একটা কথা আছে খুবই ছোট, এক ফোঁটা অশ্রুর মত! সে আর কিছুই নয়, মুক্তার পরণের কাপড় খানা এতই ছোট আর এতই ছেঁড়া, যে তা পরিয়া বাহিরের লোকের সমুখে আসা চলে না? সময় বুঝিয়াই লজ্জা নিবারণ হরি মুক্তার সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য লোক লোচনের সমক্ষে আরো অরক্ষনীয় করিয়া তুলিলেন। লজ্জাশীলার লজ্জা লইয়া লজ্জা নিবারণ হরির চিরকাল একি নিঠুর খেলা আর সে নারী ধর্ম্মের মাথায় পদাঘাত করিয়া বিশ্বের হাটে লজ্জা বিক্রয় করিয়াছেন তার বসন ভূষণের বোঝা জরির পাহাড়ের মত দিন দিন উঁচুই হইয়া উঠিতেছে?

তিল ফুলের লালচে হাসির ঢেউ খেলানো মাঠের ভিতর দিয়া আঁকা বাঁকা সবুজ আল ধরিয়া মুক্তা ভাবিতে ভাবিতে স্নানের ঘাটে পঁহুছিল? এককালে পাল চৌধুরীদের দীঘির ঘাট পাকা ছিল এখন পাকা ঘাটের চাঁদিনা কাটিয়া গিয়া সিঁড়ির পাকা ধাপগুলি কালস্রোতে অদৃশ্য হইয়া গেছে। মরা ছাতিম গাছের একটা জীর্ণ গোড়া সেঁওলা ধরা বাঁশের খুঁটীর সঙ্গে বাধিয়া তৈরী করা ঘাটটাই এখন পড়ো দীঘির সৌভাগ্যের দিনের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন! ঘাটের দুপাশের ঝাঁপ ঝোড় ও মাথার উপর হেলিয়া পড়া বুনোগাছের একখানা পাতাভরা ডালই স্নানের ঘাটের চারিদিকে একখানা সবুজ পর্দ্দা বুনিয়া রাখিয়াছে।

সেই ঘাটটীর উপর ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া মুক্তা আসিয়া বসিল? চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও মানুষের সাড়া শব্দ নাই। বনফুলের আশে পাশে কেবল নানা রঙ্গ বেরঙ্গের প্রজাপতি ম্লান রৌদ্রে পাখা দুলাইয়া নৃত্য করিতেছিল? শ্যামল তরুলতায় লীলায়িত হইতেছিল নব বসন্তের একটু কোমল উচ্ছাস অদৃশ্য পাখীর অস্ফুট গানে কোন সুদূর অলকা হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল, এক অশ্রুত মধুর অভিনব বিরহ ব্যথা। শ্যামল প্রকৃতির পত্র পুষ্প রঞ্জিত শীতল স্নেহমাখা কোনটীর ভিতরে বসিয়া মুক্তা আজ অনেকদিন পরে নিজের মনের লাগাল পাইয়াছে। তাই আজ সে স্নান করিতে আসিয়া স্নানের কথাই ভুলিয়া গিয়া আপনার ভাবনা হিল্লোলে দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া চলিল—

সব চিন্তার মধ্যে একটা কথাই তার মনে খুব বড় হইয়া উঠিল। সেটা এই যে সহরের খোসরোজে রূপ যাচাই করিয়া ফিরাই কি মানুষের চিত্তের সব চেয়ে বড় নেশা! গৃহছায়ায় বিকশিত সরস হৃদয় নিকুঞ্জে মানুষের মনমুগ্ধকর কি কোন সৌরভ নাই! তা না থাক,—বিনোদলাল যেখানে খুশী পালাইয়া যাক না কেন, মুক্তার হৃদয় ছাড়িয়া তো সে কোথাও পালাইয়া যাইতে পারিবে না! এমনি করিয়াই মনকে বুঝদিয়া মুক্তা তার গৃহবিমুখ পলাতক স্বামীটীর জন্ত হৃদয়ের

প্রেমের অমৃত পাত্র প্রতিদিন পূর্ণ করিয়া রাখিত। কেবল হৃদয় নিবেদিতার পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিবার দেবতাটী সে অমৃতের সন্ধান রাখিতেন না, এই যা! কিন্তু দেবতার এত নিষ্ঠুরতায়ও মুক্তার হৃদয়ের সহিষ্ণুতা কখনো একতিলও টলিত না। বাস্তবিক এ জগতে খাঁটী সোণা ও খাঁটী ভালবাসা এমনি ভাব সহ! কিন্তু এ কেমন ভালবাসা! ভালবাসার বাজে খরচ বন্ধ করিবার জন্য সোসেলিজমের নূতন মিটার আমাদের দেশেও যে আমদানী হইয়াছে। হৃদয় দানের মধ্যেও স্বাধীনতার মূল্য দাবী না করিয়া নির্ব্বিচারে ভাল বাসা যে ক্রীতদাসীদেরই শোভা পায়! সম্ভবতঃ মুক্তার অশিক্ষিত চরিত্রই এরূপ অন্ধ ভালবাসার জন্য আমাদের সভ্য সমাজের নিকট দায়ী।

এমন সময় পুকুর পারে হঠাৎ অনেকগুলি দেশী কুকুরের ঐকতানিক চীৎকার শুনিয়া মুক্তার স্বপ্নের হাট ভাজিয়া গেল। কিন্তু তখনো সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের সোণার টুক্‌রাগুলি এমনভাবে জড়াইয়াছিল যে মুক্তা সে অসময়ে স্নানের ঘাটে কুকুরের ডাকের অর্থটা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ক্রমে স্বপ্নের কুহেলীজাল কাটিয়া চারিদিক হইতে বাস্তবতা সচেতন হইয়া উঠিলে মুক্তা পরিস্কার দেখিতে পাইল, পুকুরের অপর পার হইতে একটা নীল চশমা পড়া বাবু খেজুর গাছে বসা নীল ঘুঘুটার পানে বন্দুক তুলিয়া নিশানা করিতেছে। কুকুরগুলি এই বাসনাশক্ত তরুণ যুবকটার নিষ্ঠুর অধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে তাদের গ্রাম্য ভাষায় যে আপত্তি জানাইতে ছিল সেই শব্দে মুক্তাকে সচকিত করিয়া তুলিল। নিশানার পাখী উড়িয়া গেল কিন্তু তবু যে শিকারীর আসল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নাই, তার কারণ সে বাবুটীর উজ্জল চক্ষু দুটী শিকারের পাখী ভুলিয়া গিয়া নীল চশমার ভিতর দিয়া মুক্তার অপরূপ মুখখানার উপরেই আবদ্ধ ছিল। তাই মুক্তা সে সময় নিজেকে লইয়া ভারি বাতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কারণ তার শীর্ণ বস্ত্রাঞ্চলে যৌবন প্রস্ফুটিত দেহলতার একদিক সামলাইতে গিয়া আরেক দিক অসামাল হইয়া পড়িতেছিল। মুক্তার নিজের সৌন্দর্য্য ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টার ভিতরেই তার অনিন্দ্য সুন্দর দেহলতার সবটুকু লোভনীয় মাধুর্য্য সখের শিকারী তার লালসা রঞ্জিত হৃদয় পাটে স্বর্ণঅক্ষরে মুদ্রিত করিয়া লইল। শুধু চোখের জলন্ত-দৃষ্টিতে যদি একটা গোটা মানুষ গ্রাস করা যাইত, তবে আজ মুক্তা সশরীরে স্নানের ঘাট হইতে বাড়া ফিরিয়া যাইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

মুক্তা সে যাত্রা শিকারী চক্ষের নিশানা পার হইয়া কোনমতে পালাইয়া বাঁচিল। তেমন ওস্তাদ শিকারীর হাতে পড়িয়াও সে নীল ঘুঘুটা যে প্রাণে বাঁচিয়া গেল, সেজন্য সেও মুক্তার সৌন্দর্য্যের নিকট চিরজন্মের মত ঋণী।

( ৩ )

বিনোদলাল কলিকাতা হইতে বাবুর সৌখীন ফরমাস তামিল করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তার বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া তার সর্ব্বনাশ হইয়া গেছে। প্রতিবেশীরা বলিল শেষ রাত্রে তারা মসালের আলো ও অনেকগুলি মুখোস পরা লোক বিভীষিকার মত বিনোদের বাড়ীতে দেখিতে পাইয়া ব্যাপার খানা ঠাহর করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সশস্ত্র ডাকাতের দলকে বাধা দেওয়ার জন্য সুপ্ত পল্লী হইতে একটী মক্ষিকাও বাহির হইতে সাহস পায় না।

পরদিন ডাকাতির খবর পাইয়া গ্রামের চৌকীদার নদী পার হইয়া তিন গাঁ ডিঙ্গাইয়া সটান তার ভগ্নি পতির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিল হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তার ভাগনেটাকে একবার দেখিতে আসিয়াছে। ভাগনেটার বয়স বছর এগারো—সে এখন গরু রাখালি করে। মামা ভাগনায় এর পূর্ব্বে আর কখনো দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। চৌকীদারের ভগ্নিপতি বেচারী নিতান্ত ভাল মানুষ। স্ত্রী সম্পর্কিত কেউ কিছু বলিলে সেটা সে নির্ব্বিকারে বিশ্বাস করে। চৌকীদারের কৈফিয়ৎ শুনিয়া তার বোন ত হাসিয়াই খুন—বলিল গায়ে দারোগা হাকিম আসবার কথা হয়েছে বুঝি। দাদা সেই লেঠাচুকাইয়া গেল। হাজার হোক, চৌকীদারের আপন বোন ত বটে।

বিনোদলালের বাড়ীর ডাকাতিটার বিশেষত্ব এই যে ডাকাতেরা তার বাড়ীর জিনিষ পত্র স্পর্শও না করিয়া তার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে. ডাকাতির পর আর মুক্তাকে সে বাড়ীতে পাওয়া যায় নাই। একথা

আর কাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইল না যে ডাকাতের দল আর সব ফেলিয়া এক মুক্তাকে লুণ্ঠন করিয়া নিয়া তাদের পাশব দস্যুবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া গিয়াছে।

বিপদের দুঃসংবাদ লইয়া বিনোদ উন্মত্ত ঝড়ের মত তার নূতন প্রভুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমদা ভূষণ যদি সাহায্য করেন, তবে মুক্তাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। এই আশারেখা বুকে বাঁধিয়াই সে ছুটিয়া হেমদা ভূষণের বাড়ীতে আসিয়াছিল। কিন্তু বিপদ কখনো একলা আসে না। আজ অনেক সাধ্য সাধনাতেও বিনোদের সঙ্গে দেখা করিবার ফরসুত তাঁর হইল না। শেষকালে অনেক চেষ্টায় বিনোদ বাবুর নায়েবের নিকট তার বিপদের কথা সব খুলিয়া বলিল? তিনি সব শুনিয়া বিনোদের দুঃখে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি জানাইলেন. কিন্তু তদতিরিক্ত আর কিছুই করিতে রাজি হইলেন না।

নিরুপায় হইয়া বিনোদ তার দুর্ভাগ্যের সংবাদ পুলিশের থানায় উপস্থিত করিল। কিন্তু দারোগা সাহেব কিছুতেই তার মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বিনোদকে জলের মত তরল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে মানুষ চুরিটা ডাকাতির অঙ্গই নয়। পাখী খাচা ছাড়িয়া কোথাও কোনো তাজা ভবনে গিয়া বসিয়াছে। তোয়াজ করিতে না পারিলে ফিরিয়া খাঁচায় আসিবে না। এই বলিয়া দারোগা সাহেব একটু টিটকারী করিতেও ছাড়িলেন না।

দারোগার হিতোপদেশে আজ বিনোদের আহত হৃদয়ের রক্তপাত কিছুতেই বন্ধ হইতে চাহিল না সে মুক্তার খোজে চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল? সারাদিন ছুটাছুটি করিয়া হয়রাণ হইয়া পড়িল কিন্তু কোথাও মুক্তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার পর রাত্রি হইল অনেক রাত্রে বিনোদ ক্লান্ত হইয়া ঘরে ফিরিল রাত্রির নিবিড় অন্ধকার হৃদয়ের গভীর নৈরাশ্যে গাঢ়তর হইয়া বিনোদের শূন্য গৃহে জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

ঘরের বাহিরে কোথাও মুক্তাকে না পাইয়া আজ যেন বিনোদ তাকে তার নিরানন্দ অন্তরের মাঝে দেখিতে পাইল। এই যেন বিনোদের মুক্তার সহিত প্রথম দেখ! তার সৌন্দর্য্যের জ্যোৎস্নায় আজ যেন বিনোদের হৃদয়, জোড়া দুঃখপুঞ্জও আলো হইয়া গিয়াছিল? অচল শিখরে নীরব চন্দ্রোদয় দেখিয়া অসীম নীল সমুদ্র যেমন কলোচ্ছাসে জাগিয়া উঠে, আজ বিনোদের সারা ব্যথিত চিত্ত তেমনি করিয়া মানস মুক্তার চারিদিকে তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছসিত হইয়া উঠিতে লাগিল? এতদিন ঘরে থাকিতে বিনোদ যার পানে একবার তাকাইয়া দেখারও উত্তেজনা অনুভব করে নাই, আজ দূরত্বের রঙ্গীন বাষ্পের ভিতর দিয়া তারি অপরূপ সৌন্দর্য্য বিনোদকে পাগল করিয়া দিল? সে পাগলের মত অন্ধকার ঘরের ভিতর মুক্তার জন্য হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। মুক্তা যদি কোনো অসম্ভব উপায়ে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া থাকে? সময় সময় ঘরের বাহির হইয়া মুক্তা মুক্তা বলিয়া সে চিৎকার করিতে লাগিল। যদি বিনোদকে ঘরে না পাইয়া মুক্তা ঘরের বাহিরে গিয়া থাকে।

কবিরা বলিয়া থাকেন, দেবতারা যাহাদিগকে বিনাশ করেন, আগে তাহাদিগকে পাগল করিয়া দেন। আঁধার ঘরে মুক্তাকে পাওয়া গেল না বটে কিন্তু বিনোদ পাগলের মত অন্ধকার ঘরে হাতড়াইতে হাতড়াইতে ঠাণ্ডা মেজের উপর কুড়াইয়া পাইল একখানা চিঠি; বিনোদকে ঘরে না পাইয়া কে যেন চিঠিখানা ঘরের মেজেতে ফেলিয়া গিয়াছিল। প্রদীপের আলোয় খাম হইতে বাহির করিয়া দেখিল মুক্তার জবানী চিঠি কোনো স্ত্রীলোকের কাঁচা হাতের লেখা! চিঠিতে মুক্তা লিখিয়াছে হেমদা ভূষণের বাগান বাড়ীতে তাকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। বন্দিশালা হইতে তাকে মুক্ত করিতে দেরী হইলে তার জীবিত অবস্থায় স্বামীর ঘরে ফিরিয়া আসা অসম্ভব হইবে কারণ তার লজ্জা শীলতার উপর কোনো প্রকার আঘাত আসিবার পূর্ব্বেই তাকে আত্মঘাতী হইতে হইবে এবং সে জন্য সে প্রস্তুত হইয়াছে।

বিনোদের প্রভুই তার স্ত্রী হরণকারী দস্যু এ জগতে রক্ষকই ভক্ষক হইয়া এমন করিয়া আশ্রিতকে পদদলিত করে! দৈন্যের উপর ঐশ্বর্য্যের এ দারুণ নিগ্রহের কথা ভাবিয়া বিনোদ ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিল। কিন্তু তার পর ক্ষণেই মনে হইল সময় নাই আর এক মুহূর্ত্তের ও সময় নাই। মুক্তাকে জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া পাইবার

শুভ মুহূর্ত্ত পার হইয়া গিয়াছে কিনা, তাই বা কে বলিতে পারে। অন্ধকার পুঞ্জ ভেদ করিয়া সহসা নক্ষত্রের সুদ্যুতি বিনোদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। আশার আলো তখনো নিবে নাই। বিনোদের মনে হইল প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া দেখিবার সময় হয়ত এখনো শেষ হয় নাই বিনোদলাল তৎক্ষণাৎ তীরের মত ছুটীয়া ঘরের বাহির হইয়াগেল?

অনেক রাত্রে মহকুমার ডেপুটী বাবুর ঘরের বন্দ দরজায় ঘা পড়িল। ডেপুটী বাবু সে সময় আহারের পর গৃহিনীর সহিত বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন ছিলেন। সারাদিনের খাটা খাটুনির পর দুপুর রাত্রে এ আবার কি উৎপাত! বাহিরে আসিয়া বিনোদের বিপদের কাহিনী আদ্যোপান্ত বিনোদের মুখে শুনিয়া পরদিন প্রাতঃকালের কাছারীতে তার কোটে উপস্থিত হইয়া তাকে দরখাস্ত করিতে বলিলেন। ডেপুটীর গৃহিনী কপাটের আড়ল হইতে সবকথা শুনিয়া সিহরিয়া উঠিলেন। তিনি হাকিমকে পরদার আড়াল হইতে ডাকিয়া হুকুম করিলেন, কাছারীতে দরখাস্ত দিয়ে নালিশ করবার বুদ্ধি এব্যক্তি পয়সা দিয়ে মোক্তারের কাছ থেকেও নিতে পারতো। সেজন্যে বেচারা তোমার বাড়ীতে দুপুর রাতে ধন্না দিতে আসেনি! ওর একটা কিছু উপায় তোমার এক্ষনি করে দিতে হবে।"

হাকিম বাবু অগত্যা বাধ্য হইয়া মুক্তাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁর নিকট হাজির করবার জন্য তৎক্ষণাৎ পুলিশের উপর থানা তাল্লাসা ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া দিয়া তবে গৃহিনীর কাছে সে যাত্রা মুখ পাইলেন।

( আগামী বারে সমাপ্য। )

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

---

# "সাহিত্যে স্বাধীনতা" বা উচ্ছৃঙ্খলতা

আজকাল সর্ব্বত্রই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলিতেছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে ২ সাহিত্যে ও স্বাধীনতার জন্য তুমুল আন্দোলন হইতেছে। আমরা এই স্বাধীনতা প্রয়াসকে খুব সমর্থন করি। কিন্তু এই এই স্বাধীনতা বুঝিতে যাইয়া প্র থমেই আমাদের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়, এই স্বাধীনতা শব্দটার অর্থ কি? ইহাকি ইংরেজী Freedom বা Liberty প্রভৃতি শব্দের অনুবাদ? অথবা আমাদের চির পুরাতন প্রাচীন আত্মনিষ্ঠা? কথাটা আরও একটু খুলিয়া বলি। একজন নামজাদা প্রতিভাশালী লেখক এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ—"ইংরাজীতে Freedom, Liberty প্রভৃতি শব্দে আমরা যাহাবুঝি স্বাধীনতা শব্দে তাহা বুঝিনা। ঐ সমস্ত ইংরেজী শব্দের অনুবাদ "অনধীনতা" হইলে ঠিক হয়। কারণ স্বাধীনতা শব্দের অর্থ স্ব—অধীনতা স্বশব্দের অর্থ আত্মা; সুতরাং স্বাধীনতা শব্দে আত্মনিষ্ঠার ভাব বুঝাইয়া থাকে। ইহা কঠোর সংযমের সূচনা করে। কাজেই স্বাধীনতা প্রয়াসকে বেশী সংযমের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে: কেননা আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আত্ম-বিরোধীকে অভিনন্দন দিতে পারেন না।

"অনধীনতা" শব্দের অর্থে যদি স্বাধীনতা" প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তবে সোজা কথাই তাহাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলিলেই চলে। এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল লেখক "সাহিত্যের সেবা করিতে গিয়া যদি কেবলি চলিত সংস্কারের দাসত্ব করিতে না পারেন, পথ চলিতে পায় পায় যদি সনাতন শাস্ত্রের নেতি নেতি শুনিয়া চলিতে না পারেন তবে তবে তাহার প্রতিভার অন্তরাত্মা ভয় পাইয়া বিদায় লইলে "আর কিছু না হউক সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ আত্মনিষ্ঠা, এই আত্মা চির পুরাতন ও সনাতন, কাজেই ইহা পিতামহ ও পিতামহীর আমলে যেরূপ আদর পাইয়াছে আগামী বংশধর গণের নিকট ও সেইরূপ আদর পাইবে। এই আত্মাই আনন্দ ও রস স্বরূপ। বাহিরের আবর্জ্জনা আচ্ছাদিত হইয়া এই আত্মা নিজকে প্রকাশ করিয়া আনন্দ ও রস বিতরণে সক্ষম হয়না। এজন্য বাহিরের আবর্জ্জনা ঝাড়িয়া দূর করিতে হইবে। এই আবর্জ্জনার বিষাক্ত হাওয়ায় দুষ্ট ব্যাধি হইলে তাহারে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সুতরাং "নবজাত শিশু যদি" কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শে সর্ব্বাঙ্গব্যাপক গলিত কুষ্ঠ লইয়া পিতামহীর ক্রোড়ে উঠিতে চায় এবং পিতামহী

ক্রোড়ে লইতে অস্বীকৃতা হয় তবে পিতামহীকে পাগলা গারদে না পাঠাইয়া শিশুকে কুষ্ঠাশ্রমে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য।

আত্মা সনাতন চিরপুরাতন, চির আনন্দ ময় ও রসময়। এজন্য যেখানে২ আমরা আনন্দের বা রসের বিকাশ দেখি তথায় আমরা সেই চির পুরাতন কেই নূতন মূর্ত্তিতে দেখি, কাজেই কোনও ব্যক্তি নূতন কিছু সৃষ্টি করেন না. সেই পুরাতনকেই নূতন করিয়া লোক সমক্ষে ধরেন মাত্র। কিন্তু এইরূপ নূতন চিরকাল সেই নিত্য পুরাতনের দ্বারাই পরিমাপিত হয় কারণ অংশ কখনও অংশী অপেক্ষা বড় হইতে পারে না, A part cannot be greater than the whole সুতরাং সমাজই গুরু মহাশয় সাজিয়া" থাকিবে এবং সর্ব্বদাই "সনাতন অতএব পুরাতন আদর্শে নূতনের ভালমন্দ যাচাই করিবে এবং অসৎ সাহিত্যকে পিযিয়া মারিবার আয়োজন" করেবে. এই আত্ম স্বরূপ পুরাণ পোষাক স্থিতিস্থাপকতা গুণ বিশিষ্ট এজন্য ইহা সকলের গায়েই বেশ মানানো হইবে যদি পরিধানকারী অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে নিজকে পঙ্গু না করে।

( ২ )

আজকাল সাহিত্যের বাজারে একটী কথা বেশী শুনা যায় তাহার নাম আর্ট। এই আর্ট যে জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়া এদেশে আসিয়াছে তাহা আমি বলি না, কিন্তু কোন কোন সমুদ্র যাত্রীর হাওয়ায় এই আর্ট এখন এমনরূপ ধারণ করিয়াছে যে সাহিত্যে এখন আর রুচির বালাই নাই. আর্টের দোহাই দিলে সমালোচক আব কথা কহিবার অবসর পান না। এই আর্ট আবার তাহার সহচরী বস্তু তান্ত্রিকতাকে ডাকিয়া আনিয়া সাহিত্যের আসরে এত আবর্জ্জনা সৃষ্টি করিয়াছে যে বহু ঝাটাধারী তীব্র সমালোচকের দরকার হইয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌভাগ্য যে এই দুঃসময় উপযুক্ত লোক এই ঝাড় দেওয়ার ভার লইয়াছেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ যেরূপ নিপুনতার সহিত সাহিত্যের এই অনাচার প্রদর্শন করিয়াছেন সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বৈষ্ণব সাধনার পারকায় ভাব এখন সাহিত্যে একটী অভিনব ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়াছে। সমাজের পক্ষে ইহা যে কতদূর মারাত্মক তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই বঙ্গীয় পাঠক সমাজের এত রুচি বিকৃতি ঘটিয়াছে যে আমরা এই বিষপান করিতে নিজেতো কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিই না, পরন্তু পরিবারে কন্যা ভগিনী প্রভৃতির হস্তে দিতে ও কুণ্ঠিত হইনা। "কবির সৃষ্ট চরিত্র সুন্দর হইলেই তাহা সাহিত্যে উচ্চপদ লাভের যোগ্য তাহাতে হিন্দু সমাজ থাক বা ভাসিয়া যাক্" এই মতাবলম্বী লেখকগণ লিখিত 'কমলের দুঃখ" এবং কিরণ ময়ীর দার্শনিক বক্তৃতা প্রভৃতি হিন্দু নারী কেন যে কোন সমাজের নারীর অপাঠ্য। সব সমাজেই ইহার বিষম প্রভাব সমান ভাবে অনর্থ উৎপাদন করিবে। তবে আমি আর্টিষ্টদিগকে কবির ভাষায় বলিতে চাই "মাটির কোঠাঘর আগুন দ্বারা পোড়াইলে আর্টের হিসাবে বেশ সুন্দর হয় কিন্তু বাস করার পক্ষে উহা কিরূপ হয় তাহা খুলিয়া না বলিলেও চলে।"

বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ ছোট গল্প উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিলে খুব স্পষ্টরূপে ধারণা হয় যে লেখকগণ কোনও প্রতিভাশালী লেখকের মোহে পড়িয়া অবাধ প্রেমটা সমাজে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রশ্ন করিলে হয়ত তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া আর্ট, বস্তু তান্ত্রিকতা, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বড় বড় কথা বলিয়া প্রশ্ন কারীকে নিরুত্তর করিয়া দিবেন।

( ৩ )

আমি সংস্কৃত সাহিত্যের কথা বলিতে চাই যদিও তাহা এস্থলে প্রাসঙ্গিক হয় না পরন্তু তাহার প্রধান ও অমার্জ্জনীয় দোষ (আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যাহা বলেন) সংস্কৃতে অশ্লীলতা বেশী। সংস্কৃতে আধুনিক রুচির অশ্লীলতা বেশী অস্বীকার করিবার উপায় নাই কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে আদর্শকে খাটো করা হয় নাই।

অশ্লীলতার একটা গণ্ডী নির্দ্দেশ করাও দুষ্কর।

একজন আধুনিক শিক্ষিত উচ্চরাজ কর্ম্মচারী একজন প্রাচীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত আলাপ প্রসঙ্গে বলিলেন "সংস্কৃত অপাঠ্য কেননা তাহাতে এত অশ্লীল কথা রহিয়াছে যাহা পিতাপুত্রে, অধ্যাপক ও ছাত্রে পঠন পাঠন চলে না, চলিতে পারেনা ইহার উত্তরে উক্ত বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "মহাশয়! আমরা যে পিতামাতার সন্তান, ইহা অপেক্ষা অশ্লীল বিষয় আর কি আছে? সুতরাং পিতাপুত্রে একত্র অবস্থান ও বিষম অশ্লীলতা প্রকাশক ব্যাপার

সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "সাহিত্য দর্পণকার" বলিতেছেন "যেহেতু মূর্খ লোকেরও একমাত্র কাব্য হইতেই অনায়াসে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধিত হয় সুতরাং কাব্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিব। একটী মাত্র শব্দ সম্যকরূপে প্রযুক্ত হইলে, সম্যকরূপে জ্ঞাত হইলে স্বর্গে ও ইহলোকে কামধেনু তুল্য ফলপ্রদ হয়।"*

এই চতুর্ব্বর্গ সাধন হিন্দুর প্রত্যেক বিষয়ের মূলকথা। তাহারা যে কোন গ্রন্থই রচনা করুন না কেন সেই গ্রন্থের ভাল মন্দের মানদণ্ড ছিল এই চতুর্ব্বর্গ সাধনতা। শুধু অর্থ ও কাম, সুপ্রচলিত কথায় শুধু আর্ট বস্তু তন্ত্রতা তাহাদের নিকট আদরণীয় হয় নাই। তাহাদের লিখিত বিষয়ে যে কম আর্ট ও বস্তু তন্ত্রতা আছে বা কম মনোবিজ্ঞান আছে তাহা যিনি শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ ও অন্ততঃ পাঠ করিয়াছেন তিনিও অস্বীকার করিবেন না।

কিন্তু এই আর্টের সহিত তাহাদের প্রধান প্রচারের বিষয় ছিল ধর্ম্ম ও মোক্ষ! সাহিত্যে ধর্ম্মের বক্তৃতা নাই, মোক্ষের কথাও প্রতিছত্রে প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু ধর্ম্ম মোক্ষের কথা আছে। সাহিত্য দর্পনকার বলিতেছেন—সাহিত্য হইতে এই ভাবটী পাওয়া চাই "রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবনাদিবৎ" অর্থাৎ অধীত গ্রন্থ হইতে এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হওয়া চাই যে "আমরা রামাদির মত চলিব রাবনাদির মত নহে।" ইহাই সাহিত্যে ধর্ম্মও মোক্ষের কথা। প্রত্যেক প্রাচীন সৎ-সাহিত্যে এই ভাবটী পাওয়া যাইবে।

অবশ্য তথা কথিত আর্টের দোহাই দাতারা বলিতে পারেন "আমার গ্রন্থ হইতেও ঐ ভাবই পাওয়া যাইবে, পাঠকের মূর্খতা হেতু তাহারা অন্যরূপ দোষারোপ করেন।" একথার উত্তর দেওয়া কঠিন—তবে একটা সাধারণ কথা এই বলা যাইতে পারে যে যখন পৌনে যোলআনা পাঠক একরকম বোঝেন তখন লেখকের বেশী জানেন বাহাদুরীটা কতদূর বিচার-সহ তাহার বিচারক সর্ব্ব-সাধারণ!

( ৪ )

এস্থলে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। সাহিত্য দর্পনকার বলিতেছেন "তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিগণ বেদ দর্শনাদি শাস্ত্র হইতেই চতুর্ব্বর্গ সাধন করিতে পারেন; মাত্র অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি তাহ'লে কাব্য পাঠ করিবে—এরূপ আশঙ্কা অমূলক কেননা বেদ দর্শনাদি শাস্ত্র হইতে চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই কিন্তু সরস কাব্য হইতে সহজেই হইয়া থাকে। যে রোগ কটুতিক্ত ঔষধ খাইলেও আরাম হয় সেই রোগ যদি বাতাসা খাইলেও সারে তবে কোন্ রোগী শর্করা ফেলিয়া তিক্ত ঔষধ খাইয়া থাকে? এই ভবরোগের তিক্ত ঔষধ স্বরূপ দর্শনাদি শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে রসপূর্ণ সাহিত্যরূপ শর্করা সৃষ্টি। এজন্য সংস্কৃতে কাব্যের লক্ষণ—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।" এই রসাত্মক বাক্য যদি চতুর্ব্বর্গ সাধনোপযোগী হয় তবেই সৎকাব্য হয়—নচেৎ "রসাভাস" হয়। সাহিত্য দর্পন লিখিয়াছেন "অনৌচিত-প্রবৃত্তত্বে-আভাসো-রসভাবয়োঃ" অর্থাৎ অনুচিত ভাবে বর্ত্তমান হইলে "রসাভাস" হয়। বিজ্ঞ সমালোচক মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে কতখানি রসাভাস প্রবেশ করিয়াছে তাহা বিশেষণ করিয়া দেখান। রসই সাহিতের প্রাণ—বিকৃত রুচির অনুচিত প্রবৃত্ত রসভাস সাহিত্যের আততায়ী। এই আততায়ী সম্বন্ধে ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশ "আততায়ীকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিবে, আততায়ী বিনাশে পাপনাই" তাহাতে আর্ট, বস্তু তান্ত্রিকতা, ও মনোবিজ্ঞান যোলকলায় থাকিলেও সে বধার্হ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃ সিদ্ধান্ত।

---

*"চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তিঃ সুখাদল্প ধিয়ামপি,
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে"
"একশব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যাগ জ্ঞাতঃ স্বর্গে
লোকেচ কামধুগ্ ভবতি।"

# স্মৃতি-শক্তি।

প্রত্যেক মানবের মধ্যে স্মৃতি শক্তির নানারূপ পার্থক্য দেখিতে পাই। কেহবা একবার শুনা মাত্রই কথাটী মনে রাখিতে পারেন কেহবা বহু চেষ্টা করিয়াও উহা পারেন না। এরূপ লোকও দেখা যায় যে মস্তকে কোন গুরুতর আঘাত কিম্বা মন কষ্টের পরে অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। যদিও একেবারে ভুলিয়া যাওয়া বিরল দেখা যায় তথাপি আমরা প্রায় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণ অতীত জীবন বিস্মৃত হইয়া থাকি অথবা কাহারও নাম, কোন তারিখ কিম্বা ঘটনা স্মরণ করিতে অনেক কষ্ট হয়। সেই জন্যই এইরূপ স্মৃতি ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করা কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাক্ ঘটনা আমাদের স্মরণ থাকে কি প্রকারে। ইহা বলা বাহুল্য যে মস্তিষ্কই আমাদের স্মৃতিশক্তির আধার। মস্তিষ্কের উপরিভাগে অসংখ্য আনুবিক্ষণীক কোষ আছে যাহাদের মধ্যে আমাদের জীবনের ঘটনাবলী মুদ্রিত হইয়া থাকে। কাজেই অতীত জীবনের সমস্তই আমাদের স্মরণ থাকিবার কথা; কেবল আমরা উহা মনে করিতে না পারাকেই বিস্মৃত হওয়া বলিয়া থাকি। এই সকল স্মৃতি কোষ গুলি চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম শিকর বা মূল সমূহ বিস্তার করিয়া থাকে ফলে এক কোষের মূলের সহিত অন্য কোষের মূল ঘন সন্নিবিষ্ট বনানীর মূলের মত বিজরিত হইয়া পড়ে। এই মূলে মূলে যোগাযোগের দ্বারা সুস্থাবস্থায় আমরা ইচ্ছাশক্তি বলে যে কোন ঘটনা স্মৃতি পথে আনিতে পারি। যখন আমরা ভ্রান্তি কিম্বা মনঃকষ্টে কাতর হই অথবা রোগ-শোকের দ্বারা মস্তিষ্ক রক্তহীন হইয়া পরে; কিম্বা ঐরূপ কোন কারণে স্মৃতি কোষ সমূহ কিম্বা উহাদের মূল শীর্ণ কিম্বা কুঞ্চিত হইয়া নিকটস্থ কোষের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে তখনই আমরা চেষ্টা করিয়াও অনেক বিষয় স্মৃতিপথে আনিতে পারি না। যেরূপ দেশব্যাপী টেলীগ্রামের তারের জাল মাঝে মাঝে কাটিয়া দিলে সমস্ত দেশের খবরাখবর বন্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ মস্তিষ্কের স্মৃতিরাজ্যে ও স্মৃতিকোষ বিশুষ্ক হইয়া স্মৃতি ভ্রম জন্মাইয়া থাকে

আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই কখন একটী নাম স্মরণ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও উহা স্মৃতি পথে আনা যায় না। এ বিষয়ের আলোচনা ও চিন্তা ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে মন স্থাপন করিয়া একটু বিশ্রাম নিলেই হঠাৎ এক সময়ে সেই নামটা আপনা হইতেই যেন মনে হইয়া পড়ে। উহার স্থূল কারণ মস্তিষ্কের স্মৃতি কোষ সকল রক্ত সঞ্চালন দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যকরী হওয়ার সুযোগের অভাব।

কখন কখন সাক্ষাৎ ভাবে বিষয়টী স্মৃতি-পথে না আনিতে পারায় অন্য বিষয় অবলম্বনে উহা মনে আনিতে হয়। কারণ কোষ সমূহের সাক্ষাৎ যোগাযোগের ব্যাঘাত হওয়াতে অপর রাস্তায় শক্তি চালনা হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কের গুরুতর আঘাত ইত্যাদির দ্বারা কখন কখন ঘটনাবলীর একটা শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে দেখা যায় এই শৃঙ্খল কতিপয় দিবস, মাস, কিম্বা বৎসর ব্যাপী ঘটনাবলী লইয়া হইতে পারি। এই আঘাতের দ্বারা মস্তিষ্কের উপরে অল্পাধিক রক্তস্রাব হইতে পারে, রক্তের চাপ অল্প হইলে অনেক সময়ে উহা সারিয়া যায় কিন্তু চাপ গুরুতর হইলে তাহাদ্বারা স্মৃতি কোষ অনেক বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে; সে সময় চিকিৎসাদ্বারা রোগীর কোন ফল হয় না। আঘাত না হইলে অন্য কারণেও স্মৃতি ভ্রম হইতে পারে। নানারূপ মানসিক কারণ দ্বারা এই স্মৃতি কোষ সমূহের কতিপয় অংশ অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে; তাহা হইলেও লোক জীবনের খানিক অংশ ভুলিয়া যাইবে। বাল্যাবস্থায় এইস্মৃতি কোষ সমূহ সতেজ থাকে, বলিয়া বাল্যের ঘটনাবলি স্মৃতি-কোষে যেরূপ বদ্ধ মূল হইয়া থাকে, বৃদ্ধ বয়সে ঐ কোষ সমূহ দুর্ব্বল হওয়াতে স্মৃতি-শক্তি তত থাকে না। চিকিৎসা শাস্ত্রমতে দুই উপায়ে অতীত ঘটনাবলি-স্মৃতি পথে আনা যাইতে পারে। প্রথম উপায় Hypnotic Suggestion দ্বারা অতীত ঘটনা বিভ্রান্তের মনে আনিয়া দেওয়া যায়; কিন্তু এই উপায় যান্ত্রিক কোন ব্যতিক্রম হইলে কার্য্যকরি হইবে না। দ্বিতীয় উপায় তাড়িৎ প্রবাহ দ্বারা স্মৃতি কোষের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া উহাদিগকে কার্য্যকরী করা যায়। আমরা অদ্য স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করিলাম ইহা কেবল মাত্র স্থূল শরীর নিয়া করা হইল মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া নহে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত

# বিনিময় প্রথা ও জার্ম্মাণার অর্থসঙ্কট।

বিভিন্ন শাসন প্রণালী দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন দেশ সমূহের মধ্যে আমদানী রপ্তানীর মূল্য আদান প্রদান কিরূপে চলে, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। বিষয়টা যদিও একটু জটিল তথাপি বেশ শিক্ষাপ্রদ। জটিলতার মূল কারণই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মুদ্রার প্রচলন, ঐ সকল বিভিন্ন মুদ্রার পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কোনও স্থায়ী সম্বন্ধ নিরূপিত করা নাই। ফ্রান্সের ফ্রেঙ্ক, ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সঙ্গে কিরূপ ভাবে বিনিময় হইতে পারে তাহার কোনও সাধারণ পরিমাপ নাই; পরস্পরের মূল্য সম্বন্ধ অনেকগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর বিনিময়ের হার নির্ভর করে। এই প্রবন্ধে মোটামুটি ভাবে তাহাই আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। প্রত্যেক দেশের আদান প্রদানের কাটাকোটি অনেকটা আমদানী রপ্তানীর মালদ্বারাই সম্পন্ন হয়। যেখানে মালদ্বারা সম্পূর্ণ কুলাইয়া উঠে না, সেখানে যদি কাহারও পাওনা বাকী থাকে তাহা স্বর্ণদ্বারা শোধ করিতে হয়। তবে স্বর্ণের ব্যবহার যত কম করা যায়, আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়িদিগের সে বিষয়ে একটু বিশেষ লক্ষ্য থাকে। স্বর্ণ নিতে কোনও দেশ আপত্তি করে না; কারণ সকলেই স্বর্ণের একটা বিশেষ মূল্য স্বীকার করে। এবং তাহা প্রায় সব দেশে এক প্রকার; পরন্তু স্বর্ণের মূল্য সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না এবং যদিও হয়, তাহা অতি ধীরে ধীরে; কারণ বৎসর বৎসর যে স্বর্ণ খনি হইতে উত্তোলিত হয়, তাহা জমায়ৎ এবং এযাবৎ অবিনাশী স্বর্ণের তুলনায় খুব কম। আবার স্বর্ণের ব্যবহার সাধ্যমত সঙ্কোচ করার কারণ প্রত্যেক দেশের ব্যবসায়িগণ ও ব্যাঙ্কারগণ যা'র যা'র দেশের স্বর্ণ যা'র যা'র দেশে রাখিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করেন মোট কথা স্বর্ণটা যতই জমা রাখা যায়, আন্তর্জ্জাতিক বাজারে ততই দেশের ধনবত্তা ও বাড়িয়া যায়। এখন আমাদের বিবেচ্য এই যে, আন্তর্জ্জাতিক আদান প্রদানের কাটাকাটি করিতে আমদানী রপ্তানীর মাল কিভাবে প্রয়োজন সাধন করে।

কোনও দেশে কোন ও বৈদেশিক বণিক জিনিষ পাঠাইলে কিংবা অন্য কোনও বাবতে বৈদেশিক বণিকের পাওনার দাবী থাকিলে, দাবিদারকে তাহার নিজ দেশ হইতে নিজ দেশের মুদ্রার হিসাবে একটা দাবী পাঠাইতে হয়। এই দাবী টুকু একখণ্ড কাগজের উপরে লেখা থাকে, যাহাকে আমরা বিনিময় পত্র বা Bill of exchange নামে অভিহিত করি। এখন এই Bill of exchange কি প্রকারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রায় মূল্য নিরূপিত করে, তাহা দেখিতে হইবে। ফ্রান্স ইংলণ্ডের নিকট যে সমস্ত মাল রপ্তানী করে, তাহার জন্য সে ইংলণ্ডের মুদ্রার হিসাবে কতকগুলি Bill of exchange বা "বিনিময় পত্র" তৈয়ার করে। আবার ফ্রান্সে ও ত এমন লোক অনেক আছেন যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে অনেক পণ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া থাকেন কিংবা অন্য কোনও বাবতে ইংলণ্ডের নিকট ঋণী; ঐ সকল ফরাসী ব্যবসায়ীরা ইংলণ্ডের মুদ্রার হিসাবে কোনও বিনিময় পত্র ক্রয় করিতে স্বভাবতঃই উৎসুক হয় তাহার কারণ এই উপায়ে তাঁহারা সহজে ইংলণ্ডের দেনা পরিশোধ করিতে পারে। অবশ্য এই বিনিময় পত্রের মূল্যটা যে দেশের ভূমিতে লেনা দেনা হয় সেই দেশের মুদ্রাতেই দিতে হয়। ফরাসী দেশে কারবারটা হইলে ইংলণ্ডীয় পাউণ্ডের মূল্য ফরাসী ফ্রাঙ্কে যত হয়, তাহাই দিতে হইবে। কিন্তু ফ্রান্সে যদি ফ্রান্সের রপ্তানী মাল অপেক্ষা ইংলণ্ডের প্রেরিত আমদানী মালের মূল্য বেশী হয়, তখন বিনিময় পত্র ক্রয়ের গ্রাহকের আধিক্য হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইংলণ্ডীয় পাউণ্ডের উপর যে দাবী থাকিবে তাহার মূল্য ফরাসী ফ্রাঙ্কের হিসাবে বেশী হইবে কিন্তু যদি ইংলণ্ডের বিনিময় পত্র ক্রয়েচ্ছুক ব্যক্তি কম থাকে, অর্থাৎ ফরাসী দেশে যদি আমদানী রপ্তানীর চেয়ে কম থাকে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের নিকট অর্থ পাঠাইবেন এমন লোকও কম থাকিবে। এরূপ অবস্থায় ফরাসী মুদ্রার হিসাবে ইংলণ্ডের বিনিময় পত্রের ধাতব মূল্য কমিয়া যাইবে। এইরূপ নিয়মে প্রত্যেক দেশে অন্যান্য দেশের নামে যে বিনিময় পত্র বাহির করা হয় তাহার মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিনিময় পত্রের মূল্য কখনও

এরূপ বাড়িবে না, যাহাতে স্বর্ণ রপ্তানী করিয়া দেনা শোধ করা যায়; কিংবা উহার মূল্য কমিবার সময়ও কখনও এমন কমিবে না, যাহাতে স্বর্ণ আমদানী করিয়াই প্রাপ্য শোধ করিয়া লওয়া যায়।

স্বর্ণের আমদানী রপ্তানীই বিনিময় পত্রের মূল্য হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি হইবার নিয়ামক। স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইলে বাধ্য হইয়াই বিনিময় পত্রের মূল্য যথেচ্ছা বাড়িতে, কিংবা কমিতে থাকে। যে দেশের এই অবস্থা অর্থাৎ যে দেশে স্বর্ণের আমদানী বন্ধ তাহাকে, আন্তর্জ্জাতিক বাজারে সে দেশকে এক প্রকার দেউলিয়া বলা যাইতে পারে। উপর্য্যুক্ত বিষয়গুলি বুঝিতে পারিলেই আমরা অনেকটা বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর দুর্দ্দশার কারণ বুঝিতে পারি। বর্ত্তমান জার্ম্মাণী অন্তর্জ্জাতিক জগতে একপ্রকার দেউলিয়া। আমরা সংক্ষেপে ইহার মূল কারণ টুকু বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে জার্ম্মাণীর বিশাল বহির্ব্বাণিজ্য একপ্রকার বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিদেশে মাল রপ্তানী করিয়া অন্যদেশ হইতে অর্থ পাওয়ার কোনও দাবী তখন জার্ম্মাণী সমর সরঞ্জামের যোগানে ব্যস্ত থাকিয়া একেবারে হারাইয়া বসিল। ইহার উপর মিত্র পক্ষ ও অতিরিক্ত হারে তাহার নিকট ক্ষতি পূরণ দাবী করিতে লাগিলেন, সে জন্য ও জার্ম্মাণী বিদেশে বহু পরিমাণে অর্থ পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে বাধ্য হইল, অর্থাৎ জার্ম্মাণীর উপরই মিত্র পক্ষের দাবী অনেক বাড়িয়া গেল এই সকলের ফলে দাঁড়াইল এই যে জার্ম্মাণীতে বিনিময় পত্রের সংখ্যা খুব কম হইতে লাগিল অথচ জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট মিত্র পক্ষীয়দের ধার পরিশোধ জন্য ব্যস্ত রহিলেন। একদিকে বিনিময় পত্রের অভাব, অন্যদিকে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক ঋণ শোধ করিবার জন্য বিনিময় পত্রের চাহিদা বেশী ইহার ফলে মিত্রশক্তি বৃন্দের বিভিন্ন মুদ্রার হিসাবে জার্ম্মাণীর মুদ্রার (মার্কের) মূল্য খুব বেশী কমিয়া যাইতে লাগিল অথচ জার্ম্মাণীর এমন সঙ্গতি তখন নাই যে উপযুক্ত স্বর্ণদ্বারা তাহার আন্তর্জ্জাতিক ঋণ শোধ করে। যেখানে এক সময় ইংলণ্ডের এক পাউণ্ড জার্ম্মাণীর ২০ কুড়ি মার্কের সমতুল্য ছিল সেখানে আজ সেই এক পাউণ্ড প্রায় সহস্রাধিক মার্কের সমতুল্য হইয়াছে। খবরের কাগজে যখনই আমরা পাউণ্ডের হিসাবে মার্কের মূল্য খুব সস্তা দেখিতে পাই, তখনই আমরা জার্ম্মাণীর ঋণাধিক্যের কথা বুঝিতে পারি, আবার পাউণ্ডের হিসাবে মার্কেট মূল্য বাড়ীতেছে দেখিলেই বুঝিতে পারি যে সেই পরিমাণজার্ম্মাণীর ঋণ কমিতেছে। এইরূপভাবে কমিতে কমিতে যেদিন জার্ম্মাণ মার্কের ধাতার মূল্য এবং ইংলণ্ডীয় পাউণ্ডের ধাতব মূলের সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে বিনিময় হইতে পারিবে অর্থাৎ যেদিন জার্ম্মাণী ঋণ-শোধ করিতে করিতে তাহার সঞ্চিত স্বর্ণদ্বারা তাহার মুদ্রা নির্দ্ধারিত করিতে পারিবে সেই দিনই বুঝিতে হইবে যে তাহার ঋণ নাই। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে স্বর্ণের অত্যন্ত অভাব এই অবস্থায় জার্ম্মাণগবর্ণমেণ্ট অবাধে কাগজের নোট চালাইতে বাধ্য হইয়াছেন। নোট চালাইবার অবাধ সুবিধা যদি কোনও গবর্ণমেণ্ট একবার পায়, তাহা হইলে যে কোনও সময় অর্থের টান পড়িলে (যাহা—যুদ্ধের সময় খুব স্বাভাবিক) আভ্যন্তরিক আদান প্রদানের সৌকর্য্যার্থে সেই গবর্ণমেণ্ট বিনা আয়াস লব্ধ অর্থে দেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া নিজের প্রদেয় ঋণ মিটাইবার সুযোগ কখনই ছাড়ে না। এইরূপ নোটের অবাধ প্রচলনে দেশে সমস্ত জিনিষেরই মূল্য অযথা বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে রপ্তানীরও ব্যাঘাত জন্মে; রপ্তানীর ব্যাঘাত জন্মিবার কারণ যে দেশে জিনিষের মূল্য বেশ সে দেশ হইতে জিনিস লইয়া লাভ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। জার্ম্মাণীতে বর্ত্তমানে উপর্য্যুক্ত কারণগুলি বিদ্যমান থাকায়ই জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। ইহা হইতে মুক্ত হওয়া জার্ম্মাণীর পক্ষে খুব সহজ নহে।

ইহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে জার্ম্মাণীর উপর অন্যান্য দেশ পাওনার যে দাবী রাখে, তাহা জার্ম্মাণীকে কমাইতে হইবে! এইরূপ ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায়—শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিলেই অতিরিক্ত মাল বিদেশে রপ্তানী করিয়া জার্ম্মাণী অনেকটা পাওনার দাবী কমাইতে পারিবে।

এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটই এক প্রকার তাহার [illegible] জার্ম্মাণীর মার্কের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় তথাকার জিনিষের মূল্যও কমিয়া গিয়াছিল। অথচ পৃথিবীর বাজারে [illegible] জিনিষের আদর বেশী এবং সেইজন্য চাহিদাও বেশী। চাহিদা বৃদ্ধি হইলে মূল্য বৃদ্ধি অনিবার্য্য। জার্ম্মাণীর প্রস্তুত সৌখিন জিনিসের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় পৃথিবীর সৌখিন সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই সুলভের সুযোগের দিকে পড়িয়াছে— যেখানে ১০০ টাকায় একটা পিয়ানো হইত সেখানে ৫০৲ টাকায় তাহা হয় ইহাতে কাহার না লোভ হয়? ফলে জার্ম্মাণী এই প্রলোভন দেখাইয়া দুর্দ্দিন কাটাইয়া উঠিতে পারিবে আশা করা যায়। এতদ্ব্যতীত জার্ম্মাণীর অর্থসঙ্কট যাহাতে দূর হয় তাহাতে বৈদেশিকগণেরর অনেক স্বার্থ আছে। জার্ম্মাণী বৈদেশিকগণের অনেক কাচা মাল এবং শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে; তাহাতে বৈদেশিকগণের আর্থিক অবস্থা অনেকটা উন্নীত হয়। আমাদের এই বঙ্গদেশ হইতে জার্ম্মাণী বহু পরিমাণ পাট এবং চামড়া ক্রয় করিত; কিন্তু বর্ত্তমানে জার্ম্মাণী তাহার অর্থসঙ্কট দরুণ তাহা ক্রয় করিতে না পারায়—আমাদের আর্থিক অবস্থা অনেকটা অবনতির দিকে গিয়াছে সন্দেহ নাই। সেইরূপ ইংলণ্ডেরও অনেক শিল্পদ্রব্য জার্ম্মাণী ক্রয় করিত। অর্থসঙ্কটকালে বৈদেশিক মাল ক্রয় করার বিপক্ষে প্রধান আপত্তি এই যে যদি বর্ত্তমানে জার্ম্মাণী বিদেশীয়দিগের মুদ্রার হিসাবে বিদেশী পণ্য খরিদ করে, তাহা হইলে [illegible] পণ্যের মূল্য তার নিজের দেশের মুদ্রার [illegible] অনেক বেশী হইয়া যায়। ধরুন, যদি জার্ম্মাণী ইংলণ্ডের মুদ্রার হিসাবে ৫ পাউণ্ড মূল্যের কোনও পণ্য ক্রয় করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণীতে জার্ম্মাণ মার্কের হিসাবে তাহার মূল্য হইবে প্রায় ৫০০০ মার্ক, অথচ এই প্রকার বিনিময় পদ্ধতির গোলমালে যে হারে জার্ম্মাণীতে বৈদেশিক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই হারে [illegible] দেশবাসিগণের আয় কিছুতেই বাড়ে নাই। ইহা [illegible] একপ্রকারে জার্ম্মাণীর ঋণ বাড়ানের পক্ষে শক্ত বাধা দেয় [illegible] বৈদেশিকগণের স্বার্থ যে বিশেষ আঘাত পায় তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই যদি মিত্রশক্তিবর্গ [illegible] জার্ম্মাণীর [illegible] ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিতে পারিতেন তাহা হইলে জার্ম্মাণীর অর্থসঙ্কট ইতিমধ্যেই অনেকটা লঘু হইয়া বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কট অনেকটা কমাইয়া দিত। অবশ্য ইহাতে ফ্রান্সের অনেকটা ক্ষতির সম্ভাবনা, কারণ ফ্রান্সের পণ্য দ্রব্যের চাহিদা জার্ম্মাণীতে কম, অধিকন্তু ফ্রান্সের অনেক বিষয় সম্পত্তি বিগত যুদ্ধে জার্ম্মাণী নষ্ট করিয়াছে। তথাপি আন্তর্জ্জাতিক অর্থ সঙ্কট ও বাণিজ্য সঙ্কট কমাইতে হইলে মিত্র শক্তিদের পরস্পর একটা সামঞ্জস্য সাধন করিয়া জার্ম্মাণীর অর্থ সঙ্কট যাহা বিদূরিত হয় তাহার জন্য বদ্ধ পরিকর হওয়া উচিত।

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

---

## সাহিত্য-সংবাদ

মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুর সম্পাদিত "গজায়ুর্ব্বেদ সংহিতার" বঙ্গানুবাদ ১মভাগ অনেকদিন হইল বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগ ও যন্ত্রস্থ।

*         *         *

সৌরভের অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত এম, এ, মহাশয়ের 'জঞ্জাল" নামক নূতন উপন্যাস বাহির হইয়াছে।

*         *         *

কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের নূতন গল্প গ্রন্থ যন্ত্রস্থ।

*         *         *

নরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নূতন গল্পের বই "উপহার" সত্বরই বাহির হইবে। তাহার অন্য একখানা ছেলেদের সচিত্র গল্পের বই "রংকথা" আশুতোষ লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানে বাহির হইতেছে।

*         *         *

ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি,এ, এবার রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা সাহিত্যিক গণের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

তুরস্কের বর্ত্তমান মহামান্য খলিফা ও খলিফাজাদী।

ASUTOSH PRESS, DACCA.
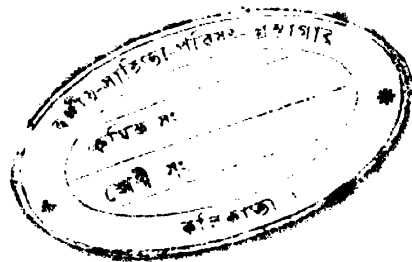
# সৌরভ



একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩২৯ সন। | দ্বিতীয় সংখ্যা।

## শিক্ষা।

স্মরণাতীত কাল হইতে মানব সমাজ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত ও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মানব-হৃদয়ে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি যে সমস্ত সাধারণ বৃত্তি আছে, তাহাদিগকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া সৎপথে রক্ষা কর ও মানব জীবনকে চরমলক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণি সমূহ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত উপদেশ ব্যতিরেকে অনায়াসে ও একই প্রণালীতে যে শিক্ষার সহায়তায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে তাহাকে সহজ বা স্বাভাবিক শিক্ষা ( instinct ) বলে। এই প্রকার শিক্ষার ভার স্বয়ং প্রকৃতিমাতা জীব নিবহের অশেষ কল্যান সাধনার্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মানব জীবন ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় মনুষ্যের পক্ষে কোন্‌টী ধর্ম্ম, কোন্‌টী অধর্ম্ম, কোন্‌টী হিতকর, কোন্‌টী অহিতকর নির্ম্মল বিচার-বুদ্ধি দ্বারা তাহা নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। এই নিমিত্তই মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক শিক্ষার সহিত উপদেশিক ও দৃষ্টান্তগত শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এই উপদেশিক শিক্ষাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এই শিক্ষা বিভিন্ন দেশে বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে। বিভিন্নতার কারণ, বিভিন্ন দেশে মানব জীবনের চরমলক্ষ্যের এই বিভিন্নতা। অনুকরণই শিক্ষার মূল ভিত্তি; সুতরাং যিনি শিক্ষকের গৌরবময় পদে সমাসীন হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহার চরিত্র যে সর্ব্বথা অনুকরণ যোগ্য হওয়া উচিত ইহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষা প্রণালীর বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রণালীর অতি সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

ভারত প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র; ইহার উত্তরে অভ্রভেদী তুষার মণ্ডিত দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়—পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপে অবস্থিত; মধ্য দেশে মেখলার ন্যায় বিন্ধ্যাদ্রি-বিরাজমান। নীলসিন্ধুজল ইহার চরণতল নিরন্তর ধৌত করিতেছে; 'জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা' ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে; ষড়ঋতু পর্য্যায়ক্রমে ভারতে বিরাজমান; "ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা—আমাদের এ বসুন্ধরা" এইরূপ প্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থার জন্য এদেশ বাসীর প্রাণ ধারণোপযোগী বস্তু সমূহের আহরণের কঠোর পরিশ্রমের আবশ্যকতা প্রাচীন ভারতে ছিলনা। চিত্তের শান্ত সমাহিত ভাব আনয়নের পক্ষে অনুকূল সমস্ত অবস্থাই ভারতে বিদ্যমান ছিল। এ অবস্থায় সাধারণতঃই মানবের মন—যাঁহার সত্তায় এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত ও প্রতিফলিত হইতেছে—সেই বেদান্ত-বেদ্য পরমব্রহ্মকে লাভ করিবার নিমিত্ত লালায়িত হয়। তাই দেখিতে পাই, প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রণালী এই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহকেও অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের নিমিত্ত প্রবাহিত হইয়াছিল।

যদিও প্রাচীন ভারতে অধ্যাত্ম বিদ্যা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তথাপি একথা যেন কেহ মনে না করেন যে লৌকিক বিদ্যা বিষয়ে তৎকালে কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। পরাবিদ্যায় ভারত যেরূপ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল, অপরা বিদ্যা সম্বন্ধেও তৎকালে ভারত পৃথিবীর অপরাপর দেশ সমূহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, জ্যোতিষ, নীতিশাস্ত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমান। রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ,

যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রাচীন ভারতে যে লৌকিক বিদ্যার উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছিল, তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। লঙ্কা, ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা প্রভৃতি নগরীর বর্ণনা পাঠ করিয়া ঐ সমস্ত নগরী ঐশ্বর্য্য ও শোভা সম্পদে যে বর্ত্তমান সময়ের লণ্ডন, প্যারী বা কলিকাতা অপেক্ষা অত্যন্ত হীন ছিল, তাহাত মনে হয় না। এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে প্রাচীন ভারতে লৌকিক ও অলৌকিক উভয় বিধ বিদ্যারই যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

অধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধন পূর্ব্বক ব্রহ্মেলীন হওয়াই আর্য্য ঋষিগণের মতে পরম পুরুষার্থ ছিল। মানব জীবনের এই চরমলক্ষ্য—মোক্ষলাভের নিমিত্ত আর্য্যঋষিগণ মানব জীবন ব্রহ্মচার্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু অথবা সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক আশ্রমের বিহিত কর্ত্তব্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এই চতুরাশ্রমের কর্ত্তব্য প্রণালী সমূহের বিষয় যদি আমরা একটু ধীর ভাবে চিন্তা করি, তাহা হইলে অনায়াসেই আমরা ইহা বুঝিতে পারিব যে সর্ব্ববিষয়ে কঠোর সংযমাভ্যাস দ্বারা প্রবৃত্তির পথ ক্রমে সঙ্কুচিত করিয়া নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হওয়া ও পরিশেষে মোক্ষলাভ করাই এই সমস্ত আশ্রম বিহিত কর্ম্ম প্রণালীর উদ্দেশ্য ছিল। কোন্ আশ্রমে কি কর্ত্তব্য ছিল, তাহা মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে অতি সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি রঘুবংশীয় নৃপতিবৃন্দের চরিত্রবর্ণনোপলক্ষে লিখিয়াছেন—

"শৈশবে২ভ্যস্ত বিদ্যানাং-যৌবনে বিষয়ৈষিনাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥"

অর্থাৎ তাঁহারা শৈশবে গুরুগৃহে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন, বিদ্যাশিক্ষা লাভের পর গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তনান্তর দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থের ধর্ম্ম পরিপালন, অপত্যোৎপাদন নিয়ম পূর্ব্বক বিষয় সেবা প্রভৃতি করিতেন, তৎপর বৃদ্ধাবস্থায় সন্তানের উপর গৃহধর্ম্ম-রক্ষার ভারার্পণ করিয়া মুনিগণের আচরিতবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মচিন্তায় মনোনিবেশ করিতেন এবং অবশেষে যোগমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতেন। ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শ। এস্থলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিষয় সামান্যভাবে একটু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কিরূপ সুচিন্তিত প্রণালী দ্বারা ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" উপনিষদের এই মহৎবাক্যের আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অতি শৈশবাবস্থা হইতেই মানবজীবন গঠিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যথাকালে উপনীত হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অতিশয় কঠোরতার সহিত সংযমাভ্যাসপূর্ব্বক অধ্যয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। প্রথমতঃ পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং পূর্ব্বতন বিদ্যাচার্য্য প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া শিশুকে বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হইত। পঞ্চম হইতে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে কোন সময়ে মানবককে আচার্য্যের সমীপে উপনীত হইতে হইত। স্বগৃহে থাকিলে নানাকারণে শিক্ষার প্রভূত ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, তজ্জন্যই আচার্য্য সমীপে মানবকের উপনীত হইবার বিধি। উপনয়নের পর অষ্টবর্ষ সাবিত্র-ব্রত আচরণকাল। অধ্যয়নার্থ বিহিত ব্রতের নামই সাবিত্র-ব্রত। এই অষ্টবর্ষকাল গুরু শিষ্যকে শৌচ ও আচার শিক্ষা করাইবেন। সাবিত্র-ব্রত সমাপনান্তর বেদব্রত ও বেদাধ্যাপনাদির বিধি। সম্ভবতঃ এই সাবিত্র-ব্রতের অষ্টবর্ষকালই ছিল শিষ্যের পরীক্ষার সময়। আচার্য্য এই অষ্টবর্ষকাল শিষ্যের পরীক্ষা করিয়া পরে বেদাধ্যাপনাদি করাইবেন। আচার্য্য সমীপে উপনীত হইবার পর হইতেই বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচর্য্যের আরম্ভ। ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাসকালীন বক্ষ্যমান নিয়মাবলী-প্রতিপালন করিবে। প্রতিদিন স্নানপূর্ব্বক শুচি হইয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ, দেবতার অর্চ্চনা এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে অগ্নিতে হোম করিবে। বেদ যজ্ঞযুক্ত স্বকর্ম্মানুষ্ঠায়ী প্রশস্ত গৃহীদিগের গৃহ হইতে জীবিকানির্ব্বাহার্থ ভিক্ষা আহরণ করিবে। গুরুকুল, জ্ঞাতিকুল ও বন্ধুদিগের গৃহে ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ। অন্যগৃহ অসম্ভব হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৃহ বর্জ্জন করিয়া ভিক্ষা করিবার বিধি। পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত গৃহস্থদিগের অভাব হইলে পাপী ও অভিশপ্ত ভিন্ন যে কোন গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করিবে; কদাপি একগৃহে

ভিক্ষা করিবেনা। গুরুর আশ্রমের দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ করিয়া শূন্য স্থানে রক্ষা করিবে, প্রতিদিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ঐ কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিবে। এই ভিক্ষা-চরণ ও অগ্নিকার্য্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। যে ব্রহ্মচারী সুস্থাবস্থায় ইহার অন্যথাচরণ করিবেন তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ। ব্রহ্মচারী ভিক্ষালব্ধ সমস্ত বস্তু প্রসন্নচিত্তে গুরুর নিকট অর্পণ করিবেন। গুরুর প্রয়োজনোপযোগী উদকুম্ভ, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা ও কুশ আহরণ করিবে। মধু, মাংস, গন্ধদ্রব্য, মাল্য উদ্রিক্ত-রসযুক্ত বস্তু (গুড়াদি), স্ত্রী, শুক্ত (যাহা স্বভাবতঃ মধুর, কালে অম্লতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে শুক্ত কহে), প্রাণিহিংসা, অভ্যঙ্গ (তৈলাদিদ্বারা শির সহিত দেহ মর্দ্দনকে অভ্যঙ্গ কহে), চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান, উপানহ (চর্ম্মপাদুকা) ও ছত্রধারণ ভোগবিষয়ে অতিশয় অভিলাষ, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বীণাদিবাদ্য, দ্যূতক্রীড়া, লোকের সহিত অনর্থক বাক্‌কলহ, মিথ্যাবাক্য, অষ্টাঙ্গমৈথুন, পরের অপকার ইত্যাদি বর্জ্জন করিবে। এতদ্‌ব্যতীত আরও বহু নিয়ম পালন-পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীকে গুরুগৃহে বাস করিয়া শিক্ষালাভ ও জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইত। এমন কি শিষ্য ভোজন পর্য্যন্ত গুরুর অনুমতি ব্যতীত করিতে পারিত না। এই সমস্ত নিয়ম পালনদ্বারা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যে প্রকার উন্নতি সাধিত হইত, তাহার চিত্র প্রাচীন ভারতেতিহাসের প্রতি পত্রে অতি উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত রহিয়াছে। এইরূপভাবে দৈনিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহদ্বারা দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালীর মধ্যদিয়া আর্য্যসন্তানগণ ঔপদেশিক ও দৃষ্টান্তগত যে শিক্ষালাভ করিতেন, তাহারই ফলে তাঁহারা বীর নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এই প্রকার শিক্ষাপ্রণালীর ফলেই—কি জ্ঞানলাভের নিমিত্ত কঠোর তপশ্চর্য্যা সাধনে, কি দৈহিক উন্নতিতে, কি ত্যাগশীলতায় সর্ব্বাংশেই মনুষ্য সমাজের আদর্শ স্বরূপ বহু বীরপুরুষ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষার প্রভাবেই দেখিতে পাই রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ অনায়াসে রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক বনবাসের ভীষণ ক্লেশ স্বীকার করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই; [illegible] পঞ্চভ্রাতাও এইপ্রকারে অতুল ধনসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিয়াছিলেন। ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি অমিত পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন; মহাবীর ভীষ্ম অদ্ভুত ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন; এইরূপ শত শত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাঁহাদের অত্যাশ্চর্য্য চরিত্রবলের কাহিনী পাঠ করিলে বিস্ময়ে ও পুলকে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। কিন্তু "তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ।"

যে শিক্ষা ও সভ্যতা একদিন ভারতকে জ্ঞানের গৌরবময়-উজ্জ্বলচ্ছটায় দীপ্তিমতী করিয়া তুলিয়াছিল! কালস্রোতের আবর্ত্তনে সে শিক্ষা, সে সভ্যতা ও সে সাধনার বিলোপ হওয়ায় ভারত দিন দিন সর্ব্ববিষয়ে দীনহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—আজ ভারত পরপদানত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত।

যে সময় ইউরোপ অজ্ঞানতার ও অসভ্যতার ঘোর ঘনান্ধকারে আবৃত ছিল সেই সময় যে ভারতের জ্ঞানালোক রশ্মি তথায় পতিত হইয়া জ্ঞান ও সভ্যতালোকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল আজ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সেই ভারতবাসীই ইউরোপের অধিবাসী-বৃন্দের নিকট অসভ্য বর্ব্বর নামে অভিহিত হইতেছে, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? যেদিন হইতে ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল, সেইদিন হইতেই ভারতবাসী ক্রমে ক্রমে হীনদশা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে; বর্ত্তমান সময় ভারতবাসীরমত পরমুখাপেক্ষী বোধ হয় আর এ জগতে কেহ নাই

ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও ইংলণ্ডে বর্ত্তমান সময় যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত আছে দেহাত্মবাদই তাহার মূল ভিত্তি। ঘোর নাস্তিকতা ও জড়বাদ সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারই ফলে তথায় জড়বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতেছে এবং নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতেছে; দয়া, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার অবতার মহাত্মা যিশুর অতি পবিত্র মধুর উপদেশাবলীর প্রতি আর তথায় কেহ বড় বেশী কর্ণপাত করে না। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময় ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের কল্যাণকর উপদেশ সমূহ যেরূপে কার্য্যে সংক্রামিত না হইয়া গ্রন্থেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে ও বক্তৃতাদ্বারা পাণ্ডিত্য প্রকাশের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে,

ইউরোপেও এখন সেই প্রকার মহাত্মা যিশুর উপদেশাবলী জীবনের দৈনন্দীন কার্য্যাবলীতে প্রতিপালিত না হইয়া গির্জ্জাগৃহের রবিবাসরিক মামুলি সৌখিন আমোদ উপভোগের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়ায় সমাজের যে শক্তি সকলের কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত ছিল, তাহা শ্রেণী বিশেষের স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইতেছে। তাই তথায় বর্ত্তমানে ধনি ও দরিদ্রের মধ্যে প্রায়শঃই অতি ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই বিদ্বেষ ও নির্ম্মমতার পরিণাম ফলে ইউরোপ খণ্ডে বর্ত্তমান সময় অতি ভীষণ Boleshevism. socialism প্রভৃতি অদ্ভুত মতবাদের আবির্ভাব হইয়া সমাজের সমস্ত সংহতি শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই শিক্ষার আবির্ভাব বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষেও প্রভূত পরিমাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। স্বাধীন ও অধীন দেশের তারতম্যানুসারে এই ভাবরাশি প্রকাশের বিভিন্নতা লক্ষিত হইতেছে মাত্র।

ধর্ম্মহীন শিক্ষা আমাদের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিতেছে। অধানতার নিমিত্ত আমাদের মধ্যে ক্রমেই নানাবিষয়ে দুর্ব্বলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে দ্রুত-গতিতে ধ্বংসের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, আমরা ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইয়া পড়িতেছে। বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল নদীতে কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় অবস্থা আমাদের সমুপস্থিত হইয়াছে; হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া আমরা অন্ধ অনুকরণ করিতেছি মাত্র। দেশ হইতে স্বাধীনচিন্তা ক্রমেই লোপ হইতেছে; একটী জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লরায়, রামানুজম্, তিলক অথবা একটী গান্ধিদ্বারা জাতীয় উন্নতীর পরিমাণ হয় না। দেখিতে হইবে, বর্ত্তমানে আমরা যে শিক্ষালাভ করিতেছি তদ্দারা দেশের অধিকাংশ লোক ত্যাগশীল, চরিত্রবলে বলীয়ান, সংযমী হইতেছে কিনা; উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন বহুলোক দেশে জন্মগ্রহণ করিতেছে কিনা; দেশের হিতাহিত স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া গ্রহণও বর্জ্জন করিতে পারিতেছি কিনা; শিল্প ব্যবসায়ে দেশ উন্নতিলাভ করিতেছে কিনা; দেশের লোক সুস্থ ও বলশালী হইয়া উঠিতেছে কিনা; ইত্যাদি বিষয়ে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর না হইয়া গতানুগতিক ভাবে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় চলিয়া দেশের লোক যদি ক্রমে সংযম ও স্বাধীন চিন্তাবিহীন, অন্ধ অনুকরণশীল হইয়া পড়িতেছে দেখিতে পাই তবেই বুঝিতে হইবে, শিক্ষার নামে আমরা কুশিক্ষা লাভ করিতেছি, দেশ ক্রমে মৃত্যুর পথেই ধাবমান হইতেছে। দেখিতে পাইতেছি—বর্ত্তমান সময় আমরা যেরূপ শিক্ষালাভ করিতেছি তাহাতে আমরা দিন দিন সংযমবিহীন বিলাসী ও অন্ধ অনুকরণশীল হইয়া পড়িতেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত যখন আমাদের দেশে প্রথম প্রবেশলাভ করে তখন এই শিক্ষার প্রভাবে অনেকেই দেশীয় যাহা কিছু তৎসমস্তই ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন— আর বিদেশীয় যাহা কিছু তৎসমস্তই নির্দোষ ও উৎকৃষ্ট এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আচারে, ব্যবহারে, চলা ফেরায়, কথাবার্ত্তায়, এমন কি ভাবভঙ্গিতে পর্য্যন্ত বিদেশীয়-দিগের অনুকরণ করাই জাতীয় উন্নতির লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এইভাবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেথুন Society তে বক্তৃতা করিবার সময় ভারতের একজন শ্রেষ্ঠবাগ্মি, ইংলণ্ড প্রত্যাগত স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ যাহা বলিয়াছিলেন এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন "It is curious to reflect that the most learned works on European literature and science should be studied and appreciated by the student who sits on a mat, eats with his fingers, does not think it necessary to cover his body and under the light of the primitive earthen lamp" মাতুরে উপবেশনপূর্ব্বক কাঁটাচামচ ব্যবহার না করিয়া হাত দিয়া আহার করিয়া, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত না করিয়াও মৃণ্ময় মল্লিকার দীপালোকের সাহায্যে লেখাপড়া করিয়া যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব সমূহ উপলব্ধি করা যাইতে পারে, ইহা তাঁহার নিকট অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কি গভীর পরিতাপের বিষয় যে বক্তা ইহা মুহূর্ত্তের জন্য ও চিন্তা করিয়া দেখিলেন না যে পর্ণকুটীর বাসী সামান্যতৃণাসনোপবিষ্ট ও জটাবল্কলধারী হইয়া এই প্রকার প্রদীপালোকের সাহায্যেই বিদ্যাভাস পূর্ব্বক

আর্য্য ঋষিগণ যে সমস্ত গভীর তত্ত্বজ্ঞানের রহস্যোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, এই বিংশ শতাব্দীতেও তাহা পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে।

যাহা হউক ভগবানের কৃপায় বর্ত্তমান সময় এভাবে কতক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন দেশের লোকের দৃষ্টি প্রাচীন দর্শন, সাহিত্য ইতিহাস, বিজ্ঞান পুরাণ প্রভৃতির প্রতি নিপতিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত বিষয়ের গ্রন্থাদি ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বহুল পরিমাণে অধীত হইতেছে। বর্ত্তমান সময় আমরা যে শিক্ষালাভ করিতেছি হাতাতে আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না দেখিয়া দেশের নানাস্থানেই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। জাতীয় বিদ্যালয়ে কিরূপ ভাবে শিক্ষা প্রদান করা উচিত, ইহাই এখন অনেকের গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে। ভারতবর্ষে এখন নানাদেশ হইতে বণিক্‌গণ অল্প সময়ে ও অল্প মূল্যে কলদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য সম্ভার আনয়ন পূর্ব্বক বিক্রয় করিতেছে; ইহাতে প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের হস্তনির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যসমূহ বিলুপ্ত প্রায় হইয়া পড়িতেছে এবং বিদেশীয় বণিক্‌গণ ভারতবর্ষ হইতে নানাউপায়ে প্রভূত পরিমাণে অর্থলুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রচুর লাভবান হইতেছেন—আর আমাদের দেশ দিন দিন দারিদ্র্যের চরমসীমায় উপনীত হইতেছে, উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদির অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। সুতরাং এই কঠোর জীবন সংগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঁচিয়া থাকিয়া যদি আমরা আমাদের দেশকে পুনরায় স্বাধীন উন্নত ও পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করি তবে আমাদিগকেও অল্প সময়ে উন্নততর প্রণালীদ্বারা আবশ্যক দ্রব্যাদি আমাদের দেশেই প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতেই হইবে। নতুবা এ জীবন সংগ্রামে আমাদের পরাজয় ও ধ্বংস অনিবার্য্য। ইহার জন্য যদি বিদেশে গমন পূর্ব্বক শিক্ষালাভের আবশ্যকতা অনুভূত হয়, তবে আমাদের বিবেচনায় বর্ত্তমান সময় আমাদিগের পক্ষে তাহার পরিপন্থী না হইয়া বরং অনুকূল হওয়াই উচিত। এ সম্বন্ধে সামাজিক নিয়মের আবশ্যক পরিবর্ত্তন না করিলে আমাদের আর্থিক উন্নতির অনেক বিলম্ব ঘটিতে পারে। তবে এস্থলে ২।১টী বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সতর্কতাবলম্বের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয়। (আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

সুসঙ্গ রাজবাটী।

# স্নেহের দান

( ৪ )

জমিদার বাড়ীর মহিলারা সকলেই আজ জীবানন্দ আশ্রমে অহোরাত্র-কীর্ত্তন শুনিতে যাইবেন। এ বিষয়ে জমিদার বাবুর একেবারেই সম্মতি ছিল না। গৃহিণীর অজস্র ক্রন্দনে, ভগিনীর ব্যাকুল অনুরোধে এবং অন্যান্য পুর-মহিলাগণের আগ্রহে, বিশেষতঃ হরকুমারের মাতার বিচিত্র ইসারা-মোহে তিনি শেষটায় মৌনাবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' বুঝিয়া কর্ত্রী ম্যানেজারকে বন্দোবস্ত করিতে আদেশ করিলেন।

পুর-মহিলাগণ যাইবেন; সুতরাং সেখানে বিশেষ বন্দোবস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। ম্যানেজার বাবু সদর নায়েবকে প্রাতঃকালেই আশ্রমে যাইয়া আশ্রমের প্লেন আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। নায়েব মহাশয় দুইজন কর্ম্মচারি ও পাইক-বরকন্দাজ লইয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন। দশটার মধ্যে আশ্রমের প্লেন লইয়া একজন কর্ম্মচারী ফিরিয়া আসিয়া ম্যানেজার বাবুকে সব বুঝাইয়া দিলেন। আহারান্তে ম্যানেজার স্বয়ং প্লেনের উপর পেন্সিল টানিয়া তাঁহার নিজ প্লেন ঠিক করিলেন; তারপর সবেজমিন তদন্ত করিতে জুড়ি হাঁকাইয়া নিজেই চলিয়া গেলেন। রাত্রির ভিতর সব বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল।

মনি মোহনের আনন্দের সীমা নাই। তাহার মা, খুড়ী মা, পিসী মা, মামী, বোন্ সকলেই আজ আশ্রম দেখিতে আসিতেছেন।

এখন তাহার বাবা ও মা, তাহাকে একটী পয়সাও দেন; না অথচ প্রতিদিন কীর্ত্তন-উৎসবে প্রায় শত লোকের অন্ন ব্যয় হইতেছে। নাম সংকীর্ত্তনের বিরাম নাই। কোথা হইতে কোন্ মহাশক্তি যে এই বিপুল ব্যাপারের যোগান চালাইতেছেন, জীবানন্দও তাহা বুঝিতেছিলেন না, মণিমোহনও তাহা বুঝিতেছিল না; অথচ অভাব তাঁহাদের কোন দিনই কোন জিনিসের হইতেছিল না।

অল্প দিনের ভিতরই আশ্রমের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দোকান-পাটসহ বিশাল বাজার বসিয়া গিয়াছিল; বাজারের মহাজনেরা অম্লান বদনে এই বিরাট উৎসব-ব্যাপারের

প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইতেছিল। আরোও কত দিক হইতে যে কত দ্রব্য আসিতেছিল সে অজস্র ভক্তি-উপঢৌকনের ইয়ত্তাই ছিল না!

কীর্ত্তন আজ এগার মাস অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। দিন-রাত্রি, গ্রীষ্ম-বর্ষা-বিরাম হীন। একদল গাইতেছে, আর একদল খাইতেছে; একদল বিশ্রাম করিতেছে, আর একদল উঠিতেছে---এইরূপ অবিশ্রান্ত দিবা রজনী কীর্ত্তন চলিয়াছে। ইহারই নাম অহোরাত্র কীর্ত্তন। আজ এগার মাস এইরূপে রাত্রদিবা চলিয়াছে—সময়সময় দুটী মাত্র লোকেও কীর্ত্তনের তাল ও সুর রাখিয়া অহোরাত্র ঠিক রাখিয়াছে। আগামী সংক্রান্তিতে সাম্বৎসরিক অহোরাত্র-কীর্ত্তন শেষ হইবে।

দূর হইতে শোভা যাত্রার হস্তীর গল-ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। মণিমোহন, জীবানন্দ স্বামী, পরমানন্দ স্বামী, দীনানন্দ স্বামী প্রভৃতিকে লইয়া আসিয়া আশ্রমের দ্বারে দাঁড়াইলেন। ম্যানেজার বাবু রাত্রিতে আশ্রমেই ছিলেন; তাহার নিকট ব্যাপারটা বেশ লাগিতেছিল। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তিনি একটু অগ্রসর হইয়া গেলেন।

একটু দূরে যাইয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আশ্রমের দৃশ্যটা কিরূপ হইয়াছে, দেখিলেন।

সারি সারি কদলি বৃক্ষ, পত্রপুষ্পে সজ্জিত বিচিত্র গেইট, নানা বর্ণের পতাকা, দ্বারের সম্মুখে যুগ্ম কদলী বৃক্ষ মূলে আম্র পল্লব সমহিত সিন্দুর লিপ্ত যুগ্ম পূর্ণ-কুম্ভ উর্দ্ধে নহবৎ—এই সকল উপসর্গ জুটিয়া এক রাত্রিতেই এই সাত্বিক আশ্রমটীকে পূর্ণ মাত্রায় রাজসিক ব্যাপারে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। ম্যানেজার বাবু তাঁহার রাজোসিক দৃষ্টিতে তাহা পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে শোভা যাত্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; দীর্ঘ দণ্ড ধারা দারোয়ান তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে-ছিল।

শোভা যাত্রা আসিয়া আশ্রম দ্বারে পঁহুছিল। প্রথমে সুসজ্জিত হস্তীর মিছিল, তারপর ঘোটক আরোহী কতিপয় সৈনিক পুরুষ; তাহার পশ্চাতে আসা সোটা ধারী পদাতিক শ্রেণী। এই পদাতিক শ্রেণীর মধ্য স্থলে সুসজ্জিত পাল্কীতে পুর মহিলাগণ, তৎ পশ্চাতে ঘোড়ার গাড়ীতে দাসী-চাকরাণী ও সেই—শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ; সর্ব্বশেষে ইংরেজী বাদ্য। মহা সমারোহে শোভা যাত্রা আসিয়া এক দিকে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। মণিমোহন পরম আগ্রহে পাল্কীগুলি অন্তঃপুরের দিকে লইয়া গেল এবং তাহার মা, খুড়ীমা, পিসীমা প্রভৃতিকে সাদরে গ্রহণ করিল।

সে দিন কীর্ত্তনের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। পুর মহিলারা স্নান আহার ভুলিয়া কৃষ্ণ কথার মনোহর পদাবলী-কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন জীবানন্দ, প্রেমানন্দ, পরমানন্দ, সত্যানন্দ, দীনানন্দ প্রভৃতি অনৃতানন্দে ভাসিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মণিমোহন আজ কীর্ত্তনে যোগদান করে নাই। সে আজ বাড়ীর মেয়েদের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যস্ত ভাবে ঘুরিতেছিল।

দ্বিপ্রহরের ভোজন মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এক দিকের এক বৃহৎ টীনের চালায় রান্না হইতেছিল এবং চারিদিকে ঘেরাও করা বিস্তৃত আঙ্গিনায় বসিয়া লোক ভোজন করিতেছিল।

লোক স্নান করিয়া আসিতেছে, আর নিজ হস্তে পাতা সংগ্রহ করিয়া বসিতেছে, স্তূপাকৃত অন্নরাশী, বৃহৎ বৃহৎ মৃৎ-ভাণ্ড সমূহে ডাল ও লাবড়া-পাঁচন। আয়োজন আর বিশেষ কিছুই নহে। ইহাই পরিবেশন-কারিগণ অম্লান বদনে পরিবেশন করিতেছে, আর ভোজন কারী তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া যাইতেছে।

মণিমোহন তাঁহার মা, খুড়ীমা প্রভৃতিকে লইয়া গিয়া তাহা দেখাইল। ভাণ্ডার গৃহ দেখাইয়া বলিল "এই দেখ মা, প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে; আবার পরদিন প্রাতঃকালের মধ্যেই তাহা পূর্ণ হইবে। কোথা হইতে যে কে কি দেয়, তার কোন নিয়ত নাই। ভগবান যেন দুহাতে যোগান দেন, আবার দুহাতে নিঃশেষ করিয়া নেন। লোক প্রতিদিন দশজন বিশজন হইতে—চার, পাচ শত হয়। গড়ে শত লোক রোজ অন্ন পাইতেছে। বল মা, এই জনসেবায়ই আনন্দ, না তোমার ঘরে গিয়া বসিয়া দরিদ্র প্রজার শোণিত সম অর্থ নিজের খেয়ালে অপব্যয় করিলে মনে আনন্দ হইবে? আজ যে অর্থগুলি অনাবশ্যক ভরং রক্ষার জন্য শোভা

যাত্রার খেয়ালে সাজ সজ্জায় ব্যয়িত হইল, সেটাও যদি এরূপ ব্যাপারে ব্যয় করিতে, দরিদ্রলোক দুমুঠা অন্ন পাইয়া, দুই হাত তুলিয়া, কায়মনবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিত।

মহিলাগণ বিস্ময়নেত্রে পুলকিত চিত্তে সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিলেন এবং অন্তরের সহিত তাহা অনুভব করিলেন।

এইরূপে সারাদিন ভরিয়া দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা সন্ধ্যায় বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এবার মণি মায়ের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিল না। শোভা যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই পদব্রজে বাড়ীতে আসিল। ম্যানেজার বাবুও সুতরাং পদব্রজেই তাহার অনুসরণ করিলেন

মহোৎসব শেষ হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে মণি বাবু, তাহার মাকে অর্থ সাহায্য জন্য ধরিয়া বসিল। মা স্বীকার করিলেন কর্ত্তার নিকট আজই রাত্রিতে প্রস্তাব পেস করিয়া একটা বিহিত ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন।

রাত্রিতে গৃহিণী কর্ত্তার নিকট আশ্রমের প্রশংসা করিয়া কর্ত্তাকে একদিন যাইয়া তাহা দেখিয়া আসিতে বলিলেন, এবং মহোৎসবের সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন।

কর্ত্তা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "ছোটলোমির প্রশ্রয় আমি কখনও দিতে পারি না। ছোট লোকের সঙ্গে ঘেসিলে মানীর মান হ্রাস হয়—জান?"

কর্ত্রী—"মিছিলে যে জমিদারী ঠাট দেখাইলে, এ অপব্যয়ে কোন্ উপকারটা হইয়াছে? না যাও, সাহায্য কর। আহা! কত গরীব লোক খাইতেছে, দেখিলে প্রাণ জুড়ায়।"

গৃহিণীকে আর বলিতে অবসর না দিয়া কর্ত্তা বলিলেন—"সে ঠাটের অর্থ, তুমি কি বুঝিবে? জমিদারের খান্দান সর্ব্বদা সমানভাবে বজায় রাখিতে হয়। হাতী মরিলেও লাখ্ টাকা—আর স্ত্রীলোকের থান কাপড় হইলেও পাছা হবে না।

কর্ত্রী শ্লেষ জড়িত বিকৃত স্বরে বলিলেন—"আঃ কি খান্দানরে! দিন রাত মদ খাইয়া মাতলামি করিলে, আর পুলিসের ভয়ে ঘরের কোণে আসিয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে খান্দান যায় না—গরীব দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হইলেই খান্দান মারা যায়। না?"

"কি! এত বড় কথা তোমার মুখে?" বলিয়া কর্ত্তা রাগ করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন

পুনরায় মর্ম্ম বসিল। জমিদার বাবু সেক্রেটারীকে বলিলেন—"খোকা বাবু, মণিকে ত্যজ্য পুত্র করা গেল। তুমি আজই নায়েবকে পাঠাইয়া সদর হইতে উকীল আনাও! নূতন উইল করিতে হইবে। এগুলি আমার স্ত্রীও নয়, পুত্রও নয়। আমাকে বলে কি না মাতাল! পুলিসেরভয়ে আমি জড়সর; শুনলে কথা! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! মন সুস্থ হইতেছে না, একটু বড় রকমের আমোদের ব্যবস্থা কর। বাগান বাড়ীতে কাল চাতকিনার গান হইবে। আজই লোক পাঠাও তাহাকে আনিতে। দেখি, আশ্রমে লোক যায় বেশী, না এখানে লোকের ভিড় হয় বেশী আমার মাথায় জল দাও।"

খোকা বাবু জমিদার বাবুর মাথায় ঝাড়ির জল ঢালিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

জমিদার বাবু বলিলেন "গুণ্ডা লাগাইয়া স্বামীর দলকে দেশ ছাড়া করিতে হইবে। ...এআমার সন্তানে আম হুকুম! ডাকাও ইব্রাহিম সরদারকে? ...কি আমি মাতাল! দেখ দেখি কি বেয়াদপি..."

খোকা বাবু বলিলেন—"কর্ত্তা মহারাজের আদেশ এখনই তামিল করিতেছি।"

( ৫ )

কীর্ত্তনমহোৎসব যথা সময়েই শেষ হইয়াছিল। মহোৎসবের পরে হঠাৎ একদিন জীবানন্দ স্বামীকে কেহ আর আশ্রমে দেখিতে পাইল না। ক্রমে আশ্রমের উপর প্রকাশ্য উপদ্রব আরম্ভ হইল।

অনেক দূর দেশ হইতে আগত বহু ভদ্রলোক স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া আসিয়া জীবানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের সূচনা হওয়ায় তাঁহারাও ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন পুলিস আসিয়া আশ্রম ঘেরাও করিয়া বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। ইহার পর ক্রমে সকলেই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

আশ্রম ও বাজার দুই হিস্যারই এজমালী স্থানে হইয়াছিল। এখন বড় হিস্যার অর্থে স্থানের উন্নতি সাধন হইয়াছে এবং তথায় বাজার স্থাপিত হইয়াছে—এই অজুহাতে তাহা বড় হিস্যার পক্ষে দখল করিয়া লওয়া হইল।

ছোট হিস্যার ন্যায়েব তাহাদের কর্ত্রীর নিকটে মোজাহেম হইবার আদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি আপাততঃ হাঙ্গামা করাইতে নিষেধ করিয়া উকীলের পরামর্শ জন্য সহরে কর্ম্মচারি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

মগুম তখন চলিতেছিল এবং তাহা হইতে নিত্য নূতন ফন্দি আবিষ্কৃত হইতেছিল। আশ্রম হইতে আশ্রম বাসীদিগকে নানা রকম গোপনীয় ও প্রকাশ্য উৎপীড়নে তুলিয়া দেওয়ায় বহুলোক ক্রুদ্ধ হইয়া জমিদারের উপর ভীষণ অভিসম্পাত করিতেছিল; সুতরাং আশ্রম নির্ব্বিঘ্নে দখল করিয়াই চতুর্দ্দিকের লোকজনকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সেখানে বারোয়ারি কালীপূজা ও তদুপলক্ষে বাই-খেমটার নাচ-গান হইবার এক প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

সকল পারিষদই একবাক্যে এই সুললিত প্রস্তাব—প্রজা সাধারণের নিকট খুব আমোদ জনক হইবে—বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন; সুতরাং অবিলম্বে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার ব্যবস্থা হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ৺বারোয়ারি কালীপূজা ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াগেল। তারপর আমোদ প্রমোদ। প্রথম দিন বাজেলোকের জন্য আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা ছিল। আজ কর্ত্তামহারাজদিগের জন্য।

কর্ত্তা মহারাজ বিকাল বেলায় সপারিষদ আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ম্যানেজার বাবুর নিকট সংবাদ আসিল—জুড়িগাড়ী উল্টাইয়া পড়িয়া কর্ত্তা মহারাজ সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছেন; বোকা বাবু কোনমতে লাফাইয়া পড়িয়া রক্ষা পাইয়াছে; কোচানও আঘাত পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার আঘাত তত গুরুতর নহে। কর্ত্তা মহারাজের অবস্থা অতি গুরুতর! কোন প্রকারে তাঁহাকে আশ্রম বাড়ীতে বহন করিয়া নেওয়া হইয়াছে।

সংবাদ বাতাসের আগে ছুটিয়া চলিল। সুতরাং অন্তপুরে সে সংবাদ পঁহুছিতে মোটেই বিলম্ব হইল না অন্তঃপুরে কান্নার রোল উঠিল।

চারিদিকে সকলে শুনিল এবং যাহার যাহা খুসী সে তাহাই বলিতে লাগিল। কেহ বলিল "এমন পাপ কি হজম হইতে পারে?" কেহ বলিল "আশ্রমের সতী সাধ্বিদের উপর অত্যাচার! ভগবান নাই কি? অবশ্যই আছেন।" কেহ বলিল "বাবাছিলেন সাক্ষাৎ কল্কি অবতার; তাহার উপর লাঠি চালানো কি সুজা যাইতে পারে?" কেহ বলিল—'এখন ও ধর্ম্ম একেবারে যায় নাই, আশ্রমে বেশ্যার নাচ, এ কি ধর্ম্মের গায় সয়?"

যাহার যাহা মনে আসিতেছে, সে তাহাই বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতেছে এবং জমিদারের এই এই শোচনায় অবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছে।

ম্যানেজার বাবু সংবাদ পাইয়াই স্থানীয় ডিস্পেন্সেরির ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি তথায় চলিয়াগেলেন।

জমিদার বাবু অচেতন। শরীরের বাহ্যিক আস্থা খুব গুরুতর নহে। স্থানে স্থানে সামান্য আঘাতের যে চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল, ডাক্তার সেগুলিতে ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া দিলেন। সমস্ত রাত্রিই যন্ত্রণার চীৎকারে কাটিল।

রাত্রিতেই সহরে লোক গিয়াছিল। প্রাতঃকালে সদর হইতে সিভিল সার্জ্জন আসিলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন "সিভিয়ার ফ্রাক্‌চার; গাড়ী হইতে পতনে হাড় ভাঙ্গিয়াছে; স্থূল মাংশল শরীর, তাই উপরে প্রকাশ পাইতেছে না।"

তিনি স্থানগুলি 'বেণ্ডেজ' করিয়া দিলেন এবং সেদিন তথায় থাকিয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন

তিনি চলিয়াগেলে সরকারী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে আনা হইল। তিনি আসিয়া তাঁহার উপরওয়ালা মুনিব সাহেবের মতেই মত দিলেন, তদুপরি কমনফ্রাকচারও বলিলেন।

কোন ডাক্তারের সহিত সর্ব্ব বিষয়ে কোন ডাক্তারের মত মিলিল না। এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে সেদিন রাখিয়া সহর হইতে অন্য একজন দেশী বড় ডাক্তার আনা হইল। তিনি আসিয়া সিভিলসার্জ্জন ও এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের কাহার ও মত সমর্থন করিলেন না!

তখন ডাক্তার মহাশয়েরা রোগীর প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তর্ক মীমাংসার দিকেই অধিক মনোযোগ দিলেন। ঘোর তর্ক-বিচারে দিন কাটিল। মতান্তর মনান্তরে পরিণত হইল; তারপর উভয় ডাক্তারই প্রস্থান করিলেন। রোগীর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা কেহ করিলেন না; অপাততঃ যন্ত্রণা উপসমের জন্য নেসার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন মাত্র।

জীবাশ্রমের প্রতি পিতার ক্রোধ ও তাহার ফলে আশ্রমের শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া মনের দুঃখে মণি কলিকাতা চলিয়া গিয়াছিল। সেখানে পিতার এই শোচনীয় অবস্থার টেলিগ্রাম পাইয়া প্রথমে রাগের ঝোঁকে তাহা অবহেলা করিয়াই রাখিয়াদিয়াছিল, পরে মাখনের উপদেশে ও বিস্তৃত চিঠিতে তথাকার চিকিৎসা বিভ্রাটের কথা অবগত হইয়া ডা: সরকারকে লইয়া আসিয়া ডহর পঁহুছিল।

মাখনের পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। সেও মণির অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহার সঙ্গে আসিয়াছে।

মণি পিতার অবস্থা দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ডাঃ সরকার নানারূপ যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"কোন চিন্তানাই।"

শুনিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। সুযোগ মত মাখন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল—"অবস্থা কেমন বুঝিতেছেন?"

ডাক্তার সরকার মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—"পেরালাইসিসতো বটেই, ফ্রাক্‌চারও হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ফুসফুসের অবস্থা। অত্যধিক মদ্যপানে তাহা একেবারে পঁচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

"চিকিৎসার কি রূপ ব্যবস্থা করিবেন?"

"বৃথা চিকিৎসা। এখন আর চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না। এখনও যে জীবিত আছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। আমাকে এখন বিদায় করিবার ব্যবস্থা করুন।"

মাখন ম্যানেজার বাবুকে জানাইল। তিনিও ডাক্তার সরকারের সহিত রোগ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন।

ডাক্তার বিদায় করিয়া মণির মাকে তথায় আনিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

মণির মা আসিয়া দেখিলেন—কর্ত্তা মহারাজের বিরাট দেহ তুলসি তলায় বাহির করিয়া রাখা হইয়াছে—তাঁহার জন্ত কাঁদিবারও একটা লোক নাই।

মাকে দেখিয়া মণি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মাও চীৎকার করিয়া মুর্চ্ছিতা হইলেন। (ক্রমশঃ)

—:•:—

# তোমারি।

আজি এ পরাণ তোমারে চায়।
তোমারি রবি, তোমারি শশি,
তোমারি বিশ্বে হাসি ছড়ায়।
তোমারি তরু, তোমারি লতা.
তোমারি ফুল, তোমারি পাতা;
তোমারি নীল অম্বর হেরি
মোহন দৃশ্যে আঁখি জুড়ায়।
তোমারি নদ, তোমারি নদী.
তোমারি প্রেম—বহে নিরবধি
কল্লোলিনী কুল্ কুল্ তানে.
দুকূলে তোমারি প্রেম বিলায়।
বিশ্ব প্রকৃতি তোমারি মাঝে,
তোমার বীণা হৃদয়ে বাজে.
আমিও তোমারি; তোমারি ফুলে
অঞ্জলি দিব তোমারি পায়।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

---

# একটী ধ্বংসোন্মুখ জাতির কথা।

পরের কথা বলার চেয়ে নিজের কথা ভাবা ভাল, এই সাধু বচনের প্রতি প্রায় অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্টি রাখা হয়না। আমরা প্রায় অধিকাংশ স্থলে পরের কথা লইয়াই সমালোচনা করিয়া থাকি, নিজের কথা ভাবিয়া দেখিবার আমাদের অবসর নাই। এস্থলেও তাহাই হইতেছে।

পরাধীন জাতির স্থান জগতে থাকিতে পারেনা। কেন থাকিতে পারে না? তাহার উত্তর এক কথায় হয় না: কেন না, তাহার কারণ বহু। সে সকল কারণ সত্যই হউক, আর কল্পিতই হউক, ফলে আমেরিকার আদিম নিবাসীরা লয় পাইয়াছে, মেক্সিকোর আজ্‌তেক জাতি, কানাডার এলগন জাতি, পেরুর ইনকা জাতি—কোথাও সামান্য আছে, কোথাও একেবারেই লয় পাইয়াছে। আফ্রিকার কপ্‌টীরা একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহাদের সহিত তুলনায় আমরাতো মায়ের কোল জুড়াইয়াই আছি'

আজ প্রশান্ত মহাসাগর কোলের নিউজিলণ্ড দ্বীপের অধিবাসী মাউরীদিগের কথা বলিব। এই জাতিটাও এখন ধ্বংস পথ-যাত্রী।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বীপটী ইংলণ্ডের অধীন আসিবার পর হইতে ইহাতে ইলণ্ডের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এই সময় এই দ্বীপটী মাউরী অধিবাসী দ্বারা পূর্ণ ছিল। মাউরী অধিবাসার সংখ্যা ছিল তখন একলক্ষ বিশ হাজার। ইহার পনর বৎসর পর ১৮৫৬ সালে

এই সংখ্যা নামিয়া দাঁড়ায় ঠিক অর্দ্ধেকের সামান্য উপর অর্থাৎ ৬৫০০০; তারপর আর ১৮ বৎসর পরে হয় ৪৫৭৪০; আর দশ বৎসরে ৪১৪০২। এইরূপে প্রতি দশসালের বৃদ্ধির সহিত দশ সহস্র করিয়া সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। এইরূপ করিয়া ধাপে ধাপে নামিতে থাকিলে কতদিনে যে এজাতির মুক্তি হইবে পাঠক তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। সৃষ্টি যদি লয়কে গর্ভে লইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এই চিন্তা যদি মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারে, তবে আর এবিষয়ের জন্য চিন্তিত হইবার কারণ কিছুই নাই!

মাউরী জাতির এইরূপ ঘন বিলুপ্তির কারণ বলিতে যাইয়া জনৈক চিন্তাশীল ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন—'বিলাতের উদ্ভিজ্জ এদেশে খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশের উদ্ভিজ্জ ক্রমে নির্ম্মূল হইতেছে; আমাদের নরওয়ে দেশীয় ইঁদুর এদেশীয় ইঁদুরকে তাড়াইয়াছে, আমাদের দেশীয় চড়ুই পাখীগুলির আমদানীও এখানে প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যইতেছে; ফলে এ দেশের দেশীয় (Indeginus) সকল বিষয়েই অভাব দেখা হইতেছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া দেশের অধিবাসীরা বলিতেছে—"এই ধারায় তাহাদের স্থানও অতিশীঘ্র শ্বেতাঙ্গের দ্বারা পূর্ণ হইবে"

এই উক্তিতে কোন ভাবিবার বিষয় আছে কিনা, তাহা পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

এই জাতির বলিষ্ঠ শরীরের সহিত আমাদের ম্যালেরিয়া গ্রস্ত, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেহ যষ্টির তুলনা চলে না। তাহাদের শরীর বলিষ্ঠ, দীর্ঘ ও কর্ম্মপটু। জগতে এমন বলিষ্ঠ জাতির জন্য স্থান না থাকিলে, আমাদের ন্যায় ননিগোপাল জাতির স্থান থাকিবার আশা, দুরাশা নয় কি?

মাউরিদিগের আদিবাসস্থান হাওয়াইকী দ্বীপে ছিল। সেখান হইতে এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মাউরী দলপতি নাগালু দল বল সহ উত্তর নিউজিলেণ্ডে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। সেই হইতে মাউরীরা উত্তর নিউজিলণ্ডেরই অধিবাসীছিল; এখন ইহারা দক্ষিণ দ্বীপে আসিয়া স্থান লইয়াছে। এক সময় ইহারা মোয়াপাখী পোষণ করিত। এই পাখী উট পাখীর মতই বৃহৎ হইত। কোন কোনগুলি ১২ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইত, তাহাদের এই সহচর পাখীটীর বংশও এখন জগত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

মাউরীরা এক সময় নরমাংস খাদক ছিল। তাহাদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে, যে মানুষের মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহার সমস্ত গুণ গুলিও খাদকের আয়ত্ব হয়। এই ভ্রম বিশ্বাসই তাহাদিগকে একটী ভয়ানক নরখাদক জাতিতে পরিণত করিয়াছিল

দলের প্রধান ব্যক্তির পক্ষে কেবল শত্রুর বামচক্ষুটী ভক্ষণ করা বিধেয় ছিল; তাহার কারণ তাহাদের বিশ্বাস বাম চক্ষেই

মাউরী জননী।

আত্মার বাস। শরীরের রক্ত, তেজ ও বীর্য্যের প্রতিক; সুতরাং তাহাছিল শ্রেষ্ঠ পাণিয়া। শত্রুর মস্তকে গৃহ সজ্জিত রাখা ছিল একটী সম্মানের পরিচায়ক। যাহার গৃহে যত শির-কঙ্কাল বেশী দেখা যাইত, সে তত সম্মানী ও বীর বলিয়া পরিচিত হইত।

বিলাতের নৃতত্ত্ব পরিষদের (Anthropologica Institute) এক অধিবেশনে নরমুণ্ড সংগ্রহ করিয়া এক প্রদর্শনি খোলা হইয়াছিল। ইয়ুরোপীয় নৃতত্ত্ববিদ্দেরা ইহা হইতে প্রচুরতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থন হইয়াছিলেন। ইহার ফলে উচ্চশ্রেণীর নরমুণ্ডের চাহিদা এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে উল্কিওয়ালা লোক দেখিলেই সে দেশে হত্যা চলিত। দাস জাতীয় মাউরীদিগকেই অধিক সংখ্যায় হত্যা করা হইত এবং তাহাদের মৃত-মুণ্ডে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় উল্কিদিয়া সেইগুলিকে সম্ভ্রান্ত লোকের মুণ্ড বলিয়া মুণ্ড ক্রেতাদিগের নিকট, বিক্রয় হইত।

শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে যে জীবিত লোকের মুণ্ড ও একদিন মুণ্ডক্রেতারা বায়না করিতে পারিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জনৈক ইংরেজ লেখকের লেখা হইতে একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

A Chief once said to an English purchaser of heads :—"Choose which of these heads you like best"—pointing to some of his own people—"and when you come back I will have it dried & ready for your acceptance."

ঠিক আমাদের দেশের পাঁঠার মাংস ক্রয় বিক্রয়ের মত ব্যবস্থা। ইহাও জনসংখ্যা হ্রাসের একটী কারণ কিনা চিন্তার বিষয়! এই স্থানে দুটী কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে (১) দলপতি (The chief দের মুণ্ড এত পবিত্র যে তাহার নামও কাহার মুখে নেওয়া পাপ। (২) মাউরী দিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পুরুষেরাই সর্ব্বাঙ্গে উল্কা কাটিয়া থাকে; মেয়েরা কেবল চিবুকেই উল্কী কাটে।

মাউরীরা তাহাদের নিজ দেশের সুতায় প্রস্তুত মোটাবস্ত্র সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া ব্যবহার করে। ঐ বস্ত্র বৃক্ষ বন্ধলের ও মূলের রংদ্বারা ইচ্ছামত নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়া লয়। পাখীর পালক স্ত্রী পুরুষ সকলেই সাজ সজ্জার উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। কুকুরের চামড়ার কুর্ত্তা অঙ্গরক্ষা রূপে তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে।

মাউরীরা এখন সভ্য হইতেছে। তাহাদের স্ত্রীলোকেরা হাট বাজার করে, সহরে বন্দরে ঘুরে বটে; কিন্তু উন্মুক্ত দেহে নহে; সম্ভ্রান্ত মেয়েরা চোখ মুখ ফ্লানেল কাপড়ে আবৃত করিয়া বেড়ায়।

ইহাদের কোন কোন ব্যবহার এখনও এমন অদ্ভুত যে তাহার কারণই অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইহারা একের নাসিকাদ্বারা অন্যের নাসিকা ঘর্ষণ করিয়া দিয়া প্রীতি প্রকাশ করি। উভয়ে সমকক্ষ হইলে, উভয়েই সমানে নাসিকা অগ্রসর করিয়া দেয়; সম্মানের পাত্র সম্মুখে পড়িলে তাঁহার দিকে নাসিকা অগ্রসর করিয়া ধরে,

মাউরী দম্পতী।

তিনি স্বীয় নাসিকা দ্বারা তাহার নাসিকা স্পর্শ করিয়া তাহাকে স্নেহ দেখাইয়া থাকেন।

মাউরীরা কুকুর পোষে, অভাবে তাহার মাংস আহার করে এবং চর্ম্মদ্বারা পোষাক প্রস্তুত করে।

গোলআলু অথবা এইরূপ ফসল ব্যতীত দেশের ভূমিতে বিশেষ কোন ফসল হয়না; সুতরাং শিকার দ্বারাই ইহারা বেশীর ভাগ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা মৎস্য ধরিতে এমন ওস্তাদ শিকারী যে ডুব দিয়া, দৌড়াইয়া মাছ ধরিতে পারে।

ইংরেজ সহবাসে মাউরীরা অনেকটা সভ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে মাউরী সমাজের নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুমারী কন্যাদের অবাধে স্বেচ্ছাচারিতা চলিতে পারিত। কোন সামান্য কারনেও ইহাদের মনে কোন আঘাত লাগিলে বা গ্লানিবোধ হইলেই ইহারা অনায়াসে আত্মহত্যা করিয়া থাকে।

মাউরী সুন্দরী।

মাউরী সমাজ গুণ কর্ম্মানুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, সম্রান্ত শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী ও দাস শ্রেণী। সম্রান্ত ব্যক্তিরা 'রাঙ্গাতিরা' পদবীতে পরিচিত হইয়া থাকেন। রাজ কর্ম্মচারী পাদরী, ইংরেজ প্রভৃতিও 'রাঙ্গাতিরা'। ইহা আমাদের দেশের শ্রীযুক্ত মহাশয় বা মিষ্টার স্থানীয়।

সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিই ইহাদের দলপতি (Great Chief) অন্যান্য শ্রেণীর প্রধানদিগকে অধীন দলপতি (inferier chief) করা হয়।

মাউরী পুরুষগুলি সংগ্রামে জলন্ত অনল তুল্য বিক্রম শালী হইলেও কার্য্যান্তে ভয়ঙ্কর অলস। বাড়ীতে কোন কার্য্যই করে না। সংসারের সব কাজ মেয়েরা ও দাস জাতীয়েরা করিয়া থাকে।

সম্ভ্রান্ত মাউরী।

মাউরীরা পিঙ্গল জাতীয় (Brown race) হইলেও, তাহাদের মধ্যে সুন্দরী মেয়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাদের সমাজে কতগুলি নিষিদ্ধ (taboo) ব্যবস্থা আছে। সামাজিক বিচার আচার এই নিষিদ্ধ ব্যবস্থা গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হয়। ব্যবস্থা গুলিকে সামাজিক আইন বলিলেই হয়। যেমন—

(১) কোন কৃষক জমি চাষ করিয়া তাহার পুরোহিতকে শস্যের অংশ দিলে তিনি ক্ষেত্রে এক নিষেধ চিহ্ন টাবু) (taboo) দেন; তখন এই জমীতে স্ত্রী, পুরুষ, কি বালক কেহই আর যাইতে সাহস করিবে না।

(২) কোন নৌকার মালীক "টাবু চিহ্ন" নৌকায় রাখিয়া নিশ্চিন্তে নৌকা খানা নদীতে বা সমুদ্রে তীর লগ্ন করিয়া রাখিয়া আসিতে পারে কেহ তাহা স্পর্শ করিবে না।

(৩) বিবাহিত স্ত্রী স্বামী ব্যতীত অন্যের পক্ষে 'টাবু' বা নিষিদ্ধ।

৪) বাক্ দত্তা কুমারী কন্যা তাহার ভাবী স্বামী ব্যতীত অন্যের নিকট টাবু বা নিষিদ্ধ।

(৫) কোন নৌকা হইতে যদি কেহ জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে নৌকা খানা টাবু। ইত্যাদি।

মাউরাদিগের কোন লিখ্য ভাষা বা বর্ণমালা নাই। তাহাদের ইতিহাস জনগণের মনের ভিতর আমাদের প্রাচীন শ্রুতি স্মৃতির ন্যায় বিরাজমান আছে। তাহাদের জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় গল্প কথা, প্রবাদ-প্রবচন বংশানুপরম্পরা স্মৃতির অভ্যন্তরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য এখন ইহাদের বর্ত্তমান বংশধরেরা ইংরেজের স্কুলে পড়িয়া বিদ্বান হইতেছে কিন্তু প্রাচীন কালেও ইহাদের মধ্যে যে কবিত্ব ও বাগ্মিতা প্রকাশ পাইয়াছিল, দেশে তাহার বিস্তর প্রমাণ বিদ্যমান। ইহাদের গল্প গুলিতে যে সাহিত্য আছে, ঐতিহ্য আছে; সঙ্গীতগুলিতে যে প্রাণ আছে, কবিত্ব আছে; আজ সভ্য জাতিকে তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে। তবে জাতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি না করিতে পারিলে যে জাতির সহিত সাহিত্য লুপ্ত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

## সুর-সন্ধান।

(ঘুঘু-ডাক ছন্দ)
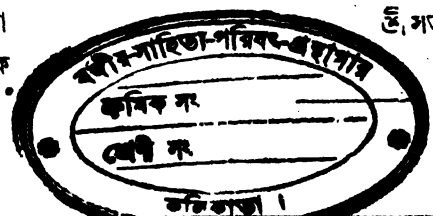
নিঝুম পল্লীর মাঝে মাঝে মাঝে,
কি সুর আটুপ'র বাজে বাজে বাজে!
নানান্ ঝঙ্কার দিশি দিশি শুনি!
সুরের জালটাই দুখে সুখে বুনি! (১)

ঘুঘুই হায় হায়, থেকে থেকে কা'কে,
অমন উন্মন্ কেঁদে কেঁদে ডাকে!
"ঘুঘুর্ ঘুঘ্ঘুর ঘুরু ঘুরু ঘুরু"—
কাঁদন শুনছিই, হিয়া উরু উরু! (২)

সুরের মন্থন চলে সারা বুকে!
হৃদয় খা'ল্ বা'ল্ করে বড় দুখে!
কি—এক ক্রন্দন প্রাণে প্রাণে বাজে!
জগৎ সংসার কাঁদে ভাঁজে ভাঁজে! (৩)

যেথায় যা'র যা'র ব্যথা ছিল চাপা,
জাগায় ওই সুর প্রাণে 'সা-নি ধা-পা'!
প্রিয়ার প্রাণ আজ কাঁদে কারো লাগি'
প্রিয়ের মন আজ কারো অনু-রাগী! (৪)

দুপুর ভোর সাঁজ একা কেঁদে মরে!
তেঁতুল বাঁশ-ঝাড় সুরে সুরে ভরে!
নে' যায় কোন্-এক ভুলে-যাওয়া ভবে!
জীবন যৌবন কাঁদে ঘুঘু রবে! (৫)

হাজার সুখ থাক্ সারা মনে প্রাণে,
উদাস ওই সুর কেন হেন টানে!
প্রিয়ায় চুম্ খাই, রাখি কাছে কাছে!
আবার চম্‌খাই! কি যে হবে পাছে! (৬)

নারীর বোল-চাল্ প্রাণে সুধা ঢালে!
সুরের রোশ্‌নাই দিকে দিকে জ্বালে!
স্বপন—ঢুল-ঢুল যত আঁখি-পাখী,
নীরব ঝঙ্কার তোলে প্রাণে থাকি'! (৭)

সুরের স্পন্দন শিশু যুবা নারী,
জাগায় বিল্ কুল্ বাটী বাড়ী বাড়ী!
প্রাণের পর্দায় বাজে ধীরে ধীরে!
মধুর মিউরাই, ভাসি আঁখি নীরে! (৮)

ও-সুর কোন সুর? কেন বুকে বিধে!
যুবক হাৎড়ায় কা'কে গাঢ় নিদে!
ফাটুক্ বুক্, মুখ কবে খোলে ছুঁড়ী?
ফোটায় প্রাণ্‌টায় সেও ছটো কুঁড়ি! (৯)

যে যার ভরপুর দুখে খালি কাঁদে!
কথায় বল্‌তেই লাজে কথা বাধে!
দুখের উচ্ছাস ধনী মানী বোঝে!
দুখের মূলটুক্ আঁতি পাঁতি খোঁজে! (১০)

মিষ্টাই উট্‌কাই! ইতি উতি মধু!
মধুর মৌচাক সে যে নব বধূ!
সে' মৌ দাও বৌ! সুধু খুঁজি সুধা!
প্রেমের হায়, হায়, কোথা মেটে ক্ষুধা! (১১)

প্রেমের তৃষ্ণায় সুরে সুরে ভাসি!
সবার মুখ চাই, দেখি, শুনি হাসি!
ভদ্রের আখড়ায় তালে মানে খুঁজি!
সে' সুর পাই-পাই! পুনঃ গেল বুঝি! (১২)

এরূপ দিনরাত খুঁজে খুঁজে মরি!
ধরার খুব সাধ, ধরি ধরি করি!
কোথায়! পাই কই! সে যে বড় দূরে!
সুরের যশ গাই ভাঙা ভাঙা সুরে! (১৩)

সুরের হিল্লোল বুঝি মাঝে মাঝে,
ব্যাকুল প্রাণটায় বাজে, বাজে, বাজে!
ঘুঘুই তাই আজ থেকে থেকে তাকে,
"ঘুঘুর্ ঘুঘ্ঘুর্" একা একা ডাকে! (১৪)

আমার প্রাণ্ মন ঘুঘু সাথে সাথে,
সে সুর ঢুঁড়ছেই সারা দিনে রাতে!
সে'সুর-সন্ধান চলে অহ-রহঃ!
বাতাও একবার! পাখী! কহ, কহ! (১৫)*

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

*কিছু দিন হইল পৌষ মাসের কলিকাতার কোনও এক বিখ্যাত প্রাচীন মাসিক পত্রিকায় এই কবিতাটির ভাবানুসরণে কবিতা লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ এই কবিতাটি ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

# রামায়ণী যুগের বাণিজ্য-ব্যবসায়।

শ্রমীর শ্রমলব্ধ ধনের বিনিময়ের নাম বাণিজ্য। দেশোৎপন্ন কৃষি ও শিল্প সম্ভার দ্বারা দেশের বাণিজ্য সম্পদ অনুমান ও নির্ণয় করা যাইতে পারে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা রামায়ণী যুগের কৃষি ও শিল্পকলার আলোচনায় সে যুগে যে প্রচুর লোভনীয় শিল্পসম্ভারের অসদ্ভাব ছিল না, তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঐ সকল শিল্পজাত দ্রব্য ও শিল্পের উপকরণ বা কাঁচা মাল ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইত; অথবা তাহা ভারতের বাহির হইতে আমদানী হইত, তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করি নাই।

রামায়ণ বাণিজ্য বিষয়ক গ্রন্থ নহে; সুতরাং তাহাতে আমরা ভারতীয় বাণিজ্যের বিস্তৃত আলোচনা পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারি না। রামায়ণের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বাণিজ্য বিষয়ের যে সকল কথা ব্যবহৃত হইয়াছে,—ঐ সকল বাক্যের প্রতিই আমরা নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিয়া তাহা হইতে কোন সামান্য সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে পারি কি না, সে বিষয়ে চেষ্টা করিয়া দেখিব।

রামায়ণের বালকাণ্ডে দেখা যায়, রাজা দশরথ রাজধানী অযোধ্যায় বৈদেশিক বণিকদিগকে সাদরে স্থান দিয়াছিলেন।* অযোধ্যাকাণ্ডে দেখা যায়, ভরত রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পূর্ব্বদেশ, পশ্চিমদেশ, দক্ষিণ দেশবাসী নর পতিবৃন্দ ও সমুদ্রবাসী বণিকগণ তাঁহাকে উপহার দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন।

উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দক্ষিণাত্যশ্চ কেবলাঃ।
কোট্যাপরান্তা সমুদ্রা রত্নান্যুপহরন্তুতে ॥ ৮—৮২ সর্গ।

একস্থানে আছে দেশের বাণিজ্য নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত হইবার জন্য নানা দিকে সুপ্রশস্ত রাজপথ সমূহ ছিল এবং সেই রাজপথ সমূহে (বণিকদিগের প্রতি অত্যাচার না হয়, সেজন্য) মার্গ রক্ষকগণ নিযুক্ত ছিল।

অন্য এক স্থানে আছে—রাস্তা হঠাৎ নষ্ট হইয়া পণ্য সরবরাহে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয় সেজন্য রাজপথগুলি সর্ব্বদা সংস্কার করিবার জন্য বিবিধ শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল।

অরাজক রাজ্যের দোষ প্রদর্শন করিতে যাইয়া মহর্ষি লিখিয়াছেন—

"নারাজকে জনপদে বণিজো দূরগামিণঃ।
গচ্ছন্তি ক্ষেমমধ্বানং বহু পণ্য সমাচিতাঃ॥ ২২ অ ৬৭

ভিন্ন ভিন্ন স্থলের এই সকল বাক্যের ভাব গ্রহণ করিলে ইহাই অবগত হওয়া যাইতে পারে যে, রামায়ণী যুগেও ভারতবর্ষের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের সম্বন্ধ ছিল এবং দেশের অন্তর্বাণিজ্য রক্ষার বেশ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ছিল। কবির অনেক কথা অতিশয় উক্তির জন্য অগ্রাহ্য বলিয়া ধরিয়া নিলেও বাণিজ্য ব্যবসায়ের পরিচালন ধারা যে তখনকার লোকেরা অবগত ছিলেন এবং তাহার সুব্যবস্থা কিরূপ বন্দোবস্তে হইতে পারে, জানিতেন, তাহা উপর্য্যুক্ত উদ্ধৃত বাক্যগুলির দ্বারা বেশ স্পষ্ট ভাবেই অবগত হওয়া যায়।

অযোধ্যা রাজধানীতে বহু শিল্পী ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈদেশিক বণিকগণ বাস করিতেন। এই বৈদেশিক বণিকগণ কি উপায়ে এদেশে আসিতেন এবং কোন দেশ হইতে কি দ্রব্য লইয়া আসিতেন এবং সেই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে এ দেশ হইতে কি দ্রব্য লইয়া স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া যাইতেন এবং তাহা কিপ্রকার যান-বাহনের সাহায্যে লইয়া যাইতেন, রামায়ণে স্পষ্ট তাহার কোন উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই না।

নৌকা, স্বস্তিকা ও অর্ণবযানের উল্লেখমাত্র রামায়ণে আছে, কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায়ে এগুলির প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হয় নাই।

বেদেও অর্ণবযানের উল্লেখ আছে। ঋক্ বেদের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় আর্য্যেরা বৈদেশিক পণ্যের জন্য জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য যাত্রা করিতেন; তাঁহারা অর্ণবযান প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

ঋক্ বেদের একস্থানে আছে—রাজর্ষী তুগ্র তাহার পুত্র ভুজ্যকে একটা দ্বীপবাসীদিগকে দমন করিবার জন্য সমুদ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভুজ্য তাহার শত দাঁড় যুক্ত তরণীতে সমুদ্র যাত্রা হইতে আসিয়া তীরে অবতরণ করেন। তখন তাহাকে শতচক্র বিশিষ্ট, ছয় অশ্বযুক্ত রথে গৃহে বরণ করিয়া লওয়া হয়। (১)

* বালকাণ্ড ৫ সর্গ—১৪ শ্লোক।

(১) ১।১১৬।২—৫ ঋক্।

বেদের এই উক্তিদ্বারা আর্য্যেরা যে সেই সুপ্রাচীন যুগেও, দেশ ভ্রম করিতে) সমুদ্র পথে বহির্গত হইতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদে এইরূপ প্রমাণ অনেক আছে। (২)

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে কোশকার ভূমির কথায়—কাহারও কাহারও মতে আসাম যে কোশকার ভূমি তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তাহা অনুমান মাত্র পূর্ব্বদেশ চীনেও তখন বোধ হয় প্রচুর কোশ উৎপন্ন হইত; এরূপ হইলে চীনকেও কোশকার ভূমি বলা যাইতে পারে। চীন দেশীয়ারা তখন কৌশেয় বসন লইয়া সমুদ্রযোগে এদেশে আসিতেন কি না, তাহা গবেষণার বিষয়।

লঙ্কার যুদ্ধে হস্তীর উল্লেখ আছে। তখন হিমাচলে ও দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য প্রদেশে বিস্তর বন্য হস্তী ছিল। (৩) লঙ্কাদ্বীপের যুদ্ধ-হস্তী দাক্ষিণাত্য হইতে নীত হইত কি লঙ্কাতেই উৎপন্ন হইত, তাহার কোন তত্ত্ব রামায়ণে নাই।

তখন কম্বোজ বাহ্লীক ও বনায়ু দেশ হইতে উচ্চৈ-শ্রবাতুল্য (অর্থাৎ খুব উৎকৃষ্ট) অশ্ব আমদানি হইত। সিন্ধু নদীর সমীপবর্ত্তী দেশ সমূহেও প্রচুর অশ্ব পাওয়া যাইত। (৪) এই সকল দ্রব্যের বাণিজ্য স্থলপথেই চলিত বলিয়া মনে হয়।

ভারতের নানা স্থানে সুবর্ণ, রজত, লৌহ, হীরক, পদ্মরাগ, নীলকান্ত, বৈদূর্য্যমণির আকর ছিল।

কেকয় দেশে বৃহৎ কুকুর পাওয়া যাইত। (৫) নেপালে ও কেকয় প্রদেশে শাল বা মুখ্য কম্বল প্রস্তুত হইত।

ইন্দ্রাশির দেশে হস্তী উৎপন্ন হইত। সে দেশের ভারবাহী গর্দ্দভও খুব উৎকৃষ্ট ছিল। (৫)

মলয় পর্ব্বতে প্রচুর চন্দনকাষ্ঠ উৎপন্ন হইত। কি ৪০) সোমাশ্রমের নিকট কাল পর্ব্বতে স্বর্ণের আকর ছিল। (কি ৪৩)। ঋষভ পর্ব্বতে গো শীর্ষ পদ্ম ও হরি শ্যাম নামে উৎকৃষ্ট চন্দন জন্মিত। (কি ৪১)

রামায়ণের ঋষি তৎকালীন অনেক দূরবর্ত্তী দেশ সমূহের উৎপন্ন দ্রব্যের নাম ও তত্ত্ব জানিতেন, আমরা ভৌগোলিক তত্ত্বের আলোচনায় সে সকল দেশের নাম করিব। এ সকল দেশের তত্ত্ব তাঁহারা কিরূপে অবগত ছিলেন বাণিজ্যের আলোচনায় তাহাতে ভাবিবার বিষয় কিছু নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

টায়ারের ফিনিসিয়ান রাজত্ব অতি প্রাচীন। খ্রীষ্টের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নোয়ার প্রপৌত্র সাইডান এই রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফিনিসিয়ানগণ বণিক বৃত্তিতে এক সময় জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া-ছিলেন। ইহারা বণিক বৃত্তি গ্রহণের প্রারম্ভেই ভারতীয় বাণিজ্যের প্রতি ইহাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। সুতরাং ভারতবর্ষের সহিতই ইহারা ইহাদের বাণিজ্যের সূত্র পাত করেন। ভারতবাসী বণিকেরা তখন বহুদর্শী প্রাচীন ব্যবসায়ী। ঐতিহাসিক হিরেন বলেন টায়ারে ও বাবিলনে যে সকল রঙ্গিন বস্ত্র ও পরিচ্ছেদ আমদানী হইত, তাহার অধিকাংশই ছিল ভারতবর্ষের উৎপন্ন। (১)

ইহার বহু শত বৎসর পর আলেকজাণ্ডার টায়ার ধ্বংস করেন। সুতরাং গ্রীক সভ্যতার উন্মেষেরও বহু পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্প সম্ভারে ভূমধ্যসাগরের তিন কূল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

হিরোডোটাস গ্রীসের অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক। তাঁহার সময় খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত গ্রীকেরা কার্পাশ বস্ত্রের সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। তাঁহার বর্ণনা হইতে এই অজ্ঞতা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—They (the Hindoos) passess like wise a kind of plant which instead of fruit produces wool of a finner and better quality than that of sheep; of this tho native make their clothes. (২)

ইহার পর ভারতীয় বণিকেরা ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র প্রতীচ্যে রপ্তানী করিতে আরম্ভ করেন।

লবণ ও সর্করা (চিনি) ভারতের অতি প্রাচীন বাণিজ্য

(২) ১।৪৬।৮; ১।৫৬।৮; ১।৫৬।২ ইত্যাদি।

(৩) বালকাণ্ড ৬ সর্গ ২৩ শ্লোক।

(৪) ঐ ২৪ শ্লোক।

(৫) অযোধ্যাকাণ্ড ৭০ সর্গ ২২–২৩ শ্লোক।

(১) Historical Researches Vol. III.

(২) Pelo's Herodotus Book. III.

সম্পদ। রামায়ণী যুগে ভারতে প্রচুর ইক্ষু চাষ হইত এবং তাহার রস হইতে সর্করা প্রস্তুত হইত। হেমিল্টন সাহেব বলেন সর্করা ভারতবর্ষ হইতে প্রথম আরবে যায়; আরব হইতে মিশর দেশে যায়; মিশর হইতে যাইয়া গ্রীসে পরিচিত হয়।

গ্রীস দেশে যখন প্রথম চিনির ব্যবহার আরম্ভ হয়, তখন তাহা গ্রীক চিকিৎসকগণের নিকট ভারতীয় লবন (Indian salt) নামে পরিচিত হইয়াছিল; ক্রমে তাহা সক্কর (Sakkhar) নাম গ্রহণ করে। (৩)

ভারতীয় বাণিজ্য বিস্তারের এই গৌরব ময় যুগের অবসানে অথবা সমসাময়িক যুগে রামায়ণ রচিত হইয়া থাকিলে আমরা মহর্ষি বাল্মীকির ন্যায় মহা কবির কল্পনার মুখে ভারতীয় সামুদ্র-বাণিজ্যের যে একটা অত্যুজ্জল বর্ণনা প্রাপ্ত হইতে পারিতাম, তাহা অনুমান করা অসমীচীন নহে। সেকালের ভৌগোলিক জ্ঞানের যে পরিচয় তিনি সীতা অন্বেষণে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সেই সুদুর্লভ অভিজ্ঞতার সহিত বর্ত্তমান বিষয়ের সঙ্গতি রাখিয়া বিচার করিতে গিয়া আমাদের মনে হইতেছে—টায়ারের ফিনিসিয় সভ্যতা বিস্তারের পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। এবং রামায়ণী যুগে ভারতীয় বাণিজ্য সাগর পথে বৈদেশিক সম্বন্ধ স্থাপনের মত উন্নত ছিল না। সে বাণিজ্য কেবল দেশের অভ্যন্তরে চলিয়াছিল এবং স্থল পথে, পূর্ব্ব দিকে—কোশাকার দেশ (মহাচীন) ও পশ্চিমে বনায়ু (পারস্য) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

সে কালে স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় বিক্রয় পরিচালিত হইত। ঐ স্বর্ণ মুদ্রার নাম ছিল নিষ্ক। নিষ্কের ওজন কি পরিমাণের ছিল অথবা তাহাতে কোনরূপ চিহ্ন বা লেখা ছিল কি না, রামায়ণে কোথাও তাহার কোন উল্লেখ নাই।

রামায়ণী যুগে লেখনি সম্ভবা লিপির আবিষ্কার হইয়াছিল না। রামায়ণী যুগের শিক্ষার বিষয়—প্রসঙ্গে * এসম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৪৪ সর্গে রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কের উল্লেখ আছে। এই "নাম অঙ্কিত চিহ্ন" রামের নামের সহিত পরিচয় সূচক একটা চিহ্ন বা চিত্রলিপি ব্যতীত আর কিছু বলিয়া আমাদের মনে হয় না! সম্ভবতঃ নিষ্ক মুদ্রাতেও এইরূপ একটা বিশেষ চিহ্নকাটা থাকিত।

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে ভারতীয় বণিকেরা যে সকল মুদ্রা ব্যবহার করিতেন তাহার কয়েকটীর নমুনা আমরা নানা স্থানের যাদুঘরে দেখিয়াছি; সেই সকল মুদ্রায় কোন অক্ষর সূচক চিহ্ন নাই, শুধু একটা গোল চিহ্ন আছে। James Kennedy এই সকল মুদ্রাকে "Punch marked coin" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১) রামায়ণী যুগে বোধ হয় এইরূপ কোন চিহ্ন রাম নামের সূচক বলিয়া প্রচলিত ছিল এবং তাহাই অঙ্গুরীয়কে ও মুদ্রায় ব্যবহৃত হইত।

তখন মুদ্রার বিনিময় ব্যতীত দ্রব্যের বিনিময়েও দ্রব্য পাওয়া যাইত। গরুদান স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনকালে ইয়ুরোপে গৃহপালিত পশুগুলি (cattle) যেমন দ্রব্য বিনিময়ের কার্য্য সাধন করিত, ভারতে গরু-বাছুর, ... মহিষ সেরূপ কার্য্য সাধনে ব্যবহৃত হইত কি না তাহার কোন প্রমাণ রামায়ণে নাই। তখন আর্য্য ভারতে গরু বিক্রয় হইত না; এই চিন্তাও তখন কাহারও মনে ছিল না; কারণ ধনী দরিদ্র সকলেরই তখন গোধন প্রচুর পরিমাণে ছিল।

তখন পরিমাপের জন্য 'অরত্নি'র হিসাব গৃহীত হইত। (২)

## মিথ্যা ও সত্য।

মিথ্যা বলে—সত্য, তব শুধু একরূপ—
অনন্ত আমার ভাষা, অপূর্ব্ব স্বরূপ।
আমার প্রভাবে দেখ অসম্ভব ঘটে,
তুমি সত্য অপদার্থ সবে নাহি ভেটে।
সত্য বলে,—মিথ্যা তুমি বহুরূপী বট,
মম দরশনে থাক ভীত অপ্রকট!
নির্ভীক হৃদয় আমি ঘুরি এ সংসার,
সাধু সুধী হে'রে মোরে করে নমস্কার।

শ্রীমহেশচন্দ্র কবিভূষণ তত্ত্বরত্ন বিদ্যানিধি...।

(৩) ভারতের সর্করা আরবে 'সকর' গ্রীসে 'সক্কর' (Sakkhar) ও লাটিনে সক্কারাম (Saccharum) নামে পরিচিত।

* আষাঢ় ... ১৩১৮।

(১) I. R. A. S. 1897, Page 287.

(২) বালকাণ্ড ১৪ সর্গ ২৬ শ্লোক।

# বেশ্যার দান

শেষ অংশ।

( ৪ )

হেমদাভূষণের বাগান বাড়ীতে পুলিশ মুক্তাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে শুনিয়া বিনোদলাল যথা সময়ে হাকিমের দরবারে উপস্থিত হইল। বিনোদের মোকদ্দমার ডাক পড়িলে পর হাকিম স্ত্রীলোকটীকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য হুকুম করিলেন। খানিক পর একটু খস্‌খস্ শব্দ, কেশ সৌরভের একটা ক্ষীণ আভাস, স্বর্ণালঙ্কারের রুণুঝুণু ধ্বনি দেখিতে দেখিতে একটী দীর্ঘাঙ্গী তরুণী অচঞ্চল পাদক্ষেপে সাক্ষীর মঞ্চে আরোহণ করিল। পরণের বেগুনী রঙ্গের সাড়ীখানার জরিদার চৌড়া আঁচলা খানি ঘোমটা পরা মুখ খানির উপর ঝলমল করিতেছে। ঘোমটার আবছায়ায় উজ্জল মুখশ্রীর উপর একটু শ্যামল আভা পড়িয়া আবার চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে।

দৈন্যের চিরন্তন মুর্ত্তি, ছিন্নবসনা মুক্তার আজ একি রূপান্তর। দস্যুলুণ্ঠিতা বিরহিনীর একি পোষাকের জলুম, জরি জহরতের চাকচিক্য। বিনোদলাল মনে মনে একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হাসি দিবসের দীপশিখার মত একান্তই নিষ্প্রভ! উজ্জল বেশ ভূষার লোভ দেখাইয়া মানুষের হৃদয় জয় করা,—মুক্তার মন স্বামীর প্রতি বিমুখ করা—দস্যুর একি দুশ্চেষ্টা। বিনোদ-লাল মনের উপর খুব জোর দিয়াই ভাবিল ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইয়া মুক্তার হৃদয় বশীভূত করিতে পারে অত বড় দস্যু আজও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই।

এমন সময় হাকিম স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘটনার রাত্রে ঘুম থেকে উঠে প্রথম তুমি কি দেখলে?"

স্ত্রীলোকটী তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত উত্তর করিল "ঘুম হবে কি করে হুজুর, আমি যে ডাকাতদের আশায় সারারাত বসেই ছিলাম" স্ত্রীলোকের জবাব শুনিয়া হাকিম অধিক বিস্মিত হইলেন না। বিপক্ষাশ্রিত স্ত্রীলোক সাক্ষীর সুর বদলাইতে বেশী সময় লাগেনা কিন্তু বিনোদ একেবারে শিহরিয়া উঠিল—মুক্তার মনের রূপান্তর যে অতি ভয়ঙ্কর।"

হাকিম এবার একটু মুখভঙ্গি করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ও ডাকাতের দলের সঙ্গে তোমার আগে থাকতেই সাট ছিল, তবে।"

স্ত্রীলোকটী অটলভাবে সংক্ষেপে উত্তর করিল "না।"

হাকিম পুনরায় জেরার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন, তবে অত রাত জেগে থাকবার মানে? স্ত্রীলোকটী পুনরায় স্থিরভাবে উত্তর করিল, "ডাকাতের হাতে ধরা দিবার জন্য?"

এবার বিনোদের বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ অনেক দূর পর্য্যন্ত শোনা গেল। হাকিম আদালতের উকীল মোক্তারদের দিকে চাহিয়া দুজ্ঞেয় স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে ইংরেজীতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আবার সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেয়েমানুষের এমন দুরন্ত মনও হয়?" হাকিমের কথা মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে স্ত্রীলোকটী জবাব করিল,—"সখের ব্যাপার হলে হুজুর বুঝতেন, কিন্তু অবস্থা সঙ্কট হলে মানুষকে নিজের গলায় ফাঁসিও পর্য্যন্ত দিতে হয় এ আর বেশী কি?"

এই কথা কটীর ভিতর যে একটী তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ লুকানো ছিল, আর যায় কিছু আহত হইয়াও হাকিম আবার প্রশ্ন করিলেন,—"ডাকাতের হাতে স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণের উদ্দেশ্য?

স্ত্রীলোকটী অপেক্ষাকৃত উত্তেজনার সহিত উত্তর করিল, "স্বামীর ইজ্জতরক্ষা।"

হাকিম হাসিয়া বলিলেন,—"স্ত্রীর পক্ষে নিজের ইজ্জত জলাঞ্জলি দিয়ে স্বামীর ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থাটা চমৎকার বটে" স্ত্রীলোকটীও একটু হাসিয়া বলিল "চমৎকার! সত্যের চমৎকার হতে দোষ কি? কিন্তু হুজুর সেটা হয়ত বুঝতে পারবেন না?"

স্ত্রীলোকটীর দুঃসাহস দেখিয়া হাকিম অবাক হইলেন। হাকিম ভাবিলেন মুখরা স্ত্রীলোকের রসনাই এ জগতে সব চাইতে স্বাধীন। তারপর একটু চিন্তা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা তুমি বিনোদলালকে তোমার স্বামী বলে স্বীকার করতে রাজি তো?"

স্ত্রীলোকটী সাক্ষীর মঞ্চে একটু নড়িয়া চড়িয়া গাড়স্বরে একটা হুঁ টুকিয়া দিয়া মুখের উপরকার ঘোমটা টা আরো একটু টানিয়া দিয়া একটু মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

সেটা বিনোদের চক্ষু এড়াইতে পারিল না। বিনোদ লাল এইবার সাহসে ভর করিয়া হাত জোড় করিয়া শুষ্কমুখে হাকিমকে জানাইল,—হুজুর, একবার ওকে মুখ-থেকে ঘোমটা খুলতে আদেশ করা হোক, এ স্ত্রীলোকটী প্রকৃত মুক্তা কিনা তাতে আমার সন্দেহ হচ্চে!"

বাস্তবিক এ স্ত্রীলোকটী যে বিনোদের স্ত্রী না হইয়া অপর কেহ হইতে পারে, সে সন্দেহটা হাকিমের মনে একবারও উদয় হয় নাই। তাকে বিনোদের স্ত্রী সাব্যস্ত করিয়াই হাকিম তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিজের অতবড় বুঝিবার ভুল হওয়ার সম্ভাবনায় হাকিমের মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গেল। সেই জন্য তিনি প্রশ্নের সহিত যথেষ্ট বিরক্তি মিশাইয়া বিনোদকে বলিলেন "বিলক্ষণ! একটা আসল মুক্তা কি নকল মুক্তা তারি খোঁজ রাখনা অথচ একেই ঘরে নিতে এসেচো! এমন বেহুঁস মানুষের বৌ থাকাই আশ্চর্য্য!"

হাকিমের অনুচিত তিরস্কারে একটু লজ্জিত হইয়া বিনোদ বলিল—

"গ্রেপ্তারের পর হুজুরের এজলাসেই একে প্রথম দেখচি। আগে পুলিশ আমাকে দেখতে দেয়নি।"

অল্পক্ষণ চিন্তার পর মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হইলে হাকিম বিনোদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া স্ত্রীলোকটীকে ঘোমটা খুলিতে আদেশ দিলেন।

স্ত্রীলোকটী কিছুক্ষণ যেন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। শত শত উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টির শরাঘাত হইতে সুন্দর মুখ খানা বাঁচাইবার লোভ স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বাভাবিক। তারপর না জানি কি ভাবিয়া সে স্ত্রীলোকটী প্রস্ফুটিতা রজনীগন্ধার ক্ষীণশ্যামল পেলব কুন্তিত শাখাটীর মত মৃদু অঙ্গ চালনে একটু হেলিয়া দুলিয়া শেষকালে মঞ্চের উপর ঋজু হইয়া দাঁড়াইল। তারপর ধীরে ধীরে যেমন করিয়া নববসন্তের লঘু পবনে শুভ্র মেঘের পাতলা ওড়না উড়িয়া গিয়া নীলাকাশে সকলঙ্ক শশী উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ঠিক তেমনি ভাবে সে স্ত্রীলোক পল্লবিত লতার মত হাত দুখানিতে শ্রীমুখের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া দিয়া লোক পরিপূর্ণ বিচারালয়ে সৌন্দর্য্যের মহিমায় রাণীর মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

সহসা শব্দ মুখরিত বিচারালয় নীরব শব্দহীন হইয়া গেল,—কি আশ্চর্য্য চক্ষু, কি অপরূপ মুখ! বিনোদলাল সে মুখ দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল,—"এতো আমার স্ত্রী নয়, এযে হেমন্তবেশ্যা।"

বিনোদের অস্বাভাবিক চীৎকারে আদালতের নিস্তব্ধ জনতা যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। মানুষের মন যেন বিনোদলালের এ অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না।

হাকিম আরো বিস্মিত হইয়া স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন —বিনোদলাল ও কি বলচে ?"

স্ত্রীলোকটী মুখের ঘোমটা না দিয়াই বীণা নিন্দিত মধুর স্বরে বলিয়া উঠিল "যার যা খুসি!"

সে অনাহত বীণার ঝঙ্কারে কি স্ত্রীলোকটীর সুদূর হৃদয় তলে কোন সুপ্ত বেদনার সুর অতি মৃদুভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল? নচেৎ তার নয়নের নীলপদ্ম দুটী সহসা শিশির সিক্ত হইয়া উঠিল কেন? হয়ত: কোথাও যেন মিথ্যার মধ্যে সত্য ছিল, সত্যের মধ্যে মিথ্যাছিল, চোখের জলের বাণী সুগভীর বেদনার মৌন ভাষায় আজ যেন মুক্তবিশ্বে সেই অস্পষ্ট সত্যই প্রচার করিল?

হাকিম আরো কিছুকাল চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিলেন তুমিই যে বিনোদের স্ত্রী মুক্তা, তার কি প্রমাণ আছে?

স্ত্রীলোকটী কোনো কথা না বলিয়া চাঁপার কলির মত একটী আঙ্গুল হইতে একটী সোণার আংটী খসাইয়া সেটী ঠুন করিয়া হাকিমের টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিল। হাকিম, ভুরু কুঞ্চিত করিয়া আংটী টী তুলিয়া বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন, আংটীর ভিতর বিনোদ ও মুক্তার নাম এক সঙ্গে খোদাই করা আছে।

স্ত্রীলোকটী সত্যি সত্যি বিনোদলালের স্ত্রী কিনা স্থির করিতে না পারিয়া হাকিমের মন অস্তি নাস্তির মাকড়সার জালে ঝুলিতে লাগিল। শেষকালে তিনি চিন্তিতভাবে বিনোদের পানে তাকাইয়া বলিলেন "এর পর তোমার আর কি বলবার আছে?"

বিনোদলালের মুখ তখন উত্তেজনায় লাল হইয়া গিয়াছে। সে বার কয়েক ঢোক গিলিয়া বলিল —"আসামীরা মুক্তাকে

ছাপাবার জন্যে বেশ্যাকে হাত করে, এ কাণ্ড করেচে এ যে আমার স্ত্রীর নয়.—হেমন্ত বেশ্যা. হুজুর একবার স্থানীয় তদন্ত করলেই জানতে পারবেন।"

স্ত্রীলোকটী অচঞ্চল দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা বলিলনা হাকিম বলিলেন 'বেশ তো, তাহাই হউক।"

( ৫ )

স্থানীয় তদন্ত করিতে হাকিম হেমন্ত বেশ্যার বাড়ীতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন তার ঘরে একটী লোক আপাদ মস্তক কম্বল ঢাকা দিয়া মরার মত বিছানায় পড়িয়া আছে। হাকিম আসিয়াছেন শুনিয়াও সে স্ত্রীলোকটী বিছানা হইতে উঠিল না বা মুখের উপর হইতে কম্বল সরাইল না? বাড়ীওয়ালি হেমন্ত বেশ্যার মাসি আসিয়া বলিয়া গেল, তার বোনঝির আজ সাতদিন একলাগা জ্বর। হাকিম মেয়েটীর বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি বাছা?"

কম্বলের আড়াল হইতে মৃদুকণ্ঠে আওয়াজ হইল "হেমন্ত।"

হাকিম অবাক হইয়া বিনোদের মুখের পানে চাহিলেন; বিনোদ ও অবাক হইয়া হাকিমের মুখের পানে চাহিল? হাকিম গম্ভীরভাবে বিনোদকে বলিলেন,—"এই স্ত্রীলোকটীকেই তো হেমন্ত বেশ্যা বলে মনে হচ্চে!"

বিনোদলাল বলিল "আমার কিন্তু কথার সুরে তো এই স্ত্রীলোকটীকেই মুক্তা বলে ঠাহর হচ্চে!"

হাকিমের আদেশ মত হেমন্তর মাসী আসিয়া স্ত্রীলোকটীর মুখের উপকার কম্বলের ঢাকনি সরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। মুখ দেখিয়াই বিনোদ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "এই তো আমার স্ত্র, মুক্তা!"

বিছানায় শোয়া স্ত্রীলোকটী বলিল "আমি হেমন্ত!"

হাকিম কিছুই মিমাংসা না পারিয়া অপর স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন,—"ব্যাপার খানা তো কিছুই ঠাউরে উঠতে পারচিনে"—

তখন থানাতাশাসে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত স্ত্রীলোকটী বলিল "সব কথাটা খোলাসা করে বললে ব্যাপারটা আপনার বুঝতে কষ্ট হবে না।" এই বলিয়া সে হাকিমের অনুমতি লইয়া সবিস্তারে সব কথা খুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—

"হুজুর, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি বিনোদের স্ত্রী কন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য যে সে কখনো আমাকে বিবাহ করে নাই। আইনের চক্ষে বোধ হয় এটা বিবাহ নয়। কিন্তু হুজুর মাপ করিবেন আমি আইন মানি না। কোন স্ত্রীলোকের নিকটই হৃদয় অপেক্ষা আইন কখনো বড় জিনিষ নয়। আমার হৃদয় একটা অরাজক স্বেচ্ছাচারের সাম্রাজ্য! সেখানে আমি আইন নীতিধর্ম্ম কিছুরই এলাকা রাখিনা বিনোদলাল আমার সেই হৃদয় রাজ্যের স্বামী সেখানে এ বিষয়ে আর কোনোতর্ক নাই।

"এক রাস পূর্ণিমার রাত্রে তার সাথে আমার প্রথম দেখা। কোথাকার রাস কোথায় পড়িয়া থাকিল, বিনোদ আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিল, যেন সে এক আদিম ঊষার আলোকিত সেখানই দেখিয়া অবাক হইয়া গেছে। বিনোদের কালো কোঁকড়ানো চুলের ডালি সাজানো সুন্দর মুখটীর উপর বিস্ময়মুগ্ধ দুটী চোখ। আমার ভারি মিষ্টি লেগেছিল যেন কত জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত সে দুটি চোখ।

প্রথম ভালবাসার ভিতর নিশ্চয় অদৃষ্টের কোনরূপ অভিসম্পাত আছে।

উভয়কে উভয়ে ভালবাসিয়া বুঝিলাম আমাদের বিবাহ হইবার নহে। আমাদের মিলনের পথে যে একটা সাঁকো ছিল, সমাজ সেটা আগে থাকিতেই ভাঙ্গিয়া রাখিয়া ছিল। আমি মা কি বুঝিবার আগেই বিধবা হইয়াছিলাম। আমার নাকি, পুনরায় বিবাহ হওয়া সমাজে কলঙ্কের কথা। পথে এত যে কণ্টক, হৃদয় এত যে ক্ষত বিক্ষত হইল, তবু বিনোদের উপর হইতে মনকে রাশ টানিয়া ফিরাইতে পারিলাম না। বিনোদের ও সেই দশা হইল। মানুষের মনের যখন এরূপ দুর্দ্দশা হয়, তখন যা হইবার তাই হইল। সমাজের মাঝে আমাদের মিলনের স্থান ছিল না, সমাজের বাহিরেই আমরা মিলনের স্থান করিয়া লইব, এই পরামর্শ করিয়া একদিন গভীর রাত্রে আমি বিনোদের সঙ্গে পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া আসিলাম; আর আমার ঘরে ফিরিবার পথ থাকিল না।

বিনোদ আমাকে আমার বাপের বাড়ী হইতে বরাবর তার নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিল সেখানে বিনোদের

স্ত্রী মুক্তার সঙ্গে পরিচয় হইলে পর আমি টের পাইলাম, ঘরের স্ত্রীকে ফেলিয়া রাখিয়া বিনোদের পক্ষে আমাকে লইয়া সমাজের বাহিরে চলিয়া যাওয়াটা একটা প্রকাণ্ড মোহের ছলনা মাত্র। কিন্তু আমি যে তখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি, তাকে হৃদয়ের স্বামী বলিয়া হৃদয় কুঞ্জেতে বরণ করিয়া লইয়াছি। যে ফুলের মালা সাধ করিয়া গলায় পড়িয়াছিলাম তার ভিতর হইতে ঘুমন্ত সর্প আমার হৃদয় দংশন করিল,—সমস্ত হৃদয়টা বিষাক্ত হইয়া নীল হইয়া গেল, বাঁচিবার আর কোন পথ রহিল না। হৃদয়ের জ্বালায় অস্থির হইয়া বিনোদকে রাগ করিয়া বলিলাম,—

"ভালবাসাকে বিশ্বাস করার অপরাধে আজ সমস্ত হৃদয় ছলনায় ভবে নিয়ে আমাকে রাস্তার দাঁড়াতে হলো। কিন্তু ঈশ্বর নিকট সেজন্য তুমি চিরদিন দায়ী থাকবে।"

বিনোদ আমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিল "হেমন্ত তুমি আমার ভালবাসার বিশ্বাস হারিয়ো না। তুমিই আমার মুক্তা, তুমিই আমার স্ত্রী! আমার আর সব স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে গেছে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্ত্রীলোকটী একবার সকৌতুকে বিনোদের পানে তাকাইয়া বলিল —"হাকিমের কাছে আমি তোমার স্ত্রী মুক্তা বলে যে পরিচয় দিয়েছিলাম সেকি সব মিছে কথা?"

বিনোদলাল মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া থাকিল? দুঃখে ও লজ্জায় তখন তার সারা মুখ রক্তজবার মত রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে!

সে স্ত্রীলোক তার অসমাপ্ত কাহিনী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

"বিনোদ তো আমাকে মুক্তার আসনে বসাইয়া মুক্তার সঙ্গে তার নিজের নাম খোদাই করা আংটী আমার হাতে হাতে পরাইয়া দিল। আংটী পরিতে আপত্তি করিলাম না। কারণ স্বামীর জন্য আমিও যে একদিন হৃদয় দান করিতে পারিয়াছিলাম—এই আংটীই আজ তার একমাত্র নির্ব্বাক সাক্ষী! আমার অন্ধকার জীবনে তো এই টুকু স্মৃতি লইয়াই বাঁচিয়া আছি, কিন্তু সহধর্ম্মিনীর পুণ্যময় আসন তো কেবল আবেগপূর্ণ প্রণয় দিয়া নির্ম্মিত নয়। মুক্তার আসনে বসিবার মত মনের বল যে আমি জন্মের মত হারাইয়াছি। তাই আর কোনো উপায় নাই দেখিয়া আমি আমার স্বামীর হাত মুক্তার হাতে সঁপিয়া দিয়া দুই চক্ষের জলে অন্ধ হইয়া বলিলাম,—

"মুক্তা, আজ আমার স্বামী তোমায় দিলাম। আমি অনেক খোয়াইয়া আসিয়াছি, স্বামীও খোয়াইতে পারিব। কিন্তু ধর্ম্ম তোমায় যা দিয়াছেন আমি নিজের সুখের জন্য তা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করিব না।"

"স্বামী দান করিয়া দেখিলাম আমার হৃদয় একটা তলহীন গহ্বর মাত্র বাস্তবিক আমার নারী হৃদয়ের আর কিছুই আমাতে অবশিষ্ট ছিল না। আমি শূন্য হৃদয়ে বিনোদের ঘর হইতে বরাবর সদর রাস্তায় আসিয়া দাড়াইলাম সেই হইতে আমি নির্লজ্জা বেশ্যা! "হাঁ নির্লজ্জা বেশ্যাই বটি আমি। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া আর কিসের আশায় বাঁচিয়া থাকিব! তাই পাপের জলন্ত আগুনে শীঘ্র পুড়িয়া মরিবার জন্যই এ তুফানের ব্যবস্থা। হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তাকে আমার সকলই দিয়া আসিলাম। কিন্তু তবু বিনোদের বাড়ীর নিকটে আমি বেশ্যার বাসা বাঁধিলাম কেন? কারণ আমি সে সর্ব্বস্ব ত্যাগের মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া হোম সমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই; কারণ বিনোদকে সময় সময় চোখে দেখার লোভ সম্বরণ করা আমার নিকট দুঃসাধ্য বোধ হইল। কিন্তু থাক সেকথা। আর আমি কখনো মুক্তার স্বামী সুখের কণ্টক হই নাই। একবার মনে অজ্ঞাত হইয়াছিলাম বলিয়াই তার প্রায়শ্চিত্ত,একটা সুদীর্ঘ নারী জীবনের দুঃসহ নিষ্ফলতা।

"তারপর বিনোদ অনেক দিন এ হৃদয় হীনা বেশ্যার ঘরে আসিয়াছে। অনেক কান্নাকাটি, পায় পড়িয়া অনেক স্তবস্তুতি করিয়াছে। কিন্তু আর কখনো তাকে বিশ্বাস করি নাই। শুধু তাকে বলিয়া কেন, কাহাকেও না। এ জীবনে অনেককে ছলনায় ভুলাইয়াছি কিন্তু একবার ছাড়া আর কখনো পরের ছলনায় ভুলি নাই।

"হুজুর বেশ্যার কলঙ্কের ইতিহাস বৃথা দীর্ঘ করিয়া লাভ কি? সমাজ বা ধর্ম্ম কেউ তাকে সহ্য করিতে পারে না। কথাটা সংক্ষেপেই শেষ করিয়া দেই. হুজুরের মূল্যবান সময় নষ্ট হইতেছে।

"হেমদা। ভুবণের নায়েব কিছুদিন হইল আমার ছলনা জালে পড়িয়া ঝুলিতেছিল। সে দিন রাত্রে আমার ঘরে আসিয়া আমার মনোরঞ্জন করিবার ছলে সে বলিল হেমদা ভুবণ শিকার করিতে গিয়া পাল চৌধুরীদের ঘাটে মুক্তাকে দেখিয়া অবধি তার জন্য পাগল হইয়াছে। এবং সে ইহাও আমাকে জানাইল যে বিনোদকে একটা কৌশল করিয়া অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া সেই রাত্রেই মুক্তা হরণের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

"আমি দুচার টুকরা বাজে মিষ্টি কথায় নায়েবকে বিদায় করিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্তার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি ব্যাপারখানা মুক্তাকে ভাঙ্গিয়া বলিতেই সে আমার দুই হাত জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল

"দিদি একদিন তুমি আমার স্বামী দান করেছিলে, আজ তুমি আমার সতীত্ব দান কর।

আমি আর সময় নষ্ট না করিয়া মুক্তাকে আমার বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। মুক্তাকে আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত হেমন্ত বেশ্যা বলিয়াই পরিচয় দিতে বলিয়া গেলাম। বাড়ীওয়ালা মাসীকে আমার বাড়ীতে লোক আসিতে মানা করিয়া দিয়া বলিলাম, চারিদিকে রাষ্ট্র করিয়া দাও যে হেমন্ত বেশ্যার বসন্ত হইয়াছে। এ সংবাদে মরা মানুষের কঙ্কাল ও বেশ্যা বাড়ীর ছায়া মাড়াইবেনা—জীবিত মনুষ্যত পরের কথা!

এই বলিয়া আমি সেই রাত্রেই আমার ঘর ছাড়িয়া করাকর বিনোদের ঘরে গিয়া উঠিলাম। সেই আমার প্রথম ও শেষ স্বামীর ঘরে বাস। এক রাত্রির কয়েক ঘন্টার জন্য স্বামী ছাড়াও স্বামীর ঘরে বাস করিয়া আমার নিষ্ফল নারী জন্ম সফল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তারপরে আমি হৃষ্টচিত্তে আমি ডাকাতের লুণ্ঠনের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকিলাম। বেশ্যার আবার মান অপমান কি? চোর ডাকাতে অপহরণ করিবার মত সামগ্রীই বা তার কি আছে!

হুজুরের কাছে আমি কোথাও মিথ্যা বলি নাই। আমি সত্যি সত্যি রাত্রি জাগিয়া ডাকাতের অপেক্ষায় বসিয়া ছিলাম।

এইখানে হেমন্ত বেশ্যা তার আশ্চর্য্য কাহিনী অসমাপ্ত রাখিয়াই হঠাৎ নীরব হইয়া গেল? যেন মুখে বলার যতটুকু ছিল সেটুকু শেষ হইয়া গিয়াছে বাকীটুকু যেন কয় ফোঁটা চোখের জল। কথা শেষ হইলে সেই কয় বিন্দু অশ্রুই সে অসমাপ্ত কাহিনীর অশ্রুময় উপসংহারের মত হেমন্ত বেশ্যার সাশ্রু নেত্র-পল্লবে উজ্জ্বল মুক্তা বিন্দু হইয়া জ্বলিতে লাগিল। চিরন্তন নারীর ত্যাগের মহিমায় বেশ্যার মূর্ত্তিও যেন সকলঙ্ক পূর্ণ শশীর মত স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে ভরিয়া উঠিল। তারপর সে ধীরে ধীরে মুক্তার কোমল হাতখানি বিনোদলালের হাতে তুলিয়া দিতে দিতে বিষণ্ণ হাসিতে সারা মুখখানি ভরিয়া লইয়া মুক্তাকে স্নেহের কোমলস্বরে বলিল—, "মুক্তা, একদিন তোমায় স্বামী দান করতে পেরেছিলাম। আজ স্বামীর হাতে ধর্ম্ম পত্নী দান করে চিরদিনের মত সরে যাচ্চি, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা যত শীঘ্র পার এ পাপ বেশ্যার কথা ভুলে যেয়ো!"

অশ্রুর বাষ্পে মুক্তার দুই চক্ষু ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল সে বেশ্যার পদধূলি লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া হেমন্তের পায়ে ছুটিয়া আসিল। হেমন্ত তাকে দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া সস্নেহে বলিয়া উঠিল

"ছি ছি ও কি কর মুক্তা তুমি সতীলক্ষ্মী...আমি বেশ্যা.—

মুক্তা জোর করিয়াই হেমন্তের পদধূলি মাথায় লইয়া উত্তর করিল—যে সতীর সতীত্ব বেশ্যার দান, তার পদধূলি আমার চক্ষে গঙ্গা মৃত্তিকার সমান।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

---

## সংবাদ ও মন্তব্য।

### আমাদের বর্ণমালার সংস্কার চেষ্টা।

গত ১৩ই ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে একটী মজার প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবটী আমাদের বাঙ্গালার শিশুদিগের বর্ণমালা শিক্ষা সম্বন্ধীয়। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, যে বাঙ্গালী ছেলে মেয়েদের বর্ণমালা শিক্ষায় বহু সময় বৃথা অপব্যয় হয়। বাস্তবিক, কথা ঠিক! বাঙ্গালার অক্ষর রাজ্যে উৎপাৎ যে নিতান্ত কম তাহা বলিবার উপায় নাই। তেরগণ্ডা স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের পর ফলা কার

ি কার, ফলা বানান ; ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাট অক্ষর যোজনা, অনুস্বার বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু হসন্ত ; ইহাতেও কি শিশু মস্তিষ্কের রেহাই আছে? এই ত্রৈরগণ্ডার ভিতরে আবার আছে, ষত্ব ণত্বের ধাঁধা, একাধিক য ও ব র গোলমাল, ততোধিক ষ ও স র হেঁয়ালী! এত হাঙ্গামা কসরতে শিশু মস্তিষ্কের যে অপব্যবহার হয় তাহাকে অস্বীকার করিবে? সুতরাং একটা সংস্কার যে দরকার, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই প্রস্তাব হইয়াছে বাঙ্গালা অক্ষরের এই গোষ্ঠি গোত্র নিপাত করিয়া দিয়া সুন্দর ইংরেজী হরফগুলি শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হউক। তাহারা সহজে সাড়ে ছয় গণ্ডা অক্ষর শিখিয়া সেই অক্ষরে বাঙ্গলা বুলি লিখিয়া যাইবে। শিক্ষা সহজে হইবে, কাজেও নূতন কিছু হইবে। অর্থাৎ শিশুরা ইংরেজী হরফগুলি লিখিতে শিখিয়া এইরূপে বাঙ্গালা কথা লিখিবে:—ame আমি।

Amar ma আমার মা।

Amar baba আমার বাবা।

প্রস্তাবটী বিস্ সাহেব করিয়াছেন। বিস সাহেবের একখানা রিপোর্ট আমরা পূর্ব্বেই সমালোচনার জন্য পাইয়াছিলাম। তাহাতে দেখিয়াছি, অনেক কাজের কথা আছে, সেই সঙ্গে এইরূপ মজার কথাও আছে। তিনি যে তাঁহার রিপোর্ট সঙ্কলনে অনেক খাটিয়াছেন এবং বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহার আভাস এই রিপোর্টে আছে। তিনি এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ফলে এইরূপ জাতীয়তা ধ্বংসী প্রস্তাব উপস্থিত না করিয়া যদি প্রথম শিক্ষার্থী দিগের জন্য কেবল বর্ণমালা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়া বাহুল্য া কার ি কার ও ফলাগুলির আপাতঃ নির্ব্বাসনের প্রস্তাব করিতেন তবে তাঁহার প্রস্তাবকে এবং প্রচেষ্টাকে আমরা শিশু হিতকরী প্রস্তাব বলিয়া মনে করিতে পারিতাম।

শিশুরাও তাহা হইলে দুই মাসেই অক্ষর শিখিয়া লিখিতে বসিত:—

"বপর চরণ নমস করন খরচ পঠন ত পঠন ন পঠন মরন।"

তারপর ক্রমে প্রয়োজনানুসারে া কার ি কার ফলা বানান শিক্ষা করুক।

আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রায় এবম্বিধ প্রস্তাবই বহুদিন যাবত চলিয়া আসিতেছে বিদ্যানিধি মহাশয় া কার ি কারের বিরোধী না হইলেও অসভ্য সংযুক্ত বর্ণগুলির বিরোধী।

কেহ কেহ যে বলেন এগুলি জাতীয় অসভ্যতা সূচক, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। এক অক্ষর এক অক্ষরকে স্কন্ধে চাপিয়া মারিতেছে, অন্য বেচারা পদতলে পড়িয়া নিষ্পেষিত ; কেহ বা নিষ্পেষণে একেবারে কায়াহীন। ভয়ানক অসভ্যতা নয় কি?

বিস্ সাহেবের প্রস্তাবটী এরূপ হইলে কেহ স্বীকার করুণ আর নাই করুণ, ইহা জাতীয় শিক্ষার একটী সংস্কার প্রস্তাব বলিয়া সর্ব্বসাধারণের আলোচ্য বিষয় হইত।

যাহা হউক এইরূপ বিজাতীয় প্রস্তাবের সমর্থনের ও যে বাঙ্গালায় লোকাভাব ঘটিবে তাহা আমাদের মনে হয় না।

---

## সাহিত্য-সংবাদ।

সুসঙ্গ রাজপরিবারের সুলেখক কুমার শ্রীযুক্ত অ—চন্দ্র সিংহ এম, এ বাহাদুরের ধনুর্ব্বেদ' বাহির হইয়াছে।

---

গৌরভের অন্যতম লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য ভগবতশাস্ত্রী, সাংখ্য-পুরাণ কাব্য ব্যাকারণ তীর্থ সম্পাদিত সানুবাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভাগবদ্ গীতা প্রকাশিত হইতেছে।

---

এই নগর হইতে "সেবক" নামক একখানা পাক্ষিকপত্র বাহির হইতেছে।

---

আগামী বৈশাখ হইতে ঢাকার "বান্ধব" আবার নব পর্য্যায়ে বাহির হইবে সাহিত্য সেবীর নিকট এসংবাদ শুভ।

---

## লুসেন কনফারেন্সে তুর্ক প্রতিনিধিবর্গ
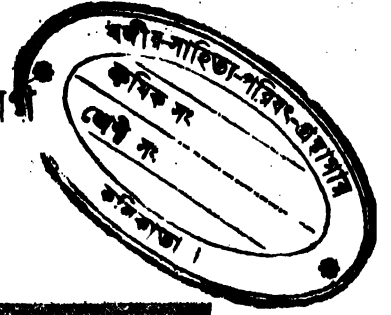
(উপবিষ্ট বাম হইতে (দক্ষিণে) রেসিৎ সাবফৎ বে, জুলিক বে রেজানুর বে, জেনারেল ইসমেৎ পাশা, জেকে বে, ভেলি বে, মোকতার বে, মুনির বে। (তুর্কের প্রধান প্রতিনিধি ইসমেত পাশা বাম হইতে দক্ষিণদিকের চতুর্থ জন।)

লুসেন বৈঠকের খবর রয়টারের মারফৎ নিত্য নূতন রকম আসিতেছে। ইহা হইতে আমাদের কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কখনও তুর্কেরা বৈদেশিকদের সব দাবী মানিয়া লইতেছেন কখনও বা বাঁকিয়া চলিতেছেন। শেষ সঠিক খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাচ্য সমস্যার কিরূপ সমাধান হইবে তাহা জানিবার উপায় আমাদের নাই এই সংখ্যার মুখ পত্রে আমরা তুরস্কের বর্ত্তমান মহামান্য খলিফা ও খলিফ জাদীর চিত্র প্রদান করিলাম।

প্রিন্টার—শ্যামলাল গুহ দ্বারা মুদ্রিত। ভিক্টোরিয়া প্রেস, ঢাকা।

সন্ধ্যা প্রদীপ

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।
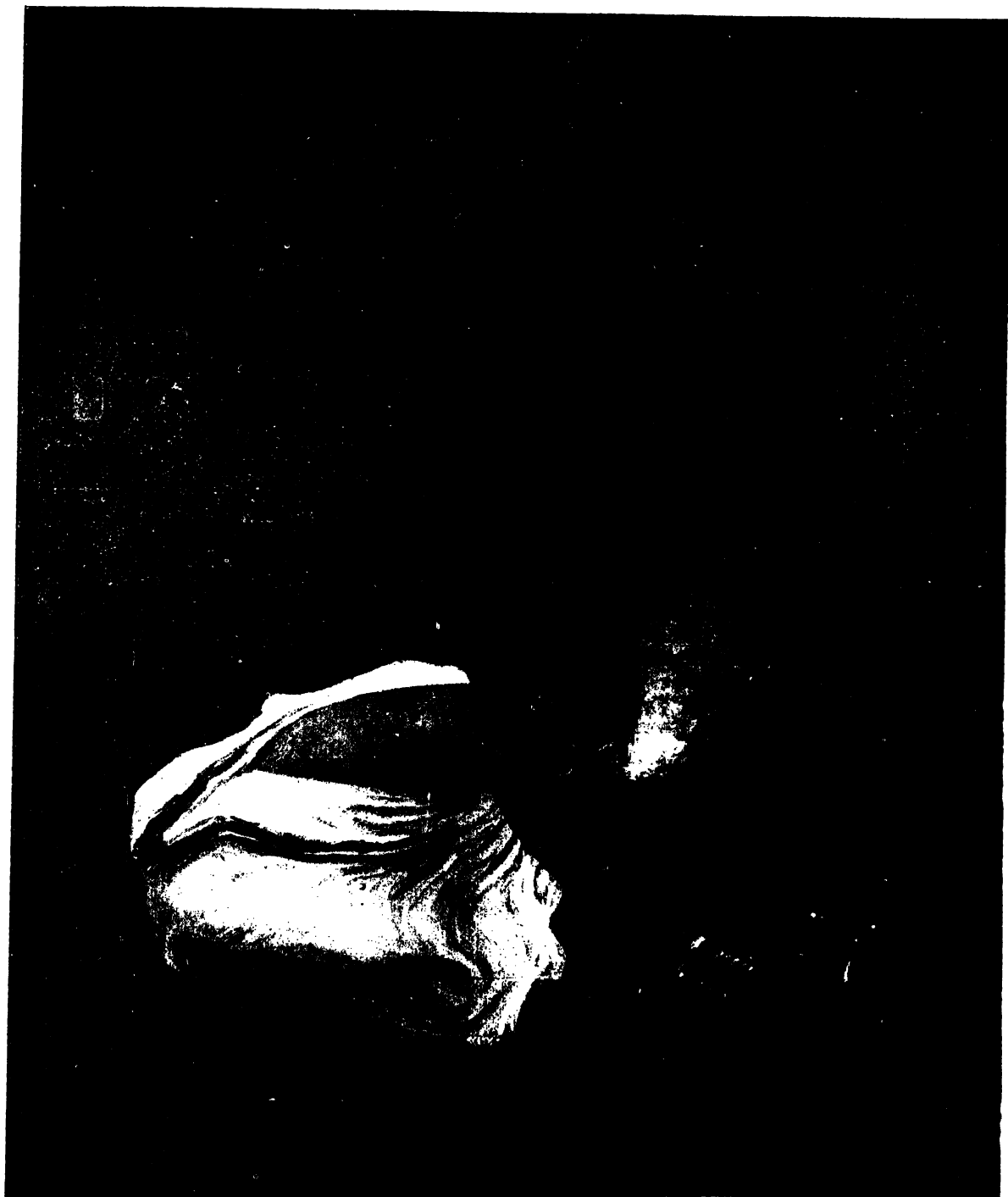
# সৌরভ
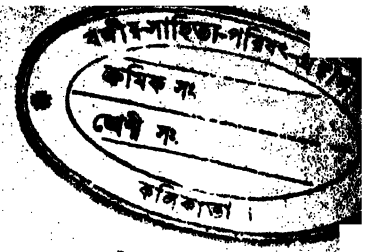
একাদশ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩২৯ সন। { তৃতীয় সংখ্যা।

## শাসন নীতির ভিত্তি

মানবের পূর্ণতার আদর্শকে বাদ দিয়া যখনই মানুষকে তাহার আশু সুখ-সুবিধা ও মানব জীবনের আপাত রম্য ভোগের আদর্শ দ্বারা বিচার করি, তখনই বিবেকের অলক্ষ্যে আমাদের দৈনন্দিন চিন্তা প্রণালীর ভিতর দিয়া এমন একটা ক্ষুদ্র আদর্শ আমাদের জীবনের পরিণতির বিঘ্নস্বরূপ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় যাহার জন্য জীবনের মূলসূত্রটি অনেক সময়ই জীবনের ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যের নিকট হারমানিয়া যায়।

মানুষ দৈনন্দিন জীবনের স্বার্থ প্রণোদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য গুলির সম্পাদন কালে কখনই নিঃস্বার্থভাবে অন্যের স্বার্থগুলির সঙ্গে নিজের স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধনের কথা ভাবে না; যদি ভাবিত, তাহা হইলে বোধ হয় পূর্ণতার দিকে যে অভিযানের সেনাপতিরূপে অনন্তকাল হইতে যুগাবতারগণ আমাদিগকে চালনা করিতেছেন তাঁহাদিগের সেই অভিযানের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া মানবজীবনের এই অপূর্ণতাকে আজ অধিকতর দুঃসহ করিয়া তুলিত না।

যে মানব যত পরিমাণে তাঁহার মানসিক বৃত্তিকে সংযত করিয়া নিজের কার্য্যপ্রণালীকে পরের স্বার্থের সঙ্গে মিশাইতে পারিয়াছেন তিনিই সেই পরিমাণে স্বাবলম্ব অর্থাৎ সেই পরিমাণে বিনা বিধি নিয়ন্ত্রণেই তিনি চলিতে পারেন। বিধি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যই মানবের দৈনন্দিন জীবনের ভিতর দিয়া পূর্ণতার বিকাশ সাধন করা। অবশ্য একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য যে বিধি নিয়ন্ত্রণের বাধ্যতা মূলক শক্তি কখনই মানব জীবনের স্বাধীনতার উদ্বোধন করিতে পারে না, যদি না সেই শক্তির পশ্চাতে স্বাধীনমতের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না থাকে। আর পূর্ণতার পরিণতিও মানবের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে হইতে পারে না, কারণ স্বায়ত্ত্ব না হইলে কখনই মানব তাহার পূর্ণতার আদর্শকে পরিণত করিতে পারে না। তাই, বিধি নিয়ন্ত্রণ কিংবা শাসন নীতি তাহার বাধ্যতা মূলক শক্তিকে এমনভাবে পরিচালনা করিবে যাহাতে মানবের মূল স্বাধীনতাটুকু অক্ষুণ্ণ থাকিয়া মানবকে বাস্তবিকই পরিণতির দিকে লইয়া যাইতে পারে। তাই শাসননীতির মূলভিত্তি মানবজীবনের সার্ব্বজনীন বিকাশ ও পরিণতি (পূর্ণতা); আর এই সার্ব্বজনীন বিকাশ ও পরিণতির মূল ভিত্তি স্বাধীনতা।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে এই সার্ব্বজনীন পরিণতি অর্থে আমরা কি বুঝি? কিংবা তাহার বিকাশের সাহায্যকারী স্বাধীনতাটুকুরই অর্থ কি?

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের বিভিন্ন স্বার্থের আঘাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনন্দিন স্বার্থ অনেক সময়ই পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে। অতএব যদি প্রত্যেককেই অসংযত স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহা হইলে মানুষ তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে পরস্পরের স্বার্থসাধনের এমন বিঘ্ন উপস্থিত করে যে তাহাতে কাহারও স্বার্থ রীতিমত ভাবে সাধিত হইতে পারে না। তাই মানবের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, এমন কতগুলি সামাজিক বিধি আবশ্যক; যাহাতে প্রত্যেকেই নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব স্বার্থ সাধন করিয়া সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে। স্বেচ্ছাচারিতাটুকুকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অভীষ্ট স্বাধীনতাটুকুকে নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে পারে, নতুবা সবল দুর্ব্বলের

উপর অত্যাচার করিয়া দুর্ব্বলের স্বাধীনতাটুকুকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। তাই সমাজে স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ দেখিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনেকটা নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এই নিয়ন্ত্রণ অথবা শাসননীতির উপরই সমাজিক জীবনের প্রকৃত বিকাশ নির্ভর করে।

উপর্য্যুক্ত বিষয় আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে শাসননীতির প্রকৃত উদ্দেশ্যই স্বাধীনতাকে সার্ব্বজনীন ভাবে উপলব্ধি করা। সার্ব্বজনীন স্বাধীনতার ভিত্তিস্বরূপ শাসন নীতি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ কালে প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের জন্য কতকগুলি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে। এই কর্ত্তব্য পালনদ্বারাই মানুষ পরস্পরের স্বার্থের একটা সামঞ্জস্য সাধন করে। শাসননীতি কর্ত্তব্যের পাশাপাশি ক্ষমতাকে (Right) দাঁড় করায়। যাহা একজনের কর্ত্তব্য, তাহা আর একজনের ক্ষমতা। একজনের ক্ষমতাকে বাঁচাইতে হইলে আর একজনকে তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য করা আবশ্যক। আমার সম্পত্তি ভোগ করা আমার ক্ষমতা, অন্যের কর্ত্তব্য আমাকে আমার ভোগে কোনও প্রকার উপদ্রব না করা। যদি কেহও অন্যায়ভাবে আমাকে উপদ্রব করে তাহা হইলে শাসন যন্ত্র তাহাকে দমন করিবে। এই প্রকারে শাসননীতি কর্ত্তব্যদ্বারা মানুষকে সম্বোধিত করিয়া পরস্পরের বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে এক সামঞ্জস্য সাধন করিয়া দেয়। এই সামঞ্জস্য (Harmony) সমাজ জীবনকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে পারে। তাই, ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে কিছু খাট করিয়া তাহাকে অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হয়; কারণ সামাজিক ভাবে স্বাধীনতার ভোগই ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থাৎ পূর্ণতার দিকে টানিয়া নিতে পারে।

এখন একটা প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয় যে, স্বাধীনতার সুষ্ঠু বিকাশ করিতে হইলে, ক্ষমতা অথবা Rightএর উপরই বেশী জোর দেওয়া আবশ্যক, না, কর্ত্তব্য অথবা Duty'র উপরই বেশী জোর দেওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক বর্ত্তমান জগতে Right অথবা ক্ষমতার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়, অর্থাৎ আমাদের নাগরিক (Citizen) জীবনযাত্রার প্রত্যেক বিষয়ই আমরা ক্ষমতার দিক্ হইতে দেখি। তাহাতে অনেক সময় কর্ত্তব্যের দিক্‌টা আমরা ভুলিয়া যাই। বাস্তবিক, কর্ত্তব্য জ্ঞানের উদ্বোধনই সামাজিকতার প্রসারক; কারণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন দ্বারাই আমরা অন্যের ক্ষমতাকে সুনিশ্চিত ভাবে নিরাপদ করি। আর, ক্ষমতার দিকে জোর দিয়া নিজের ক্ষমতা রক্ষার জন্য আমাদের যে বদ্ধ পরিকরতা তাহা অনেক সময় পরের ক্ষমতা রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। তাই, Rightএর নামে বর্ত্তমান Democracyর যুগে অনেক রক্তারক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু কর্ত্তব্য পালনরত প্রাচ্য সামাজিক জীবনে সামাজিক শৃঙ্খলা অনেকটা নিরাপদ বলিয়াই মনে হয়। তাই কর্ত্তব্যের দিকে জোর দেওয়াই বোধ হয় সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার বিশেষ অনুকূল।

শাসন নীতি আমাদের কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের স্বাধীনতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা অনেকটা দৃঢ়তর করিয়া তুলে। শাসন নীতি আমাদের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করিয়া দেয় বলিয়াই আমরা অন্যান্য ভাবে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের উন্নতির দিকে প্রচেষ্ট হইতে পারি। সুশৃঙ্খলিত সমাজে পরস্পরের স্বেচ্ছা প্রণোদিত সহযোগিতা আমাদের মানব জীবন বিকাশের উপযোগী নৈতিক শক্তিগুলির ক্রমশঃ স্ফুরণ করিয়া আমাদিগকে ব্যক্তিগত জাতীয় ও সার্ব্বভৌম পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে পারিবে।

একটা কথা আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে পূর্ণভাবে আমাদের স্বাধীনতা লাভের ও সেই সঙ্গে জীবনে পূর্ণতালাভের অনুকূল হইতে হইলে শাসন নীতির মূলটুকুও আমাদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত স্বাধীন মতের উপরই থাকা চাই। কারণ, সার্ব্বজনীন পূর্ণতার ভিত্তি স্বাবলম্বনও নৈতিক শক্তির উদ্বোধন; তাহা কখনই কোনও বাহিঃশক্তির প্রবর্ত্তিত শাসন নীতি দ্বারা সম্ভব হয় না।

স্বাধীন জনমত হইতে উদ্ভূত শাসন প্রণালী সাধারণতঃ দুই প্রকারে হইতে পারে। ইহার এক প্রকার অজ্ঞাতভাবে নানাবিধ ব্যবহারের (custom) উৎপত্তিতে।

ইহাও এক প্রকার জনমতের বিকাশ। যেমন আমাদের দেশের হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র (Hindu law)। ইহা জনমতের বিকাশ। আধুনিক ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উক্ত ব্যবহারনীতি মানিয়া বাস্তবিক পক্ষে শাসন নীতি সম্বন্ধে জনমতের স্বাধীন দাবী টুকুকেই গ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অজ্ঞাত ব্যবহারের উৎপত্তি কম। ইদানীং কোনও সামাজিক নীতি প্রচলন করিতে হইলে রীতিমত ভাবে তাহার অভাব জনসাধরণ প্রথমতঃ বোধ করে, তাহার পর সমাজে ইহার বিশেষ আলোচনা হয় এবং গণতন্ত্র প্রধান দেশসমূহে জনসাধারণের সমষ্টিগত মত দ্বারা বিশেষ বিবেচনার সহিত শাসননীতির প্রবর্ত্তন হয়। যে পরিমাণে যে সামাজিক নীতি আমাদের স্বাধীন চিন্তা হইতে উদ্ভূত সেই পরিমাণে সেই নীতি আমাদের স্বাধীনতা ও নৈতিক বা পূর্ণতার, অনুকূল।

তাই শাসন নীতির ভিত্তি সার্ব্বজনীন পূর্ণতা, যে পূর্ণতা মানুষ স্বাধীনতা ব্যতীরেকে কখনও পাইতে পারেনা। এখানে স্বাধীনতা অর্থ জনসাধরণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যাহা ইংরেজের অধীনে থাকিয়াও হইতে পারে, যদি আমাদের শাসনযন্ত্রগণ তন্ত্রমূলক হয়; আর যাহা দেশী রাজার অধীনে থাকিয়াও হইতে পারেনা, যদি আমাদের শাসন যন্ত্র গণতন্ত্র মূলক না হয়।

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

## চন্দ্রোদয়ে সিন্ধুবারি।

হে অনন্ত, হে উদার,
শঙ্কাহীন ভৈরব ভীষণ!
অনাদি কালের সাক্ষী
একি তব ঘোর গরজন।
অসীম অপার বক্ষে
ফুকারি, ফুকারি,
কোন্ ব্যথা হৃদে তব
নিত্য নব উঠিছে বিদারি?
সহস্র রুদ্রের নৃত্য
অহরহঃ হৃদয়ে তোমার
আনিছে এ মরধামে
অমরার কোন সমাচার?
তালে তালে গর্জ্জি উঠে
কি দারুণ প্রলয় কল্লোল,
অপূর্ব্ব অশ্রুত ধ্বনি
অবিরাম অভিরাম রোল।
সে নাদে আনত বক্ষ
লুটাইয়া পড়ে তব পায়,
ক্ষুদ্র এ মানব হৃদি
অসীমের সীমা পেতে চায়।
অনন্ত হৃদয়ে তব
ধূ ধূ করে উলঙ্গ আকাশ।
সহস্র তপন চন্দ্র
তোমা মাঝে পকাশ বিকাশ।
চাঁদের রজত ধারা
মিশে কি গো তোমার হিয়ায়,
অথবা তোমারি বারি
স্নাত হয় ইন্দু-জ্যোছনায়!
কে ভাঙাবে এই ভুল—
ভ্রান্তিমান্ মানবের মনে,
অপরূপ তব রূপ
চির শুভ্র কৌমুদী-মিশ্রনে।
স্বচ্ছ-ধারা মন্দাকিনী
সুধাধারা বহিয়া মরতে
ঢালিয়া দিয়াছে বুঝি
কোটিগুণে অতৃপ্ত জগতে।
অথবা সে ত্র্যম্বকের
হাসি রাশি গলিয়া গলিয়া
দিকে দিকে দ্রবীভূত
বিশ্বমাঝে চলিছে বহিয়া
ধুইবারে মলিনতা
পঙ্কিলতা মর মানবের,
সঞ্চিত গভীর যাহা
অন্তহীন শত জনমের।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

# রামায়ণী যুগের ভাস্কর শিল্প।

ধাতু ও প্রস্তরাদির উপর কারুকার্য্যকে ভাস্কর্য্য বলে। অট্টালিকা গাত্রে বা ইষ্টক গাত্রে চিত্রাঙ্কনও ভাস্কর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। রামায়ণী যুগে ভাস্কর্য্যের যে প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন রামায়ণের প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

রামায়ণের যে স্থানেই প্রাসাদ-অট্টালিকা, চৈত্য-দেবায়তন প্রভৃতির উল্লেখ আছে সেই স্থানেই তক্ষণ শিল্পের ন্যায় ভাস্কর্য্যেরও প্রচুর নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে।

রাম ভবনের শত শত বিতর্দ্দি (বেদীকা) কাঞ্চন প্রতিমায় এবং মৃগমূর্ত্তিতে অধিকৃত ছিল। মূর্ত্তি রচনা ভাস্কর্য্যের চরম উন্নতির পরিচায়ক।

আধুনিক ইয়ুরোপ ধাতু মূর্ত্তি রচনায় উন্নতির চরম নিদর্শন জগতের সম্মুখে প্রদর্শন করিতেছেন; ইটালির ভাস্কর্য্যও এক সময় জগতের বিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কাজান কেথিড্রেলের ঈশা জননী মেরীর স্বর্ণমূর্ত্তি ও ইয়ুরোপের অন্যান্য ধর্ম্ম মন্দিরের স্বর্ণ ও রৌপ্য মূর্ত্তিও আজ কাল ভাস্কর্য্যের চরম আদর্শ বলিয়া কথিত। কিন্তু এই ভাস্কর্য্য রীতির আদিম আদর্শ কোন প্রাচীন সভ্যতার বুক হইতে ছানিয়া নেওয়া হইয়াছে তাহা একবারও ভারতবাসী চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন কি?

সে কালে হর্ম্ম্য প্রাচীরে নানাপ্রকারের প্রস্তরের ও মণিবিদ্রুমের লতা পাতা বসাইয়া তাহাকে বিচিত্র সাজে সজ্জিত করা হইত। রাম ভবনের বর্ণনায় ও লঙ্কার বর্ণনায় আমরা তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। ইহাও ভাস্কর্য্য রীতির অন্তর্ভুক্ত। তাজমহলে ও মোগল দুর্গাভ্যন্তরের বহু গৃহে এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল; আবু পর্ব্বতের উন্নত জৈন ভাস্কর্য্য রচনা এই রচনা রীতিরই অনুসরণে চালিত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

লঙ্কার বর্ণনায় স্ফটিক স্তম্ভের উল্লেখ আছে। স্ফটিককে পত্রপুষ্পের আকারে কর্ত্তিত করিয়া লঙ্কার কপাট গাত্রে অন্যান্য বহুমূল্য প্রস্তরাদির সহিত বসান হইয়াছিল, এরূপ বর্ণনা লঙ্কার বিভব বর্ণনায় আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি। ভাস্কর্য্যের এই উচ্চ আদর্শ আধুনিক যুগেও বিরল।

খ্রীঃ পূঃ শতাব্দীর খোদিত একটী গুহা।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের আর একটী উন্নততম নিদর্শন গুহা-ভাস্কর্য্য। বর্ত্তমান সময় ভারতের গুহা ভাস্কর্য্যের আলোচনায় ভারতীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের যশোগাথা পৃথিবীর দিগ দেশ মুখরিত করিতেছে। কার্লি, লোমাশ (১) অজন্তা এলি-ফাণ্টা, প্রভৃতি পর্ব্বত-গুহা-গাত্রে যে উন্নত ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে রামায়ণী যুগই যে সে শিল্পের জন্ম যুগ, ইহা নির্দ্দেশ করিবার মত প্রমাণ রামায়ণে বর্ত্তমান আছে। তখন দাক্ষিণাত্যের বহু পর্ব্বত গহ্বরে এইরূপ ভাস্কর্য্যের চিহ্ন লক্ষিত হইত।

রাম কিষ্কিন্ধ্যায় যাইয়া প্রস্রবণ পর্ব্বতের যে গুহায় আশ্রয় স্থান নিরূপণ করিয়াছিলেন, ঐ গুহাটী ছিল—

"চারুচিত্র লতাবৃতম।" ৮ (কিষ্কিন্ধ্যা ২৭ সর্গ)

(১) লোমশ মুনির গুহা ব্যতীত এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত সকলগুলি গুহাই বৌদ্ধ যুগের পরের শিল্প-প্রভাব-জাত।

সুগ্রীবের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যাও ছিল একটী পরম রমণীয় * * * মহতীং গুহাম ॥৪

হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাঃ * * *। (কি ৩৭ সর্গ।)

পর্ব্বত গুহার অভ্যন্তরে গিরিগাত্র খোদিয়া বিচিত্র হর্ম্ম্য-প্রাসাদ নির্ম্মাণের উন্নত রীতি কার্লি অজন্তা প্রভৃতির

অজন্তা গুহা চিত্রের নমুনা। অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২০ হইতে খ্রীষ্টীয় ৪০০ অব্দ মধ্যে খোদিত।

গুহা হর্ম্ম্যমালা না প্রত্যক্ষ করিলে এই উন্নত যুগেও কেহ কল্পনা করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। রামায়ণের ঋষি গিরিগাত্র খোদিত প্রাসাদপুরী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই কিষ্কিন্ধ্যার গিরি-গুহা অভ্যন্তরস্থিত প্রাসাদপুরীর এরূপ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমরা এই সঙ্গে খোদিত দুটী গুহার প্রধানঃ চিত্র গুহা ভাস্কর্য্যের নমুনা স্বরূপ প্রদান করিতেছি। ইহার সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিলে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিবেন রামায়ণীযুগের গুহা ভাস্কর্য্যের সূচনা ক্রমে বৌদ্ধযুগে এইরূপ উন্নত শিল্প রীতিতে আসিয়া পরিণত লাভ করিয়াছিল।*

রামায়ণে হস্তীদন্তের উপর কারিকরির কথাও অনেক স্থানে আছে। লঙ্কার গবাক্ষগুলি ছিল গজদন্তময়। (১) অযোধ্যায় কৈকেয়ী ভবনের বৃক্ষবাটীকায় গজদন্তে নির্ম্মিত বেদিকা ও আসন ছিল। (২) রাবণের পর্য্যঙ্কের পাদগুলি ছিল। হস্তীদন্তে নির্ম্মিত।

দান্ত কাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈ র্বৈদূর্য্যৈশ্চ বরাসনৈঃ।

(সুন্দরকাণ্ড ১০ সর্গ ২ শ্লোক)।

লঙ্কার রাজ প্রাসাদের সোপান স্তম্ভগুলিও ছিল গজদন্ত নির্ম্মিত। আ ৫৫—৮ শ্লোক।

---

## জোনাকী।

আপন প্রাণের আলোক দিয়ে খুজিস্ কারে জোনাকী?
গভীর ঘন আঁধারে!
গোপন ধনের স্বপন কথা কারুর কাছে শোনা কি?
সেই মোহে কি বাঁধারে;
আকাশ ছেয়ে তারার মেলা রেতের বেলা ঠিকরে;
তেম্নি ধারা তোরা কি?
ধরার তলে সবাই মিলে ফুটাস্ তারা-নিকরে
তোরাও তাদের জোড়া কি?
গহন-ঘন আঁধার রেতে রাধার যেতে কুটিরে—
বিভোর হয়ে বাঁশীতে;
তখন বুঝি হঠাৎ তোরা প্রথম গেলি ফুটিরে—
পথের আঁধার নাশিতে?
তোদের দেখে থমকে থেকে, সদাই ভাবি নিশিতে
কেমন তোরা খেয়ালী?
বছর ভরা বিরাম নাহি, কি বসন্ত কি শীতে,
জ্বেলেই আছিস্ দেয়ালী!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

---

* ফার্গুসন সাহেবও এইরূপ মনে করিয়াই বোধ হয় তাঁহার Lecture on Indian Archetecture গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"Stone Archetecture was unknown in India & men were only begining to think of more durable materals."

যাঁহারা মনে করেন, রামায়ণ বৌদ্ধ যুগের কোন এক সময়ের রচনা, তাঁহারা বৌদ্ধ যুগের উন্নত গুহা-ভাস্কর্য্যের সহিত মহাকবির বর্ণনার একটু তুলনা করিয়া দেখিবেন; মহাকবির বর্ণনা এ বিষয়ে অত্যন্ত দীন। তাহার কারণ তাহা গুহা-ভাস্কর্য্যের মাত্র প্রারম্ভ যুগ। আমাদের প্রদর্শিত চিত্রদ্বয় পরবর্ত্তী উন্নততর যুগের শিল্প নিদর্শন। ফার্গুসন সাহেবও সেই প্রাথমিক আলোচনারই এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১) সুন্দর ৬ ও কিষ্কিন্ধ্যা ৫০. (২) অযোধ্যা ১০।

# শিক্ষা

( শেষ অংশ )

আজ কাল প্রায় সকলেই ব্যারিষ্টারী ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাস করিবার নিমিত্ত বিলাতে গিয়া থাকেন; অতি অল্প সংখ্যক লোক শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে যান। বিদেশ হইতে যাঁহারা শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আহার বিহার প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত সংযমহীন ও বিলাসী। তাঁহাদের এই অসদৃষ্টান্তের প্রভাব সামান্য নহে।

ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণ প্রধান ও দরিদ্র দেশের উপর এইরূপ সংযমহীনতা ও বিলাসিতা বিষবৎ কার্য্য করিতেছে। বিদেশ গমনের ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থ কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইলেও এদেশের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সুতরাং জাতীয় জীবনে দুর্দ্দিন ও দুরবস্থা বিশেষ ভাবে ঘনাইয়া আসিতেছে।

আহার, বিহার, বেশভূষা প্রভৃতি দ্বারাই জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়। জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়া শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ শিক্ষা লাভ করিতে কোন রূপ আপত্তির কারণ আছে, আমাদের মনে হয় না। তাহা না করিয়া কেবল অন্ধ অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেওয়া কদাপি সঙ্গত নহে।

আমাদের জাতীয় ভাবের এইরূপ অনাবশ্যক পরিবর্ত্তনের পথ যাহাতে রুদ্ধ হয়, তাহার দিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়—আহার বিহার ও অন্যান্য কতক কতক বিষয়ে আমরা দিন দিন অত্যন্ত অসংযমী হইয়া পড়িতেছি বলিয়াই নানাবিষয়ে আমরা দ্রুত গতিতে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি; এ অবস্থার প্রতিরোধ যে কোন উপায়েই হউক করিতেই হইবে, নতুবা ভারতবাসীর, বিশেষতঃ হিন্দু জাতির অস্তিত্ব জগৎ হইতে শীঘ্রই লুপ্ত হইবে। যাহাতে আমাদের সর্ব্ববিষয়ে সংযমাভ্যাস হয়, ভবিষ্যতে শিক্ষা প্রণালীর বিধান সেইরূপে করিতে হইবে।

আমাদের দেশেও যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও একটী বিষম অনর্থকর দোষের ভাব দেখা যাইতেছে। সামান্য শিক্ষালাভ করিলেই তাঁহারা অনেকেই নিজেদের যে সমস্ত ব্যবসায় কায়িক পরিশ্রমের আবশ্যকতা আছে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সার্ট, কোট, কলার, নেকটাই, বুট প্রভৃতি পরিবৃত হইয়া বিলাস সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন এবং কৃষিকার্য্য, কর্ম্মকারের ও সূত্রধরের কার্য্য, বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি কার্য্যকরাকে অপমান জনক মনে করেন; ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। শিক্ষালাভ করিয়া যাহাতে ঐ সমস্ত বিষয়ে অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে পারেন বরং তদ্বিষয়েই মনোযোগী হওয়া উচিত।

গত বৎসর নাগপুরে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, ঐ সভার সভাপতি স্বরূপে লালা লাজপতরায় আমাদের বর্ত্তমান কালান শিক্ষা বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা খুব সময়োপযোগী ও সমীচীন বলিয়াই আমাদের নিকট বোধ হয়; এ স্থলে তাঁহার মত উল্লেখ করা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছেন "There was a time when as the result of English education the literate classes despised every thing Indian. Fortunately that period was over but they still stood in the danger of going to the other extreme and consider every thing Indian as absolutely perfect. I must say that so far as I am concerned I believe that truth is truth, knowledge is knowledge, science is science. They are neither eastern nor western, nor Indian nor European. We have to maintain our educational continuity and we must keep that object in view. We do not want to be a European, or American nation, we want to remain an Indian nation quite up to date. The underlying policy of the scheme of education should not be based on the past civilisation remodelled in the light of the present day developments. What was good in each culture should be embraced. True

nationalisation of India should be above religious distinction and above all narrowing influence that would retard educational progress. The economic and social system under modern civilisation was bad but that should not blind them to the fact that science and Knowledge had made wonderful progress during the last three hundred years. All science and knowledge coming from whatever culture should be fully utilised to free India and then maintain that freedom at any cost." ইহার ভাবার্থ এই যে কাল স্রোতের আবর্ত্তনে আমরা বর্ত্তমানে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছি তাহাতে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মভাবের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তনানুসারে যতটুকু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক কেবল ততটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে উপযোগী জ্ঞান আহরণ পূর্ব্বক আমরা পুনরায় সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারি, সাধ্যানুসারে তাহার ব্যবস্থা করাই বর্ত্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

ধর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ যাহাতে বিজ্ঞান চর্চ্চায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, ভাস্কর্য্যে, স্থপতি বিদ্যা প্রভৃতিতে উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা জীবন সংগ্রামে আমরা দিন দিন পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িবই। আমাদের শিক্ষা বর্ত্তমানে ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত হইতেছে। ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্ত আমাদের শক্তির প্রভূত অপচয় ঘটিতেছে সন্দেহ নাই। ইংরেজী ভাষায় জ্ঞানলাভ করিতে যে সময়, শক্তি ও উৎসাহ ব্যয়িত হয় যদি মাতৃভাষার সাহায্যে ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইত তবে অতি সহজে ও অল্পায়াসেই আমরা ঐ সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিতাম। বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে সাধারণের শিক্ষা প্রদানের দৃষ্টান্ত বোধ হয় ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে নাই।

সুখের বিষয় সম্প্রতি বাংলা ভাষা আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ে স্থান লাভ করিয়াছে; আশা করি অতঃপর যাহাতে আমরা মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতে পারি এরূপ ভাবে গ্রন্থাদি প্রণয়নের চেষ্টা হইবে এবং ক্রমে আমরা ইংরেজী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষায় পরিণত করিতে সমর্থ হইব। ইংরেজ আমাদের রাজা, সুতরাং ইংরেজী ভাষা আমাদিগকে অল্পাধিক পরিমাণে অবশ্য শিক্ষা করিতে হইব। বিশেষতঃ গণিত বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে যে পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত বিষয়ে উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে মাতৃ ভাষায় লিখিত না হইতেছে ততদিন ঐ সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আমরা একেবারে ত্যাগ করিতে পারিবনা। বর্ত্তমান সময় শিক্ষা বিষয়ে যে সমস্ত দোষ দেখা যাইতেছে তাহার প্রতিবিধান করিতে হইলে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক; অবশ্য ইহা সময় ও প্রভূত ব্যয় সাধ্য। রাজার সহায়তা ভিন্ন এই কার্য্যে সহজে ও শীঘ্র ফললাভ করার আশা সুদূরপরাহত।

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোক দিগেরও যে শিক্ষার আবশ্যকতা আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই তবে তাহাদের দৈহিক গঠন প্রণালীর বিভিন্নতা, স্বভাবের মৃদুতা ও অন্যান্য কারণে কোন কোন বিষয়ে পুরুষদের শিক্ষাপ্রণালী হইতে তাঁহাদের শিক্ষা প্রণালী স্বতন্ত্র হওয় উচিত বলিয়া মনে হয়। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে সাধরণতঃ শিক্ষকতার কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। নিতান্ত অভাব স্থলে চরিত্রবান সংযমী পুরুষের দ্বারাও নির্ব্বাহিত হইতে পারে বটে কিন্তু ইহা নিতান্ত অভাব স্থলেই হওয়া উচিত অন্যথা নহে। যেরূপ শিক্ষা দ্বারা স্ত্রী লোকের স্বাভাবিক মৃদুতা, লজ্জাশীলতা, কমনীয়তা ও সতীত্ব এবং মাতৃত্বভাবের হানি ঘটে এরূপ ভাবের শিক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে না দেওয়াই সঙ্গত; কারণ তাহা হইলে সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ইংলণ্ডে Suffraggest movementই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। শুনিতে পাই প্রতীচ্য ভূখণ্ডে অনেক স্থলে জননীগন সন্তান পালনে ও সন্তানদিগকে স্তন্যদানে বিমুখা হইয়া পড়িতেছেন। ইহাই যদি শিক্ষার ফল হইয়া থাকে তবে এরূপ শিক্ষা যাহাতে আমাদের দেশের স্ত্রী-

লোক দিগের মধ্যে প্রসার লাভ না করিতে পারে তজ্জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা উচিত। স্ত্রীলোকের শিক্ষার মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে প্রদান করা সঙ্গত। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী,, বেহুলা প্রভৃতি আদর্শ সতীগণের দৃষ্টান্তই আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অনুকরণ যোগ্য। হিন্দু দুহিতা দিগেকে যে ভাবে উপদেশ প্রদান করা উচিত তাহা মহা কবি কালিদাস তৎপ্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক গ্রন্থে শকুন্তলার পতিগৃহে গমন-কালে কুলপতি কণ্বের মুখে সামান্য চারিটী ছত্রে যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয় একখানা গ্রন্থ লিখিলেও ইহার চেয়ে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব! শকুন্তলার পতিগৃহে বিদায় কালীন দুঃখে প্রপীড়িত হইয়া দয়ার্দ্রহৃদয় কণ্ব বলিতেছেন "যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া। কণ্ঠঃ স্তম্ভিত বাষ্পবৃত্তি কলুষ-শ্চিন্তা জড়ং দর্শনম॥ বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ। পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথংনু তনয়াবিশ্লেষ-দুঃখৈর্নবৈঃ॥"

তৎপর শকুন্তলাকে পতিগৃহে গমনান্তর কিরূপ আচরণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছেন:—"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখিবৃত্তিং সপত্নী জনে। ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ॥ ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী। যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"

বর্ত্তমান সময়ে বেথুন কলেজ প্রভৃতিতে যেভাবে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে, তাহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই প্রসব করিতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মহাকালী পাঠশালা প্রভৃতিতেও যেরূপভাবে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে তাহা উপযোগী হইলেও যথেষ্ট নহে। সে শিক্ষা ব্যবস্থায় আরও কতক কতক বিষয়ের সংযোজনা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়।

অনেকের ধারণা প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিলনা; ইহা যে নিতান্তই অমূলক তাহা বলা অনাবশ্যক। যাঁহারাই এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, প্রাচীন ভারতে যথেষ্ট পরিমাণেই স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল, তবে আধুনিক প্রণালীতে অবশ্য নহে। যে ভারতে মৈত্রেয়ী, গার্গী, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, খনা লীলাবতী, উভয়ভারতী প্রভৃতি বিদুষী রমণী রত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে ভারতে স্ত্রীদেবতা সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, একথা যে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।" মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত এই বচনও উক্ত ভ্রান্ত ধারণার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বর্ত্তমান সময় স্ত্রীলোকগণ সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াই নানারূপ উত্তেজনাপূর্ণ নাটক নভেলাদি পাঠে ও কায়িক পরিশ্রমশূন্য উলসূতা প্রভৃতির কার্য্যে কালাতিপাত করেন; রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যে সমস্ত গ্রন্থপাঠে মানসিক-বল বৃদ্ধি হয়, গৃহকর্ম্ম এবং রন্ধনাদি—যে সমস্ত কার্য্যে শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়, তাহাতে প্রাচীনাদিগের ন্যায় নব্যাদিগের রুচি দেখা যায় না। ইহার কুফল সমাজে এখনই বিলক্ষণরূপে দেখা যাইতেছে। সুকুমার বিদ্যার অনুশীলন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অনুচিত একথা আমরা বলিতেছি না বরং ইহার বিপরীত ভাবই আমরা পোষণ করিতেছি। প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকগণ যথেষ্ট পরিমাণে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষালাভ করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় কাব্য নাটকাদি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই আমাদের এই উক্তির সমর্থন করিবেন। নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যা এখন নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে কিন্তু প্রাচীন ভারতে ইহার রীতিমত অনুশীলন হইত। এ বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে মহর্ষি বাৎস্যায়ণ প্রণীত কামশাস্ত্র মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

বর্ত্তমান সময় দেশবাসিগণের মনে যাহাতে প্রাচ্যের ধর্ম্মভাব এবং প্রতীচ্যের কর্ম্ম ও দেশাত্ম বোধের ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে সেই ভাবে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
সুসঙ্গ রাজবাড়ী।

# পাণের গান

( রঙ্গ কবিতা )

বরজ মাঝে জন্ম আমার, আমি সবুজ পত্রিকা !
রাঙা কচি ঠোঁটের 'পরে জ্বালাই রূপের বর্ত্তিকা !
তৃষ্ণাভরা অধরেতে, সবাই পেলে উঠেন মেতে,
বিশেষ কোরে' রসিক যুবা, আধেক-ফোটা সুন্দরী !
মনের সুখে বে ান রুখে কি দিবা কি শর্ব্বরী !

কটকে মোর চটক্ বেশী, সাঞ্চী, উড়ের ট্যাক্-ঝুলি !
আমায় আদর করতে জানে রসবতীর রস ভুলি !'
ঢল্ ঢলে মুখ দূরে রেখে, আমায় রসিক দেখেন চেখে,
বেশী কথা বলবো নাকো. নাও গো বুঝে ইঙ্গিতে !
অনেক কথাই বুঝতে হয় গো ঠারে-ঠোরে ভঙ্গিতে !

দমে ভারী বঙ্গনারীর প্রতিদিনের পার্ব্বণে.
হৃদয়-প্রসাদ পাই গো আমি তড়িৎ-মাখা স্পর্শনে ;
আমায় হাতে আধেক রাতে, যান কিশোরী প্রাণ জাগাতে,
আর কি ক'ব বুড়োর সোহাগ পাচ্ছে বুড়ী থুড়্থুড়ি !
সবার প্রাণে জাগাই আমি টাটকা ভাবের সুড়সুড়ি।

নব্য পুরুষ নারীর বেজায় আমার প্রতি তুচ্ছতা !
শুনবে তবে আমায় ছেড়ে কেমন তাঁদের উচ্চতা ?
মুখের বিকট গন্ধে মানুষ একেবারে হয় যে বেহুস্ !
যতই তাঁরা জিহ্বা চাঁচুন, দন্ত রাখুন চকচকে !
ঝেড়ে ঝুরে যতই করুন বাহির-টাকে তক্‌তকে !

আমার রসের রসিক যারা রটাও মোরে পৃথ্বীতে !
ফিকে হাসি মধুর করো আমার রঙীন কীর্ত্তিতে !
বরফ দেশের বদনগুলো, বাহার কোরে রাঙিয়ে তুলো,
জয় জগদীশ, ভরসা রাখিস্, হোস্‌নে তোরা ক্ষান্তরে !
উড়বে ধ্বজা বিশ্ব মাঝে পর্ব্বতে কি প্রান্তরে !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

---

# কবি কালিদাস।*

বাসন্ত-মুকুল দল গ্রীষ্মের সুপক্কফল
একাধারে এসব চাও কি মানব।
অথবা হৃদয় যায় পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায়,
পুলকিত মুগ্ধ হয়, চাও কি সে সব !
কিম্বা যদি এক নামে স্বর্গ আর মর্ত্ত্য ধামে
মিলিত দেখিতে চাও তবে আমি বলি
অভিজ্ঞান শকুন্তল ! অভিজ্ঞান শকুন্তল !
তোমারি নামেতে বল হইল সকলি। (১)

কালিদাস ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ভারতের কবিকুল রাজচক্রবর্ত্তী, তাঁহার অদ্ভুত কবি যশঃ পৃথিবীব্যাপ্ত। এদেশের লোকে তাঁহাকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া থাকেন। সুসভ্য-ইউরোপ খণ্ডেও তাঁহার আদর কিছুমাত্র ন্যূন নহে। কালিদাস উজ্জয়িনীপতি বিখ্যাতনামা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সুপ্রসিদ্ধ নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার রত্ন শ্রেষ্ঠ কালিদাসের সময় কেহই এপর্য্যন্ত অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সময় সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে সকল সিদ্ধান্ত পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

কালিদাস, বিক্রমাদিত্য, উজ্জয়িনী।

জনপ্রবাদ কালিদাসকে বিক্রমাদিত্য এবং উজ্জয়িনীর সহিত সংশ্লিষ্ট করিতেছে। ইহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণও বিদ্যমান আছে। শকুন্তলা নাটকের কোন কোন পুথির প্রস্তাবনায় বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ আছে। কালিদাস, উজ্জয়িনী এবং তৎপার্শ্বের মনোহর বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যেই মেঘদূতকে বক্রপথে উজ্জয়িনীতে লইয়া গিয়াছেন। উজ্জয়িনীর প্রতি এই অনুরাগ লক্ষ্য করিবার যোগ্য। এই সকল প্রমাণ দ্বারা অনুমিত হয় যে, উজ্জয়িনীনগরী এবং বিক্রমাদিত্য রাজার সহিত কালিদাসের সম্বন্ধ ছিল।

---

* এই প্রবন্ধের কোন কোন অংশ অখিল বাবুর মেঘদূতের ভূমিকা হইতে সঙ্কলিত।

(১) জর্ম্মান কবি গেটের কবিতার অনুবাদ। অনুবাদক পণ্ডিত অম্বিকাচরণ(?) কবিরত্ন।

এই প্রমাণ হইতে আমরা আর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী।

মুসোঁ হিপোলাইট ফুসে অনুমান করিয়াছেন যে, রঘুবংশে বর্ণিত শেষ রাজার রাজত্ব সময়ে কবি জীবিত ছিলেন। এইমত সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার আবির্ভাবকাল খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী বলিতে হয়।

খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী।

মৎস্য পুরাণে এক বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ বিক্রমাদিত্য শতানীকের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কালিদাস এই বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক হইলে তিনি খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিতে হয়।

খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী।

ডাক্তর ফ্লিট মান্দাশোর লিপির সাহায্যে স্থির করিয়াছেন, এক বিক্রমাদিত্য শকদিগকে পরাস্ত করিয়া সংবৎ নামক এক অব্দ প্রচার করেন। কালিদাসের আবির্ভাব কাল এই বিক্রমাদিত্যের সময়ে হইলে তিনি খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন—স্বীকার করিতে হয়। অধুনা (১৯২৩ খৃঃ) সংবতের ১৯৮০ বর্ষ চলিতেছে। ফলতঃ কালিদাস ১৯৮০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সার উইলিয়ম জোন্স, ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই মতের সমর্থক।

কালিদাস যে খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার একটি প্রমাণ জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ মহাকবি কালিদাসের কৃতরূপে প্রচলিত আছে। জ্যোতির্ব্বিদাভরণের শেষে লিখিত হইয়াছে যে, কলিযুগের ৩০৬৮ বৎসর অতীত হইলে উহার প্রণয়ণ আরম্ভ হয়। এখন (১৩২৯ সন) কলিযুগের ৫০২৩ বৎসর অতীত হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময় হইতে ১৯৫৫ বৎসর পূর্ব্বে কালিদাস জ্যোতির্ব্বিদাভরণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত কুলের মতে জ্যোতির্ব্বিদাভরণের রচনা অতি নিকৃষ্ট। উহা মহাকবি কালিদাসের লেখনি প্রসূত নহে। ৺রামদাস সেন জ্যোতির্ব্বিদাভরণের কালিদাসকে জাল কালিদাস নামে অভিহিত করিয়াছেন। (১)

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী।

প্রোফেসর কাউয়েলের বিবেচনায় অশ্ব ঘোষ প্রণীত বুদ্ধ চরিত নামক পুস্তক হইতে সম্ভবতঃ রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের কতকগুলি দৃশ্যের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই হেতু তিনি অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় অব্দ আরম্ভ হইবার পর কালিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। অশ্ব ঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত এবং মহারাজ কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী

অধ্যাপক লাসোনের মতে কালিদাস খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্র গুপ্তের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। হরিষেণের প্রশস্তি এবং রঘুবংশের চতুর্থ সর্গ একত্র পাঠ করিলে এবং উভয়ের মধ্যে ভাবের, ভাষার, অর্থের এবং বিষয়ের আনুরূপ্য দেখিলে মনে হয় রঘুর দিগ্বিজয় সমুদ্র গুপ্তের দিগ্বিজয়ের আদর্শে লিখিত হইয়া থাকিবে। (২)

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

কর্ণেল উইল ফোর্ড, মিঃ জেমস প্রিন্সেপ এবং মিঃ মাউন্ট ষ্টুয়ার্ট এলফিন্‌ষ্টোনের মতে কালিদাস খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড স্বীয় সংস্কৃতের ইতিহাস নামক পুস্তকে কালিদাসকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে স্থাপন করিয়াছেন। ভিনসেণ্ট এ স্মিথের মতে গুপ্তবংশ-তিলক উজ্জয়িনী বিজেতা বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কিম্বদন্তী-প্রসিদ্ধ এবং নবরত্নের পৃষ্ঠপোষক উজ্জয়িনী পতি বিক্রমাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র পণ্ডিত ভণ্ডারকর এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

প্রাগুক্ত মতের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি এই যে রঘুবংশে হুন জাতির উল্লেখ আছে, কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত অথবা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতবর্ষে হুন জাতির আবির্ভাব হয় নাই। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, গুপ্তবংশীয়গণ পরম

(১) বঙ্গদর্শন ১ম খণ্ড।

(২) মানসী ৭ম বর্ষ ৫৩৮ পৃষ্ঠা।

বৈষ্ণব ছিলেন। রঘুবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ রামচন্দ্র। তিনি বিষ্ণুর অবতার। কিন্তু কালিদাস তাঁহার মহিম-গর্ভকাব্য রঘুবংশের সূচনায়ও বিষ্ণুকে প্রণাম করেন নাই। শিব পার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়াছেন। কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক নরপতি বৈষ্ণব হইলে রঘুবংশের প্রারম্ভে বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

রঘুবংশে হূনজাতির উল্লেখ থাকায় প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কালিদাস স্কন্দগুপ্তের সভাসদ ছিলেন এবং ৪৭০ খৃঃ অব্দের পরবর্ত্তী কালে রঘুবংশ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ৪৫৫ খৃঃ অব্দ অথবা তাঁহার সমকালে হূন জাতির আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। ৪৮০—৯০ অব্দ মধ্যে রঘুবংশ রচিত এবং তাহার ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বেই ঋতু সংহার এবং মেঘদূত কবির লেখনী হইতে নির্গত হয়।

জর্ম্মাণ অধ্যাপক কিলহরনের মতে কালিদাস ৪৭২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ ৪৭২ খৃঃ অব্দে মান্দাশোরের শিলালিপি উৎকীর্ণ হয় এবং কিলহরণ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে এই শিলালিপির লেখক ঋতুসংহার কাব্যের নাম জানিতেন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী নগরে যশোধর্ম্মদেব নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার উপাধি ছিল। যশোধর্ম্মদেব বিক্রমাদিত্য হূন দিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া শকারি উপাধি গ্রহণ এবং স্বীয় গৌরব প্রচারার্থ স্বরাজ্য প্রচলিত মালব সম্বৎকে বিক্রম সম্বৎ নামে অভিহিত করেন। কবি কালিদাস রামের পূর্ব্ব পুরুষ রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা উপলক্ষে সম-সাময়িক দেশের ও জাতির পরিচয় নিজ কাব্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কালিদাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে রচিত রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থে ভারতের নানা প্রদেশের যেরূপ ভৌগোলিক ও জাতি বিষয়ক বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কবি প্রয়োজন সত্বেও সেই সকল প্রদেশের ও জাতির মধ্যে অনেকগুলি নাম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যে সকল দেশ ও জাতির সহিত রঘুর কোন সম্পর্ক থাকিবার কথা নাই; তাহাদের নাম গ্রহণ করিয়াছেন; ইহা দেখিয়া মনে হয়, কবি নিজ কালের কোনও দিগ্বিজয়—কাহিনী অনুসরণ করিয়া রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকিতে পারেন। সে নরপতি কোন নরপতি? ডাঃ হরণলির মতে সে নরপতি যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য। † এই যশোধর্ম্মদেবের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে রাখালদাস বাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "মালবরাজ যশোধর্ম্মদেব গৌড়, মগধ ও বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মান্দাশোরে আবিষ্কৃত খোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, হিমালয় হইতে মহেন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত ও লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র তীর হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল।"

কালিদাস এবং দিঙনাগ।

কবি কালিদাস যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার আর একটি প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে। মেঘ দূতের একটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নিম্নলিখিত রূপ।

"বুঝি গিরি শৃঙ্গ উড়ায় পবন"
সিদ্ধাঙ্গনাগণ ভাবিয়া মানসে,
উৎসাহে কৌতুকে তুলিয়া বদন,
হেরিবে তোমারে পরম হরষে।
উঠ শূন্যে তুমি উঠ ত্বরা করি
ত্যজি এ বেতসপূর্ণ আর্দ্র স্থান,
দিঙ্নাগের স্থূল—কর গর্ব্ব হরি
উত্তরের পথে কর হ গমন।"

দিঙ্নাগ শব্দের অর্থ দিগ্গজ। এইরূপ প্রসিদ্ধ যে ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামণ, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্প দন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক এই ৮টি হস্তী তাহাদের স্ত্রী যথাক্রমে অভ্রমু, কপিলা, পিঙ্গলা, অনুপমা, তাম্রকর্ণী, শুভ্রদন্তী, অঙ্গনা ও অঞ্জনাবতী নামে দিগ হস্তিনী সহ আকাশে ৮টি দিক রক্ষা করিতেছে। যক্ষ দূতরূপী মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, তুমি আকাশে উত্থিত হইলে দিগ গজগণ তোমার গাত্রে শুণ্ডদ্বারা প্রহার করিতে আসিবে. তখন তুমি তাহাদের গর্ব্ব হরণ করিও,—তোমার বিপুল দেহ দেখিলেই দিগ্গজ-দিগের শুণ্ড গরিমা লোপ পাইবে।

† মানসী, ৭ম বর্ষ।

কালিদাস কর্তৃক দিগ্‌গজ অর্থে দিঙ্‌নাগ শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে মল্লিনাথ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই শ্লোকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ও বিপক্ষ সমালোচক দিঙনাগ নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতের উপর শ্লেষোক্তি আছে। ডাক্তার ভাউদাজি বলেন যে, বৌদ্ধাচার্য্য অসঙ্গ খৃঃ ৫৪১ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। দিঙনাগ এই অসঙ্গের ছাত্র ছিলেন। দিঙনাগ প্রণীত গৌতম সূত্রবৃত্তি এখনও পাওয়া যায় এবং অধ্যাপক ই, ই, হিল তাঁহার কৃত বাসবদত্তার টীকায় ঐ বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন।*

কালিদাস এবং মাতৃগুপ্ত।

বিখ্যাত কাশ্মীর ইতিহাস রাজতরঙ্গিনী রচয়িতা কহ্লন মিশ্র (হর্ষ নামে) এক বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ করিয়াছেন; এই বিকমাদিত্য (উজ্জয়িনীর অধিপতি) কবিদিগের আশ্রয় দাতা এবং নানাবিধ বরণীয় গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। মাতৃগুপ্ত, বেতালমেন্থ (মেন্থ—ভট্ট) এবং ভর্ত্তৃমেন্থ, এই তিনজন কবি তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। অনেকে বিবেচনা করেন, নীতিশতক প্রভৃতির কবি ভর্ত্তৃহরি এবং ভর্ত্তৃমেন্থ একই ব্যক্তি। উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ হর্ষ বিক্রমাদিত্যের চেষ্টায় কবি মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর রাজ্যে রাজরূপে গৃহীত হইয়া ছিলেন।

সাহিত্যাচার্য্য স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতে বঙ্গদর্শন বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, পূর্ব্বতন জনশ্রুতির স্তর ভেদ করিলে মাতৃগুপ্তই কালিদাস. (১) ডাক্তার ভাউদাজি সর্ব্বপ্রথমে মহাকবি কালিদাস এবং মাতৃগুপ্ত অভিন্ন বলিয়া প্রকাশ করেন। এতৎ সম্বন্ধে রমেশ দত্ত মহোদয় লিখিয়াছেন, "ডাক্তার ভাউদাজি প্রথমে সাহস সহকারে এই মত প্রচার করেন যে, মাতৃগুপ্ত আর কেহ নহেন, তিনি কালিদাস। তাঁহার যুক্তি এই যে, ভারতবর্ষের সাহিত্যিক ইতিহাসে সাধারণতঃ নামের স্থানে সম্মান সূচক উপাধি লিখিত হইয়া থাকে।

কালিদাস এবং মাতৃগুপ্ত এক অর্থবাচক, উভয় নামেরই অর্থ দেবী কালীমাতার ভৃত্য অথবা আশ্রিত, তাঁহার দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, মাতৃগুপ্ত অবশ্যই খ্যাতনামা কবি ছিলেন. কিন্তু মাতৃগুপ্ত এবং কালিদাস অভিন্ন না হইলে মাতৃগুপ্ত সম্বন্ধে হিন্দুগণ কোন তত্ত্বই অবগত নহে। পক্ষান্তরে রাজতরঙ্গিনী প্রণেতা কহ্লণ পণ্ডিত অবশ্যই কালিদাসের নাম অবগত ছিলেন তিনি অন্যান্য কবির নাম করিয়াছেন। কিন্তু মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস অভিন্ন না হইলে তিনি শকুন্তলার কবির উল্লেখ করেন নাই। (?) তাহার শেষ যুক্তি এই যে, প্রবর সেন বিতস্তার উপর একটি সেতু নির্ম্মাণ করেন এবং তাহার স্মারক কবিতার টীকাকার উহা কালিদাস রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক এবং এইমাত্র বল যাইতে পারে যে. ডাক্তার ভাউদাজি আপন মত প্রতিপন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিলেও উহা প্রণিধান যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন।" (১)

এই মতের প্রতিবাদ করিয়া অধুনা পরলোকগত প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয় ১২৮০ সনের বঙ্গদর্শনে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। কালিদাস সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবি। যদি কাত্যায়ণবররুচির ন্যায় তাহার দুইনাম থাকিত তাহা, হইলে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কোন কোষকার বা টীকাকার তদ্বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই কেন? মাতৃগুপ্ত কৃত কুমারসম্ভব রঘুবংশ কেন কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় না? রাঘব ভট্ট কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলার টীকার মধ্যে যখন মাতৃগুপ্তের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন নিঃসন্দেহে তাঁহার মতে মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস দুই পৃথক ব্যক্তি। নাটকত্রয়ে কালিদাস আপনাকে মাতৃগুপ্ত না বলিয়া কালিদাস

* দিঙনাগের সময় সম্বন্ধে অন্যরূপ মতও দেখিতে পাওয় যায়। পণ্ডিত প্রবর ভণ্ডারকর যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এখানে প্রদত্ত হইতেছে। দিঙনাগ বসু বন্ধুর শিষ্য ছিলেন। বসু বন্ধুর গ্রন্থ সমূহ চৈনিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অনুবাদের কাল ৪০৪। ৫ অব্দ। চৈনিক মতে বসু বন্ধু শ্রাবস্তী অর্থাৎ অযোধ্যার অধিপতি বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। তিনটি কারণে এই বিক্রমাদিত্য এবং গুপ্তবংশ তিলক চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। (১) উভয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালেরই সময় এক, (২) উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং (৩) অযোধ্যা প্রদেশ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনাধীন ছিল।

(১) নবজীবন, ১ম বর্ষ।

(1) Ancient India.

কহিয়াছেন। উদ্‌ভট শ্লোকাবলীতে মাতৃগুপ্তের প্রশংসা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। "উপমা মাতৃগুপ্তস্য" "কবি মাতৃগুপ্ত" এইরূপ শ্লোক কেন রচিত হয়নাই? যদি কালিদাস ও মাতৃগুপ্ত অভিন্ন, তবে অদ্যাবধি কেন প্রথম নামটি প্রচলিত ও অপর নামটী অপ্রসিদ্ধ। মাতৃগুপ্ত যে সেতু কাব্যের প্রণেতা, কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হইল? তিনি প্রবর সেন কর্ত্তৃক নিষ্কাসিত হইয়া বারাণসী ধামে বাস করিয়া যাহার দ্বারা রাজ্যচ্যুত হইলেন, তাঁহার অধিকারে বাস করিয়া চাটুকার বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, ইহা কতদূর সম্ভব? অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের ফল স্বরূপ একাধিক কালিদাস লব্ধ হইয়াছে। সেতু কাব্যের লেখক কালিদাস যে নব রত্নের কালিদাস, ইহারই বা প্রমাণ কি? কালিদাস কোন্ গ্রন্থে কাশ্মীরের বর্ণনা করিয়াছেন? সুন্দররূপে অশুদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে চির প্রচলিত প্রবাদ কেন পরিত্যক্ত হইবে?

### ভোজ রাজা এবং কালিদাস।

দক্ষিণাপথ, মালব, গুজরাট প্রভৃতি দেশে প্রসিদ্ধি আছে যে কালিদাস উজ্জয়িনী নগরে ভোজ রাজার সভায় শ্রেষ্ঠ রত্ন রূপে শোভা পাইতেন। কর্ণেল টড স্বপ্রণীত "রাজস্থান" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে যতদিন হিন্দু সাহিত্য জগতে জীবিত থাকিবে ততদিন রাজা ভোজ প্রমর ও তাঁহার নবরত্নের নাম কখনও বিলুপ্ত হইবেনা। তিনি তিনজন ভোজরাজার উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম খৃঃ ৫৭৫, দ্বিতীয় ৬৬৫; ও তৃতীয় ১০৪৪ অব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাস এই তিন জন ভোজরাজার মধ্যে কাহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন, তাহা বলিবার উপায় নাই।

### খৃঃ একাদশ শতাব্দী।

ভোজ প্রবন্ধ এবং আইন আকবরীর মত অবলম্বন করিয়া মিঃ বেন্টলী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কবির আশ্রয় দাতা রাজা বিক্রম খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতে ছিলেন।

### কালিদাস, পৌরাণিক ধর্ম্ম, হুণআক্রমণ, উজ্জয়িনীর অধিপতি যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য

পণ্ডিত দিগের এই সকল মতের আলোচনা করিয়া কোন্ এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা নাই। কোথায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দী আর কোথায় খৃঃ একাদশ শতাব্দী! কালিদাসকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্ত্তী রূপে নির্দ্দেশ করিবার পক্ষে বাধা এই যে ডাক্তারফ্লিট খৃঃ ৬৩৪—৬৫ (৫৫৬ শকাব্দ) অব্দে চালুক্য বংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশী রাজার রাজত্ব সময়ে খোদিত একশিলা লিপিতে কালিদাস ও ভারবীর নাম লিখিত থাকা দেখিয়াছেন। অধ্যাপক কিল হরণ ৬০২ অব্দে খোদিত একটী শিলালিপিতে রঘুবংশের একটী কবিতা উৎকর্ণ দেখিয়াছেন। পক্ষান্তরে কালিদাসকে খৃষ্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে নির্দ্দেশ করাও সত্যানুমোদিত নহে। রঘুবংশে হুন জাতির উল্লেখ আছে; ফলতঃ তিনি যে হুন আক্রমণের পর ভারতবর্ষের মুখশ্রী উজ্জল করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হুন উপদ্রব খৃষ্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ট শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। (১) কালিদাসের কাব্যাবলীর আভ্যন্তরীণ প্রমাণও তাঁহাকে এইকাল মধ্যে স্থাপিত করিতেছে। তাঁহার সময়ে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্ম পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সর্ব্বত্র দেব মন্দির উত্থিত হইয়াছিল। দেব মূর্ত্তি সকল পূজিত হইতেছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব জগৎ নিয়ন্তার এই ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা হইয়াছিল খৃষ্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতেই পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব ঘটিয়াছিল। ফলতঃ ভারতবর্ষের অক্ষয়ভূষণ কবি কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং বিক্রমাদিত্য নামে আখ্যাত কোন দিগ্বিজয়ী সম্রাটের মুকুট মণি ছিলেন। তাদৃশ্য অসাধারণ সম্পদ ও সৌভাগের অধিকারীর অনুসন্ধান কালে একাধিক নরপতির নামোল্লেখ হইয়াছে। এতন্মধ্যে যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্যের সহিত কালিদাসের মিলনই যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কালিদাস শৈবছিলেন,

(১) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছেন—মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বে হুন জাতির উল্লেখ আছে অতএব কালিদাস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে আবিভূত হইয়াও রঘুবংশে হুন জাতীর উল্লেখ করিতে পারেন। কিন্তু মহাভারতের এই অংশের বয়স কত, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক; কারণ মহাভারত যুগে যুগে বর্দ্ধিত কলেবর হইয়াছে। পণ্ডিত প্রবর ভাণ্ডারকারের মতে গুপ্তবংশের রাজত্ব কালে মহাভারত শেষবার পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

যশোধর্ম্ম শিব ভক্ত ছিলেন ; পার্ব্বতীর পঞ্চ অঙ্গুলি চিহ্নিত বৃষধ্বজ তাঁহার শত্রুর তেজ হরণ করিত।

কালিদাস এবং নবরত্ন সভা

আমাদের দেশে বদ্ধমূল বিশ্বাস এই যে উজ্জয়িণীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের একটি পণ্ডিত সভা ছিল। রত্নতুল্য নয়জন মনীষী ঐ সভার অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া উহা নবরত্ন সভা নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐ নয় জন পণ্ডিতের নাম যুক্ত একটী শ্লোকও জ্যোতির্বিদাভরণ নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যথা, ধন্বন্তরী, অমরসিংহ, শঙ্ক বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ, মিহির, বররুচি। (১) এই শ্লোক পাঠ করিলে ইহাঁদিগকে সমসাময়িক বলিয়া স্থির করিতে হয়। বস্তুতঃ ধন্বন্তরি (২) বরাহ মিহির খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই নয়জন মনীষীর সকলেই সমসাময়িক ছিলেন এরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

# কবির লড়াই।

কবিগানের ব্যবসায়টা সুদূর অতীতেও উচ্চবংশীয় লোকদিগের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ উহাতে অকথ্য গালাগালি আছে। মান, মাথুর ও বসন্ত বিষয়ক গানগুলি যদিওবা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ টপ্পা পাঁচালীই অশ্লীলতা দোষদুষ্ট—তাহা আসরে বসিয়া শ্রবণ করাই যথেষ্ট, সাহিত্যে সঙ্কিত হইতে পারে না। টপ্পা বা কবির লহরে যেটুকু ঢাকা থাকে, পাঁচালীতে তাহাও থাকে না, একেবারেই খোলাখুলি বন্দোবস্ত। সে অশ্লীলতা কিরূপ শুনুন, দাঁড়ার যুধিষ্ঠির বিপক্ষের সরকারকে বলিতেছে :—

স্বর্গে মর্ত্ত্যে লাইন খুলেছে
টিকিট মাষ্টার পাণ্ডুরাজ,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির,
এইত তোমার সতী মায়ের কাজ !

এখানে তবু কাব্যের আবরণে পুঁতিগন্ধটুকু ঢাকা আছে, ছড়া কাটিবার সময় "তোর মা, তোর বাপ" বলিয়া যে সব কদর্য্য কথার অবতারণা করা হইয়া থাকে, তাহা শুনিয়া কাণে আঙ্গুল না দিয়া থাকা যায় না। এই জন্যই উচ্চস্তরের লোক কবির ব্যবসায়ে বড় লিপ্ত হইতে চান না।

১২৪১ সালেও সুবিখ্যাত পাঁচালীকার ৺দাশরথি রায় কবির দল চালাইতেছিলেন। একদিন প্রতিপক্ষের সরকারের নিকট তিরস্কৃত হওয়ার সংবাদে তাঁহার পিতা তাঁহাকে যে মর্ম্মবাণী শুনাইয়া ছিলেন তাহাতেই তিনি কবির দল ছাড়িতে বাধ্য হয়েন। তাঁহার পিতা মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন, "বৎস দাশরথি, আমি তোমার ধনবান পিতা নহি সত্য, কিন্তু বুদ্ধিমান পুত্রের নিকট দরিদ্র পিতার হিতকথা গ্রাহ্য হয় নাকি ? তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ, উহা অতি বিশুদ্ধ বংশ, এ বংশে কেহ কখনও অসৎকর্ম্ম বা অসৎ ব্যবসায় করে না" ইত্যাদি। যখন সাতাশি বৎসর পূর্ব্বেই কবি 'অসৎ ব্যবসায়ে' পরিগণিত হইয়াছে তখন এখন আর উহাকে কৌলিন্য দান করা যাইতে পারে না। তবে অশ্লীল অংশ বাদ দিলে কাব্য পিপাসী মাত্রেরই নিকট কবি উপভোগের সামগ্রী। আমাদের বিশ্বাস 'সৌরভ' সম্পাদক মহাশয়ও কবির পক্ষপাতী, তাই বরাবর তাঁহার 'সৌরভে' মৃত কবিদিগের টপ্পা, সখিসংবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তৎপক্ষে সুলেখক চন্দ্রকুমার দে ও বিজয়নারায়ণ আচার্য্যের সাহায্যই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহাদের ন্যায় সরস ব্যাখ্যা সম্বলিত কবিগানের যোগান দেওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। সে ভার তাঁহাদিগকেই দিয়া আমি এক নূতন পথের পথিক হইতেছি। বলিতে কি ময়মনসিংহের বিখ্যাত নিরক্ষর কবি রামু-রামগতি আমাদের কৈশোর জীবনকে কবির কবিত্ব দোলায় এমনই আন্দোলিত করিয়া গিয়াছে যে এই প্রৌঢ় বয়সেও সে ধাক্কা সামলাইতে পারিতেছি না তাই আমাদের সমসাময়িক জীবিত কবি শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্যের সুন্দর একটী

পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিলাম। যাহারা এ রসের রসিক, তাহাদিগকেও সাদরাহ্বান জানাইতেছি। সাহিত্যের আসরে সাধু ভাষায় "কবির লড়া

(১) সাহিত্য সংহিতা প্রথম বর্ষ।
(২) পঞ্জিকা।

করিতে বোধ হয় কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারেনা।

শ্রীবৃন্দাবনে বসন্ত-কাল প্রবর্ত্ত হইয়াছে। শ্রীমতী কৃষ্ণ-বিরহে আকুলা। তাঁহার পক্ষ হইতেই কবি বিজয় নারায়ণ মনোরম ভাষায় এই গীতটী রচনা করিয়াছেন।

নূতন স্বভাবের শোভা মরি কিবা শিশির অন্তে।
কিবা রসালে মুকুলের ভার দৃশ্য অতি চমৎকার
নূতন বসন্তে॥
প্রকৃতির বন বাগানে ফুটলো কুসুম স্থানে স্থানে
জুটলো অলিকুল,
তুললো রোল, কি অতুল পেয়ে ফুটন্ত ফুল;
বাসন্তী ফুল নানা জাতি, শোভার সম্পদ সে সব অতি
মল্লিকা রঙ্গণ মালতী জাতি যুথি, গন্ধরাজ বকুল।
গৌরবে ফুলের সৌরভ করিয়ে হরণ,
বহিছে মলয় পবন সুধীর গতি মন্থর।
বিরহিণী নারী বিনে কে জানে বসন্ত দিনে
যে করে অন্তর॥
ধরিয়া ললিতার গলে কমলিনী কেঁদে বলে—
শুনলো প্রাণ সই,
দুরন্ত বসন্ত জ্বালা আর বা কত সই;
কোকিল পাখী কুহুতানে হলাহল ঢেলে দেয় কাণে
মদনের পঞ্চবাণে প্রাণে হানে নিরন্তর।
বিরহিণী নারী বিনে কে জানে বসন্ত দিনে
যে করে অন্তর॥
এ সুখ বসন্তে আমার কান্ত দেশান্তর।
ব'লে ছিল যাওয়ার কালে আসিব ফিরে সকালে
ব্রজে পুনরায়,
সেই আশায়, দিন যায়; এ'লনা শ্যামরায়;
আশার দিনত হ'ল গত, আসার আশে থাকব কত
কত চাব আশা পথ পিপাসিতা চাতকিনীর প্রায়।
কত জন্মে কত কর্ম্মে করেছি কি পাপ
না জানি ভুগিব সন্তাপ কত জন্ম জন্মান্তর;
বিরহিনী নারী বিনে ইত্যাদি।
( ঝুমুর ) ও সই, কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দাবনে
আমি কেন প্রাণে বেঁচেআছি।
ম'রে যাই, ক্ষতি নাই, আমি মরিলে পরাণে বাঁচি।
সরল জানিয়ে তাবে সঁপে ছিলাম সমাদরে
জীবন যৌবন ধাঁচি, কুলমান, করলেম দান
তার দোষগুণ নাহি বাছি।
( পর চিতান ) দিনরজনী বিচ্ছেদ বিষে থাকা যদি
কিবা প্রয়োজন;
আমার কাজ কি এ ছার জীবনে, শ্যাম কুণ্ডের জীবনে
দিব বিসর্জ্জন।
কোন দিন আসিলে ফিরে দাসীর কথা মনে করে
রসরাজ কানাই,
বলে যাই তোমার ঠাঁই বোলো—রাই বেঁচে নাই।
বসন্ত বিচ্ছেদ অনলে শ্যাম বন্ধু শ্যাম বন্ধু বলে
ডুবিয়ে শ্যাম কুণ্ডের জলে
মৈল তোমার দীন-দুঃখিনী রাই।
গৌরবে ফুলের সৌরভ করিয়ে হরণ,
বহিছে মলয় পবন সুধীর গতি মন্থর।
বিরহিণী নারী বিনে ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

( জবাব ললিতা পক্ষে )

হয়ে অতি বিষাদিতা, কয় ললিতা রাধা কমলে—
ও সই, শীতান্তে বসন্তের প্রায় দুঃখ অন্তে সুখ পায়
শুন্তে পাই বলে।
আমাদের আদরের ধনে হরে নিতে বৃন্দাবনে
এসেছিল চোর,
সে অক্রূর, হায় কি ক্রূর করলো সব ভগ্নচুর;
মগ্ন ছিলাম কৃষ্ণ সুখে শোক শেল হানিয়া বুকে
সহসা গোকুলে ঢুকে প্রাণ বন্ধুকে নিল মধুপুর।
ক্ষান্ত হও কমল মুখী, দেখি কিবা হয়,
হ'তে পারে কুহু মলয় 'উহু' নাশেরি ঔষধ।
মনে মনে ভাব কান্তে, তা হ'লে আর এ বসন্তে
ঘটবেনা বিপদ।
আজ দেখ সব শুভ-লক্ষণ তৃণ দল করে ভক্ষণ
কুরঙ্গ দল,
এ বঙ্গ কি দেখছ নব [illegible]
শ্যামা শিখী শারী [illegible]

আশ্বাসে বাঁধলো বুক আসবে বলে প্রেমাস্পদ।
মনে মনে ভাব কাস্তে তা হ'লে আর এ বসন্তে
ঘট্‌বেনা বিপদ।।
মরতে হয় মরিব সবে ঘুচিবে আপদ।
চাইনা কিছু ভালবা র প্রেম জন রাই এমনি দশার—
সুসার মন্ত্র ঐ,
বন্ধু কই, বন্ধু কই, হা হুতাস সতত ই;
থাকলেও বন্ধু খুব গোচরে নাই বলে মন সঙ্গে করে
অহেতুকা প্রেমে পড়ে ঘটে পরে, এই জ্বালাতনই
(ঝুমুর) ও সই, মাধবে মাধব আসিবে
দিবে মাধবীর বনে দেখা।
এ হৃদয়, তাইত কয় হবে, না এ'লে পরাণে ঠেকা।
মদন জ্বালাতে করি আমরাও রাই, প্রাণে মরি
তুমি না মরিছ একা
সদা মন, উচাটন এযে আছিল করমে লেখা।
(পর চিতান) রমনীর শিরোমণি, কমলিনী
শুনলো তোরে কই,
যখন ফুল ফুটনের হয়লো সময় ফুলে ধরা ফুলময়
কোন্‌দিন না হয় সই? ফুটে বকুল, ফুটে বেলী,
মল্লিকা তগর চামেলী, ফুটে সে রঙ্গন,
অতুলন, সে কাঞ্চন, ফুটে চাঁপা চন্দন।*
পদ্মকুমুদ কৃষ্ণ চূড়া রাধা পদ্ম মনোহরা
করবী কনক ধুতুরা রসে ভরা পুষ্প অগনণ
(২ নং ফুকার)
চিন্তা মোহ জাগরণ কর ইহার যা করণ?
মরণ ভাল নয়;
মরলে ভয় অতিশয় বন্ধু কার কাছে রয়?
মৈলেপরে কেব' তারে রত্ন জ্ঞানে যত্ন করে,
ক্ষীর সর দিয়ে করে কে বন্ধুরে কোলে তু ল লয়?
বসন্ত খুলেছে তার শোভার ভা ণ্ডার,
এ সময়ে বন্ধু কি আর ব্রজে না বাড়াবে পদ?
মনে মনে ভাব কাস্তে, তা হলে আর এ বসন্তে
ঘট্‌বেনা বিপদ
শ্রীমহেশচন্দ্র কবিভূষণ

* চন্দন গাছেও ফুল ফুটে, কবিবর ৺গোবিন্দ দাসের চন্দন দ্রষ্টব্য

# স্নেহের দান।

(৬)

পিতৃবিয়োগে মণিমোহন গুরুতর দায়িত্বের বোঝা মাথায় লইয়া বসিল।

শ্রাদ্ধের পর মাখন চলি। যাইতে চাহিয়াছিল, মণির অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারে নাই। পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে মণির সহিত ডহরে থাকিয়া গেল।

মণির মা মণির বিবাহের কথা মণি ও মাখন উভয়ের নিকট তুলিয়াছিলেন। মণি মার অনুরোধের উত্তরে পরিস্কার জবাব দিয়াছিল—"আমি বিবাহ করিব না।" মাখন বলিয়াছিল—"কাল অশৌচে বরং নাই হইল; পরে দেখা যাইবে। বিবাহ না করিয়া যা বে কোথায়? আপনারা পাত্রি অনুসন্ধান করুন।"

কথা ছোট গিন্নার কর্ত্রীর সম্মুখেই হইয়াছিল। মাখন চলিয়া গেলে কনকের বিবাহ সম্বন্ধে যে ছোট কর্ত্রী মোটেই কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না ইহা উপলক্ষ করিয়া মণির মা তাঁহাকেও বলিলেন—"ছোট বউ তোমারও যে মেয়ের জন্য কোন চিন্তা দেখিতেছি না; এত বড় মেয়ে তোমার, এ দিকে কি দৃষ্ট করিতে নাই?"

ছোট কর্ত্রী বলিলেন—"কি করিব বল দিদি? হিন্দুর ঘরের মেয়ে, কুল ও কপাল বিধাতা ঠিক করিয়াই পাঠাইয়াছেন। সময়ও তাঁহারই হাতে, মানুষের কি সাধ্য তাহা খণ্ডন করে?"

বড় কর্ত্রী—"এক কুল-কপাল ভাবিয়া থাকাও ঠিক না। শেষ বেণী পুড়িয়া আঙ্গুলে ধরিলে চিন্তা করিবারও অবসর থাকে না—যেখানে সেখানেই ডুবাইয়া দিতে হয়।"

ছোট কর্ত্রী—"তাহাও কি দিদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ছাড়া হইতে পারে? ছোট হইতে দুঃখ ও বিপদ ভোগিয়া ভোগিয়া ঈশ্বরের বিচারের উপরই নির্ভর জন্মিয়া গিয়াছে। তিনি যখন জগতের ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন কনকেরও ব্যবস্থা নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন।"

বড় কর্ত্রী—"মনতো তা বুঝে না বোন, তাই মন আই ঢাই করে।"

ছোট কর্ত্রী "ছেলের বিবাহের জন্য চিন্তাকি দিদি, বল না মণিকে, সে আপনা হইতেই বাছিয়া আনিবে তোমাদের অনাসৃষ্টি কারবারের জন্যইতো সেবার ইদিলপুরের বিবাহ পণ্ড হইল। ইহার পর ওতো কত আসিল।"

বড়কর্ত্রী—"সেও বোন্ তাহা হইলে কুল-কপালেরই কথা..."

ছোটকর্ত্রী—"তাতে কি আর ভুল আছে? আমাদের জন্য আমাদের চেয়েও বেশী ভাবেন, বেশী চিন্তা করেন, এমন দরদীও আছেন সেটা ভাবিতে পারিলে, আর চিন্তা থাকে না; তাই ভাবিয়াই দিদি নিশ্চিন্ত আছি। নতুবা আজ আমার দুঃখে পাষাণ কাঁদিত"

ছোটকর্ত্রী এইস্থলে—তাঁহার জগন্নাথ তীর্থের বিপদে ভগবানের করুণ কর স্পর্শ তিনি কিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—চক্ষু জল ফেলিতে ফেলিতে তাহার অনেক কথা বড়কর্ত্রীর নিকট ইচ্ছা করিয়াই বলিয়া ফেলিলেন। এই প্রসঙ্গে মাখনের কথাও উঠিল!

শুনিয়া বড়কর্ত্রী একটু চকমিত হইয়া বলিলেন "তাহা হইলে মাখন তোমার সত্যিকার বোন্‌পুত নয় ছোট বড়?"

ছোটকর্ত্রী বলিলেন "না হইলে ও দিদি সে আমার এত আপনার যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, আমার সকলি ছাড়িতে হয়। ভগবান তাহাকেই আনিয়া আমার আশ্রয় স্বরূপ ধরিয়া দিয়া আমাকে এ সংসারে পুনরায় আনিয়াছেন মাখনের সাক্ষাৎ না পাইলে কে আমাকে করুণা বাবুর আশ্রয় ধরাইয়া দিত?"

বড় বউ জিজ্ঞাসা করিলেন—"করুণা বাবু কে ছোট বউ?"

ছোট বউ—"ঢাকার উকিল, যাঁর আশ্রয় করিয়া আমি এই বিপদ সাগরে কুল পাইয়াছিলাম। করুণা বাবু আমার জন্য কত বিপদে সাঁতার দিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ দিদি!

"না বোন, আমরা কেমন করিয়া শুনিব? আমরা কেবল শুনিয়াছি, তুমি বাবা জগবন্ধুর কৃপায় রক্ষা পাইয়া আসিয়া ঢাকায় এক উকীলের বাসায় আছ।"

বড়কর্ত্রীর মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে ছোটকর্ত্রী বলিতে লাগিলেন—"করুণা বাবু অনন্ত বিপথ মাথায় নিয়া নিজের ঘর হইতে টাকা খরচ করিয়া পুরীর হাসপাতালের ডাক্তারকে সমন করিয়া আনিয়া আমার কুল রক্ষা করেন সে মোকদ্দমায় আপোষ না হইলে আমার যে আজ কি দশা হইত, তাহা ভাবিতে ও শরীর সিহরিয়া উঠে।..."

এইস্থানে ছোটকর্ত্রী মাখনের সহিত তাহার আকস্মিক সাক্ষাতের কথা ও তাহার সম্বন্ধে অন্যান্য যাবতীয় কথা বলিলেন।

শুনিয়া বড়কর্ত্রী বলিলেন—"এতকথা তো জানিনা; তাহা হইলে তুমি তো একরকম বোধ হয় নিশ্চিন্তই আছ বোন্। মাখনের ও আশ্রয় নাই।"

ছোটকর্ত্রী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "সকলি ভগবানের হাত।"

বড়কর্ত্রী—"সম্বন্ধ কি উত্তরে?"

ছোটকর্ত্রী আগ্রহের সহিত বলিলেন—"দেখাতো যায় দিদি উত্তরে এখন ভবিতব্যতা কাহার কি আছে, কে জানে? এ পর্য্যন্ত মনের কথা কাউকে কিছু বলি নাই। তোমার কেমন মনে হয় দিদি?"

গোপী ভাণ্ডারী মাখনের নীচ ও ক্ষুদ্র দৃষ্টির অনেক দৃষ্টান্ত বড়কর্ত্রীর নিকট দুই বৎসর পূর্ব্বে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছিল। মাখনের সংস্পর্শে মণির স্বভাবেও যে সে সম ক্ষুদ্রভাব সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা বড় হিস্যার কাহারও অবিদিত ছিল না। সে সকল কথা স্মরণ করিয়া বড়কর্ত্রী গম্ভীরভাবে বলিলেন—"কি জানি ছোটবউ আমার যেন বড় বেশী ভাল ঠেকিতেছে না। তোমার এতবড় সংসার লাড়াচাড়া করিবে যে সে কেন—না অমুক নবম্বং সচবারি পাত্রং একজন দুকুল হীন পথের কাঙ্গাল হইবে? সে হয় হইবে—একজন হাইকোর্টের উকীল, নয় এমন আর একটা জমিদারের ছেলে—যেন যুগ্যে যুগ্যে বসুন্ধরা মিলে।"

ছোটকর্ত্রী প্রতিবাদের ভাবে বলিলেন—"মাখনও কি হাইকোর্টের উকীল হইতে পারিবে না দিদি? মণি বলিয়াছে, মাখন জেলার কর্ত্তা হইবে।"

বড়কর্ত্রী সে কথায় আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া বলিলেন—"স্বামীর নাম বজায় থাকুক বোন; যায় যা—কুলে কপালে আছে তো হইবেই; ভাল ঘর দেখিয়া একটি

পোষ্যপুত্র রাখ, আর সংবরে মেয়েটিকে তুলিয়া দাও; স্বর্গীয় কর্ত্তার পিণ্ড পাউন; ঈচ্ছ নাম বজায় থাকুক ”

ছোটকর্ত্রী—“তা হইবে না দিদি! পেটের মেয়েকে পরের হাতে সঁপিয়া দিয়া, পরের ছেলের অনুগ্রহ দৃষ্টির ভিকারী হইতে পারিব না

বড়কর্ত্রী—“ছেলেও যেমন পর, জামাইও তেমনি পর, এ পথে উভয়ই তুল্য ”

ছোটকর্ত্রী—“পেটের মেয়ে সুখে থাকিবে, এ দেখিয়াও সুখী থাকিতে পারিব দিদি; মেয়ে যদি বিরূপ হয়, তবু সান্ত্বনা থাকিবে—নিজের সন্তানের সুখের জন্যই দুঃখ ভোগ করিলাম।

বড়কর্ত্রী হাল ছাড়িয়া বলিলেন—“যাহা ভাল বুঝ কর।”

---

# শাসনের পুরস্কার।

“কে? মহিম? এতখানি বড় হ'য়েছিস? অনেক দিন তোকে দেখিনি।” এই বলিয়া মাতুল সুরেশচন্দ্র মহিমের মাথায় ও পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহাকে নিজেরই নিকটে বসাইলেন। আজ পাঁচ বৎসর পর সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভগিনীর বাড়ীতে আসিয়াছেন, ভগিনীর একটি মাত্র সন্তান মহিমচন্দ্র মাতার আদেশে মাতুলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহারই নিকট বসিল।

ভাই ও ভগিনীতে অতীত এবং বর্ত্তমান সুখ দুঃখের কাহিনী চলিতে লাগিল। মহিমের মুখে শব্দটী নাই, সে শুধু শুনিয়া যাইতেছে। এমন সময় গিয়াছে, যখন মহিমচন্দ্র মাতুল মহাশয়কে বাঘের মত ভয় করিত। সেই সংস্কারটা এখনও তার হৃদয়ের ভিতর হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই।

সুরেশ বাবু বলিলেন “মহিমকে এতটুকু দেখে গিয়েছিলেম দিদি! একদিন এর শরীরে আমার কত না শাসন চিহ্ন অঙ্কিত হ'য়েছে। অপোগণ্ড শিশু—বুঝতে পারেনি তখন—প্রহারের অর্থ ভাল কি মন্দ! আজিও বুঝতে পারিনি—সাত বৎসরের শিশুকে অনবরত পাঁচ বৎসর কাল প্রখর শাসনে রাখলে তার মেধা শক্তিও প্রখর হ'য়ে উঠবে কিনা! কোন ক্লাসে পড়ছিস এখন তুই?”

মহিম নিরুত্তর। জননী বলিলেন—“বলনা মহিম, কোন্ ক্লাসে পড়ছিস?” তথাপি মহিম নিরুত্তর। সুরেশ বাবু তখন শুনিতে পাইলেন, মহিমের প্রতি মা সরস্বতী তত সদয়া নহেন, প্রত্যেক ক্লাসেই দুই তিনবার সরস্বতীর নিগ্রহ সহ্য করিয়া সে এখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়িতেছে। সুরেশ বাবু গণনা করিয়া দেখিলেন, রীতিমত প্রমোশন লইয়া উপরের ক্লাসে উঠিলে সে আজ আই, এ ক্লাসে পড়িবার অধিকারী হইত।

মহিমের মা বলিলেন “যেদিন থেকে তুমি আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছ সুরেশ, সেইদিন থেকেই মহিমের বুদ্ধি বিগড়াতে আরম্ভ করলে। কারুর কথা শোনা নেই, লেখা পড়ায় মনোযোগ নেই। কর্ত্তা স্বর্গীয় হয়েছেন পর শুধু তোমাকে দেখলেই তার শাপের মাথায় শিকড় পড়ত। তুমিও এখান থেকে পরীক্ষায় পাশ দিয়ে চলে গিয়েছ, মহিমও স্বাধীন হয়েছে।”

সুরেশ বাবু তখন বুঝিতে পারিলেন পুত্রের প্রতি জননীর অতিমাত্র স্নেহ তাহাকে শাসনের বহির্ভূত করিয়াছে। এখনও সে গোল্লায় যায় নাই বটে কিন্তু আঠার বৎসরের দরিদ্র যুবকের যতটুকু ভবিষ্য চিন্তা হওয়া দরকার মহিমের সে সব কিছুই হয় নাই। এক শ্রেণীর যুবক আছে যাহারা নিজের ভাবনা কিছুই না ভাবিয়া শুধুই পরের খবর এবং পর দেশের বৃত্তান্ত নিয়াই কাল কাটায়। তাহারা মনে করে—তাহাদের নিকট বুঝি পৃথিবীর সংবাদ কিছুই অবিদিত নাই। মহিমচন্দ্র আজি সেই “সব জান্তা” শ্রেণীর যুবক। তাহার মামা সুরেশ বাবু গৌতমনগর স্কুল হইতে পনর টাকা বৃত্তি পাইয়া ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া গিয়াছেন পর সেই স্কুল হইতে যে এই পর্য্যন্ত আর কেহও বৃত্তি পায় নাই, সেই হিসাব তার নখদর্পণের মধ্যে ছিল। গৌতম নগর স্কুল স্থাপনের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার মামাই যে সর্ব্বপ্রথম ছাত্র, এই গৌরবটা ভাগিনেয়ের মনে অলক্ষিতে রেখাপাত,

করিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মহিমচন্দ্র নিজগ্রামের স্কুলটীর পূর্ব্বাপর ইতিহাস মুখস্থের মতই বলিয়া যাইতে পারিত। এই পর্য্যন্ত কয়জন হেড্‌মাষ্টার বদলী হইয়াছেন, কোন হেড্‌মাষ্টার ইংরাজী ভাল জানতেন, কোন বৎসর লাইব্রেরীঘরে আগুণ লাগিয়াছিল—এই সমস্ত খবরও সে যথার্থভাবে এবং অতি রঞ্জিতভাবে—দুইপ্রকারেই সংগ্রহ করিয়াছিল। তারপর তার মামা আই, এ পরীক্ষায় বিশ টাকা বৃত্তি পাইয়া বি, এ পরীক্ষায়ও যখন অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিল এবং মুরুব্বির অভাবে সাধারণ একটা প্রাইভেট্ স্কুলে পঞ্চাশ টাকা বেতনে কাজ গ্রহণ করিয়াছিল, তখন মহিমচন্দ্র মনে করিত ছাত্রজীবনের সেই দিগন্তব্যাপী যশোরাশি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে মাসিক পঞ্চাশ টাকার অধিক বিকায় না তখন কিছাড় শ্রমপরিশ্রমে, কিছাড় বৃত্তিলাভে।

তখন হইতে সে খবর সংগ্রহ করিত ছাত্রজীবনের পর কে কোন্ লাইনে প্রবেশ করিয়াছে, কার কত বেতন, পরীক্ষার সময় কে কোন্ বিভাগে পাস্ করিয়াছিল ইত্যাদি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির কেলেণ্ডারগুলি যে মাঝে মাঝে স্কুল-লাইব্রেরী হইতে বাসায় লইয়া গিয়া মনোযোগের সহিত পড়িত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা ছাত্রদের নাম ধাম দেখিয়া দেখিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিত। এই নেশাটাই তাহাকে আউট্-বুক পড়বার জন্য প্রবল আগ্রহান্বিত করিয়া তোলে। বহুলোকের জীবনী সে অধ্যয়ন করিয়াছে কিন্তু নিজের বেলায় সে স্কুলের বই-পুস্তক মোটেই ধরে না। বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ত্তমান সময় কে কেমন লেখক, কার কবিতাগুলি মিষ্টি শুনায়, কার কবিতায় মিষ্টিসরস্ সৃষ্টি করিয়াছে কোন পত্রিকার সম্পাদক নির্ভীক সমালোচক, কার পত্রিকা বাজারে বেশী কাটে ইত্যাদি বহুবিধ সংবাদ সেই অষ্টম শ্রেণীর পাকা ছেলেটির নিকট কলিকাতা গেজেটের মত মুদ্রিত থাকিত। উপর্য্যুপরি তিন বৎসর সে অষ্টম শ্রেণীতেই পড়িতেছে—যে-সে কথা নহে।

আজ যখন সে তাহার মাতার নিকট শুনিতে পাইয়াছিল য এই গৌতমনগর স্কুলেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র তাঁহার মাতুল মহাশয় আজি তাহাদেরই বাড়ীতে আসিতেছেন তখন হইতেই তাহার একগুঁয়ে প্রকৃতি কথঞ্চিৎ স্বভাব ধারণ করিয়াছিল। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াও যে কর্ম্মক্ষেত্রে পঞ্চাশ টাকার বেশী মূল্য হয় না সেই বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা তাহার মনে তাহার মাতুলের অবস্থা হইতেই জন্মিয়াছিল।

সুরেশ বাবু ভগিনীর বাড়ীতে যে কয়দিন ছিলেন, মাঝে মাঝে ভাগিনেয়কে উপদেশ দিতেন। যে স্রোতস্বিনীর গতি শতপথে শতদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাকে একমুখো করা দুঃসাধ্য। মহিমের মনে মাতুলের উপদেশ বেশী কিছু ক্রিয়া করিতে পারিল না। পঞ্চাশ টাকা বেতনের শিক্ষক, ভবিষ্যৎ অর্থোপার্জ্জনের উপদেশ দিতেছেন,ইহা মহিমের নিকট যেন প্রহসন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পঞ্চাশ টাকার আবার মূল্য কত?

( ২ )

আজ গৌতমনগরের চক্রবর্ত্তী বাড়ীতে পাড়ার লোক একত্র হইয়াছে। যে মহিম সারাদিন বাড়ীর ছায়া না মাড়াইলেও সন্ধ্যাকালে জননীর স্নেহাঞ্চল তলে না আসিয়া থাকিতে পারিত না আজ দুদিন হয় সেই মহিমের কোন উদ্দেশ নাই। সেই যে একদিন দুপুর বেলায় খাওয়াদাওয়ার পর মহিমচন্দ্র বাড়ীর বাহির হইয়াছে, তারপর আর ফিরিয়া আসে নাই। জননী কাঁদিয়া আকুল,পরিবারের লোক শোকে অধীর; প্রতিবেশীগণ সকলে সমবেত হইয়া সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে।

মাসের পর মাস চলিয়া গেল, তারপর বৎসর চলিয়া গেল—মহিমের কোন খবর নাই পুলিশের সাহায্যে ও পত্রিকার সাহায্যে অনুসন্ধানের চেষ্টা হইল, কিন্তু সকল নিষ্ফল। মহিমের কোন সংবাদই পাওয়া গেলনা। সুযোগ বুঝিয়া মহিমের খুড়া জেঠা সকলেই পৃথগন্ন হইলেন, সামান্য যা কিছু জমাজমি ছিল, তাহাও উঁহাদের দখলে চলিয়া গেল। বিধবা ক্রমে নিরাশ্রয় হইলেন। প্রতিবেশিনী একটী মেয়ের সাহায্যে মহিমের মাতা সুরেশ বাবুর নিকট পত্র লিখাইলেন। সংবাদ অবগত হইয়া সুরেশ বাবু অবিলম্বে ভগিনীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। জ্ঞাতিবর্গের কবল হইতে ভগিনীর প্রাপ্য এক কপর্দ্দকও আদায় করিতে পারিলেন না।

( ৩ )

তারপর দুঃখে কষ্টে চারিটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে। মহিমের বিচ্ছেদ সকলেই প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। সময়ের অন্তরালে শোক দুঃখ হাসি কান্না সমস্তই সমুদ্রগর্ভে উৎপাদিত ক্ষুদ্র তরঙ্গ রেখার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। সময়ের কুটিলভ্রূকুঞ্চনে কোথায় যে কত শত রাজ্য ঐশ্বর্য্য স্বকীয় শৌর্য্য বীর্য্যের অহঙ্কার ভুলিয়া গিয়া অবলীলাক্রমে ভূমিচুম্বন করিয়াছে, তাহার গণনা কে করে? একদিন গিয়াছে যখন সুরেশবাবুর মানস চক্ষে অমরার সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইত, আকাশ কুসুমেরদিব্য সুরভি আঘ্রাণ কামনায় মনঃ প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। আজ তার সেই দিন নাই। ছাত্রজীবনের নিরাবিল আনন্দ, পরীক্ষা ক্ষেত্রের উন্নত প্রতিষ্ঠা—শতমুখের সহস্র প্রশংসাবাণী সকলই এখন দারিদ্রের নিষ্পেষণে হত প্রাণ হইয়া উঠিয়াছে। বিষয় সম্পত্তি তেমন কিছুই নাই—অথচ সংসারে তার আট দশটী পোষ্য। ইহার উপর বিধবা ভগিনীকে আনিয়া সুরেশবাবু নিজের ইচ্ছায় বোঝার উপর শাকের আটী বাঁধিয়াছেন। মোটাপার্জ্জনের মধ্যে স্কুলের বেতন ও প্রাইভেট টীউসন। সমাজের সর্ব্বনেশে প্রথাকে পুষ্ট করিবার নিমিত্ত এই চারিবৎসরের মধ্যে নিজ পরিবারের তিনটী মেয়ের বিবাহে সুরেশবাবুকে জামাই বাবাজিদের মর্য্যাদা বাবৎ সম্ভাবনার অতিরিক্ত নগদমুদ্রা দক্ষিণাস্বরূপ দিতে হইয়াছে জামাইবাবুদের অভিভাবকগণ সুরেশবাবুকেই নজির স্বরূপ ধরিয়া বরপণ আশাতিরিক্ত চড়াইয়াছিলেন। বিবাহের কালে স্বয়ং সুরেশবাবুরও আটশ টাকা দক্ষিণা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। এখন জামাইদেবতাগণ ও সুতরাং সেই অজুহাৎ দেখাইতে লাগ্ল। এই তিন মেয়ের বিবাহে সুরেশবাবুকে যে অধমর্ণের খাতায় নাম দস্তখত করিতে হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। মা ষষ্ঠীর আশীর্ব্বাদে চারি বৎসরে দুইটী শিশুর মুখ দর্শন হইয়াছে। সরস্বতী ও ষষ্টিদেবীর আশীর্ব্বাদে সঙ্গে সঙ্গে যদি কমলার কৃপাকটাক্ষপাতের সম্ভাবনা থাকিত, তবে কিছুই ভাবনার বিষয় ছিলনা। এখন সুরেশবাবুর ভাবনার বিষয় হইয়াছে—তিনি কি প্রকারে সেই বাদ্ধা [illegible] টাকা খরচ নির্ব্বাহ করিবেন। বিকাল বেলায় নিজে যে একটু জল খাইতেন, অবস্থার সঙ্গে সেই ব্যবস্থাটী দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; বাড়ীতে একটা চাকর ছিল, তাহাকে জবাব দেওয়া হইয়াছে। হাট বাজারের পশরা এখন নিজকেই বহন করিতে হয়। সময় সময় ছেলে পিলেরা সাহায্য করে। বাড়ীতে দুইটী গাভী ছিল, অভাবে পড়িয়া দুইটীই পরিত্যাক্ত হইয়াছে। এখন নগদ মূল্যে সাদাপানি কিনিয়া শিশুদের ক্ষুন্নি বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে হয়।

বিজয়া দশমীর পর দিবস এতদ্দেশের প্রথা অনুসারে রায়বাজারের গদাধর পোদ্দার আসিয়া বাকী কাপড়ের মূল্য বাবৎ চল্লিশ টাকা তের আনার হিসাব সুরেশবাবুর সম্মুখে রাখিল। সুরেশবাবু ফর্দখানা পড়িয়া দেখেন জামাই ষষ্ঠীর কাপড় ও পূজার কাপড় একত্র করিয়া মূল্য শোধ করিতে গেলে তাহার একমাসের বেতনেও কুলায় না। হায়! দরিদ্র শিক্ষকের শিক্ষাচিন্তা বুঝি এই প্রকার শুষ্ক শান্তিতেই শুকাইয়া যায়।

( ৪ )

"জল" বলিয়া এক যুবক অতি কষ্টে শয্যার উপর পাশ ফিরিল। "এই দিচ্ছি" বলিয়া অপর এক যুবক টেবিলের নীচ হইতে এক টুকরা বরফ লইয়া রোগীর মুখে দিল। রোগী ও শুশ্রূষাকারী উভয়েই সমবয়স্ক।

বর্দ্ধমান জেলায় পরাশিয়া নামক স্থানে—পাহাড়ে মাঠের উপর দুইখানা ঘর, মাটির দেয়ালে ঘেরা। একটী বাসগৃহ, অপরটি রান্নাঘর। সেই বাসগৃহের ভিতরে আমাদের পরিচিত মহিমচন্দ্র বাস করে। সে আজ রোগী। শুশ্রূষাকারী তাহারই বন্ধু। মহিম নিকটবর্ত্তী এক কলিয়ারির অংশীদার; বন্ধুটি তাহারই বেতনভুক্ত সহকারী। এত বড় একটা কলিয়ারির মালিক হইয়াও মহিমের বেশী কিছু আড়ম্বর ছিল না। বাসায় এক বিহারী চাকর রান্না-বান্নার আয়োজন করে; রাজবংশীদের ঘড়ের এক বুড়া ঝি, বাহিরের কাজ করিয়া দেয়। অতি কষ্টে এক পাচক ঠাকুর মিলিয়াছিল। সেই ঠাকুরদেবতা আজ তিনদিন হয় বৈশাখ মাসের অগ্নিসম সূর্য্যরশ্মি সহ্য করিতে না পারিয়া সেই নির্জ্জন স্থানটিকে জনহীন করিয়াছেন। পাচকের অভাবে মহিম এবং তাহার বন্ধু উভয়েই পালা করিয়া রন্ধনশালার অগ্নিকার্য্যটি সমাধা করিত

গত রাত্রিতে প্রথম যখন মহিমচন্দ্র জলের মত বমি করে তখন কাহারও মনে কোনরূপ কঠিন রোগ বলিয়া আশঙ্কা হয় নাই কিন্তু দেখিতে দেখিতে তৃতীয় বারের বমির সঙ্গে যখন খুব পাতলা একটা ভেদ হইল অথচ সেই সঙ্গেই মহিমের শরীর এলাইয়া পড়িল তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে কি শক্ত রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। বন্ধুটি প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দূরে এক ডাক্তার আছে—সেও প্রায় তিন মাইল দূর, তাতে আবার এলোপ্যাথি ডাক্তার। সে যাই হউক, বিপদ ঘনাইয়া আসিলে, চিকিৎসকের কুলজি পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। বন্ধুবর চাকরের সাহায্যে ডাক্তারের নিকট শ্লীপ পাঠাইলেন। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী টিপিয়া, মুখ, চোক, বাহ্যি দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ঔষধ আনা হইল, দেওয়া হইল; দিন গেল, রাত্রি গেল, ব্যারামের 'কস্ত হ্রাস নাই। রোগীর তৃষ্ণার বিরাম নাই, ঘন ঘন জল চাহিতেছে। বন্ধুবর কলিয়ারির লোক পাঠাইয়া রাণীগঞ্জ হইতে বরফ সোডাওয়াটার, বেদানা প্রভৃতি আনাইলেন। কলিয়ারীর কুলিগণ একে একে ভাগিতে লাগিল, যাহারাও ছিল, তাহারাও শুশ্রূষা কাকে বলে জানে না। এই ঘোর বিপাকে পড়িয়া উভয় বন্ধুই বিপদাপন্ন।

আজিও আবার ডাক্তার আসিলেন, ঔষধের ব্যবস্থা বদলাইলেন এবং ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন। রোগী আবার একটু বরফ মুখে দিয়া অতি ধীরে বন্ধুকে বলিল "বাড়ীতে কি তবে খবর দিবে?"

বন্ধু উত্তর করিল "নিশ্চয় খবর দেবো, আমিত তোমাকে কতবার বলেছি তোমার মাকে চিঠি দি, তুমি তা কিছুতেই শুন্‌বে না। এখনি আমি টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি।"

অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছিল। মহিম মাঝে মাঝে কথা বলিতেছিল কিন্তু ঠিকভাবে উত্তর দিতে বা পুনঃ প্রশ্ন করিতে পারিতেছিল না। অবস্থা বুঝিয়া বন্ধুটী তাড়াতাড়ি একখানা টেলিগ্রামের ফরম্ পূর্ণ করিলেন এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মনে মনে কি একটা চিন্তা করিয়া ভৃত্য ভগলুর হাতে একটি টাকা ও ফরম্‌খানা দিয়া বলিলেন 'এক দৌড়ে টেলিগ্রাম অফিসে যাবি এবং টেলিগ্রাম বাবুকে এই টাকাটা এবং কাগজটা দিয়ে আস্‌বি। এই আমি মাটিতে আক্ কাট্‌লাম, যত শীগ্‌গির পারিস্ চলে আস্‌বি। আর এই নে তোর বক্‌সিস্।" এই বলিয়া বন্ধুবর ভগলুর হাতে আরও একটা টাকা দিলেন।

তাঁহার মনে আশঙ্কা হইতেছিল কি জানি বিপদের সময় বুঝিয়া যদি এই চাকর বেটাও ফাকী দেয় আরও বলিলেন "শোন্ ভগলু, এই দেখ্ আমার হাতে—টেলিগ্রাম বাবুর নিকট থেকে রসিদ নিয়ে আস্‌লে—এই টাকা বকসিস দেব। যদি তাড়াতাড়ি না আস্‌তে পারিস্ তবে জানিস্ ইতো,—যত টাকা আমাদের নিকট গচ্ছিত রেখেছিস্—তারএক পয়সাও পাবিনে।"

ভৃত্য দৌড়াইল। এদিকে ভগলুকে টেলিগ্রাম অফিসে পাঠাইয়া বিনয় বাবু পায়খানায় গেলেন। পায়খানা হইতে আসিয়া তাহার মাথায় "ভ্রমি" দিল; তাড়াতাড়ি নিজের শয্যায় যাইয়া চাঁদর মুড়ি দিলেন।

এদিকে মহিমের সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত। হঠাৎ একবার বলিয়া উঠিলেন "ভাইরে বিদেশে বিপাকে মারা গেলুম, কেউ জান্‌তে পেলে না। মামাকে একটা টেলিগ্রাম—" আর কথা সরিল না। বিনয় বাবু যে মহিমের অজ্ঞাতসারে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিয়া আসিয়া নিজে শয্যাতল আশ্রয় করিয়াছেন তাহা এখন পর্য্যন্তও মহিমের অজ্ঞাত।

( ৫ )

এদিকে সুরেশবাবু মহা বিপন্ন। বাড়ীতে ইস্তাহার আসিয়াছে। বাড়ীর সংলগ্ন পুকুর এবং আমবাগানটী ঋণের দায়ে রেহাণে আবদ্ধ ছিল, এখন তাহা নিলামে চড়িয়াছে। দাবির টাকা শোধ করিতে না পারিলে দখলীস্বত্ব হস্তান্তরিত হইবে। এতদূর পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়াও আজ কিনা পৈতৃক সম্পত্তিটুকু রক্ষা করিবার শক্তি সুরেশবাবুর নাই! শিক্ষার সঙ্গে নিরাবিল দারিদ্র্যের বন্ধুত্ব বন্ধন কি এতই পাকাপাকি? কবে যে আসিয়া ঋণ রাক্ষসী থানা বাড়া থানা পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসিবে সুরেশবাবু এখন শুধু সেই চিন্তাই করেন।

ওদিকে বিধবা ভগিনীর নিরুদ্দিষ্ট পুত্র মহিম চন্দ্রের

পৈতৃক সম্পত্তির অংশে যাহা যাহা প্রাপ্য, তৎ সমস্তই অপরাপর সরিকের জালিয়াতি কবুলিয়াতে লিপিবদ্ধ হইয়া তাঁহাদেরই ভোগ দখলে আসিতেছে।

সরিকে সরিকে লাঠালাঠি বিবাদের ফলে ফৌজদারী মোকদ্দমায় উহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই অজস্র টাকা জলের মত ব্যয় হইয়াছে।

ফৌজদারী ও আদালত প্রভৃতির নালিশ বিবাদ একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি। একটায় একবার পাইয়া বসিলে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা আসিয়া জুটিয়া বসে। এই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মহিমচন্দ্রের বৈরিপক্ষ সমস্তই দেউলিয়া প্রায়। বাকী খাজনার দরুণ ষোল আনা সম্পত্তি নীলামে উঠিয়াছে। সুরেশ বাবু উকীলের বাটিতে হাটাহাটি করিয়া বহু তদবিরের পর জানিতে পারিলেন—কিস্তির ভিতর ষোল আনা সম্পত্তির রাজস্ব দাখিল করিতে না পারিলে মহিমের অংশটুকুও থাকিবে না চিন্তায় ভাবনায় মহিমের মার ঘুম নাই।

ঠিক এমনি সময় সুরেশ বাবুর হাতে টেলিগ্রাম আসিল—"আপনার ভাগিনেয় মহিমচন্দ্র পরাশিয়া কুলিয়ারীতে কলেরায় আক্রান্ত; শীঘ্র আসুন।"

সংবাদ শুনিয়া মহিমের মা মূর্চ্ছিতা হইলেন। সুরেশ বাবু সকল বিপদ পদে ঠেলিয়া তাড়াতাড়ি বৰ্দ্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অণ্ডাল জংশনে গাড়ী বদলাইয়া অতি কষ্টে পরাশিয়া পৌছিয়া দেখেন দুই শয্যায় দুই রোগী আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। একটি চাকর মাত্র ঘরের বাহিরে বসিয়া আছে। এই বিপদের কালেও ভৃত্য ভগলু নিমকহারাম হয় নাই।

রোগীদের কাহারও সংজ্ঞা নাই, বেলা প্রায় অতীত, আজ আর ডাক্তার বাবুর পদার্পণ হয় নাই: কল না হইলে কোন্ ডাক্তারইবা পুরাতন রোগীকে স্বেচ্ছায় দেখিতে আসেন? রোগী ও ডাক্তারের সম্পর্কটাই যে টাকার উপর। উপযুক্ত ঔষধ এবং ব্যবস্থা দিতে জানেন এই কথা কয়জন চিকিৎসক বুকে টোকা দিয়া বলিতে পারিবেন? বিশেষতঃ এই ক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেবের হোমিওপ্যাথি কোন কাজেই আসিতে ছিলনা, তাই ডাক্তার সাহেবের মনে সামান্য একটু সঙ্কোচের কারণও বিদ্যমান ছিল।

সুরেশ বাবু আসিয়া স্নানাহার ভুলিয়া ভৃত্য ভগলুর সাহায্যে রোগীদের শুশ্রূষায় লাগিয়া গেলেন। উভয় রোগীরই কাপড় বদলাইলেন এবং যথাসম্ভব নূতন শয্যা পাতিয়া দিলেন কলেরার খবর পাইয়া তিনি নিজের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ শয্যা আনিয়াছিলেন, তাহাই এখন কাজে লাগাইলেন। ভৃত্য ভগলু প্রভুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে। পুরস্কারের টাকা সে তাড়ি খাইয়া উড়াইয়া দেয় নাই। প্রভুদের সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া সে ঐ পাঁচ টাকা হইতে বরফ, সোডা, বেদানা কমলা প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়া রোগীদিগকে দিতেছিল।

রমেশ বাবু বাড়ীতে থাকাকালে নিজে ও সামান্যভাবে হোমিওপ্যাথির আলোচনা এবং চিকিৎসা করিতেন। তাহার সুচিকিৎসারও বহুরোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। তিনি নিজের সঙ্গে সেই ঔষধের বাক্সটী লইয়া আসিয়াছিলেন অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তিনি উভয় রোগীকে নিজেই চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই তিনদিন চলিয়াগেল।

কিন্তু চিকিৎসকের উপর ও অপর এক মহাচিকিৎসক বর্ত্তমান আছেন। যাহার ব্যবস্থা যোগী, ঋষি সাধু, সন্ন্যাসী, মুণি, তপস্বী, গৃহস্থ, বনবাসী সকলকেই মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে হয়, ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে বিনয় বাবুর গণান দিবস ফুরাইয়া আসিতেছিল। চতুর্থ দিবস রাত্রি আটটা কালে বিদেশের বিজন প্রদেশে বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিনের তরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

মহিমের অবস্থা পূৰ্ব্ববৎ; সুরেশ বাবু নিজে ঔষধ দিয়াও পার্শ্ববর্ত্তী কলিয়ারিতে ডাক্তারের জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত ডাক্তারের অপেক্ষা করিয়া তিনি কাহাকে ও সেইস্থানে দেখিতে পাইলেন না। আশেপাশে আরও দুই একজনের কলেরা দেখা দিয়াছে। পরাশিয়ার সেই কলিয়ারী এখন আর ভোর বিকালে কুলিদের কল কোলাহলে মুখরিত হয় না। একে একে সকলই সরিয়া পড়িয়াছে। দুই তিন মাইল দূরে কলেরার প্রকোপ আরও বেশী, কাজেই ডাক্তার মিলান দুর্ঘট। একমাত্র

তগলুকে সম্বল করিয়া সুরেশ বাবু সেই নির্জ্জন রাজ্যের অষ্টপ্রহর পাহাড়ায় নিযুক্ত। রাত্রি দশটার সময় মহিমের সামান্য জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন সমস্ত শয্যা প্রস্রাবে ভিজিয়া গিয়াছে। অবস্থা ভাবিয়া সুরেশ বাবুর শুষ্কপ্রাণে জলের সঞ্চার হইল। ভগবান বুঝি প্রসন্ন হইলেন।

* * *

সাতদিন পর মহিমের অন্নপথ্য হইল। তারপর সুরেশ বাবু মহিমকে দেশে লইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন। মহিমচন্দ্র মাতুলের চরণে প্রণত হইয়া বলিল "আমি কয়েক দিন মধুপুরে থাকিব, দেশেগেলে শরীর সুধরাইবে না; বৈদ্যনাথ, মধুপুর, প্রভৃতি স্থান গুলিতে কিছুকাল থেকে তারপর বাড়ীতে আস্‌ব। কেউ যেন কোন চিন্তা না করেন। মাকে আমার প্রণাম দিবেন। আপনারও স্কুল কামাই হচ্ছে।..."

সুরেশ বাবু ভাগিনেয়ের প্রকৃতি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, কাজেই কোন উত্তর করিলেন না। ষ্টেশনে আসিয়া মহিমচন্দ্র মাতাকে টীকেট করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন এবং একটী ক্ষুদ্র ক্যাসবাক্স হাতে দিয়া বলিলেন "মাকে দিবেন।" আমি শরীর একটু সুধরাইলেই বাড়ী চলে' যাব।"

( ৬ )

বাড়ীতে পৌঁছিয়া সুরেশ বাবু মহিমের খবর জানাইলেন। এবং তাহার প্রদত্ত বাক্সটী তাহার মাতার হস্তে অর্পণ করিলেন।

মহিমের মা ভ্রাতার হস্তে তাহা ফিরাইয়া দিয়া খুলিয়া দেখিতে বলিলেন। বাক্স খুলিয়া দেখিয়া সুরেশ বাবু বিস্মিত হইলেন। বাক্সে তিনি পাইলেন একতাড়া নোট, কয়েকখানা পাস বই ও একখানা চিঠি। তিনি মনকে সংযত করিয়া মাতার নিকট লিখিত পুত্রের চিঠি খানাই অগ্রে পাঠ করিলেন।

মহিম লিখিয়াছে—"তোমার অকৃতী সন্তান তোমাকে বহু জ্বালাতন করিয়াছে। আরও কত নির্য্যাতন অদৃষ্টে আছে, তাহা কে বলিতে পারে। আমার শারীরিক অবস্থা মাতুল মহাশয়ের নিকট জানিবে। আমি এখন কতককাল দেশে দেশে ঘুরিব মনে করিয়াছি। কলিয়ারীর একটা বন্দোবস্ত করিয়া আমি একবার ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির মোহন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার শ্রীচরণ প্রধান তীর্থ। তাহা যে আবার কবে, দেখিব নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না। ক্যাসবাক্সটীর ভিতরে দশ হাজার টাকা আছে সমস্ত টাকা আমার ভাগ্য বিধাতা মাতুল মহাশয়ের প্রাপ্য। আমি উহার এক কপর্দ্দকের ও মালিক নই। তবে আমার একটু নিজস্ব অভিমত এই—ঐ টাকা হইতে এক হাজার টাকা যেন আমার বন্ধু বিনয় ভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের জন্য পরিবারবর্গকে দেওয়া হয়। মাতুল মহাশয় উহার ঠিকানা জানেন। এই ক্ষুদ্র দান তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পুরস্কার। বাকী নয় হাজার টাকা মাতুল মহাশয়ের স্নেহ শাসনের অকিঞ্চিৎকর প্রতিদান।

* * * *

মহিমের মাতা ও সুরেশ বাবু ভিন্ন এই সংবাদটি অপর কাহারও কর্ণগোচর হইল না। তারপর যখন বিপদে ধীর সুরেশ বাবু ধীরে ধীরে নিজের বাগান বাড়ী ও পুকুর এবং মহিমের মাতার নামায় নাবালকের সম্পত্তি উদ্ধার করিলেন অথচ মহিমের জ্ঞাতিবন্ধুদের অংশীভূত অপর কতক খণ্ড সম্পত্তিও নীলামের দায় হইতে রক্ষা করিয়া মহিমের বিপক্ষাচারী খুড়া জেঠাদিগকে মহিমের মাতার মুখাপেক্ষী করিয়া তুলিলেন তখন ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে বর্দ্ধমানের মাটি খুঁড়িয়া মহিমচন্দ্র ভাগ্যবলে সাতরাজার ধনের অধিকারী হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

## গ্রন্থ সমালোচনা।

**'বঙ্কিমচন্দ্র'।** অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম্ এ, প্রণীত। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। এই পুস্তকে গ্রন্থকার বঙ্কিমের জীবন, তৎকালিক সমাজ ও তদীয় গ্রন্থ সকলের সমালোচনা করিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে English men of letters series এর পুস্তকগুলি যেভাবে এবং যে উদ্দেশ্যে লিখিত এই বইখানিও সেইভাবে ও সেই উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর পুস্তকের বড়ই অভাব। এদেশের

সাহিত্যিকগণ মানুষের জীবন চরিত্রের কোন প্রয়োজন আছে তাহা কোন কালেই মনে করেন নাই। মনে করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভাবান লেখকের একখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবন চরিত প্রণীত হইত। যে বঙ্কিমচন্দ্র "কাব্য অপেক্ষা কবিকে বুঝিয়া অধিকতর লাভ" লিখিয়াছিলেন তিনি ও একটী সংক্ষিপ্ত আত্মজীবন চরিত কিম্বা একখানি ডায়েরী পর্য্যন্ত রাখিয়া যান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকালে তাঁহার অনেক অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধু এবং আত্মীয় জীবিত ছিলেন। তাঁহারা তখন ইচ্ছা করিলে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু সে কর্ত্তব্য তাঁহারা পালন করেন নাই। ইংরেজী সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই লেখক ছোট হউক বড় হউক সকলের জীবন চরিত আছে। বাঙ্গলা সাহিত্য এ বিষয়ে বড় দরিদ্র বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বিতীয় সাহিত্যিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেক বিখ্যাত উপন্যাসিক আছেন, অনেক প্রতিভাশালী কবি আছেন, অনেক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সমালোচক ও ঐতিহাসিক আছেন কিন্তু বঙ্কিমের ন্যায় একাধারে এই সকল শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি জগতের সকল সাহিত্যেই দুর্লভ। বঙ্কিম বাঙ্গালা জাতিকে অসামান্য শক্তিশালিনী ভাষা দিয়া গিয়াছেন। আজ যে ভাষায় গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, সংবাদ পত্রিকা ও মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে, সভায় বক্তৃতা হইতেছে সেই ভাষার স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। উপন্যাসে বঙ্কিম একচ্ছত্র সম্রাট। তিনি ঐতিহাসিহাসিক ও প্রথম পথ প্রদর্শক। সমালোচনায় তাহার অসামান্য সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয় বাবু তাহার পুস্তকে এই সকল কথাই ধারা বাহিকরূপে সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন। অক্ষয়বাবু বিজ্ঞ ও রসগ্রাহী। তিনি কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ প্রভৃতি গ্রন্থের চরিত্র বিশ্লেষণে যথার্থ সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সংক্ষেপে বঙ্কিম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথাই এই পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে। মাসিক পত্রিকায় বঙ্কিমের সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহাও এই গ্রন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ইংরেজীতে Hutton's life of Scott যেমন মনোহর এই পুস্তকখানিও তদ্রূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে অক্ষয়বাবু বঙ্কিমের উপন্যাস সকলের চরিত্র বিশ্লেষণে অধিকতর স্থান প্রদান করিবেন। আর একটী কথা এই পুস্তকের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে "ধর্ম্মব্যাখ্যা" বিষয়ে বঙ্কিম ও জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজের অধ্যাপক পরলোকগত মিঃ হেষ্টি মহাশয়ের সহিত প্রতিমা পূজা উপলক্ষে যে লড়াই হইয়াছিল তৎসম্পর্কে অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন,—"এই অধ্যাপক পুঙ্গবের বক্রক্রীড়া করিবার সখ অত্যন্ত বলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজের শৃঙ্গের দৃঢ়তা যতটা অপরিমেয় মনে করিয়াছিলেন কার্য্যতঃ দেখিলেন ততটা নয়।" অধ্যাপকদিগের শৃঙ্গ থাকে তাহা আমাদের জানা নাই। ঢাকা কলেজের অক্ষয়বাবু একদিন অধ্যাপক ছিলেন। আমরা আমাদের কোন পরিচিত বা অপরিচিত অধ্যাপকের শৃঙ্গ দেখি নাই। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে অক্ষয়বাবু এই অপবাদ দূর করিবেন। আমরা জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজের পুরাতন অধ্যাপকদিগের মুখে মিঃ হেষ্টির অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়াছি। মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পর এইরূপ উক্তি সুরুচি সঙ্গত নয়। অক্ষয়বাবুর মত বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেতো নহেই। এই পুস্তক খানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই এই দোষটী গ্রন্থকারকে দেখাইয়া দেওয়া সঙ্গত বোধ করিলাম।

শ্রীহিতব্রত।

## সাহিত্য সংবাদ।

বাঙ্গালার কথা নামক দৈনিক পত্রিকা খানা আপাততঃ বাহির হইবে না।

বাবু যামিনীমোহন ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী নামে একখানা ইংরেজী ইতিহাস গ্রন্থ বাহির হইয়াছে।

### প্রবাসের চিত্র।

চৈত্রমাসে বাঙ্গালার কুমারী কন্যারা। "উত্তম ব্রত" করিয়া সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়া থাকে এই সংখ্যায় প্রদত্ত সন্ধ্যা প্রদীপ চিত্র খানাতে চিত্র শিল্পী সেই ভাবটীই প্রকাশ করিয়াছেন।

আশা-পথে

শিল্পী—
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ
মজুমদার।
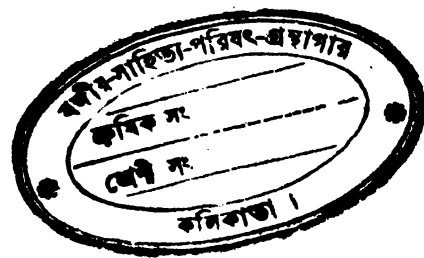
# সৌরভ

একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩৩০ সন। | চতুর্থ সংখ্যা।

## লোক মত।

সংসারে মানুষ কেবলমাত্র সত্যের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ সাধ্য নহে। বস্তুতঃ বহু মহানুভব ব্যক্তি এ প্রশ্নের সুমীমাংসার প্রয়াস করিয়াছেন। লোকমত সত্যোপলব্ধির সহায়ক কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজসাধ্য না হইলেও করা যাইতে পারে।

অনেকের মতে লোকমতই সত্যের রূপান্তর মাত্র। ভগবানের বাণী প্রকারান্তরে মানবের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায়, মানুষ যখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে একই মত পোষণ করে, তখন ইহা ভগবানের আদেশ বলিয়া মানিয়া লইতে কাহারো কাহারো মতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ হয় না। সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে লোকমতই সত্যের রূপান্তর মাত্র।

কিন্তু, জগতের ইতিহাসে বিপ্লবের পর বিপ্লবের কাহিনী আসিয়া এমনইভাবে মানবহৃদয়ে আঘাত করিয়াছে যে লোকমতের উপর অনেককেই বহুবার আস্থা সম্পূর্ণ ভাবে হারাইতে হইয়াছে; মহামতি Burke এর মত বিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিকেও প্রথমতঃ French Revolution এর পক্ষ সমর্থন করিয়া পরিশেষে লোকমতের বিরুদ্ধে যাইয়াও সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতের প্রচার করিতে হইয়াছে। লোকমত সময় সময় অত্যন্ত ন্যায্য এবং আবশ্যক বোধ হইলেও লোকমতের অপবাদ বহু ক্ষেত্রে এতই অন্যায় এবং অসম্ভব হইয়া উঠে যে তখন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ইহার উপর সমুদয় আস্থা হারাইয়া ফেলেন। মিলটন সেক্সপীয়ার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণ লোকমতকে "Hydra headed monster" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লোক মতের অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তাই যে ইহার উপর আস্থা হারাণের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

লোকমত এতাদৃশ দ্বিভাব সম্পন্ন হইলেও বহু লোকেই ইহাকে সত্যের রূপান্তর বলিয়া মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদের মতে আপাততঃ বিরুদ্ধ ভাব সম্পন্ন হইলেও উভয়ভাবেরই সমর্থন করা যাইতে পারে। আজ যাহার প্রয়োজন, কালই হয়ত তাহার আবশ্যকতা নাও থাকিতে পারে। কাজেই লোকমত আজই কোনও এক ভাবের জন্য পীড়ন করিয়া কালই অন্য ভাবের জন্য উৎপীড়ন করিলেও তাহা সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে, ইহা না ভাবিলেও চলে। কিন্তু লোকমত সত্যাশ্রয় করিয়াই যে সকল সময় দাবী করে, তাহা যথার্থ নহে। কবি শ্রেষ্ঠ সেক্সপীয়ার তাহার 'জুলিয়স সিজর' পুস্তকে তাহা বিস্তৃতভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

অনেকেরই মতে, সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র, সুতরাং ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য, সমাজের বেলায় তাহাই সত্য। ব্যক্তির স্বভাব আলোচনার ফলে জানা যায় যে কতকগুলি সত্য প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। এই সত্যগুলিকে আমরা **পারমার্থিক সত্য** নাম দিতে পারি। রাজনীতি কিম্বা সমাজ নীতিতে যে প্রকারের সত্য লইয়া আমরা সাধারণতঃ আলোচনা করিয়া থাকি, সেইগুলি এই শ্রেণীর নহে, সে গুলিকে আমরা **ব্যবহারিক সত্য** নাম দিব। এই ব্যবহারিক সত্য গুলিই ব্যক্তি বিশেষের নিকট প্রকার ভেদে প্রকাশ পায়। এই সত্য উপলব্ধির বেলায় প্রাক্তন, সামাজিক শক্তি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির স্রোত, ব্যক্তির

উপর ক্রিয়া করে, ফলে সত্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। সুতরাং ব্যবহারিক সত্যের ব্যক্তি-ভেদে রূপের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। লোকমত এ ক্ষেত্রে সকল সময় এক হইতে না ও পারে। প্রায়ই ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সত্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য না রাখার ফলে লোকমত যখন যাহা দাবী করে তখন সেইটাই চরম সত্য ইহাই মানিয়া লইতে হয়। ব্যবহারিক সত্যকেও পারমার্থিকের স্থান দিতে হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি কোনও কারণে দশের উপর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, সেই লোকমতের স্রোত পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ইচ্ছানুসারেই করিতে পারে। বস্তুতঃ লোকমত ব্যক্তি বিশেষ দ্বারাই গঠিত হয়। এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, লোকমত ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা চালিত হয় ইহাও ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব হেতু নয়—কিন্তু সেই ব্যক্তি লোকমত স্পষ্ট এবং সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারে বলিয়াই লোকমত তাহার অনুমোদন করে। কিন্তু, ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে অনেক সময়ই সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষ দশের হাতে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হইয়াছেন। আজ লোকমত তাদৃশ মহাপুরুষকে অবহেলা করিলেও তাহার পরবর্ত্তী যুগে লোকমত তাঁহারই স্মৃতির পূজা করিয়াছে—জগতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। জীবিতকালে দশজনের পূজ্য হইলেও মৃত্যুর পর তাহার শবদেহকে জনসঙ্ঘ পদাঘাত করিয়া সুখানুভব করিয়াছে, এ দৃশ্যও জগতের ইতিহাসে বহুবার পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে Cromwell ও Charles এর সময় ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ লোকমত এমনই অনিশ্চিত এবং উচ্ছৃঙ্খল যে আজ যাহাকে স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবে কালই হয়ত তাহাকে নরকের কীট বলিয়া প্রমাণিত করিবে। দৃষ্টান্ত খুঁজিলে বর্ত্তমান জগতেও বহুল পরিমাণেই পাওয়া যায়। ফলতঃ নেতৃত্ব বিহীন লোকমত বড়ই ভয়ঙ্কর এবং উদ্দাম হইয়া দাঁড়ায়। ইহাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য—প্রায় ক্ষেত্রেই লোকমতের নেতা নেতৃত্ব হারাইয়া ফেলেন—কারণ, জনমতের বিরুদ্ধে যাইয়া জনমত চালনের ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই বিদ্যমান থাকে। ফলে হয় এই যে, যে কোন লোক লোক-নায়ক হইয়া অবশেষে নেতৃত্ব হারাইয়া লোক সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন।

মোটকথা আমাদের এই মনে হয় যে, সমাজে কিম্বা রাজনীতিতে লোকমতের একান্ত আবশ্যকতা থাকিলেও লোকমত সত্য আশ্রয় করিয়া সকল সময়ই চলে—ইহা স্বীকার করা যায় না। অধিকন্তু নেতৃত্ব বিহীন লোকমত সর্ব্বদাই ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস্য। ফলকথা আমাদের মনে হয়, লোকমত সত্যোপলব্ধির সহায়ক অনেক সময়ই হয় না এবং নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ইহার উপর আস্থা স্থাপন করা চলে না।

মানুষ Expediencyর খাতিরে অনেক সময় লোকমতের উপর নির্ভর করে। যে সকল বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণ স্থির চিত্ত নহে, অথবা যে সকল বিষয়ের সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে মানুষ যথাযথ বুঝিয়া উঠিতে পারে না—তখন লোকমতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু, ইহা ভুলিলে চলিবে না যে লোকমত সত্য পথেই চালিত করিবে ইহার কোনও স্থিরতা নাই।

ফলকথা সময় সময় লোকমত খুবই ন্যায়সঙ্গত পথে পরিচালিত হয় এবং ইহাদ্বারা পরিচালিত হওয়া ক্ষেত্র বিশেষ এবং সময় বিশেষে নিরাপদও সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকমতই সকল ক্ষেত্রে চরম সত্য এবং উৎকৃষ্ট পন্থা, ইহা কখনও স্বীকার্য্য নহে। লোকমতের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে গীতোক্ত ভগবাণীই চরম কথা—লোকমত চালনের জন্যই অবতারের প্রয়োজন।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।
( মহারাজা সুসঙ্গ )

---

## কর্ম্মফল

রজত পালঙ্কে শুয়ে দুখে নরপতি,
ছট্‌ফট্ করিতেছে রোগ-যন্ত্রণায়!
ব্যাকুল হয়েছে ভেবে কি যে হবে গতি!
থেকে থেকে আর্ত্তনাদ করিতেছে, হায়!
পুত্র কন্যা পরিবার দাস দাসী আদি,
সেবায় নিযুক্ত সদা, তবু শান্তি নাই!
গুপ্ত যত অপকর্ম্ম আমন্ত্রিত ব্যাধি
কেঁদে বলে, "দেহে বুঝি ঠাঁই নাহি পাই!"
কর্ম্মফল কহে রোষে, "আমি দেবো স্থান!
ডেকে এনে কার সাধ্য করে অপমান!"

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

# বালী দ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ।

হিন্দু জাতি যে একদিন জলধি-প্রাচীর অতিক্রম করিয়া আপনার সভ্যতা ও ধর্ম্ম দিক্ দেশে প্রচার করিতে বাহির হইয়াছিলেন, আজিকার হিন্দু জাতির নিকট তাহা স্বপ্নের অসম্ভব-কল্পনা-কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের নাগপাশ-বন্ধন আজ হিন্দুকে গণ্ডিবদ্ধ কূপ মণ্ডুক করিলেও এক দিন যে হিন্দুজাতি নিতান্তই আবেষ্টনাবদ্ধ মন্ত্র মুগ্ধ জাতি ছিল না, জগতের ইতিহাস হইতে আজও সে তত্ত্ব মুছিয়া যায় নাই। তাই স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্র নাথ ব্যঙ্গ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

হিন্দু যবে সিন্ধু তরি দখল কল্লে যব দ্বীপ,
কোথায় ছিলেন ভট্টপল্লি, কোথায় ছিলেন নবদ্বীপ ?

ভারতীয় হিন্দুগণ একদিন যে লবনাম্বু অতিক্রম করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ বেদের অপৌরুষেয় উক্তিতে যেমন উজ্জল হইয়া রহিয়াছে, ভারত সমুদ্রের বক্ষস্থিত যাভা, বালী, লম্বক প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে ও তেমনি প্রত্যক্ষ ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আজ আমরা সেই বালীদ্বীপের হিন্দুরাজত্বেরকথাই বলিব। ভারত মহাসাগরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত অগণিত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যব দ্বীপের পূর্ব্বদিকে যে দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপ,তাহারই একটীর নাম বালী আর একটীর নাম লম্বক। এই উভয় দ্বীপই বর্ত্তমান সময়ও হিন্দু রাজার রাজ্য বলিয়া পরিচিত। অথচ ভারতবর্ষের বিশাল হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত এই স্বজাতীয় সমাজের কোন তত্ত্ব সংগ্রহের অনুমাত্রও আবশ্যকতা অনুভব হয় নাই। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে ?

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদ ও ভ্রমণকারিগণ ইহাদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছেন, সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক—সম্মানেরই হউক, আর অসম্মানেরই হউক—তাহাই জগতে প্রচারিত হইয়া হিন্দু জাতির সভ্যতা বিস্তৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরাও সেই সকল বিবরণ হইতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

বালী দ্বীপ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহার পরিমাণ ফল ২২৪০ বর্গমাইল, বাঙ্গালার একটী ছোট জেলার ন্যায়। দ্বীপটী শাসন সম্পর্কে একদিন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; এক ভাগ ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন,অপর ভাগ দেশীয় হিন্দু নৃপতিদিগের অধীন।

বালীর অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু; বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অতি সামান্য। বালী হিন্দু অধিবাসীদিগের আদিম নিবাস নহে। মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তৃতির সময় ভারতবর্ষের ন্যায় যাভার হিন্দু রাজ্যের উপরও মুসলমান আক্রমণ বিস্তৃত হইয়াছিল। এই আক্রমণে যবদ্বীপের হিন্দুগণ—যাহারা বিধর্ম্মীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন, তাহারা যব দ্বীপে রহিলেন; যাহারা পারিলেন না, তাহারা দ্বীপান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

এই বিপ্লবে যবদ্বীপের হিন্দু নৃপতি বহুবাহু বহু অনুচর সমবিভ্যাহারে যব দ্বীপ ত্যাগ করেন এবং বালী দ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। বহুবাহুই বালী দ্বীপের প্রথম হিন্দু রাজা।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে যেমন বর্ণ ও জাতি বিভাগ আছে, বালী দ্বীপের হিন্দু সমাজেও তেমনি ব্রাহ্মণ, সত্রিয়, বিষিয়, ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ আছে। ভারতবর্ষের ন্যায় সেখানেও সাম্প্রদায়িক হিসাবে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অধিক। বৈদিক ধর্ম্ম এবং বৈদিক আচার ব্যবহার অনেক স্থলেই সেখানে আচরিত হইয়া থাকে।

বালীর হিন্দুগণ শৈব মন্ত্রে দিক্ষিত। কালী, দুর্গা, প্রভৃতির পূজার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বটে কিন্তু শিব মূর্ত্তির পূজাই অধিক হইয়া থাকে। বলি দানের প্রথাও সেখানে প্রচলিত আছে।

দেব দেবীর মূর্ত্তি পূজা বৈশ্য ( বিষিয় ) ও শূদ্রেরা নিজে নিজে করিয়া থাকেন। শিব পূজায় 'ওঙ্গ শিব চতুর্ভুজ' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করা হয়। ব্রাহ্মণগণ সাকার মূর্ত্তির পূজা করেন না। বৈদিক অনুষ্ঠানে যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দীর্ঘ শিখা আছে কিন্তু যজ্ঞোপবিত নাই। ইহা প্রাচীন ভারতের বৈদিক রীতি। বালীর হিন্দু ব্রাহ্মণগণ সেই রীতিরই অনুসরণ করেন।

এই চারি বর্ণের লোক ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর লোক এ চারি বর্ণের অস্পৃশ্য। ঐ অস্পৃশ্যদিগকে সাধারণতঃ চণ্ডাল বলা হয়। চর্ম্মকার, কুম্ভকার, রজক, শুঁড়ী প্রভৃতি এই অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের বাসস্থান গ্রামের বাহিরে কোন এক দিকে। এই প্রথা ভারতীয় হিন্দু সমাজের পূর্ব্ব উপকূলের মলয় মারুত প্রবাহের ফল-অনুমান করা—বোধ হয় অসমীচীন নহে।

বহু বিবাহ প্রথা এখানে বড়ই প্রচলিত। "উষণাবলী" নামক বালীর একখানা প্রাচীন গ্রন্থে নাকি লিখিত আছে যে কালিমন ( কালীমোহন ? ) নামক এক রাজার প্রপিতামহের পাঁচশত বিবাহিতা রাণী ছিল। অধুনা তথাকার অনেক বড় লোক ১৮।২০টা বিবাহ করিয়া থাকেন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে রাজা দশরথ ৩৫০ বিবাহ করিয়াছিলেন; ১৮।২০টী দার পরিগ্রহ প্রথাতো সেদিন মাত্র বন্ধ হইয়াছে। আমাদের মনে হয় ভোগ-বিলাসের প্রাবল্য ও আর্থিক স্বচ্ছন্দতাই এইরূপ উশৃঙ্খল সমাজ রীতির প্রশ্রয় দান করিয়া থাকে।

বালীদ্বীপে স্বজাতীয় বিবাহই ধর্ম্মানুমোদিত। তবে উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিরা নিম্ন বর্ণসমূহ হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। এই অনুলোম রীতি হিন্দু ভারতের প্রাচীন রীতি। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীতে কন্যা প্রদান করিতে কেহ সহজে সম্মত হন না। এই প্রতিলোম বিধি প্রাচীন ভারতীয় সমাজে একদিন প্রচলিত থাকিলেও ক্রমে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এখানে প্রতিলোমজ সন্তান বর্ণ সঙ্কর বলিয়া গণ্য হয়।

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে এখানে বাছ বিচার নাই। বলিতে কি হিন্দু অধিবাসীগণও গোমাংস গ্রহণ করিয়া থাকেন; কুক্কুট ও বরাহ তাহাদের অতি প্রিয় খাদ্য। বোধ হয় প্রথম দুটা মুসলমান জাতির সংস্পর্শে ও শেষ নিষিদ্ধটী ইউরোপীয় জাতির সংস্পর্শে প্রাপ্ত অভ্যাসের নিদর্শন। বালীর ব্রাহ্মণেরা কিন্তু একেবারে নিরামিষাসী। উচ্চ শ্রেণীর ফলমূলাহারী সাধু সজ্জন গৃহস্থেরও এখানে অভাব নাই।

মৃতদেহ এখানে অগ্নি সংযোগে দাহ করা হয়। রাজাদিগের সৎকার খুব ধূমধামে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। মৃত দেহটী এক মাস কাল পর্য্যন্ত তৈল সংযোগে রাখা হয়। ইহাও ভারতীয় প্রাচীন প্রথা; রাজা দশরথের দেহ রক্ষার ব্যবস্থাই বোধ হয় বালী দ্বীপে অনুসৃত হইয়া থাকে।

সতীদাহ প্রথা বালী-সমাজের একটা পুণ্যময় প্রথা। এই প্রথাকে তাহারা 'সত্য' বলে। এই উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। রাজাই হউক, প্রজাই হউক, কাহারও মৃতদেহ বাড়ী হইতে—বাড়ীর রাস্তা দিয়া বাহির করা তাহারা দোষণীয় বলিয়া মনে করে, এইজন্য রাজরাজরাদের মৃতদেহ বাড়ীর দেওয়াল টপকাইয়া বহির্গত করা হয়।
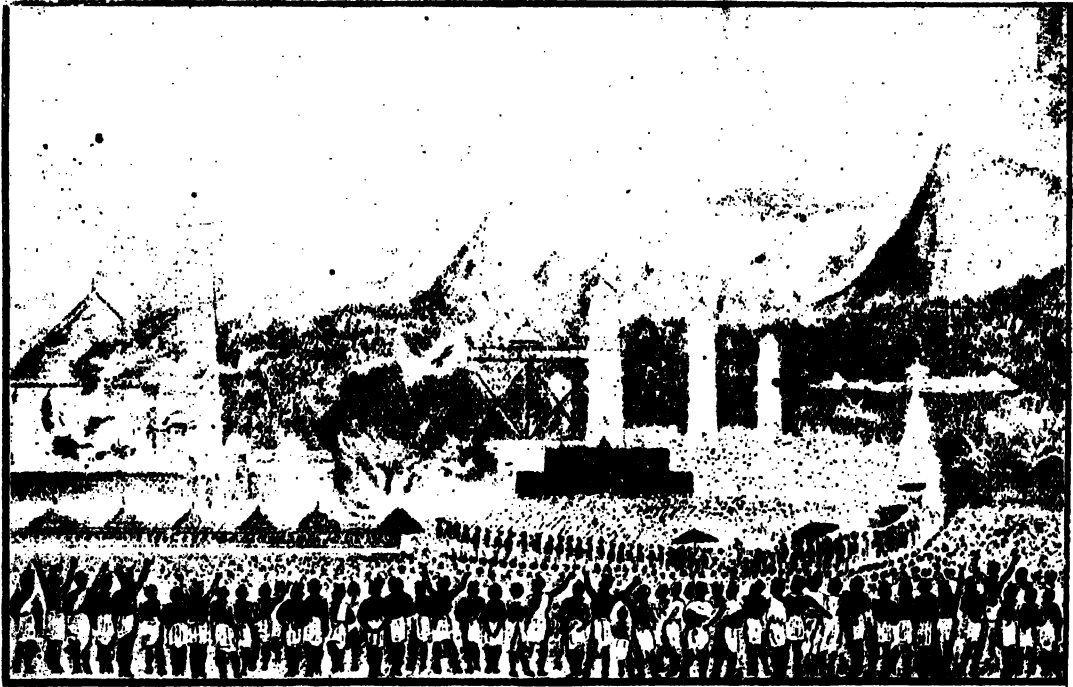
বালী দ্বীপের হিন্দু রাজার শবদাহ ও সতীদাহ চিত্র।

রাজাদের মৃতদেহের সহিত তাহাদের অসংখ্য পত্নীগণ চিতায় প্রবেশ করিয়া থাকেন; সে দৃশ্য দেখিবার জন্য কিরূপ লোক সমাগম হয়, এই চিত্রখানা দেখিয়া তাহা অনুমান করিতে পারিবে। ইহা সতীদাহের একখানা চিত্র। উচ্চ চূড়া বিশিষ্ট যে স্তম্ভগুলি দেখা যাইতেছে তাহাদিগকে 'বদি' বলে। এক একটী বদি ১১ তলা। এই বদীর উপরে

তুলিয়া রাজারাণীদের মৃতদেহ শ্মশানে আনয়ন করা হয় এবং তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে বিরাট শোভাযাত্রা চলিয়া থাকে। চিত্রের বামদিকে যে ঘর দেখা যাইতেছে ঐ কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহে মৃতদেহ রাখিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করা হয়।

সতীদাহের ন্যায় আরও অনেক ভারতীয় হিন্দুর সংস্কার প্রথা বালীদ্বীপে প্রচলিত আছে।

এখানে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা—প্রিয় বস্তু ত্যাগ, অজ্ঞাতবাস, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন প্রভৃতি। এগুলিও ভারতীয় হিন্দু বিধি। এখানকার সমাজ শাসন অনেকটা নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইলেও তাহা অত্যন্ত কঠোর। চোরের শাস্তি প্রাণদণ্ড। পরদার গামীকে ভ্রষ্টাসহ সমুদ্রে নিক্ষেপ বিধি। ইহা কার্য্যতঃই সম্পাদন করা হয়। রাজার আদেশ—রাজ্যে অসতী থাকিতে পারিবে না। এই বিধিটী সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন—এই প্রাচীন বিধিটী এখনও এমন ভাবে চলিত আছে যে তাহা প্রতিপালিত হইতে কোন শক্তিই প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করিতে পারে না। সেদিন একটা ইউরোপীয় বণিক একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। রাজার জল্লাদ আসিয়া তাঁহার গৃহে ঐ স্ত্রীলোকটীর শিরশ্ছেদ করিয়া গেল।

অবশ্য সে দিন আর এখন নাই।

বালীদ্বীপের লিখিত ভাষা দুই প্রকারের। এক "সংস্কৃত ভাষা" দ্বিতীয় "কবিভাষা"। শাস্ত্রাদি গ্রন্থ সমুদয় সংস্কৃত ভাষায়ই রচিত। বাঙ্গালা ভাষায় যেমন গদ্য ও পদ্য দুই রীতি প্রচলিত বালীদ্বীপের কবিভাষাও তদ্রূপ গদ্য ও পদ্য দ্বিবিধ আকারে বিদ্যমান আছে। শাস্ত্রাদি গ্রন্থ সমুদয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইলেও আমরা যেমন সাহিত্যালোচনায় আমাদের বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি, বালীদ্বীপ বাসীরাও তদ্রূপ সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাতে কবি ভাষাই (মাতৃভাষা ?) প্রয়োগ করিয়া থাকে।

লিখিত ভাষার ন্যায় কথিত ভাষাও দুই প্রকরের। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চেয়ে অশিক্ষিত ইতরশ্রেণীর লোকেরা অপেক্ষাকৃত অপ ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে।

শাস্ত্রাদি গ্রন্থাবলীর মধ্যে বেদ চতুষ্টয়, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং কয়েকখানি তন্ত্র বিশেষ আদরণীয়। কবি ভাষায় লিখিত পদ্য গ্রন্থের মধ্যে "রামায়ণ" 'ভরত যুদ্ধ,' 'বিবাহ' 'অর্জ্জুন বিজয়' হরিবংশ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। গদ্য গ্রন্থের মধ্যে আগম, 'আদিগম', দেবাগম, সার সমুশ্চয়াগম, পম্যাগম, শ্লোকান্তরাগম, ইত্যাদি ব্যবহার শাস্ত্র উল্লেখ যোগ্য। তথাকার "বর্ণমালা" বাঙ্গলা বা দেবনাগর বর্ণমালার সহিত আকৃতিগত অনেকটা সাদৃশ লক্ষিত হয়। দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ প্রচলন আছে। এখানকার প্রচলিত অব্দ শালিবাহনাব্দ বা শকাব্দ। এখানে ইহাকে শক-বর্ষ-চন্দ্র বলা হয়।

রামায়ণকে এখানে বাল্মীকি রচিত বলিয়া স্বীকার করা হইলেও রাজা কুসুম কর্ত্তৃক সঙ্কলিত কবি ভাষায় রচিত রামায়ণই এখানে প্রচলিত। ঐ রামায়ণে উত্তরকাণ্ড আদৌ নাই। মহাভারতও কবি ভাষায় লিখিত; তাহাতে আটটী মাত্র পর্ব্ব বিদ্যমান আছে।

এক সময়ে সমগ্র বালীদ্বীপ একজন হিন্দু নৃপতিরই শাসনাধীনে ছিল। কালক্রমে নানা বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় বালীদ্বীপ আটটী ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু রাজ্যে পরিণত হয়। যথা :— (১) কুলুকুং (২) জ্ঞান্যায় (৩) বাংলীং (৪) মেঙ্গুই (৫) কারাং আসেম (৬) বোলেলং (৭) তাবানান্ (৮) বাদাং। এই আটটী হিন্দু রাজার মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ফলে এই গৃহ বিবাদ সূত্রেই বালীদ্বীপে ওলন্দাজদিগের প্রবেশ পথ সুগম হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সমগ্র বালীদ্বীপই ওলন্দাজ শাসনাধীন। যে দুই একজন হিন্দু রাজা আছেন, তাহারাও ওলন্দাজদিগের প্রাধান্য মানিয়া চলেন এবং রাজ্য শাসন বিষয় সম্পূর্ণ পরাধীন। বালীর প্রজাদিগের রাজকর অতি অল্প; কেবল আবাদি জমির জন্যই নাম মাত্র কর দিতে হয়। ইহাও আর্য্য ভারতের প্রাচীন প্রথা।

বালীদ্বীপের স্বাস্থ্য অন্যান্যগ্রীষ্ম প্রধান দেশের ন্যায় এবং স্থানটীও গ্রীষ্ম প্রধান দেশেরই পর্য্যায়ভুক্ত। অধিবাসীগণ দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। অন্যান্য রোগের মধ্যে বসন্তও ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত দুই ব্যাধিতে অনেক সময় অনেক লোক মারা গিয়াছে। তত্রস্থ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, তামাক, কফি, পেপে, নীল, তুলা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। শিল্প কার্য্যে তথাকার অধিবাসীরা বড়ই নিপুণ। সকল প্রকার শিল্প কার্য্যই তাহারা করিতে জানে। ইউরোপীয়, চীন এবং আরব দেশীয় বণিকগণ ব্যবসা বাণিজ্য

ব্যপদেশে এই দ্বীপে গতায়াত করিয়া থাকে। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্র, লৌহ ও আফিংই প্রধান; শস্যাদি রপ্তানির অন্তর্গত। এখানকার জীবিকা অর্জ্জন ব্যাপারের স্বচ্ছলতা হেতু এখানে ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

---

# কেরাণী ও মস্যাধার

মস্যাধার কহে "ওরে অবোধ কেরাণী!
কলমের খোচা আর সহেনা আমার!
গর্দ্দভ তোদের চেয়ে শত গুণে জ্ঞানী!
তাহাদেরো আছে শক্তি দুঃখ বুঝিবার!"
কেরাণী কাঁদিয়া কহে, "কি করিব কহ!
পেটের জ্বালায় এত নিশিদিন সহি!
সাদরে হয়েছি তাই শত দুঃখ বহ,
কলম চালাই শুধু নত মুখে রহি!"
ব্যবসা হাসিয়া কহে, "এস মোর কাছে,
ঐশ্বর্য্য ইজ্জৎ সবি মোর কাছে আছে।"

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

---

# নববর্ষ সংবাদ।

## ( বৈকুণ্ঠের বেতার বার্ত্তা )

মর্ত্ত্যের কার্য্য বৃদ্ধি হইয়া যাওয়ায় ভগবান বৈকুণ্ঠপতি এখন আর নিজে সব দিক রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। স্বর্গের দ্বারে-পথে, ঘাটে-আঘাটে বিনাতারে টেলিগ্রাম বসিয়াছে। সেই বিনাতারে বৎসর ভরিয়া যে কলরব পুঞ্জীভূত হয়, নববর্ষের প্রথম দিবসে সমস্ত দেবগণের সম্মিলনে তাহার বিচার-আলোচনা হইয়া থাকে।

শুভ নববর্ষের ১লা বৈশাখ অপরাহ্নে সমস্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ মর্ত্ত্যবাসীর দুঃখের কান্নায় দয়ার্দ্রচিত্তে মনোনিবেশ করিলেন। নারায়ণ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ওহে সহৃদয় দেবগণ, আমিতো আর শোক-দুঃখ আধি-ব্যাধি প্রপীড়িত মর্ত্ত্যবাসীর কষ্টের ক্রন্দন সহ্য করিতে পারিতেছি না। সুতরাং আমি তাহাদের দুঃখের প্রতিকারার্থ তোমাদের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি যে মর্ত্ত্যবাসীর সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য তোমাদের যে Co-oparation তাহা পূর্ণমাত্রায় তাহাদের জন্য যথা সময়েই যেন প্রকাশিত হয়। প্রজার দুঃখ বৃদ্ধিতে প্রজাপতির সুখ বৃদ্ধি হয় না; বিশেষ বৈকুণ্ঠে বসিয়াও যদি সর্ব্বদা কর্ণযুগল কার্পাসগ্রস্ত করিয়া সক্রিয় ইন্দ্রিয়দ্বয়কে নিষ্ক্রিয় রাখিতে বাধ্য হইতে হয়, তবে এই সুখসেব্য বৈকুণ্ঠেই বা সুখ কোথায়?"

ভক্তবৎসল নারায়ণের এই কথা শুনিয়া দেবগণ একে অন্যের মুখ তাকাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ মাথা গুঁজিয়া বসিয়া থাকিয়াই চুপি চুপি বলিলেন—"এত Sentimental হইলে কি চলে?"

কেহ বলিলেন—"চীৎকার মাত্রকেই যদি দয়ার যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হয়, তাহা হইলে আর ··ইত্যাদি।

নারায়ণের প্রস্তাবে কেহ প্রকাশ্য সাড়া দিতেছেন না দেখিয়া নারায়ণ দেবগণের মুখের দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিত করিলেন। বরুণের উপরই তাহার দৃষ্টি প্রথম পড়িল। বরুণ নিরুপায় হইলেন, বিরক্তও হইলেন।

নিরুপায় বরুণ বিরক্তির সহিত ঘৃণা মিশ্রিত ভাবে বলিলেন—"সভাপতি মহাশয় যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে সমগ্র দেবগণের পক্ষে আমি নিবেদন করিতে চাই যে ইদানীং মর্ত্ত্যবাসী সকলেই আমাদের সঙ্গে ননকোঅপারেশন করিয়াছে, তাহারা একেশ্বরবাদী—যা একটু স্বীকার করিতে হয়, সে কেবল নারায়ণকেই করিয়া থাকে; আমরা এই যে কোটী কোটী আদি দেবতা স্বর্গ যুড়িয়া পড়িয়া আছি, পক্ক রম্ভা দূরে থাকুক, একটী অপক্ক কদলি দ্বারাও আমাদের প্রাধান্য স্বীকার করে না। একদল যাহারা বহু দেবতা বাদী আছেন, তাহারাও তাহাদের মনগড়া দেবতার পূজা করিয়া আমাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুলিই প্রদর্শন করিতেছেন। এজন্য মর্ত্ত্যবাসীদিগের সহিত আমাদের ও পাল্টা ননকোঅপারেশনই করা উচিত।······"

দিনের বেলায় সভা, সেজন্য সূর্য্য আসিতে পারেন নাই; তিনি প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। সূর্য্য যে বরুণের একজন প্রতিপক্ষ এজ্ঞান প্রতিনিধিটীর ছিল সুতরাং তিনি বরুণের 'ননকো-অপারেশন' বাণী মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "নিশ্চয়ই নহে—Certainly not।"

বরুণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিলেন—মহাশয় বসুন আমার বক্তব্য শেষ হয় নাই। আমরা মর্ত্ত্যবাসীর সঙ্গে তাহা করিব না। কারণ নির্লিপ্ত ভাবে মর্ত্ত্যবাসীর উপকার করাই হচ্চে আমাদের উদ্দেশ্য। তবে আমি যে 'ননকোর' কথা উল্লেখ করিলাম তাহার কারণ দেবগণের একটী বিশেষ স্বার্থ এবং অধিকার নরগণ নষ্ট করিতেছেন।"

যম উঠিয়া বলিলেন "আমাদের দেবগণের মধ্যেই ঐক্য সখ্য নাই, তাই শাসন কার্য্যে অনেক সময় আমাকে বেগ পাইতে হইতেছে। এক সময় আমারও মর্ত্ত্যে পুজা ছিল—এখন আমার অধস্তন চরগণের আছে, কিন্তু আমি প্রভু হইয়াও আমার নাই।"

স্বর্গরাজ্যের অপবাদে দেবরাজ ইন্দ্র আপত্তি করিয়া বলিলেন—"যমরাজের কথার কোন মূল্যই নাই। আমাদের ঐক্য সখ্যের অভাব তিনি কোথায় দেখিলেন? এই মন্তব্য আপত্তি জনক।"

যম দাঁড়াইয়া বলিলেন—"দৃষ্টান্ত দিতে গেলে ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে, সে জন্য ক্ষমা করিবেন—উপায় নাই। সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত সূর্য্য এবং বরুণের বৈরভাব। সূর্য্যের সঙ্গে আড়ি করিয়া বরুণ তেমন যে সূর্য্যের চলনপথ গ্রীষ্মমণ্ডলটা তাও জলীয় হাওয়ায় হীম শীতল করিয়া রাখিয়াছেন—মানুষ সুখ পাইলেই আর্ত্তনাদ করে, দয়ার্দ্র বিষ্ণুর সিংহাসনও তাহাতেই টলে।—যেখানে সূর্য্যের শাসন, বরুণ তথায় যদি আড়ি পাতিতে না যান, আর যেখানে বরুণের প্রভাব, সূর্য্য যদি সেখানে উকিঝুঁকি না দেন—দেখিবেন আর্ত্তনাদ কোথায় থাকে? তাহা হইলে আমার শাসনও নীরবে চলিতে পারে! তাই বলি চাই ঐক্য, চাই সখ্য, চাই কড়া শাসন।"

পবন উঠিয়া বলিলেন—"যমের সে প্রাচীন চালে এখন আর চলিবে না। এখন modern deplomecyর দিন। Martial idea টা আপাততঃ বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্ব প্রেমের মূলমন্ত্র যমকে অন্ততঃ মুখে আওরাইতে হইবে। কার্য্যোদ্ধারের যে ইহা একটী উৎকৃষ্ট পন্থা, তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। উচ্চারিত যাদু মন্ত্রের মোহন স্পর্শে অক্ষম শক্তিশালী হয়; মর্ত্ত্যবাসীর উপর আমার প্রভাব লক্ষ্য করিলে দেবগণ তাহা সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন। ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহ্যিক ব্যবহারেই মর্ত্ত্যবাসী বিচার করিয়া থাকে। মর্ত্ত্যে আমার আদর তাহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মর্ত্ত্যের এক একটা নর গড়ে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত উন্নত। কিন্তু সেই সাড়ে তিন হস্ত দেহ যষ্টির উপর আমি চাপাইয়াছি কত ভার, অনুমান করুণ দেখি আপনারা?
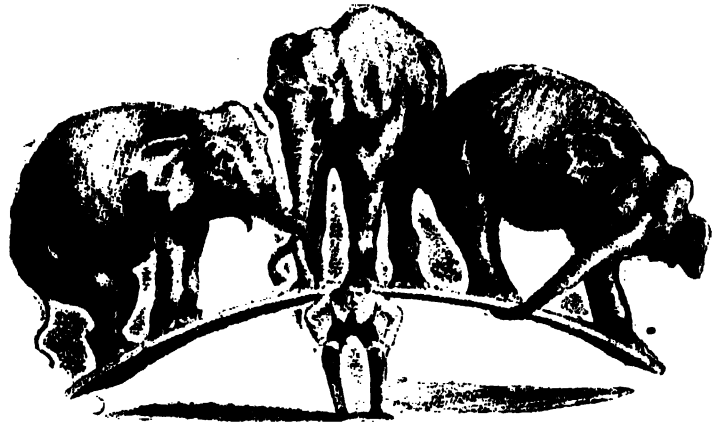
আমি চাপাইয়াছি এই তিনটী ঐরাবতের বোঝা; প্রায় ৩০০০০ ত্রিশ সহস্র পাউণ্ড বা ৩৭৫ মণ ভার। আমার এইরূপ বিরাট বোঝার ভার মর্ত্ত্যবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেকে বহন করিয়াও কি আমাকে মুখে কটু কথাটী বলিতেছে?

সকলে সমস্বরে—'শুনুন-শুনুন।'

আমি এমন কায়দা সহকারে আমার এই বিরাট বোঝা মর্ত্ত্যবাসী মানবের স্কন্ধে চাপাইয়া বসিয়া আছি যে সময় সময় আমার অভাবেই বরং তাহাদের অসোয়াস্তি উপস্থিত হয়। পারিবেন কি ইন্দ্র তাহার ঐরাবত মর্ত্ত্যমানবের বক্ষের উপর দিয়া চালাইয়া নিতে? অথচ আমার চাপ কিন্তু ঐরাবতের তিনটার সমান?"

চন্দ্র উঠিয়া বলিলেন—"সন্ধ্যা আগত; এখন আমাকে বিদায় হইতে হইবে। দেবগণেরও সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হইয়াছে; আজকার জন্য সভা মুলতবী রাখাই এখন উচিত—তবে পবন দেবের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহার কোন্ গুণে মর্ত্ত্যবাসী তাহার এমন সম্মান করে, যাহা সুধা বিতরণ করিয়াও আমি পাইনা।"

পবন উঠিয়া বলিলেন—"বর্ত্তমান কূট নীতি, মৌখিক শিষ্টাচার—এ আমাদের সকলেরই শিক্ষা করা উচিত।"

(সেদিনকার জন্য সভা ভঙ্গ হইল।)

# স্নেহের দান

( ৭ )

মাখন প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়া এল-এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কলিকাতা চলিয়া যাইবার পুর্ব্বে একদিন মাখন ছোট হিস্তার পশ্চিমের দালানের খাটে শুইয়া ঐতিহাসিক গিবন সম্বন্ধে একটা ইংরেজী পুরাতন মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিল। প্রাতে মণির সহিত বিবাহ বিষয় অনেক তর্ক হইয়াছে; এ প্রবন্ধটিতে সে তর্কের অনেক উপাদান ছিল।

গুরুজনের নিষেধ অমান্য করিয়া গিবন তাঁহার ভালবাসার পাত্রীকে বিবাহ করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি জীবনে চির কুমার রহিয়া গেলেন। সে সময় তিনি তাঁহার উদ্দাম যৌবন নিরাশার গাঢ় আঁধারে পড়িয়া নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আগার হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ক্রমে যতই কর্ম্ম জীবনের সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ততই তাহার মুক্ত জীবন যে তাহার নিকট প্রকৃত সুখ ও সম্পদের আস্পদ হইয়া উঠিয়াছিল—তাহা ভাবিয়া মাখন মনে মনে ভারি আনন্দ অনুভব করিতেছিল। নিউটনের অবিবাহিত জীবনের সাফল্য, বায়রণ ও মিলটনের পত্নী ভাগ্য এবং সক্রেটাসের দুর্ভোগ প্রভৃতির আলোচনায় তাহার মনে যুগপৎ ঘৃণা ও প্রীতির ভাব খেলিতেছিল। ঐ সময় কনক ঐ ঘরেরই দক্ষিণের কোঠার ভিতরের দিকের জানালার ঠিক সম্মুখে একখানা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের দিকে উপুর হইয়া লাল রঙ্গের একখণ্ড ভেলভেটের উপর সোণার গুণা ও চুম্‌কী বসাইয়া একযোড়া জড়াও জুতা প্রস্তত করিতেছিল এবং মাখনকে নানাবিধ বিষয়ে প্রশ্ন-বৃষ্টি করিয়া তাহার পাঠে ও চিন্তায় ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল।

কনক চুমকীটী গুণার সহিত পেচ দিয়া বসাইয়াই প্রশ্ন করিল—"বর্ষাকালে ফুল ফোটে কি দাদা? হেঁ দাদা?"

মাখন কনকের প্রশ্নে মন দিতে পারিতেছিল না, কেবল সংক্ষেপে উত্তর করিল—"হাঁ ফুটে।"

মাখনের মনোযোগের অভাব দেখিয়া কনক বলিল—'না দাদা, এদিকে চাহিয়া বল। যদি ফুটে, তবে ডি, এল, রায় "হীরা কি আঁধারে জলে, মেঘে ফুল কি ফুটে হায়" বলিয়া আক্ষেপ করিলেন কেন?"

মাখন পুর্ব্বভাবেই পুস্তকের দিকে চক্ষু রাখিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া উত্তর দিল—"ওর অর্থ তা নয়।"

কনক কতক্ষণ মাখনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তারপর আর একটী পেচ তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"কোকিল কি শরৎ কালেও ডাকে?"

মাখন পুর্ব্ববৎই পাঠে বিভোর থাকিয়া সংক্ষেপে উত্তর করিল—"না।"

কনক বলিল—"ডাকিছে কোয়েল, ডাকিছে দোয়েল, শরৎকালের প্রভাতে"—কেন তবে?"

মাখন কনকের দিকে চাহিয়া হাস্য করিয়া বলিল—"কোকিল যদি তখন সেখানে থাকে, তবে অবশ্যই দশ জনের সঙ্গে ডাকে।"

মাখনের ঔদাসিন্য ও অমনোযোগ কনকের অভিমানে আঘাত করিল। সে তাহার জুতার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া উঠিয়া বলিল—'ওর অর্থ তা নয়', 'যদি থাকে তবে ডাকে'—এরূপ বলিলে চলিবে না। পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে।"

কনক যখন তাহার জড়ির আয়োজন পত্র গোছাইয়া বাক্স-বন্দী করিবার ব্যবস্থা করিতেছিল, ঠিক সেই সময় মণিমোহন ঝড়ের মত সেই ঘরে আসিয়া ঢুকিয়া কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল—"এই নাও ভাই আমার সম্মতি লিখিয়া লও, আমি বিবাহ করিব। কিন্তু এক দিনেই হওয়া চাই।"

মাখন পত্রিকাখানা বন্ধ করিয়া রাখিয়া হাসিয়া বলিল—"সাধু, সাধু! বিবাহটা বৎসর ভরিয়া নিশ্চয় হইবেনা, এক দিনেও না—শুভহিবুক লগ্নে রাত্রিতে হইবে। কোন ভয় নাই, এখন এই কাগজে স্বীকার উক্তি লিখিয়া সাক্ষর কর; তোমরা জমিদার জাত, কথায় বিশ্বাস নাই। প্রাতঃকালে বলিলে 'করিব না', দ্বিপ্রহরে বলিতেছ 'করিব', আবার বিকালে বলিবে, না; তাহা যাহাতে না হইতে পারে, তাহার জন্য স্বহস্তে লিখিত স্বীকার পত্র চাই।"

মণি স্বীয় বুকের পকেট হইতে ষ্টাইলোটি টানিয়া লইয়া সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া বলিল—'এখন খানাপুরী করিয়া লও; কিন্তুটা যেন থাকে—তোমাকে কিন্তু সেই এক দিনেই বিবাহ করিতে হইবে।"

মাখন উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল—ইহাই কি—"কিন্তু এক দিনে হওয়া চাই?"

মণি বলিল—"নিশ্চয়।"

মাখন বলিল—"তবে আর এ স্বীকার উক্তির কোন মূল্য নাই।"

মণি—"কেন ?"

মাখন—"আমার জীবন কোন অংশেই তোমার জীবনের সহিত তুলিত হইতে পারে না। তা তোমাকে প্রাতঃকালেই বলিয়াছি। তোমার জীবন, তোমার দায়িত্ব—এজগতের নশ্বর ও অবিনশ্বর বহু বিষয়ের সহিত নিত্য সম্পর্কযুক্ত; অপর দিকে আমি—আমার বলিতে যদি এ জগতে কোন কিছু থাকে, তাহা হইতে—সম্পূর্ণ মুক্ত পুরুষ; সুতরাং তোমার চেয়ে ঢের উপরে আমার স্থান।" বলিয়া মাখন খুব উচ্চ হাস্য করিল।

মণি বলিল—"দোষ বুঝি কেবল আমারি বেলা ?"

মাখন—"সে কেমন ?"

মণি—"তুমি এখন আপত্তি করিতেছ কেন ?"

মাখন গম্ভীর ভাবে বলিল—"আমার ও তোমার স্থান সমাজের কোন স্থলেই এক সমতল ক্ষেত্রে নয়; সুতরাং তোমার বিবাহ আমার জন্য, বা আমার বিবাহ তোমার জন্য আটক থাকিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে এরূপ প্রশ্নেরই অবকাশ নাই। তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তুমি কার্য্য করিবে, আমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি কার্য্য করিব।"

বিবাহ করিব না—বলিয়া মণিমোহনের মনে মনে কোন ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল না, তবে পিতৃবিয়োগের পর এক বৎসর মধ্যেই যে পণ্ডিতেরা বিবাহে পাতি দিবেন না, এই একটা সাধারণ বিশ্বাস মাখনের সহিত আলাপে তাহার জন্মিয়াছিল, সেইজন্য তাহার মাতা যখনই তাহাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতেন তখনি সে—মাতার আগ্রহ বৃদ্ধির জন্যই হউক বা খেয়াল বসেই হউক—'বিবাহ করিব না'—বলিয়া জবাব দিত।

মাখন পাস হইয়াছে, এখন শীঘ্রই চলিয়া যাইবে বলিয়া মণির মা আজ ছেলের শেষ কথা জানিয়া দিবার জন্য মাখনকে প্রাতে ডাকাইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে মাতার সম্মুখে দুই বন্ধুতে বিবাহ সম্বন্ধে বেশ কথা কাটাকাটি হইয়াছিল।

মণিমোহন বুঝিয়াছিল; এই সুযোগেও ধরা না দিলে আলোচনা চাপা পড়িয়া যাইবে; তাই কিভাবে ধরা দিতে হইবে, তাহা মনে মনে আবিষ্কার করিয়া মণি তাহার মনকে বেশ জমাইয়া তুলিয়াছিল এবং সেই অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভাবী জীবনের বেশ একটা সোনালী স্বপ্ন কল্পনা করিয়া লইয়া তাহার রঙ্গীন নেশাতে নিজকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিয়াছিল। তারপর সে তাহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত কল্পনা কার্য্যে পরিণত করাইবার জন্য উদ্দাম ভাবে ছুটিয়া বন্ধুর নিকট আসিয়াছিল। দুই বন্ধুতেই নব ভাবে জীবনকে সজীব করিয়া লইয়া নবীন পথের পথিক হইবে—ঠিক এক ভাবে—ঠিক এক গতিতে! কিন্তু এখন মাখনের একি বিপরীত ভাব!

মাখনের এই বিপরীত উত্তর মণিকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। মাখনের কথা শুনিয়া মণি দুঃখিত হইয়া বলিল—"তোমার কথা ও ভাব—আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না ভাই! তোমার জীবন যে আমার চেয়ে কোন হিসাবে ছোট বা বড় এবং এ কথাটাই যে এ ক্ষেত্রে কেমন করিয়া উপস্থিত হয়—আমার কিছুই বোধগম্য হইতেছে না।"

মাখন বলিল—"তোমাতে এবং আমাতে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য হেতু তোমার ভিতর যে অভিমান ও আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, তাহা কি তুমি এত সহজেই ধুলিস্মাৎ করিয়া দিতে পারিবে মণি? যদি না পার, তবে আমার সহিত তোমার তুলনা চলিতে পারিবে না।"

মণি বলিল—"পার্থক্যটা যে কি, তাইতো বুঝিতে পারিলাম না।"

মাখন হাসিয়া বলিল—"তবে আর এত কথায় কোন দরকার নাই; তোমার চিন্তাই তুমি কর।"

মণি দুঃখিত হইয়া বলিল—"তবে তুমি বিবাহ করিবেই না।"

মাখন হাসিয়া বলিল—"করিতে হয় করিব, না করিতে হয় না করিব—সে সকল বিষয়ের চিন্তা করিবার সময় আমার ঢের আছে।"

মাখনের কথার ভঙ্গিতে মণি মনে মনে অত্যন্ত আঘাত অনুভব করিয়া বলিল—"আমরা কি তোমার চক্ষে এতই নিকৃষ্ট যে কথা বলিতেও তোমার একটু ইতস্ততঃ করা প্রয়োজন মনে হয় না।"

মাখন হাসিয়া বলিল—"ক্ষমা কর ভাই, আমার মনে কণা মাত্রও তোমার প্রতি ঘৃণার ভাব নাই, থাকিতেও পারে না। কিন্তু এই খানেই তোমার সহিত আমার পার্থক্য স্পষ্ট নয় কি? আমার অবহেলার ভাব তোমার ব্যক্তিত্বকে

আঘাত করিয়াছে এবং তাহাতেই তোমার প্রচণ্ড আত্মাভিমান জাগ্রত হইয়াছে। এই যে আত্মাভিমানী তুমি, এই তোমার সহিত সংসারে সম্পর্ক হীন কপর্দ্দক শূন্য আমার তুলনা অসম্ভব। সকল ভাবকেই ভাই ভাষায় আকার দেওয়া যায় না; অবস্থাই তাহার স্পষ্ট অভিব্যক্তি। অবস্থার ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাহির হইতে বিচার করিলে চলিবে কেন? এরূপ অন্ধের ন্যায় বিচার করিতে যদি যাও, তবে ঐ রূপ অবহেলার উত্তর ব্যতীত আর কি সম্ভব হইতে পারে?"

মাসীমা মণি ও মাখনের তর্ক এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন, এই বার তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া উভয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন—"মণি, তুই কি তোর বাসাখানা মাখনকে ছাড়িয়া দিবি?"

মণি উত্তর করিল—"কেন খুড়ীমা?"

মাসীমা বলিলেন "তা না হইলে মাখন বউ লইয়া আসিয়া উঠিবে কোথায়? সে কি বলিতেছে, তুই বুঝিতে-ছিস না?"

মণি দুঃখিত ভাবেই বলিল—"এ মাখনের অত্যন্ত অসরল ব্যবহার খুড়ী মা!…"

মাখন মাসীমার ইঙ্গিত-কথায় লজ্জিত হইয়া আত্ম রক্ষার ছলে বলিল—"বউ করিবার মত যখন সময় হইবে, তখন মাসীমার ঢেঁকী ঘরই আমার বাসাখানা-বাসর ঘর হইতে পারিবে; সে জন্য কোন চিন্তার কারণ নাই। এখন চাবুকের জন্য ঘোড়া রাখা, না ঘোড়ার জন্য চাবুক রাখা, সেইটাই বিবেচনার বিষয়।"

মণি বলিল—"আচ্ছা, তবে তুমি তোমার বিবেচনাই কর।"

মাখন মাসীমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা মাসীমা, আপনি বলুন, মণির বিবাহ করার সহিত আমার বিবাহ কারার যুক্তি কিসে আসিতে পারে? সে করিবে তার প্রয়োজনে, আমি করিব আমার প্রয়োজনে। আমার প্রয়োজন অভাব, আমি করিব না; তাহার প্রয়োজন গুরুতর, সে জন্য সে তাহার প্রয়োজন পুরণ করিবে—এই তো জগতের রীতি!"

মণি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"আমার এমনই বা কি গুরুতর প্রয়োজন তুমি বুঝিলে? আমি তো নিজে কিছুই বুঝিতেছি না, সেটাই একটু সরলতার সহিত বুঝাও না।"

মাখন বলিল—"সরল বা অসরল ভাব ইহাতে কিছুই নাই। তোমার কর্ম্ম জীবনের আরম্ভ হইয়াছে; ইহাতে যৌবনের প্রলোভন গুরুতর, মনকে একদিকে আকর্ষণে শৃঙ্খলিত রাখিবার জন্য এই সময় তোমার সংসারবন্ধন প্রয়োজন, অন্যথায় পদস্খলন বিচিত্র নহে। বরং তোমার ন্যায় বিলাস বিভবে যাহাদের বাস তাহাদের সে সম্ভাবনাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহাই আমার ধারণা। অবশ্য তোমার বিবাহের বয়স যায় নাই—সেজন্য আমি তোমাকে এখনই তাহা করিতে বলিতেছি না;—কিন্তু বিবাহ করা উচিত মনে করিতেছি; তোমার মায়েরও সেই মত।"

মাসীমা বলিলেন—"এখন তোমার সম্বন্ধে তোমার নিজ মতও সরল ভাবে মণিকে খুলিয়া বল।"

মাখন বলিল—"আমার পাঠ্যাবস্থাই শেষ হয়, নাই; এম, এ, টা না পাস করা পর্য্যন্ত আমার আকর্ষণ ঐ দিকেই শৃঙ্খলিত থাকিবে। ততদিন পর্য্যন্ত আমার মনকে এক চুল পরিমাণও এদিক ওদিক দিবার ইচ্ছা নাই। আমার জ্যেঠা মহাশয়ের অনুসন্ধানকেও আমি ইহা অপেক্ষা গুরুতর মনে করি না। আমার সম্বন্ধে আমার নিজের ইহাই চূড়ান্ত মত।"

মণি বলিল—"লেখাপড়ার জন্য তুমি যখন মনুষ্যত্বও বর্জ্জন করিতে বসিয়াছ, তখন আর অন্য পরে কা কথা।"

মাখন হাসিয়া বলিল—"মনুষ্যত্ব জন্মিবার পূর্ব্বে মনুষ্যত্ব হীনতার অপবাদ খুব গুরুতর নহে; আর তাহা হইলেও সহ্য করিবার শক্তি প্রত্যেকের থাকা দরকার। তাহা বুক পাতিয়া লইতে হইবে ও মূক হইয়া সহিতে হইবে। তারপর ঐ জিনিসটা লাভ হইলে পর অপবাদ ক্ষালনের বিস্তর অবকাশ জন্মিবে। যাক্, এ সকল বাজে কথার সময় যথেষ্ট হইবে। এখন মণির মাকে বলুন মাসী মা, যে মণি বিবাহ করিবে, পাত্রী স্থির করুন। দেখিয়া পছন্দ করিতে হয়, এই অবকাশে যাইয়া করা যাইতে পারিবে।"

মণি কোন উত্তর করিল না। চুপ করিয়া বসিয়া মাখনের হাতের সেই ইংরেজী মাসিক কাগজখানা পড়িতে লাগিল। তারপর কিছু দূর পড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"এই বুঝি তোমার বিবাহ না করিবার আরগুমেণ্ট সব! বাঃ! কি সুন্দর।"

মাখন মণির হাত হইতে পত্রিকাখানা টানিয়া লইয়া বলিল—"এগুলির প্রতি কেন তাকাও ভাই। তোমার সম্মুখে এই অপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিরাট বোঝাটাই জাজ্বল্যমান অবস্থিত, এ প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাখিয়া অন্য প্রমান কেন?"

ইহার পর মাখন মণিদের ষ্টেট সংক্রান্ত কথা তুলিল। মাখনের উপর মণি ও মাসীমা তাঁহাদের মফস্বলের নিকাশ পরীক্ষার ভার দিয়াছিলেন। মাখন প্রাতে ও বৈকালে ম্যানেজার বাবুর সহিত একযোগে তাহা দেখিতেছিল।

মাখন বলিল—'তোমাদের মৃজাপুর ডিহির নায়েব মহাশয় প্রায় ৮।১০ হাজার টাকা তহবিল ভাঙ্গিয়াছেন, কি উপায় করিবে তাহার?"

মণি উত্তর করিল—"সেতো শুনিয়াছি, ম্যানেজার বাবু কি বলেন?"

মাখন—"তিনি বলেন টাকা আদায় হইবে না; নালিশ করিলে সে খরচপত্রও অনর্থক যাইবে। এখন তোমরা যাহা ইচ্ছা কর তাহাই করিতে পার।"

মাসীমা—"এতগুলি টাকা কি একদিনে ভাঙ্গিয়াছে?"

মাখন বলিল—"চড়ের মোকদ্দমায় বিপক্ষের নিকট হইতে ডিক্রিপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ টাকাই আদালত হইতে লইয়াছে, অথচ হিসাবে জমা করে নাই। ইহাতে চারি হাজার; তারপর নানা ব্যক্তির নামে রিসৃক্ত বাবত খরচ লিখিয়াছে, অথচ কোন হুকুম নামা নাই; বারোয়ারী পূজার বাবত মাথট আদায় করিয়াছে, সরকার হইতেও খরচ লিখিয়াছে—এইরূপ নানা প্রকারে......"

মাসীমাও বলিলেন—"এখন উপায়?"

মাখন বলিল—ওদের দোষ কি? পাঁচ টাকা বেতন পাইবে, তাহাও ছয় মাস পরে। ইহাতে কোন ভদ্র লোকের পেট পোষাইতে পারে কি, পরিবার তো পরের কথা! মোকদ্দমা না করিয়া অনুগ্রহ করিলে কু দৃষ্টান্তের আদর্শ হইবে; পূর্ব্বে পূর্ব্বে এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করাতেই নাকি ইহাদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এগুলি আপনারা ম্যানেজার বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া এক মত হইয়া যাহা করিতে হয় করিবেন। আমি সংসার বুদ্ধি অনভিজ্ঞ, আমার মত এখানে গ্রাহ্য নহে। নায়েব বেচারা একেবারে ধন্না দিয়া পড়িয়াছে। ম্যানেজার বাবু বলিলেন—আরো কয়েকটা কাছারির কাগজ পত্র নাকি ঠিক নাই।"

কনক, তাহার কোঠায় চুপ করিয়া বসিয়া এতক্ষণ অতি আগ্রহের সহিত বিবাহ সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ শুনিতেছিল। যখন ষ্টেট সংক্রান্ত কথা উঠিল, অমনি সে বাহির হইয়া গিয়া জ্যেঠাই-মাকে সংবাদ দিল—"জ্যেঠি মা, ভাই দাদা বিবাহ করিবে, তাহার সম্মতি কাগজে লিখিয়া দস্তখত করিয়া দিয়াছে।"

কনকের নিকট সংবাদ পাইয়া মণির মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মাখন শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া বলিল—"এই নিন্ বড় মাসী মা, মণির জন্য পাত্রী অনুসন্ধান করুন; সে সম্মতি দিয়াছে।

মণি পরিষ্কার সম্মতি দেয় নাই, তাহার সম্মতিতে মাখনের বিবাহেরও অজুহাত ছিল। এখন মাখন নিজের কথা অপ্রকাশ রাখায় মণি কি করিবে, ঠিক করিতে পারিতেছিল না। এ দিকে সে তাহার নিজ কল্পনাকে বিবাহের নেসায় বেশ মস্‌গুল্ করিয়া চিত্তকে সম্পূর্ণ আবিষ্ট করিয়া লইয়াছিল—সুতরাং একেবারে অস্বীকার করিতেও সাহসে কুলাইতেছিল না—সে অগত্যা ইংরেজীতে বলিয়া ফেলিল—"নিশ্চয় না।"

মাখন ও ইংরেজিতেই জবাব দিয়া বলিল—"ভাই, মার মনে কষ্ট দিওনা, তাহাকে পাত্রী দেখিতে অবসর দাও; পছন্দ না হয়, করিও না।"

মণির মা বলিলেন—"আবার কি কথা হইল বাবা?"

মাখন—"ও কিছু নয়; আপনি ঘটক ডাকিয়া পাত্রী অনুসন্ধান করুন; ফটোগ্রাফ চাই! পছন্দ হইলে মণি নিজে যাইয়া দেখিবে।—সে সব পরের কথা পরে..."

মণি মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল "কনকেরও বিবাহ এখন দেওয়া প্রয়োজন খুড়ী মা; সেই টাই বরং আগে..."

খুড়ীমা বলিলেন—"সে তো ঠিক, সে ও তো তোমরাই দেখিবে বাবা।"

বড় কর্ত্রী যেন বুঝিলেন, ছোট কর্ত্রীর মন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন তাহার সে দিনকার উপদেশ বাক্যেই যে হইয়াছে ইহা নিশ্চয়! সুতরাং তিনিও এই প্রস্তাবে সায় দিয়া বলিলেন—"ঘটক ডাকাইব, সে দুই বিবাহেরই অনুসন্ধান

লইবে; ছেলের বিবাহ দুদিন পরে হইলেও হয়, কিন্তু মেয়ে লইয়া কি বসিয়া থাকা চলে?"

মণি বলিল—"ছেলের খোঁজ ঘটক অপেক্ষা মাখন করিলেই ভাল হইবে, এবং পছন্দসই হইবে।"

মাখন বলিল—"সেটা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি অবশ্যই তাহা দেখিব। সে সম্বন্ধে আমি মাসীমাকেও ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি; বাঁশরী বাবুর ছেলে—মণিতো দেখিয়াছই—তোমার ছেলে! এবার বি, এ, পাস করিয়াছে। আমি তোমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম; নতুবা তাঁর সঙ্গে আলাপ করিব ইচ্ছা ছিল।"

মণির মা বলিলেন—"মন্দ কি? বাঁশরী বাবু কে রে, মণি?"

মণি—"হাইকোর্টের উকীল বাঁশরী বাবু—আমাদের সরকারেরই উকীল।"

মণির মা বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"আমাদের উকীলের ছেলের নিকট মেয়ে বিবাহ দিবে, ছোট বউ? তোমার কি সম্মান অসম্মান জ্ঞানও নাই। ছিঃ! শুনিতেই যে গা বমি বমি করে!"

মাখন লজ্জায় মাথা নোয়াইয়া রহিল। মাসীমা মাখনের অবস্থা বুঝিয়া চিন্তিত হইলেন।

মণি হোঃ হোঃ করিয়া উচ্চ হাস্যে হল প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিল—"মা তোমার সম্মান জ্ঞানটা খুব টন টনা দেখিতেছি! বাঁশরী বাবুকে তুমি তোমাদের চেয়ে ছোট ভাব কোন হিসাবে? অর্থে, বৃত্তে, না সম্মানে? বাবার মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাঁর নিকট হইতে ৭০।৮০ হাজার টাকা কর্জ্জ আনিয়াছেন। তোমাদের এই জমিদারী তো তাঁর হাতে বাঁধা। এই টন্‌টনা সম্মান জ্ঞানই অনেক তথাকথিত সম্মানি ঘরের পতনের কারণ···"

মণির মা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কি জানি বাবা, বেতন নিয়া যে চাকুরী করিবে, সেও যদি আসিয়া সম্পর্ক পাতিতে চায়, তবে খান্দান থাকে কেমন করিয়া? কর্জ্জতো শুঁড়ির নিকট হইতেও লোকে করে।"

(ক্রমশঃ)

---

# রণছোড়জী দর্শনে

নানাবেশে নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনি ধর্ম্ম আচরণ করিয়া জীব শিক্ষা দিয়াছেন। দ্বারকায় তিনি রাজা হইয়াছিলেন। বাঙ্গলা হইতে দ্বারকা সুদূরে। বোম্বাইপ্রদেশের কচ্ছ উপকূলে দ্বারকা। বোম্বাই হইতে জাহাজে সমুদ্র পথে দ্বারকা যাওয়া যায়। আবার ভবনগর, জুনাগড়, সুদামাপুরী পোড়-বন্দর হইয়া হাঁটা পথেও যাওয়া যায়। হাঁটা পথে যাওয়া কষ্ট সাধ্য। গো-গাড়ীতে যাইতে হইলে কয়েকদিন সমুদ্র উপকুল দিয়া মরু ও জঙ্গল প্রদেশ দিয়া যাইতে হয়। আমি করাচি হইতে জাহাজে দ্বারকায় গিয়াছিলাম। দ্বারকা সহরটী বড় সুন্দর—যেন তাহাতে রাজশ্রী লাগিয়াই আছে। বৃন্দাবনের রাখাল কৃষ্ণ দ্বারকার শ্রী দেখিয়াই হয়ত এখানে রাজা হইয়া রাজধানী করিয়াছিলেন। দ্বারকার নীচেই সমুদ্র—প্রকাণ্ড বেগে ঢেউ আসিয়া সমুদ্র পুলিনে লাগিয়া উঠা নামা করিতেছে। রাজ বেশে শ্রীকৃষ্ণ ইহারই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া মাতিয়া যাইতেন।

এখানে একজন বাঙ্গালী সাধু আছেন, বৃন্দাবন হইতে তাঁহার নিকট পত্র আনিয়াছিলাম। আমি তাঁহার আশ্রয়ে রহিলাম। তিনি একাধারে ত্রিবিধ,—তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা, তিনি রোগে ঔষধদাতা, মামলায় পরামর্শ দাতা। তাঁহার বিলক্ষণ নাম, যশ আছে। তিনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী, ঢাকায় তাঁহার নিবাস, তথায় তিনি মাষ্টারী করিতেন। একদিন হঠাৎ তাঁহার মাথায় সংসারটা ভাল লাগিল না; আর অমনিই সব ছেড়ে ছোড়ে ডোর কৌপিন পরিয়া বৃন্দাবনে হাজির! তারপর এই বাঙ্গালী হীন দ্বারকায় আসিয়া একেবারে রাজা হইয়া বসিলেন আর কি! তিনি সাধু হইলেও তাঁহার এখন প্রচুর সম্পত্তি। ঠাকুর বাড়ীটা যেন একটা রাজপ্রাসাদ। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গোধনের সংখ্যাও প্রায় হাজার। সুতরাং দধি,দুগ্ধ,মাখনের অভাব নাই। তাঁহার নিজের বাড়ীর ঠাকুর ব্যতীত অন্যান্য দেবালয়েও তাঁহার গৃহের গব্য প্রেরিত হয়। সাধুজী নিঃসম্বল এখানে আসিয়া নিজবলে এই পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

এ হেন গৃহে হইলাম আমি অতিথি। প্রশস্ত, বিস্তৃত গৃহে গালিচা বিছাইয়া আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আহারটা

নানা বিধ গব্য উপাদানে প্রচুরই হইতে। দ্বারকায় পঁহুছিয়া তীর্থ প্রাপ্তি হেতু শ্রদ্ধাদি করিয়া দেব দর্শন করিলাম।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ একাকী; শ্রীরাধা এখানে আসিয়া সম্রাজ্ঞী হইতে পারেন নাই; বৃন্দাবন হইতে তিনি সখী পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব করিয়াছিলেন। বৃন্দাসখী তাঁর সাজ-সজ্জা দেখিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিতেই সাহস পান নাই। ফিরিয়া গিয়া রাধাকে বলিলেন "ওগো সে কি আর এখন বসে আছে? না তোমাকেই সে নিতে পারিবে? ইত্যাদি।" শুনিয়া স্ত্রীলোকের যা ব্রহ্মাস্ত্র, রাধা তাহাই ধরিলেন—অভিমান।

দ্বারকার মন্দির অতি প্রকাণ্ড, এত বড় মন্দির ভারতে খুব বেশী নাই। মাদুরার ও নাথদোয়ারার শ্রীনাথজীর মন্দির ইহার সমতুল্য হইতে পারে। স্থাপত্য শিল্পে ইহা একটা আদর্শ স্থানীয়। কতকাল হইল যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। রক্ত প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে বিশেষত্ব আছে। এ মন্দির দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের অনুরূপ। অসংখ্য ভৃত্য ও পূজারী নিত্য ইহাতে কাজ করিয়া থাকে। এই মন্দিরের ভোগ পাইয়া বহু দরিদ্র নরনারী প্রতিপালিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া সঙ্গীয় পাণ্ডাজীকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিলাম; সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। বিকালের সমুদ্র হাওয়া বেশ সুখ সেব্য। এই হাওয়া লবণাক্ত বিধায় তাহা গায় লাগিয়া শরীরটা চট্ চট্ করিতে লাগিল।

যখন গৃহে ফিরিলাম তখনও সূর্য্যদেব অন্ধকারের আহ্বানে একবারে নীচে নামিয়া পড়েন নাই। সীঁদুর লেপিত পশ্চিম গগনে অন্ধকারের ছায়া পড়িয়াছে। আমি গৃহে আসিতেই সাধুজী কহিলেন—"দ্বারকার দেবারতি বড় সুন্দর, একবার এহেন মনোরঞ্জন আরতি দেখিয়া আসুন।"

সায়াহ্নাহ্নিক সারিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই দিকেই চলিলাম। আমার সঙ্গে সাধুজীর গৃহের একজন বৈরাগী চলিল। আমরা মন্দিরে পঁহুছিবার পরেই চারিদিকে যেন রণভেরী বাজিয়া উঠিল; কত প্রকার শ্রুতি কর্কশ ও মধুর বাজনায় আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় তখন ভরিয়া উঠিল। কত ধূপ, ধুনা, গুগ্গুল, অগুরু—আরো কত কিছু সুগন্ধ আমাদের নাসারিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল।

আরতিওয়ালারা তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া বাদ্য বাজাইয়া আরতির তাল ধরিয়াছে, আর মাঝে মাঝে উচ্চ চীৎকারে "জয় দ্বারকাধীশের জয়" ঘোষণা করিতেছে। তারা যেন সবাই উন্মত্ত, মাতোয়ারা।

প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী আরতি হইল, তবু মনে হইল, কেন ইহা আরো দীর্ঘ হইল না। একালটুক আমি পৃথিবীর সব ভুলিয়া-গিয়াছিলাম। আমি ইহাদের সঙ্গে নাচিব ইচ্ছাছিল, কিন্তু লজ্জা আসিয়া সে পথ আটকাইয়া ধরিল। ভাবোন্মত্তেরা এমনই ভাবে নাচিয়া থাকেন! আমাদের মত মরু হৃদয়ে কি ভাবের বন্যা আসে?

আরতির পর কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ হইলে। গান বক্তৃতা —সব না বুঝিলেও একটা ভাব আমার হৃদয়ে আসিয়াছিল। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ যে সব লীলা করিয়াছিলেন তাহা লইয়াই এই কৃষ্ণযাত্রা। নিত্যই এখানে ইহার অভিনয় হয়। দু'চারটা দৃশ্য দেখিয়াই চলিয়া আসিলাম।

সমুদ্র তীর বলিয়া দ্বারকায় না শীত, না গ্রীষ্ম। অন্যান্য স্বাস্থ্যও ভাল। এ দেশের লোকেরা মৎস্য, মাংস খায় না। কোন কোন ইতর জাতীয় হিন্দু ও মুসলমানেরা মৎস্য-মাংসাহারী। এখানে ছানার মিঠাই পাওয়া যায় না। তবে আমি বাঙ্গালী সাধুজীর গৃহে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রস্তুত ছানার মিঠাই পাইতাম। এখানে মুসলমান অতিকম; নাই, বলিলেই হয়।

পরদিন প্রাতে বেট দ্বারকা যাত্রা করিলাম। ইহাই নাকি আদি দ্বারকা। উহা সমুদ্র গর্ভের একটা দ্বীপ। বৃহৎ নৌকায় চড়িয়া তথায় যাইতে হয়। সেখানে গিয়াও শ্রাদ্ধ করিতে হয়। গোপীতালাও নামক একটী পুকুর আছে, তাহাতে স্নান করিয়া দেবদর্শন করিতে হয়। বাঙ্গালী ব্যতীত অন্যেরা দ্বারকা বা বেট দ্বারকায় শ্রাদ্ধ করে না। ক্ষুদ্র দ্বীপ বলিয়া এখানে দেব ভৃত্য, পূজারী ও দুএকটা দোকানী ব্যতীত অপর কেহ বাস করে না। ইহাদের কেহ কেহ সপরিবারেও বাস করে।

আমাদের দেশের বৈষ্ণবেরা যে মাটি দিয়া ফোঁটা তিলক করিয়া থাকেন, তাহা গোপীতালাও হইতে আনীত হইয়া থাকে। এখানে বাজারে উহা কিনিতে পাওয়া যায়। উল্কী দেওয়ার মত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামের ছাপ দিয়া অঙ্গে দেওয়া হয়। তাহা অতি ভক্ত ব্যতীত অপরেরা গ্রহণ করে না। দ্বারকা হইতে প্রাতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বেট দ্বারকার কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসা যায়। দ্বারকা ও বেট দ্বারকায় পাণ্ডাদের উপদ্রব না থাকিলেও রাজকর বা ট্যাক্স বড় জুলুম। এত অধিক কর অপর কোন তীর্থে নাই। সমুদ্রে স্নান করিলে, শ্রাদ্ধ করিলে, দেবদর্শন করিলে—বড় জুলুম কর দিতে হয়। ২৲, ৪৲ বা ৬৲ টাকা করিয়া এক এক স্থানে সেলামী দিতে হয়। তীর্থ যাত্রীর উপর বরদা রাজের ইহা এক প্রকার দৌরাত্ম্য বিশেষ। যাত্রীরা বাধ্য হইয়া তাহা দেয়। বরদা রাজ এ দিকে লক্ষ্য করিলে হিন্দু সাধারণের উপকার হয়। স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত যখন বরদা রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে এই অত্যাচারের কথা জানাইয়াছিলাম, তিনি আশ্বাস দিয়াছিলেন কিন্তু ফলে কিছু হয় নাই।

দ্বারকার দেবতা বা শ্রীকৃষ্ণকে রণছোড়জী কহে। দ্বারকা আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কোন্ রণ ত্যাগ করিয়া রণছোড়জী হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারিনা; হয়ত তিনি বৃন্দাবন হইতে শ্রীরাধিকার সঙ্গে প্রেমরণে পরাভূত হইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়াই রণছোড়জী হইয়া থাকিবেন।

সাধারণতঃ নৃপতিগণ বহু পত্নী রক্ষা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা হইয়া তদ্রূপ বহু পত্নী রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই এখনও রণছোড়জী পালা করিয়া এক এক পত্নীর আঙ্গিনায় তাহারই হেপাজতে বাস করেন। দ্বারকায় জলাভাব। "মিঠা কূয়া বা ভাল কূয়া একেবারেই নাই, "খাট্টা কূয়ার" জল পাওয়া যায়। দূর বর্ত্তী স্থান হইতে পাণীয় জল গো গাড়ীতে আনিয়া স্থানে স্থানে রক্ষা করা হয়; তাহা হইতে স্ত্রীপুরুষেরা জল লইয়া থাকে; এইরূপে সহরের জলাভাব দূর হয়।

এখানে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাব মোটেই নাই। এখন শুনিয়াছি, তাঁহাদের আড্ডা সেখানে হইয়াছে। ইহারা কোন কোন ধর্ম্ম বিশেষের অনিষ্ট করিলেও মানবের উপকার করিয়া থাকেন। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন সুদামাপুরী বা পুরবন্দর পর্য্যন্ত রেল ছিল না। এখন বোম্বাই হইতে সুদামাপুর পর্য্যন্ত রেলে যাওয়া যায়।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি, একজন বাঙ্গালী সপরিবারে সাধুজীর বাড়ীতে তীর্থ দর্শনার্থ আসিয়াছেন। পরদিন তাহাদিগকে লইয়া পুনরায় বেট দ্বারকা গেলাম। একবারের রোগী আর বারের ওঝা সাজিলাম। তাঁদের সব কাজ হইলে তাঁদেরই অনুরোধে আমাকে ফিরিবার সময় তাঁদের সঙ্গ লইতে হইল। আমরা তখন হাঁটা পথে সুদামাপুরী হইয়া গোষানে ভবনগর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। জঙ্গল ও

মরুভূমির উপর দিয়া সমুদ্র তীরের পথে যাইতে হইল। লোকালয় সে পথে অতিকম, প্রতিক্ষণেই আমাদের সকট চালক আমাদের উপর ডাকাত পড়িবার আশঙ্কা করিত। আমরাও তাহার কথা মত আড়ষ্ট হইয়া পড়িতাম। ফলে ডাকাত বা ডাকাতির কোন চিহ্ন আমাদের নয়ন গোচর হয় নাই। রাত্রিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে আশ্রয় লইয়া, অথবা অন্যান্য যাত্রী সহ একত্র হইয়া একস্থানে অবস্থান করিতাম। তারপর পুনরায় সকলে মিলিয়া পথ ধরিতাম।

এ প্রদেশের লোকেরা আমাদের অপেক্ষা স্বদেশী। নিজে বস্ত্র প্রস্তুত করে, তারা দেশী লবণ খায়। ইহারা সম্বর, পরভদ্রা প্রভৃতির নুণ খাইয়া থাকে। বিলাতি কোন দ্রব্যই তাহারা ব্যবহার না করিয়া পারে। মরুভূমির নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইলেও এ অঞ্চলে শস্য একপ্রকার মন্দ জন্মায় না। ইহাদের সামাজিকতা কতকটা আমাদের অনুরূপ। সধবা স্ত্রীলোকগণ ঘোমটা দেন না, বিধবারা দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশ অপেক্ষা এ প্রদেশে স্ত্রী স্বাধীনতা বেশী। ঘরের মেয়েদের পথে বাহির হইতে দেখা যায়, অপর পুরুষের সহিত আলাপ করিতেও বাধা নাই। এ দেশীয়েরা চাকরী অপেক্ষা ব্যবসাটা বেশী বুঝে। তুলা ও সূতার কল, কাপড়ের কল—এ দেশে খুব আছে। চাষের মধ্যে তুলার চাষ এ দেশে খুব বেশী। বাঙ্গালীরা এ দেশে আসিয়া এই সকল কলে চাকরী করে, কিন্তু কোন কালেরই স্বত্যাধিকারী বাঙ্গালী নহে। অন্য ব্যবসা সূত্রেও বাঙ্গালীকে এ দেশে পাওয়া যায় না। অথচ বোম্বাই ও রাজ পুতনার লোক বাঙ্গালার ধন লুটিয়া লইতেছে; সুতরাং "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

---

# গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব

## নূতন প্রমাণ।

### পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহেও প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কি?

মানুষ বাল্যকাল হইতেই অনুসন্ধিৎসা-প্রিয়। এই অনুসন্ধিৎসার মূলে চিত্ত বিনোদন যে অলক্ষ্যে বর্ত্তমান, তাহা কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। চিত্তের সন্তুষ্টির জন্য মানুষ এযাবৎ বহু অসাধ্য সাধন করিয়াছে; আরও যে কত করিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। বহু দিন হইতে মানব অন্যান্য গ্রহেও প্রাণী আছে কি না জানিবার জন্য উৎসুক। তাহার এই সমস্যা সমাধানের জন্য যিনি যখনই যাহা বলিয়াছেন তাহা সে উদগ্রীব হইয়া শুনিয়াছে। শিশুর জিজ্ঞাসায় ঠাকুরমার 'চাঁদের মা বুড়ীর কথা', প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। ঠাকুরমা ঘোলের স্বাদ অম্বলে মিঠাইয়া শিশুর চিত্তবিনোদন করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানীর তৃপ্তি তাহাতে মিটে কই। তাঁহার প্রজ্ঞা সকল সময়েই প্রামাণিক তত্ত্ব চায়। সম্প্রতি ফরাসী বিজ্ঞান ও ভেষজ পরিষদের অন্যতম সভ্য ডাক্তার গালিপে অন্যান্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে বিস্ময়কর নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা যে সুধীবৃন্দের প্রজ্ঞা চক্ষুর কিঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধন করিবে সন্দেহ নাই।

ডাক্তার গেলিপে তদীয় সহযোগী ডাক্তার সুকল্যাণ্ডের সহায়তায় ক্রম পরম্পরায় কতকগুলি পরীক্ষিণ ( Experin ont ) করিয়াছেন। ঐ গুলিকে তিনি প্রস্তরীভূত উদ্ভিদও প্রাণীদেহের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ রূপে বিশ্বাস করেন। ভূপৃষ্ঠে পতিত কোন কোন উল্কাপিণ্ডে এই সকল প্রস্তরীভূত দেহের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

## উল্কাপিণ্ড ও তারা খসা।

উল্কাপিণ্ড কাহাকে বলে সকলেই জানেন। কেহ কেহ ইহার ভূপতন—ক্রিয়াকে তারাখসা বলিয়া থাকেন। প্রতি রাত্রেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে এই উল্কাপিণ্ডগুলি ছোট তারা অর্থাৎ স্থানভ্রষ্ট বা কক্ষ্য চ্যুত

তারা নহে। এমনকি উহারা আদৌ তারাই নহে। মধ্যে মধ্যে ব্যোমবিহারীদেহী হইতে কৃষ্ণবর্ণ খণ্ড খণ্ড প্রস্তর সমূহ খসিয়া পড়িয়া এই ব্যাপার উৎপাদন করে। এই সকল প্রস্তর খণ্ডকে কোটী কোটী মাইল দূর হইতে অনন্ত আকাশের মধ্য দিয়া আসিতে হয়। এই দীর্ঘপথের প্রথম ভাগে ইহারা অদৃশ্য থাকে। মানবের পক্ষে যদি এই দীর্ঘযাত্রার প্রথম ভাগে ইহাদের অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকিত তথাপি ইহাদিগকে দেখা যাইত না। কারণ তখন ইহারা অতি শীতল অবস্থায় থাকে। পৃথিবীর বায়ু স্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর ইহারা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বহুদূর হইতে আপতন হেতু যে অমিত বেগ জন্মে, বায়ুর অন্যতর উপাদান অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্পের সহিত ঐ বেগের সংঘর্ষ বশতঃ এই প্রস্তর খণ্ডসকল জ্বলিয়া উঠে। তাহাতেই উহারা অগ্নিগোলকের ন্যায় দৃষ্টিপাত হয়।

ভূপতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই সংঘর্ষ অবসান ঘটে। সুতরাং পুনরায় উহারা কাল ও শীতল হয়। উহাদের এই পতনশীল অবস্থার নাম তারাছোটা। ভূপতিত হওয়ার পর উহারা উল্কাপিণ্ড নামে কথিত হয়। এইরূপ উল্কাপিণ্ড সহস্র সহস্র রহিয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তু-প্রদর্শনী যে কোন যাদুঘরে গেলেই তাহা প্রত্যক্ষ গোচর হইবে।

প্রথমে যখন এই উল্কাপিণ্ডগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষিত হইতে আরম্ভ হয় তখন পরীক্ষকগণ ইহাদিগকে জ্বলনশীল প্রস্তরখণ্ড বলিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন; অর্থাৎ অত্যন্ত তাপাধিক্য বশতঃ গলিত ধাতব পদার্থ ভিন্ন ইহারা অন্য কিছুই নহে এই মত পোষণ করিতেন।

কিন্তু এই সাদাসিধাগোছের পরীক্ষায় তাঁহারা বেশী দিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। শীঘ্র তাহাদের নিকট উল্কাপিণ্ডে ঔৎসুক্যের অধিক রহিল না। কহারা পূর্ব্বের মণ্ডল বর্ত্তমানেও এই পৃথিবীতে অন্যান্যটিদের এক মাত্র সংবাদ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাই, কয়েক যুগ ধরিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এই সংবাদ পত্রগুলি পাঠ করিয়া আরও কিছু উদ্ধার করিতে পারেন কি না তজ্জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন।

এই সকল উল্কাপিণ্ড হইতে ঠিক ঠিক কি কি সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে বৈজ্ঞানিক মহলে বহুকাল ব্যাপিয়া তাহা তর্কের বিষয় ছিল। বর্ত্তমানেও যে ঐরূপ তর্ক না আছে এমন নহে কিন্তু ডাক্তার এইচ্, এইচ্ বালুর মতে শেলিপ্পে ও সুকল্যাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক আবিষ্কার অনন্ত আকাশেও যে প্রাণ আছে বা কোন কালে ছিল তাহার অবিসংবাদী প্রমাণ।

তাঁহাদের পরিবীক্ষণ ( Experinets ) গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রকমের অনুবিক্ষনিক ও রাসায়ণিক বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ উল্কাপিণ্ডগুলিতে যে শুধু ষ্টারফিস্ (Starpish) ও সি-আর্চিন ( Sea urchin ) প্রভৃতি ক্রিনয়ড ( Crinoid ) জাতীয় এবং প্রবাল ও স্পঞ্জ জাতীয় নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীসমূহের বীতুভূত আকার আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নহে অধিকন্তু পিট ( Peat ) ও পাথুরিয়া কয়লা ( Coal ) ও যে উহাদের উপাদান তাহাও নির্ণিত হইয়াছে। সকলেই জানেন Peat ও পাথুরিয়া কয়লা উদ্ভিজ্জ পদার্থ। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি উল্কাতে জলের এবং অপর কতকগুলিতে অক্সিজেন অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

প্রস্তরখণ্ড সম্ভূত এই আবিষ্কারগুলি হইতে আমরা যে সংবাদ প্রাপ্ত হই তাহা সুসামঞ্জস্য, দ্বিধাশূন্য এবং বিস্ময়জনক। ইহারা, প্রস্তরখণ্ডগুলি অনন্ত অসীমের যে জগত হইতে স্খলিত হইয়াছে তাহা যে কেবল জীবাধিনাস্ভূত তাহাই প্রমাণ করিতেছে তাহা নহে পরন্তু ঐ জগৎ যে কোন কোন বিষয়ে আমাদের পৃথিবীরই অনুরূপ তাহাও প্রমাণ করিতেছে।

Crinoid প্রবাল এবং স্পঞ্জ গুলির গঠন আমাদের ভূপৃষ্ঠস্থ বর্ত্তমান Crinoid প্রবাল এবং স্পঞ্জের প্রায় অনুরূপ। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে এই দ্বিতীয় পৃথিবীতেও সমুদ্র ছিল। Peat ( পিট ) এবং পাথুরিয়া কয়লা প্রমাণিত হইতেছে যে উহাতে উদ্ভিদ এবং সম্ভবতঃ বৃহৎ অরণ্য ছিল। আর জল ও অক্সিজেন প্রমাণ করিতেছে যে উহাতে বায়ু মণ্ডলও ছিল।

এই উল্কাপিণ্ডগুলি যাহার অংশস্বরূপ তাহা কি প্রকারের জগৎ এবং কোথায় আবর্ত্তন করিতেছে? সেখানে কাহাদেরই বা প্রভুত্ব বর্ত্তমান? তাহারা কি মানুষেরই মত, অথবা তদপেক্ষা উচ্চ কিম্বা নীচ জাতীয় জীব? অথবা আমাদের অপরিজ্ঞাত রকমের অমবিকাশ সম্ভূত অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী? এবং সেজগতে খাটাইবা কি? ইত্যাদি প্রকারের প্রশ্নের উত্তরে অনুমান ভিন্ন উপায় নাই।

তবে উহার জীবসমূহের আকৃতি সম্বন্ধে আমরা দুইটা বিষয়ে বিচারসূত্রে নিশ্চিত। একটি, ইহার কতকাংশে আমাদের পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের অনুরূপ। পৃথিবীর crinoid জাতীয় প্রাণিদেহের সহিত উক্তজগতের crinid জাতীয় প্রাণীর প্রস্তরীভূত দেহের সাদৃশ্য এবং জল ও অক্সিজেনের অস্তিত্বই উহার প্রমাণ। জল এবং অক্সিজেনের অস্তিত্বে আরও প্রতিপন্ন হয় যে উক্তজগতের অবস্থা আমাদের পৃথিবীরই মত। অপরটী—আমরা নিশ্চয়তার সহিত বিশ্বাস করিতে পারি যে ঐ সকল প্রাণীর আকৃতি যেমন কোন কোন বিষয় আমাদের উক্ত জাতীয় প্রাণিগণের আকৃতির তুল্য তেমনি অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। কারণ, ক্রমবিকাশ সূত্রে তাহারা যে যে অবস্থার ভিতর দিয়া পরিণত প্রাপ্ত হয়, তাহা নিশ্চয়ই কোন কোন বিষয়ে তুল্য এবং অপরাপর বিষয়ে পৃথক।

## প্রস্তরীভূত প্রাণী ও উদ্ভিদ।

ভূপৃষ্ঠে যে সকল উল্কাপিণ্ড পতিত হইয়াছে তন্মধ্যে 'ন্যাহিন্যা' নামক উল্কাপিণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত এবং সকলের আলোচনা স্থানীয় হইয়াছে। হাঙ্গরীদেশের 'ন্যাহিন্যা' নামক সহরের নিকট উহা পতিত হইয়াছিল বলিয়া উহার উক্ত নামকরণ হইয়াছে। ডাক্তার ওটোহ্যান ইহাকে যত রকমে পরীক্ষা করিতে পারেন, তাহা করিয়াছেন; তজ্জন্য ইহার আর একটী নাম হইয়াছে "হ্যানমিটিয়র" (Hahn-meteor) বা হ্যান-পিণ্ড। তাঁহার মতে এই উল্কাপিণ্ডটী প্রধানতঃ বহু প্রস্তরীভূত প্রাণী ও উদ্ভিদে গঠিত। এই মত অবশ্য গত যুগের কথা। উনবিংশতাব্দীর মনীষীগণ কিন্তু বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

ডাক্তার বালো, হ্যানের মতের সমর্থন করেন না, বা 'হ্যানপিণ্ডের' উপরও তত আস্থাবান্ নহেন। 'হ্যানপিণ্ড সম্বন্ধে পূর্ব্বের ন্যায় এখনও মতানৈক্য বর্ত্তমান। বহু গণ্যমান্য বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা বলেন, তথাকথিত প্রস্তরীভূত দেহগুলি বালুকা কণার স্ফাটিক আকৃতি (crystallisation) বই নয়।

কিন্তু হ্যানের মতের প্রত্যাখ্যানেই বিষয়টী মীমাংসিত হইলনা। ফ্রান্সে, গেলিপ্পে এবং স্কল্যাণ্ড বর্ত্তমান সময়ে খুব আধুনিক ধরণের যন্ত্রাগারের (Laboratory সাহায্যে 'হ্যানপিণ্ডের" সহিত সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্পর্কিত অন্যান্য কতকগুলি উল্কাপিণ্ড অবলম্বন করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আরও আশ্চর্য্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অনেকেই যে বলেন, আমাদের পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহেও প্রাণী আছে, এই সিদ্ধান্তগুলিই তাহার ভিত্তি।

ধর্ম্মযাজক (Dean) ইঞ্জে বলেন, মানবের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতই মূল্যবান্ সম্পত্তি। তাঁহার মতে অন্য কোথায়ও এই প্রকার সত্যানুরক্তিতা, বুদ্ধি পরিচালিত, সুনিয়মিত পরিশ্রমে দৃঢ়বিশ্বাস এবং মূল্যবত্তাজ্ঞান, সূক্ষ্ম সঠিক পরিবীক্ষণ সিদ্ধ কল্পনার উধাও গতি দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিক সর্ব্বদাই এমন একরাজ্যে বাস করেন যেখানে সমস্তই সূক্ষ্ম, এবং পবিত্র সেখানকার বায়ু যেন পর্ব্বত শিখরস্থ প্রবহমান বায়ুরমত অতিসূক্ষ্ম, নির্ম্মল এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট। প্রকৃত বৈজ্ঞানিককে বালকোচিত উচ্চাশয়প্রিয়তায় অভিযুক্ত করা যাইতেপারেনা। তিনি অসীম বিশালত্বের চেয়ে দুরধিগম্য, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রেই অনুরক্ত বেশী।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ।

# ঘোড়া রোগ।

বি এ, পাস করিয়াও একটী মাত্র স্ত্রীর পেট পোষণ যে না করিতে পারে, তার জীবনের প্রয়োজন? প্রয়োজন নাই মনে করিলেই যে সব কর্ত্তব্য শেষ হইবে, তাহা নয়। প্রয়োজন করিয়া নিতে হইবে, সে যেমন করিয়াই হউক। তাই অভাবের মুখে সতীশ যাহা সম্মুখে পাইল, তাহাই অমূল্য আশ্রয় বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল।

শ্যামবাজার হাই স্কুলের হেডমাষ্টার করালী বাবুকে পিতৃবন্ধু দুইজন উকীল ও একজন হাইকোর্টের জজ দ্বারা বেজায় রকমে সুপারিসে পাকড়াও করিয়া সতীশ সেই স্কুলের ৩৫৲ টাকা বেতনে এসিষ্টান্ট শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিল।

শ্যামবাজারেরই একটা অতি নিকৃষ্ট চন্দ্র-সূর্য্যের সম্পর্ক শূন্য এবং মশা-মাছির উৎপাত পূর্ণ সংকীর্ণ অন্ধ গলিতে পাঁচ টাকায় একখানা কোঠা লইয়া সে কোন মতে তাহার যুবতী স্ত্রীটিকে লইয়া বাস করিতেছিল।

সতীশের স্ত্রী রাণী সৌভাগ্যে না হউক সৌন্দর্য্যে রাণীই ছিল; সংসারের কাজেকর্ম্মেও রাণী দাসীর চেয়ে অধম ছিল। এমন স্ত্রীরত্ন পাইয়া সতীশ পঁয়ত্রিশ টাকার এই সামান্য শিক্ষকতাকেই পরম আশ্রয় বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। বাস্তবিক সংসারে সহধর্ম্মিণী যাহার প্রিয়বাদিনী ও প্রিয়কর্ম্মিণী, অভাবের সংসারও তাহার শান্তির আগার।

রাণীর দুর্লভ স্বভাব গুণে সতীশ এই সামান্য আয়েতেই বেশ শান্তি-সুখে জীবনযাপন করিতে ছিল।

রাণী ভোরে উঠিয়া সংসারের সকল কাজ কর্ম্ম সমাধা করিয়া কয়লা ধরাইয়া রান্না চড়াইতেই সতীশ বাজার বেসাতি লইয়া ফিরিয়া আইসে; তারপর উভয়ে হাস্যামোদে একে অন্যের সাহায্যে রান্না শেষ করিয়া ফেলে। স্বামী ঠিক সময়ে স্কুলে চলিয়া যায়; রাণী নিজ কাজ গোছাইয়া অবসর গ্রহণ করে! তারপর স্বামীর আগমনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে।

স্বামী গৃহে আসিলে তাহার জল খাবারের যে দিন যাহা করিতে পারে, তাহা পরিবেশন করিয়া দিয়া প্রিয়বাদিনী পত্নী প্রীতি-প্রফুল্ল সম্ভাষণে স্বামীর শ্রান্ত-ক্লান্ত হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া দেয়।

এইরূপ প্রীতি ও প্রণয়ের পেলব স্পর্শে তাহাদের নবীন দাম্পত্য জীবন রাজধানীর নিত্যনূতন আকাঙ্ক্ষা ও লোভনীয় দ্রব্যের অভাবের মধ্যেও বেশ সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

( ২ )

সতীশের মনে কোনরূপ দৈন্য না থাকিলেও সে যখন তাহার এই সুন্দরী কর্ম্মক্লান্ত পত্নীটীর সদাহাস্য মুখের দিকে তাকাইত, তখন সে তাহার নিজ মনের ভিতর গভীর বেদনা অনুভব করিত। ... রাণী কেবল আমার জন্যই রাত্রি দিবা খাটিয়া তাহার সৌন্দর্য্যটাকে মাটি করিয়া দিল; আমি দুর্ভাগ্য স্বামী তাহার এই যৌবন কালের ভোগের বাসনাটাও কোনরূপ সম্ভোগনীয় দ্রব্য দ্বারা পরিতোষের চেষ্টা করিতে পারিলাম না! স্ত্রীলোকের যৌবনকালই ভোগের কাল। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সকলেরই ভোগের যথাযথ সময় আছে। থিয়েটার, সার্কাস, বায়স্কোপ, সিনেমা,—এ পল্লির কে না দেখিয়াছে? রাণীর কি তাহাতে সখ্ নাই? কোথায়, সে তো এক দিনের জন্যেও আমাকে মুখে আব্দার দেখাইয়াও বলে নাই যে—চল না একদিন থিয়েটারটাই দেখিয়া আসি!

বাস্তবিক রাণী তাহার গরীব স্বামীটীর নির্দ্দিষ্ট আয়টীকে এমনই পবিত্র বলিয়া মনে করিত যে তাহার একটী পয়সা তাহার নিজ ত্রুটীতে বৃথা ব্যয় হইলে সে নিজকে পরম অপরাধী বলিয়া মনে করিত।

সতীশ শীতের প্রারম্ভে এক দিন বলিল—"রাণী বড় বেজায় শীত পড়িয়াছে, তোমার জন্য একটা ফ্লানেলের সেমেজ তৈয়ার করাব; কি রকম কাপড় তুমি পছন্দ কর—লাল না সবুজ?"

রাণী বলিল "কোন দরকার নাই; সেমেজ আমি গায় দিব কখন? শীতের সময়তো উনুনের নিকটই কাটাই; তারপর কাজের ব্যস্ততায় শরীর বেশ গরম থাকে। তোমার না না দিকে যাইতে হয়; তোমারই বরং দরকার একটা ভাল জামার। তুমি একটা কাল বনাতের কোট প্রস্তুত করিয়া লও।"

সতীশ—"আমিইবা এমন কোথায় যাই? তোমার যদি প্রয়োজন না হয়, আমার কোন প্রয়োজনই নাই। আমার সাদা সার্টটাতেই আমাকে বেশ ভদ্র দেখায়। তোমার দুপরে এ বাড়ী, সে বাড়ী যাইতে হয়, পাড়ার মেয়েরা আসে ....."

রাণী হাসিয়া বলিল—"তাহারা কি আমার সেমেজ, বডিজ, দেখিতে আসিবে, না আমি তাই দেখাইতে যাইব?"

সতীশ বলিল থাক্, তুমি না চাও আমি আমার কর্ত্তব্য করিব—তোমার জন্য আমার পছন্দ মতই একটা সেমেজ প্রস্তুত করাইয়া আনিব।"

রাণী হাস্যমুখে বলিল—"না গো না, তা কখনো করিও না; বরং দোকান হইতে একটা আনিও, গায়ে লাগে, রাখিব; দামও কম হইবে..."

'তবে তাহাই করিব।"

( ৩ )

শনিবার! নূতন পদ্মা পার্কে স্কুলের মেয়েরা টেব্‌লো অভিনয় ( ইঙ্গিত অভিনয় ) করিবেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত মেয়েরা তাহা দেখিতে যাইবেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাছিয়া বাছিয়া টিকেট বিলি করা হইয়াছে। শ্যাম বাজার স্কুলের হেডমাষ্টারের নিকট দুইখানা টীকেট আসিয়াছে।

সতীশ নিতান্ত বেহায়ার মত হইয়া একখানার জন্য প্রার্থী হইল।

হেডমাষ্টার বলিলেন "আমার দুটী মেয়ে; সুতরাং দুখানারই আমার দরকার, তা এক খানা যদি আপনি নিতে চান নিন, আমার মেয়েদের তা হইলে আর যাওয়া হইবে না।"

সতীশ অপ্রতিভ হইয়া দাবী ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহার প্রবল ইচ্ছা রাণীকে সে ইঙ্গিত অভিনয় দেখাইবে এবং এই উপলক্ষে সেই অসূর্য্যম্পস্যা কোঠরাবদ্ধ প্রাণীটার গায়ে বাহিরের হাওয়া লাগাইয়া তাহাকে একটু সজীব ও স্ফূর্ত্তিপূর্ণ করিয়া আনিবে।

হেড্‌মাষ্টার সতীশের অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন—"তবে এক কাজ করুন, আমি হেড্‌মিষ্ট্রেসকে চিঠি লিখিয়া দেই, আপনি নিজে গিয়া আরএক খানা টিকেট সংগ্রহ করিয়া আনুন—দারোয়ান পাঠাইলে এই সকল কাজ হইবে না। ৪টায় আরম্ভ—মেয়েদের মেসামেসির এ এক ভয়ানক সুযোগ......"

সতীশ উৎসাহের সহিত স্বীকার করিল! হেডমাষ্টার চিঠি লিখিয়া দিলেন।

( ৪ )

"রাণী প্রস্তুত হও, আজ ৪টায় পদ্মাপার্কে মেয়েদের অভিনয়—এই নাও টিকেট!" বলিয়া সতীশ সোৎসাহে রাণীর মুখের উপর কার্ড খানা উড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া গায়ের চাদরটা গোছাইয়া লইয়া স্বীয় ঘর্ম্ম-ক্লান্ত শরীরে চাদরের বাতাস দিতে দিতে টেবিলের উপরিস্থিত টিক্ টিক্ শব্দকারী টাইমপিস্‌টির দিকে তাকাইয়া দেখিল।

রাণী স্বামী দত্ত কার্ড খানা সযত্নে মাটি হইতে কুড়াইয়া তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া সহাস্যে বলিল "কেবল টিকেট হইলেই কি অভিনয় দেখা হয়? অনর্থক কেন পয়সা গুলি ফেলিলে? আমি যাইবনা।"

"কেন যাইবে না? ওতে পয়সা খরচ হইবে না, হয়ও নাই। পয়সা না লাগিলেও কিন্তু খোসামোদ ও দৌড়াদৌড় এত করিয়াছি যে আমি চাকুরী লইতেও এত করি নাই! তার পর স্ত্রীলোকের নিকট খোসামোদ—অসহ্য খোসামোদ—সুতরাং যাইতেই হইবে......"

রাণী হাসিয়া বলিল—"হুকুমটা একটু চিন্তা করিয়া করিতে হয়! এই ধুয়াটে কাল কাপড় পরিয়া ঘরে থাকি বলিয়াকি সদরেও যাইতে পারি? এ নিয়া গেলে বসিতে দিবে দূরে থাকুক, দাসী বাঁদী বলিয়া—দাসীরাও আজকাল এমন কাপড় পরে না—পাগল বলিয়া তাড়াইয়া দিবে। বৃথা অপমান ডাকিয়া আনার চেয়ে ঘরে বসিয়া—তুমি আমাকে অপমান কর, আমি তোমাকে অগ্রাহ্য করি—এ ভাল!"

সতীশ হতাশ ভাবে বলিল—"তোমার কি ধলাই কাপড় একখানাও নাই?"

রাণী—"একখানা ধলাই কাপড় হইলেই কি এইরূপ একটা নিমন্ত্রণে দিনের বেলায় যাওয়া যায়? আমাদের গরীবের ঘোড়া রোগের দরকার নাই। কোন স্থানে যাইতে হইলে মান-মান্যাৎ রাখিয়া যাওয়াই উচিত—না গেলে যখন কোন ক্ষতি নাই......"

সতীশ চিন্তা করিয়া বলিল—"তা ঠিক, তবে একখানা কাপড় আমি আনিতেছি......"

"পরের বাড়ী হইতে ধার করিয়া আনিয়া সং সাজা অপেক্ষা না যাওয়াই সৎপরামর্শ। না গেলে আমাদের ক্ষতি কি?" বলিয়া রাণী হাসিয়া ফেলিল।

সতীশ বলিল—"যাইতেই হইবে। অনেক পরিশ্রম করিয়া টিকেট সংগ্রহ করিয়াছি। বিশেষ তোমাকে আমি এই কলিকাতায় থাকিয়াও কোন স্থানেই নিয়া কিছু দেখাইতে পারিলাম না, এ আমার একটা বড়ই আপষোশ,—বড়ই দুঃখ রহিয়াছে। আজ এটা দেখাইতেই হইবে। একখানা ধলাই কাপড়, একটী ব্লাউজ, হাতের কগাছা চুড়ী, এক গাছা নেক্‌লেস—এই হইলেইতো হয়? এখন দুটা বাজিয়াছে, এক ঘণ্টার মধ্যে এই চার পদ সংগ্রহ করিতে

হইবে। তুমি মিসেস দাসের বাড়ী একটীবার যাও, ঠাকুমার একটা নেক্‌লেস চাহিয়া লইয়া আইস। আমি বাকী তিনটার জোগাড় করিতেছি।

মিসেস দাস সতীশের গ্রাম সম্পর্কে ঠাকুর মা বা খুল্ল পিতামহী, এখানেও প্রতিবেসী।

রাণী হাসিয়া বলিল—"তথাপি পর্দ্দাপার্কে যাইতেই হইবে! এমন যাওয়ার মূল্য কি?"

সতীশ বলিল—"সে বিচারে তোমার প্রয়োজন নাই, আমি যা বলিতেছি তা কর। না গেলে আমি বড় কষ্ট পাইব—এ পাড়ার মেয়েরা দিন রাত থিয়েটার দেখিয়া মসগুল্, আর তোমাকে আমি…যাও, যাও।"

( ৫ )

সতীশ লাউ দাস এণ্ড কোং হইতে ৭৸৹ আনা দিয়া একটা ব্লাউজ কিনিল, ক্লিনিং হাউস হইতে আট আনা ভাড়ায় একখানা উৎকৃষ্ট ঢাকাই জামদানী লইল; আর এক বন্ধু হইতে বন্ধু পত্নীর চারগাছ সোণার চুড়ী লইয়া তিনটার পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিয়া আসিল।

সতীশ বাসায় আসিয়া দেখিল, রাণীও মিসেস দাসের গৃহ হইতে নিজ পছন্দমত বাছিয়া একটী মূল্যবান মুক্তার হার বাক্সশুদ্ধ লইয়া আসিয়াছে।

হারটী দেখিয়া সতীশ বলিল—"কাপড়, চুড়ী, ব্লাউজের সহিত এ হার মানাইবে কি? হারটা যে বেজায় উঁচু দরের। থাক্, এখন ধীরে ধীরে; সাজগুজ কর। ঠিক চারটায় বাহির হইতে হইবে। আমি যাই, হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসায়—জানাইয়া আসি, তাঁহার মেয়েদের সঙ্গেই তুমি যাইবে। অনর্থক দুটা টাকা যাতায়াতের গাড়ীভাড়া আর লাগাইব না। চার ছয় আনা খরচ করিয়া হেড্‌মাষ্টারের বাসায়ই দিয়া আসিব পারিবে না তাঁদের সঙ্গে যাইতে? না, সাহস পাও না?"

বাহিরে যাওয়ায় অনভ্যস্ত রাণীর মনে স্বামী ছাড়া অপরিচিতের সঙ্গে যাইতে প্রকৃতই সাহস হইতেছিল না। কিন্তু কি করে সে, দরিদ্র স্বামীর অভাবের অর্থ —তার পর—সেখানেতো আর পুরুষলোক যাইতে পারিবে না। রাণী অগত্যা বলিল—"দেখি, পারি কি না! কাঙ্গালের ঘোড়ারোগ জন্মানই ভাল নহে, যখন জন্মিয়াছে, তখন যেমন করিয়াই হউক তাহা দমন করিতেই হইবে।"

সতীশ হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসায় চলিয়া গেল।

( ৬ )

রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সতীশ হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসায় রাণীর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। দেওয়ালের ঘড়িতে দশটা বাজিলে হেড্‌মাষ্টার বাবু বলিলেন—"আর কতকাল বসিয়া থাকিবেন, আপনি বাসায় যান; ওদের প্রগ্রেম লম্বা; আমোদ প্রমোদের পর খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা আছে; সুতরাং আসিতে রাত্রি ঢের হইবে বলিয়া মনে হয়। আজ বরং তিনি মেয়েদের সঙ্গে এখানেই থাকিবেন, কাল দুপরে আহারের পর লইয়া যাইবেন।"

সতীশ হেড্‌মাষ্টার বাবুর শিষ্টাচারের নিকট মস্তক অবনত করিয়া বলিল—"থাক্, এত রাত্রিতে আর যাইয়া কাজই নাই। কিন্তু কাল ভোরে না লইয়া গেলে আমাদের আহার বন্ধ……"

হেড্‌মাষ্টার বলিলেন—"তবে কাল ভোরেই লইয়া যাইবেন।"

সতীশ দোকান হইতে খাবার কিনিয়া লইয়া বাসায় ফিরিল এবং আহার করিয়া নিদ্রার ব্যবস্থা করিল

পত্নীকে আজ পর্দ্দা পার্কে পাঠাইতে পারিয়া সতীশ তাহার বুকের বোঝা যেন অনেকখানি লাঘব করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার এত উদ্যম যে সে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া সে আজ পরম উৎসাহী। এই ব্যাপারে যে আট দশ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা কষ্টসাধ্য অপব্যয় হইলেও রাণীর জন্য সে করিতে পারে, এবং করা উচিত। তবে এত দিন যে করিতে পারে নাই, তাহার কারণ রাণীই তাহাকে তাহা করিতে সুযোগ দেয় নাই।

রাণী নিজ আকাঙ্ক্ষা আব্দার চরিতার্থ করিতে তাহার দরিদ্র স্বামীকে ইঙ্গিতেও কখন পীড়ন করে নাই; এ বিষয়ে সে ছিল অতি সাবধান।

( ৭ )

সতীশ ভোরে হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসায় যাইয়া যাহা শুনিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

হেড্‌মাষ্টার বলিলেন—"আপনার স্ত্রীর গলার হার কাল রাত্রিতে খোয়া গিয়াছে। কোথায়, কোন্ সময়, কি প্রকারে তাহা কণ্ঠচ্যুত হইয়াছে—তাহা তিনি একেবারেই বলিতে পারেন না।"

সতীশ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিল. আর ফেল্ ফেল্ করিয়া হেড্‌মাষ্টারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না।

হেড্‌মাষ্টার বাবু বলিলেন—"আপনি ওঁকে লইয়া একবার পার্কে যান. যদি কোথাও ছিঁড়িয়া পড়িয়া থাকে, এই সময়—ভোর বেলায় পাইতে পারেন। কোন্ দিকে তাঁহারা ছিলেন, কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন—সবটা যায়গা দেখিয়া আসুন।"

সতীশ তাহাই করিল। স্ত্রীকে লইয়া গাড়ীতে পর্দা পার্কে যাইয়া যে যে দিকে তাহারা গিয়াছিল, যে স্থানে বসিয়া অভিনয় দেখিয়াছিল যে স্থানে জলযোগ করিয়াছিল—ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পতি-পত্নী তাহা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল; মুক্তার একটা রেণুকণাও তাহাদের চক্ষে পড়িল না।

রাণীর দুইচক্ষু ছাপিয়া জল পড়িতেছিল; আর সে মুখে শুধু বলিতেছিল—"কি হ'বে গো আমার—উপায় কি হবে।"

সান্ত্বনা নাই। তবু সতীশ রাণীর অবস্থা চিন্তা করিয়া নিজের মনের ভিতর কোন প্রকারে সান্ত্বনা আনিল—জিনিসের ক্ষতি তো হইয়াছেই, এ ক্ষতি তো পূরণ করিতেই হইবে। কিন্তু ইহার উপর এই দুশ্চিন্তায় স্ত্রীটীও যদি পাগল হইয়া উঠে।

সতীশ রাণীকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"কোন চিন্তা নাই রাণী, তুমি এত ঘাবড়াইও না; না হয় ঋণ করিয়া একটা নূতন কিনিয়া ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিব। চার বৎসরে পারি, ছয় বৎসরে পারি, ঋণ শোধ করিব। না হয়, আরো কষ্ট করিব। খোলার ঘরে থাকিব; তথাপি ব্যাকুল হইয়া মাথা নষ্ট করিও না। ভগবান আমাদের ব্যবস্থা যাহা করিবেন, ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা হইবেই। এখন দুই একটা কথা স্মরণ হয় কি না, দেখ দেখি! তুমি কি রাত্রিতে গলার হারের কোন খোজই নেও নাই—প্রথম জানিলে কখন?"

রাণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল—"হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসায় গিয়াও হারটা আমার গলায় আমি দেখিয়াছি.."

সতীশ—"তবে তাঁহারা এরূপ বলেন কেন?"

রাণী—"তাঁহারা সন্দেহ করেন, পার্কেই ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে।"

সতীশ—"তুমি ঠিক জান, তাঁহাদের বাসায় গিয়াও তোমার গলায় হার দেখিয়াছ?"

রাণী বলিল—"হাঁ ঘুমাইবার পূর্ব্বেও আমি হারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি; আর কেউ দেখিয়াছে কি না বলিতে পারি না।"

সতীশ—"তুমি যদি নিশ্চয় জান এবং বল যে তুমি ঘুমাইবার পূর্ব্বক্ষণেও হার গলায় দেখিয়াছ, তবে আর বৃথা পার্কে ঘুরিয়া ফিরি কেন রাত্রিকার ভাড়াটীয়া গাড়ীর খোজ লইবারইবা কি প্রয়োজন! চল বাড়ী যাই!"

রাণী কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সতীশ তাহাকে খুব মোলায়েম ভাবে সান্ত্বনা করিয়া অভয় বাক্যে বলিল—"তোমার কোন দোষ নাই রাণী, আমি যদি কাল রাত্রিতেই তোমাকে লইয়া যাইতাম, তবেই আর এ সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘটিত না। এ আমারই দোষে ঘটিয়াছে—এ জন্য দায়ী আমি......"

রাণীর কান্না থামিল না। সতীশ তাহাকে লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। তাহার অটল বিশ্বাস জন্মিল—হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসারই তাঁহার কোন সম্পর্কীয় লোক রাণীর ঘুমের মধ্যে তাহার গলা হইতে হার ছড়া অপহরণ করিয়াছে। উপায় নাই! এ লইয়া গোলমাল করিলে কোন ফল হইবে না—মাত্র হেড্‌মাষ্টার বাবুকে লজ্জিত করা হইবে। যে চুরি করিয়াছে, সে অবশ্য এখনও তাহা আগলাইয়া লইয়া বসিয়া রহে নাই। রাত্রিতেই সরাইয়া ফেলিয়াছে।

সতীশ রাণীর ভবিষ্যৎ আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"ভগবান আমাদিগের দণ্ড করিয়াও তাঁহার আর এক জন অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীর আশা পূর্ণ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, তাই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুনরায় যেদিন প্রয়োজন বুঝিবেন,

আমাদিগকেও এইরূপ উপায়ে বা কোন উন্নত উপায়ে অভাব পূরণ করিয়া দিবেন। ভগবান তাঁহার সংসারে এই উপায়েই দেওয়া নেওয়ার অভিনয় করিয়া থাকেন। চিন্তা করিয়া মাথা নষ্ট করিও না; অগ্রই আমি ইহার প্রতিকার চেষ্টা করিব।"

( ৮ )

নেকলেসের বাক্সটীতে সাওয়ালেসের দোকানের লেভেল আটা ছিল। সতীশ স্কুল কামাই করিয়া সেই বাক্স লইয়া দোকানে গেল।

'হারটীর দাম কতছিল?" জিজ্ঞাসা করায় দোকানের লোক তাহাদের খাতা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া জানাইল—হারের শুধু বাক্সটীই তাহারা বিক্রয় করিয়াছিল, হার বিক্রয় করে নাই।

সতীশ সে দিন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

রাণী বলিল—"আমার কি উপায় হবে গো! কেন আমি এমন কাজ করিয়াছিলাম?"

সতীশ বলিল—"তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি মিসেস দাসকে বলিয়া আসিয়াছি, আমাদের আর একটি নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে, সুতরাং হারটা আরো দু সপ্তাহ পরে ফেরত দিব; তিনি সম্মত হইয়াছেন। এই পনরদিনে আমরা যেমন করি যাই হয় একটা হার সংগ্রহ করিবই।"

সতীশ প্রতিদিনই কলিকাতার বড় বড় জুয়েলারি দোকান গুলিতে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিল কিন্তু কোথাও তেমন মুক্তার হারপাইল না।

সিংহলের এক মুক্তা ব্যবসায়ী বড় বাজারে মুক্তার মালা বিক্রয় করে; সে ইচ্ছা করিলে যে কোন পেটার্ণের হার প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে—এক বন্ধুর নিকট এই আশাপ্রদ সংবাদ পাইয়া সতীশ পরম উৎসাহে সেই ব্যবসায়ীকে যাইয়া খুজিয়া বাহির করিল।

ব্যবসায়ী তাহার বাক্সটী দেখিয়া তাহাকে কতগুলি উৎকৃষ্ট মুক্তার মালা দেখাইল। একটী হার দেখিয়া তাহার মনে হইল, এ হারটীই যেন ছিল রাণীর গলায়। সে সন্দেহ করিয়া হারটী সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিল শেষে তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বিক্রেতা বলিল—"আড়াই হাজার।"

শুনিয়া সতীশ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। বিক্রেতা বলিল "চাই কি?"

সতীশ বলিল—"চাই; কিন্তু এত মূল্য দিতে পারিব না। তা ছাড়া হারটী একবার আমার স্ত্রীকেও দেখান দরকার..."

বিক্রেতা বলিল—"এগুলি সৌখিন জিনিস, যাহারা নিজে সৌখিন, মূল্য সম্বন্ধে চিন্তা করেন না, কেবল তাঁহারাই ইহা লইয়া থাকেন। মূল্য কম হইবে না।"

আড়াই হাজার টাকার সংস্থান দরিদ্র শিক্ষকের কোথা হইতে হইবে? পৈত্রিক ভিটাবাড়ী বন্ধক রাখিয়া যদিও হইতে পারে, তাহার পরিশোধের উপায় কি? সতীশের চিন্তার শেষ নাই।

রাণীকে সতীশ এ চিন্তার রাজ্যে আনিল না; রাত্রিতেই তাহাদের দেশের এক ধণী মহাজনের নিকট জমিবাড়ী রেহান রাখিয়া আড়াই হাজার টাকা কর্জ্জের প্রস্তাব করিল। পরিচিত মহাজন সতীশের চিন্তার ভার লাঘব করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আসিয়া সতীশ কয়েকটী মুক্তার হার সহ সেই ব্যবসায়ীকে একখানা গাড়ী করিয়া তাহার বাড়ী লইয়া গেল। পথে সে অম্লান বদনে তাহার বিপদের ইতিহাস সেই ব্যবসায়ীর নিকট জানাইয়া তাহার নিকট মূল্য সম্বন্ধে কিছু অনুগ্রহ ভিক্ষা চাহিল।

মিসেস দাসের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া গাড়ী যাইবার সময় সেই বাড়ীটিও সে দেখাইতে তাহাকে ছাড়িল না। মুক্তা ব্যবসায়ীর মন, দেখা যাউক তাহাতে একটু টলে কি না। বিপন্নের ব্যথিত প্রাণের যুক্তি এমনি সরস!

রাণী মুক্তার হারটী দেখিয়াই বলিল "হঁা ঠিক এইরূপ হারটিই ছিল ঠাকুরমার।"

সতীশ রাণীর গলায় হারটি ঝুলাইয়া দিয়া তাহার পরিমাণ করিল।

রাণী বলিল—"আর একটু লম্বাছিল; ঠিক আমার এই স্থান পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িত।"

ব্যবসায়ী বলিল—"লম্বা যতদূর চান তা বরং করিয়া দিব, মূল্য কমাইতে পারিব না।"

রাণী সতীশকে জিজ্ঞাসা করিল—"মূল্য কত?"

সতীশ রাণীর প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। পরদিন হারটি ক্রয় করিয়া আনিয়া পথেই মিসেস দাসের বাড়ী বুঝাইয়া দিয়া আসিল।

( ৯ )

ছয় বৎসর চলিয়া গিয়াছে সতীশ ঋণের সুদ পরিশোধ করিতে যাইয়া হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছে। রাণীর ক্রমে দুটি সন্তান জন্মিয়াছে। সংসারের অনটন চিন্তায় রাণীর সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য চিরতরে নষ্ট হইয়াগিয়াছে।

পরিবার বৃদ্ধির ও ঋণের দুর্ভাবনার তাড়নায় সতীশ কলিকাতার পঁয়ত্রিশ টাকার চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া মফস্বলে আসিয়া ষাইট টাকায় চাকুরী লইয়াছিল এবং অতি দীন ভাবে স্ত্রীপুত্র কন্যা লইয়া নীরবে জীবন যাপন করিয়া নিজ অবিমৃশ্যকারিতার ফল ভোগ করিতেছিল।

আশ্বিনমাস। পূজা আসিয়াছে, এ সময় বাঙ্গালী মাত্রেরই মনে আনন্দ। কিন্তু সতীশের তাহাতে আনন্দ নাই। স্ত্রী পুত্রকে সংসার জীবনে যে একটু আনন্দের স্বাদ না দিতে পারে, সে দুর্ভাগ্যের জীবনে সুখ কোথায়?

রাণীর কিন্তু জীবন তখন যেমন, এখনও তেমনই চলিয়াছে। স্বামীটিকে পীড়ন করিয়া সে কোনদিন সুখের কল্পনা করে নাই। এ দুঃখ তো আজ তার নিজের অসাবধানতাতেই ঘটিয়াছে। সুতরাং সে তাহার ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কুড়িতেই বুড়ি সাজিয়া পতিদেবতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়াই শান্তিলাভ করিতেছে।

পূজার বন্ধে সতীশ সপরিবারে বাড়ী আসিয়াছে॥

একদিন সে গৃহে বসিয়া তাহার সামান্য যে জমি জমাটুকু আছে তাহারই হিসাব নিকাশ করিতেছিল; এমন সময় তাহার ছয় বৎসর বয়সের ছেলেটি দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে জানাইল। "বাবা. দেখ আসিয়া একটি মেয়ে মানুষে জুতা পায়ে দিয়া, চসমা চোখে দিয়া আসিয়াছে।"

সতীশ বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল—মিসেস দাস।

মিসেস দাসকে দেখিয়া সতীশের মন আগে যেমন ভক্তি ও প্রীতিরভাবে নাচিয়া উঠিত, আজ আর তেমন হইল না। বোধ হয় তাহার মনে হইল, হায়, এই লোকটার জন্যই তো আজ জীবনে আমরা যত কিছু অশান্তি ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছি। তারপরেই যেন সতীশের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—ছিঃ ইঁহার দোষ কি?

সতীশ মিসেস দাসকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল। এদিকে সতীশের পূর্ব্বেই রাণী আসিয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ঠাকুর মা রাণীর মুখের দিকে নিজ বিস্মিত চক্ষু দুটি রাখিয়া বলিলেন—"একি রাণী বৌ তোর চেহারা এমন বিশ্রী..."

এই সময় সতীশ আসিয়া প্রণাম করিয়া প্রশ্নটার উত্তর দিল—"ঠাকুরমার মুক্তার মালার যে কি বিষ ছিল.."

মিসেস দাস সতীশের মুখের দিকে একবার ও রাণীর মুখের দিকে একবার চাহিতে চাহিতে বলিলেন—"কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না রে. তোদের কথা সতীশ! আহা কেমন সুন্দর মুখ খানা ছিল রাণী বৌর..."

এতদিন পরে ঘটনাটী খুলিয়া বলিতে সতীশের মনে ও মুখে আর আটকাইল না। সে ঠাকুরমাকে তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার আনিয়া বাহিরে বসিতেদিয়া সেই মুক্তার হারটী হারাইয়া যাইবার গল্পটী এবং তাহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্য সে যে পন্থা অবলম্বন করিয়া জমি বাড়ী বন্ধক রাখিয়া আজ বৎসর ৬।৭ যাবত ঘোর দুর্দ্দশায় কাল যাপন করিতেছে, তাহা অবিকল বিবৃত করিল।

শুনিয়া ঠাকুর মা বলিলেন—"ছি, ছি, তুমি এমন একটা কাজ বিনা পরামর্শে করিলে সতীশ, একটীবার আমাকে শুনাইলে না! আরে, সে মালাটী যে ছিল নকল মুক্তার! মিঃ দাস বিজিগাপট্টম থাকিতে মাত্র কুড়ি টাকায় কিনিয়াছিলেন! .."

অগাধ জলে একটু আশ্রয় লাভের আভাষ পাইলে মানুষের নিরাশ মনে যেমন আশার সঞ্চার হয় সতীশ সেইরূপ আশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমি যে হার ছড়া আড়াই হাজারে কিনিয়া দিয়া ছিলাম,সে ছড়াটা..."

মিসেস দাস সতীশের কথার ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"তুমি সেটি ফেরত দিলে আমি আর খুলিয়া তাহা দেখি নাই। তার দুদিন কি একদিন বাদেই একটা সিংহলী বণিক আসিয়া তাহা তিন শত টাকায় ক্রয় করিয়া লইয়া গেল—আমি বেশ্ চড়া দাম দেখিয়া ..."

রাণী কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল—"ঠাকুর মা একেই বলে কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ।"*

* একটী বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

# ময়মনসিংহের প্রাচীন কাহিনী।

## ডাকাইতের কথা।

৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে দেশে সর্ব্বত্র দস্যু ডাকাইতের ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব ছিল। রাত্রে ডাকাতির তো কথাই ছিলনা, ঘাটে মাঠে দিনে দুপরেও ডাকাতি চলিত। সে সময় গয়া-কাশী প্রভৃতি দূরদেশে যাইতে হইলে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইত। যাওয়ার সময় বন্ধু বান্ধবের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া জীবনের সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে হইত। কারণ তখনকার দিনে ডাকাইতের হাতে পড়া আর যমের হাতে পড়া একই কথা। সে সময় পথিক কি যাত্রিগণ ডাকাইতদিগকে টাকা পয়সা সমস্ত দিয়া প্রাণ ভিক্ষা মাগিলেও তাহারা খুন না করিয়া একটী পয়সাও গ্রহণ করিত না। খুন না করিলে তাহাদের বীরত্ব বজায় থাকে না মনে করিত এবং ভবিষ্যতে ডাকাতি প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কাও করিত। সুতরাং সে সময় ডাকাইতের হাতে পড়িলে ধন প্রাণ উভয়ের আশাই বিসর্জন দিতে হইত।

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তখন আমি সারদীয় পূজার সময় নৌকাযোগে ময়মনসিংহ হইতে বাড়ী যাইতে ছিলাম। পদ্মানদী পাবি দিয়া যাইতে হইত সুতরাং ফরিদপুরের মুসলমান মাঝির এক বড় নৌকা ভাড়া করিয়া লইলাম।

লক্ষানদীর এক ডালার বাঁকে পর্য্যন্ত গিয়াছি, তখন রাত্রি প্রায় একটা। ঐ নদীর ঐ বাঁক পরিসরে খুব অধিক এবং উহার নিকটবর্ত্তী স্থান একেবারেই মনুষ্যালয় শূন্য। এস্থান অতি ভয়ঙ্কর, তৎকালে এখানে প্রধান প্রধান ডাকাইতের আড্ডাছিল। আমি নৌকার মধ্যে জাগ্রৎ অবস্থায় আছি, এমন সময় অদূরে ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিতে লাগিলাম। বাবারে, গেলামরে, বলিয়া একটা বিকট হৈচৈ পড়িয়াগেল। "কর্ত্তা! জাগেন কি?" বলিয়া আমরা নৌকার একজন দাঁড়ী আমাকে সাড়া দিতেই, মাঝি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, চুপকর, কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গিস না। আমি ব্যস্ত, হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম মাঝি! ব্যাপার কি? মাঝি বলিল না কর্ত্তা কিছুনা, ঘুমাইয়া থাকুন, ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম। চক্ষুঃ স্থির হইয়া আসিল, হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, প্রাণের ভয়ে কম্পিত কণ্ঠে ভগানের নাম নিতে আরম্ভ করিলাম। ইত্যবসরে ডাকাইতের নৌকা আমাদের নৌকার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন ডাকাইত গর্ব্বিত স্বরে বলিল ওরে মাঝি! তোমাদের নৌকা কিসের।" মাঝি উত্তর দিল আমাদের নৌকা কাঠের।" ডাকাইত বলিল "ওরে বেটা নৌকাতো কাঠেরই থাকে, উহাতে আর কি আছে? মাঝি বলিল "সুধুকাঠে কি নৌকাহয়, ইহাতে আর আছে লোহা।" এই উত্তরে ডাকাইতেরা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল "বেটা ঠাট্টাকর, এই দেখ তার প্রতিফল।" এই বলিয়া তাহারা আমাদের নৌকা ধরিয়া মাঝির মুখের দিকে তাকাইয়া মাথা হেট করিল। কেবল মাথা হেট নহে, প্রত্যেকেই একে একে সেলাম ঠুকিতে আরম্ভ করিল। আমি মনে করিলাম, ইহা একপ্রকার ঠাট্টা। সেলাম ঠোকার পরেই তরবারি ঠুকিয়া মাঝির আত্মা বাহির করিয়া দিবে। কিন্তু আমার অনুমান মিথ্যা হইল। বড় মিঞা সেলাম, বলিয়া প্রত্যেকেই মাঝিকে ভক্তিভরে বার বার সেলাম করিতে লাগিল।

সেলামের পর তাহারা বলিল "মিঞাসাহেব! আপনার এ অবস্থা কেন।" মাঝি বলিল, আরে আমি অনেকদিন হইতে ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছি, ও ব্যবসায় কাঁপে না, পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।

ডাকাইতেরা যাওয়ার সময় হাত যোড় করিয়া বলিল বড় মিঞা! অনেক বেয়াদবি করিয়াছি, মাপ করিবেন। মাঝি হাসিতে হাসিতে বলিল আরে যাঃ যাঃ সালারা আর নেকামি করিস না। মাঝির এই শালা সম্বোধনে ডাকাইতেরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া পরিল। হাস্যমুখে আবার সেলাম দিতে দিতে বিদায় হইয়াগেল। বাচিলাম বলিয়া আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিলাম মাঝি! কিছু কিছু বুঝিতে পারিলেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিনাই, বল দেখি ইহারা তোমাকে এত ভক্তি শ্রদ্ধা করিল কেন! মাঝি বলিল কর্ত্তাঃ আপনে বড় ভয় পাইয়াছিলেন কার ঘাড়ে দুটা মাথা যে আমার নৌকায় ডাকাতি করিতে আসে। আমার ও একদিন এই ব্যবসাছিল, এরা সকলেই আমার সাগরিতেরও সাগরিত।" আমি তখন মাঝির কথায় নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলাম।

# প্রজাস্বত্ব আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গীয় প্রজা স্বত্ব বিষয়ক আইনের পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে একটা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপি শীঘ্রই ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা হইবে। প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট জন সাধারণের অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে ইহার উদ্দেশ্য এবং কার্য্য কারিতা সম্পর্কে দুই একটা কথা বলিব। সৌরভের পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রজাস্বত্ব আইনের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তৎকালীন সমাজে রাজার সহিত প্রত্যক্ষভাবে প্রজার সম্বন্ধ ছিল। রাজা ও প্রজার মধ্যে এখনকার জমিদার ও তালুকদারের ন্যায় মধ্য স্বত্ববিশিষ্ট কোন ভূম্যধিকারীর অস্তিত্ব ছিল না। প্রজা রাজস্ব স্বরূপে উৎপন্ন ফসলের ন্যূনাধিক এক ষষ্ঠাংশ প্রদান করিত। রাজা প্রজাকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন এবং শৃঙ্খলার সহিত দেশ শাসন করিতেন। তখন সমগ্র দেশ বহু সংখ্যক স্বনিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে বিভক্ত ছিল। এক একটী গ্রাম এক একটী স্বতন্ত্র কেন্দ্র ছিল। গ্রাম্য মণ্ডল বা মোড়ল ছিল প্রত্যেক কেন্দ্রে সভাপতি। গ্রামের শাসনও বিচার সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য্য গ্রাম্য লোক নিরপেক্ষ ভাবে রাজ-সাহায্য ব্যতীত নিজেরাই সুসম্পন্ন করিত। Sir Henry Maine প্রমুখ পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন প্রকৃত প্রজা তন্ত্র শাসন প্রণালী প্রাচীন ভারতেই সর্ব্বাগ্রে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গ্রামের মণ্ডলগণ উৎপন্ন ফসলের নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিত। গ্রামের ভূমি ছিল তখন অধিবাসী জন সাধারণের সম্পত্তি। মণ্ডল গ্রামের জমি নিজ গ্রামের অধিবাসীদিগকে ভাগ করিয়া দিত। ভিন্ন গ্রামের লোক জমি পাইত না। কেননা চাষী জমির পরিমাণ লোকের অনুপাতে অল্প ছিল। সেই প্রাচীন যুগে কৃষি ছিল জীবিকার্জ্জনের একমাত্র উপায়। তখনও শিল্প বাণিজ্যের প্রসার হয় নাই। তাই আমরা প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি বশিষ্ঠ পরাসর প্রভৃতি ঋষি এবং জনকের ন্যায় রাজর্ষিরা ও ভূমিকর্ষণ করিতেন। সেই সময় শ্রমিক শ্রেণীর (labourclass) উদ্ভব হয় নাই। কাল ক্রমে যখন সমাজের উন্নতি হইল, শিল্প বাণিজ্য বিস্তৃত হইল, তখন নানাবিধ ব্যবসায়ের সৃষ্টি হওয়ায় উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা কৃষি ব্যবসায় ত্যাগ করিলেন। সেই সময়ে চাষের জন্য ভিন্ন গ্রামের লোকদিগকে ও ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইত। গ্রামের অধিবাসী প্রজারা নির্দ্দিষ্ট খাজানা আদায় করিলে পুরুষানুক্রমে জমিদখল করিতে পারিত; তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা যাইত না। কিন্তু ভিন্ন গ্রামের কৃষকগণের এরূপ স্বত্ব উদ্ভব হইত না। যখন প্রয়োজন হইত তখনই ভিন্ন গ্রামের প্রজাদিগকে উচ্ছেদ করা হইত। ইহাই ছিল সেকালের প্রথা ( Customs ) বা ব্যবস্থা। ( Common Law ) পরবর্ত্তীকালে ইংরেজ আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রামের অধিবাসী প্রজারা "খোদখাস্ত" এবং ভিন্ন গ্রামের প্রজারা 'পাইখাস্ত' নামে অভিহিত হইত।

মুসলমানগণ যখন এই দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন তখনও বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত সেই ভাবেই রাজকার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল। তখনও গ্রাম্য-সমিতি ( Village Communities ) স্বীয় আভ্যন্তরীন শাসন কার্য্য পরিচালন করিত। রাষ্ট্র বিপ্লব এবং অরাজকতার মধ্যেও গ্রাম্য সমিতি নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু মোগল শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার কিছুদিন পরে সুশৃঙ্খল ও স্বনিয়ন্ত্রিত গ্রাম্য সমিতি গুলি জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। মোগল সম্রাটগণ পাঠান রাজাদিগের চেয়ে অধিকতর বিলাসী ও অপরিমিত ব্যয়ী ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাদিগের অর্থের ও অধিকতর প্রয়োজন ছিল। বিশেষতঃ পাঠান শাসন মোগল শাসনের ন্যায় বিস্তৃত হয় নাই বলিয়া তৎকালে জনসাধারণ নির্ভীক ও তেজস্বী ছিল। যদৃচ্ছা কর আদায় করা পাঠান রাজাদিগের পক্ষে অসাধ্য ছিল। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য মোগল সম্রাটগণ জমিদারের সৃষ্টি করিলেন। প্রত্যেক পরগণার রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারগণ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা পরগণার কর সংগ্রহের চুক্তি গ্রহণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা তাঁহাদিগেরই লাভ থাকিত। জমিদারগণ রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করিতে পারিতেন ততই তাঁহাদের লাভের মাত্রা বৃদ্ধি হইত।

সুতরাং তখন যে ভীষণ প্রজা পীড়ন হইত সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ইংরেজগণ বাঙ্গালার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া সাবেক বন্দোবস্ত বহাল রাখিলেন, তাঁহারাও জমিদারদিগের সহিত রাজস্ব আদায়ের চুক্তি করিলেন। ফল হইলপ্রজার সর্ব্বনাশ। ইংরেজগণ এ দেশ জয় করিয়া রাজ্যের মালীক হইলেন। ভূমির স্বত্ব হইল রাজার। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ হইতে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূমিতে রাজার স্বত্ব অক্ষুন্ন রহিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইল। ইহার ফলে জমিদার ও খারিজা তালুকদারগণের (independent talukdar) রাজস্ব চিরদিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ সঙ্গে ভূমির সর্ব্বস্বত্ব অর্থাৎ দান বিক্রয় ও অন্যবিধ প্রকারে হস্তান্তরের অধিকার পূর্ব্বোক্ত জমিদার ও তালুকদারগণ প্রাপ্ত হইলেন। প্রজার অবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল পরে তদপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় হইল। পূর্ব্বে যাহারা রাজস্বের সংগ্রাহক মাত্র ছিলেন তাহারা হইলেন ভূমির মালীক। সুতরাং প্রজার উপর তাহাদের উৎপীড়নের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। বঙ্গীয় প্রজার দুঃখের কাহিনী তৎকালে স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎপ্রণীত Bengal ryot. নামক গ্রন্থে ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বিবৃত করিয়াছিলেন। সেই চিত্র অঙ্কিত করিয়া কোন ফল নাই। এখন জমিদারগণের সেই অত্যাচার আর নাই। মাথট, পার্ব্বনি, আবওয়াব ইত্যাদি এখন সব উঠিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে উৎপীড়ক জমিদারের সংখ্যা অতি বিরল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তনকালে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১ আইনের ৮ধারায় গবর্ণমেণ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ভবিষ্যতে অসহায় অধীন তালুকদার ও প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনানুসারে গবর্ণমেণ্ট নূতন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। তাহার বলে প্রজার হিতের জন্য গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে প্রজার বিশেষ উপকার হয় নাই। সে কালের প্রবল জমিদারদিগের বিরুদ্ধে সেই আইন কার্য্যকরী হয় নাই। তাহা গবর্ণমেণ্টের সাধু ইচ্ছার চিহ্ন স্বরূপে গ্রন্থেই আবদ্ধ ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তনের ৬৬ বৎসর পর ১৮৫৯ সনের ১০ আইনে প্রজার প্রকৃত হিত সাধিত হইল। দশ আইনের বলেই মালীকের খামার জমি ব্যতীত অন্য জমিতে দ্বাদশ বৎসর কাল দখিলকার থাকিলে তাহাতে প্রজার জোত স্বত্ব উদ্ভব হইত। এই প্রথম জোত স্বত্বের সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বোল্লিখিত "খোদখাস্ত ও পাইখাস্ত" উভয়বিধ প্রজাই দ্বাদশ বৎসর কাল জমি দখল করিয়া জোতস্বত্ব অর্জ্জন করিল। এই জোতস্বত্ব, প্রজাগণ পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ক্রমে ভোগ করিবার অধিকারী হইল। কিন্তু ১৮৫৯ সনের ১০ আইনে একটী বিধান ছিল যে প্রজা ইচ্ছা করিলে কোন জমিতে তাহার জোতস্বত্ব কখনও উদ্ভব হইবেনা এইরূপ লিখিত চুক্তি করিতে পারিত এবং তাহা আইন সঙ্গত ছিল। আর নূতন জমি দ্বাদশ বৎসর কাল দখল না করিলে তাহাতে প্রজার জোতস্বত্ব উদ্ভব হইতনা। ১৮৮৫ সনের ৮ আইন প্রজাকে অধিকতর স্বত্ব এবং সুবিধা প্রদান করিয়াছে। এখন কোন প্রজা যদি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কোন ভূম্যাধিকারীর সহিত এরূপ চুক্তি বদ্ধ হয় যে তাহার দখলের জমিতে কোন দিন তাহার জোত স্বত্ব জন্মিবে না তবে সে চুক্তি বেআইনি হেতু অকর্ম্মন্য হইবে এবং দ্বাদশ বৎসর অন্তে ঐ জমিতে প্রজার জোতস্বত্ব জন্মিবে। এই আইনের বিধান অনুসারে গ্রামে কোন স্থিতিবান প্রজা নূতন জমির অধিকারা হওয়া মাত্র তাহাতে তাহার জোত স্বত্ব উদ্ভব হইয়া থাকে। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইবার কোন প্রয়োজন হয় না।

পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ইহা বোধগম্য হইবে যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ভূমি সংক্রান্ত যত আইন গভর্ণমেণ্ট প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল প্রজার হিত সাধন করা। দুর্ব্বলের রক্ষক রাজা। প্রবলের হাত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা রাজ ধর্ম্ম। প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রণয়নে রাজা সেই রাজধর্ম্ম হইতে স্খলিত হন নাই। বর্ত্তমানে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পরিবর্ত্তনের জন্য যে সকল বিধান নূতন পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহার, উদ্দেশ্য ও বোধ হয় প্রজার কল্যাণ সাধন করা। প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে প্রজার হিত সাধন উদ্দেশ্যর কতদূর সফলতা লাভের সম্ভাবনা আছে এবং তাহাতে প্রজা ভূম্যাধিকারী উভয়েরই স্বার্থ কিরূপ সংরক্ষিত হইবে সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমতঃ 'বিলে' প্রজাকে জোত স্বত্ব হস্তান্তরের ক্ষমতা প্রদান করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তনের পর হইতে জমিদার ও তালুকদারগণ ভূমির মালিক হইয়াছেন। সুতরাং প্রজার জমি হস্তান্তর করিবার কোন অধিকার নাই। বর্ত্তমানে জোতদারগণ মালীকের সম্মতি গ্রহণ করিয়া জমি বিক্রয় করিতেছে। অথবা বিক্রয়ের পর ক্রেতা মালীককে "নজর" দিয়া জমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতেছে। প্রজাকে স্বাধীন ভাবে জোত হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলে ভূম্যাধিকারীর এই ক্ষমতা খর্ব্ব হইবে। এই জন্য ভূম্যাধিকারীগণকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপে বিক্রীত ভূমির মূল্যের শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে "নজরানা" দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। আমরা প্রজার স্বার্থের কথাই প্রধানতঃ আলোচনা করিব। দীর্ঘ কাল যাবত প্রজাগণ জোতস্বত্ব হস্তান্তরের ক্ষমতা পাইবার জন্য আন্দোলন করিতেছে। তাহাদের মত এই যে, মালীকের সম্মতি ব্যতীত জোত হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা পাইলে জোতের মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং যখন অর্থের প্রয়োজন হইবে তখনই তাহারা উপযুক্ত মূল্যে জমি বিক্রয় করিতে পারিবে। বর্ত্তমানে নজরের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকায় এবং জোত খরিদের পর মালিক ক্রেতাকে বন্দোবস্ত দিবেন কিনা তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়তা না থাকায় জমির উপযুক্ত মূল্য হয় না। বাস্তবিক এই কথা যথার্থ। ইহার বিরুদ্ধে এই বলিবার আছে যে স্বাধীনভাবে প্রজাগণ জমি বিক্রয় করিতে পারিলে তাহারা অমিত ব্যয়ী হইয়া জমি নষ্ট করিবে। প্রজার হাতে আর জমি থাকিবেনা। সব জমি মহাজনের হাতে যাইবে।

জমি যাহাতে মহাজনের হাতে না গিয়া কৃষকের হাতেই থাকে তজ্জন্য বিলে দুইটী উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। একটী বর্গাদারদিগকে প্রজা স্বত্ব প্রদান, আর একটী কোর্ফা প্রজাকে জোত স্বত্বের অধিকারী করা। প্রজার জোত মহাজনগণ খরিদ করিলে তাহারা সাধারণতঃ ঐ জমি খামার করিয়া বর্গাদার দ্বারা চাষ করান এবং উৎপন্ন ফসলের ন্যূনাধিক অর্দ্ধেক পরিমাণ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিলে বর্গাদার দিগকে প্রজাস্বত্ব দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং বর্গাদার ৪০ ধারার বিধান অনুসারে ফসলের পরিবর্ত্তে পার্শ্ববর্ত্তী জমির নিরিখ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট নগদ খাজনা দিতে পারিবে। খামার জমিতে চাষীর প্রজাস্বত্ব উদ্ভব হইলে মালীক আর তাহা ছাড়াইয়া নিতে পারিবেন না এবং নির্দ্দিষ্ট নগদ খাজনা পাইয়াই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এই পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবে সমগ্রদেশে ভয়ানক আন্দোলন ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। যাহারা এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন তাহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন। বর্গা জমির ফসল বহু দরিদ্র ভদ্র লোকের গ্রাসাচ্ছদনের একমাত্র অবলম্বন। বহুলোক সারা জীবনের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা খামার জমি ক্রয় করিয়াছেন। কত গরীব ভদ্রলোক তালুক বিক্রয় করিয়া দুইটী অন্নের সংস্থানের জন্য খামার জমি রক্ষা করিয়াছেন। কত অসহায় বিধবা খামার জমির আয় দ্বারা কোন রকমে জীবন ধারণ করিতেছেন। সহসা আইনের পরিবর্ত্তন হেতু খামার জমীর ফসল হইতে বঞ্চিত হইলে ইহাদের অনেকেই সপরিবারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে। অন্যদিকে কোর্ফা প্রজাকে জোত স্বত্ব প্রদান করিলে জোতদারগণের গুরুতর ক্ষতি হইবে। জোতদারগণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া জমি ক্রয় করিয়াছে এবং মালীককে উপযুক্ত নজর দিয়া সেই জমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছে। কোন কোন জোতদার পদ মর্য্যাদার খাতিরে, লোকজনের অভাবে অথবা নিজে সকল জমি চাষ করিয়া উঠিতে পারে না বলিয়া কতক জমি কোর্ফা প্রজার নিকট নির্দ্দিষ্ট খাজনায় পত্তন দিয়াছে। জোতদারেরা জানে যখন প্রয়োজন হইবে তখনই তাহার জমি কোর্ফার নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইতে পারিবে। কোর্ফা প্রজাও জানিয়া শুনিয়াই এই সর্ত্তে জমি চাষ করিতে নিয়াছে। কোর্ফাদারকে তাহাদের চুক্তির বিপরীত কোন স্বত্ব প্রদান করিলে জোতদারদিগের অন্যায় রূপে গুরুতর ক্ষতি করা হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা কেবল আইন বিরুদ্ধে নহে; উহা নীতি ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ।

বর্ত্তমান আইন অনুসারে বর্গাদারের এবং কোর্ফা প্রজার অধিকৃত জমিতে তাহাদিগের কোন স্বত্ব উদ্ভব হয় না। এই আইন অনুমোদিত যে সকল সঙ্গত চুক্তি সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহা উপেক্ষা করিয়া অন্যের ভূমিতে বর্গাদার ও কোর্ফা প্রজার স্বত্ব সৃষ্টি করিবার বিধান অতিশয় অন্যায় এবং গর্হিত। যদি প্রকৃত স্বত্বাধিকারী ব্যক্তিকে বঞ্চিত

করিয়া নিঃস্বত্ববান ব্যক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা 'বলশেবিক' বাদ হয় তবে এই পাণ্ডুলিপিতে উহার যথেষ্ট উপাদান বর্ত্তমান আছে।

ইংরেজিতে একটী কথা আছে "To rob Peter to pay Poul" অর্থাৎ "গরু মেরে জুতা দান।" এই বিলে পূর্ব্বোক্ত নীতি বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছে। খামার ভূমির মালীক এবং জোতদারদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া কতিপয় বর্গাদার ও কোর্ফা প্রজার উপকার করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে বর্গাদার ও কোর্ফাদারদের ও উপকার হইবে না। যাহাদের জমি ক্রয় করিবার অর্থ নাই, উপযুক্ত নজর দিয়া জমি বন্দোবস্ত লইবার সঙ্গতির অভাব, এই শ্রেণীর দরিদ্র কৃষকগণই পরের জমি ভাগে অথবা বর্গাদার স্বরূপে চাষ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে। এই 'বিল' আইনে পরিণত হইলে বর্গাদার ও কোর্ফাপ্রজা আর জমি পাইবেনা। 'বিল' প্রকাশিত হইবার পর বহু মালীক, বর্গাদার ও কোর্ফাপ্রজাদের হাত হইতে নিজ নিজ জমি ছাড়াইয়া লইয়াছেন। এই 'বিলের' বিধান বজায় থাকিলে ইহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। বহু নিঃস্ব কৃষকদিগের জীবিকার্জ্জনের পথ চিরুদ্ধ হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই অভিনব পরিবর্ত্তনে জোতদার কোর্ফা প্রজা, বর্গাদার এবং মালীক ইহাদের কাহারও উপকার হইবেনা। সকলেরই গুরুতর অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি জোতস্বত্ব হস্তান্তরের ক্ষমতা পাইবার জন্য দীর্ঘকাল যাবত প্রজারা আন্দোলন করিতেছে। এই ক্ষমতা পাইলে জোতের মূল্য বৃদ্ধি হইবে ইহা সত্য। কিন্তু কোর্ফা প্রজাকে জোত স্বত্ব প্রদান করিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। জোতের মূল্য বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহা অপেক্ষা অনেক হ্রাস পাইবে। কারণ তখন কোর্ফা প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। ক্রেতাকে কোর্ফার খাজানা পাইয়াই সুখী থাকিতে হইবে। এখন পাঁচবিঘা জমির মূল্য ন্যূনাধিক ৫০০৲ টাকা হয়। পাঁচবিঘা জমিতে যদি কোর্ফা প্রজা থাকে আর ইহার খাজনা যদি ২৲ টাকা হারে ১০৲টাকাও হয় তবে উহার মূল্য ১৫ গুণ হিসাবে ৫০০৲ টাকা স্থলে মাত্র ১৫০৲ টাকা হইবে। নূতন পরিবর্ত্তনে কোর্ফাদারের আপাততঃ লাভ হইবে বটে কিন্তু জোতদারের সর্ব্বনাশ হইবে।

সুতরাং পাণ্ডুলিপির প্রস্তাব অনুযায়ী আইন পরিবর্ত্তিত হইলে কোন প্রকারেই প্রজার সুবিধা হইবে না। অথচ প্রজারউপকারের জন্যই আইনের পরিবর্ত্তন করা হইতেছে। নূতন বিধান গুলি এরূপ জটিল যে এইগুলি প্রবর্ত্তিত হইলে মোকদ্দমার সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে। বর্ত্তমানে মোকদ্দমা প্রজার দারিদ্র্যের অন্যতর কারণ। রেকর্ড অব রাইট্‌স্ (Records of rights) এর পর মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন খুব কমিয়া যাইতেছে। প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ, খাজানাও জমির পরিমাণ এবং সীমা এখন রেকর্ড অব রাইট দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জন্য প্রজা ভূম্যাধিকারী একটু 'সোয়াস্তি" পাইয়াছে। বর্ত্তমান বিলের প্রস্তাবানুসারে প্রজাস্বত্ব আইন পরিবর্ত্তিত হইলে সব 'উলটপালট' হইয়া যাইবে। তাহাতে লাভ হইবে একমাত্র আইন ব্যবসায়ীদের। অনিচ্ছা সত্বেও সরকার বাহাদুর এই 'তুম্বন' শ্রেণীর লোকের উপকার সাধন করিবেন।

শেষ কথা প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া প্রজার দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। দেশের শিল্প বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় শিল্পীকুল নিজ নিজ বংশ পরম্পপরাগত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে স্যার উইলিয়ম হাণ্টার (Sir William Huntur) লিখিয়াছিলেন—"The tide of circumstances has compelled the Indian weaver to exchange his loom for the plough" অবস্থা পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষের তাঁতিগণ তাঁত ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে। কেবল তাঁতি নয়, বিদেশী শিল্পীদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া কামার, কুমার, সূতার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর শিল্পিগণই নিরুপায় হইয়া কৃষি কার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। তাই জমির তুলনায় কৃষকের সংখ্যা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষিকার্য্যের আয় দ্বারা কাহার ও গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হইতেছে না; ইহার ফলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ভারতবাসীর নিত্য সহচর হইয়াছে ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের সরকারী দুর্ভিক্ষ কমিসন রিপোর্টে এই কথা অতি স্পষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

" At the root of much of the poverty of the people of India, lies the unfortunate circumstance that agriculture forms almost the sole occupation of the mass of the population and that no remedy for present evils can be completed which does not include the introduction of a diversity of occupation through which surplus population may be drawn from agricultural pursuits and led to find the means of subsistence in manufactures or some such employments. "

বর্ত্তমানে কৃষিকার্য্যই অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবিকার্জ্জনের একমাত্র উপায় হইয়াছে। ইহাই ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। নূতন শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষি ক্ষেত্রের অতিরিক্ত লোকদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা না করিলে এদেশের জন সাধারণের দারিদ্র্য কিছুতেই দূর হইবে না।

আমরা চাই শিল্প বাণিজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন যে ভাবে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ইহা কার্য্য পরিণত হইলে প্রজার দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজায় প্রজায় এবং প্রজায় ভূম্যধিকারীতে ভীষণ কলহের সূচনা হইবে। আত্ম কলহের ফলে সমাজের শান্তি নষ্ট হইবে। ব্যাধি অপেক্ষা ঔষধের ফল ভীষণতর হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

---

## দূরে।

তোমারি কুটীর পূর্ণ রহিবে
সুধু রহিব না আমি!
থাকিবে আনন্দ, উৎসব গান,
হে সখা! দিবস যামি।
আমিত' তোমারে ছাড়িয়ে যাইব
ছাড়িবে না মোর মন!
রাখিবে আঁকিয়ে হৃদয় মাঝারে
তোমারি নন্দন-বন।
আমিত' তোমারে ছাড়িয়ে যাইব
ছাড়িবে না মোর স্মৃতি!
রাখিবে কুটীরে তোমারি প্রণয়
তোমার মধুর প্রীতি!
আমিত' তোমারে ছাড়িয়ে যাইব
ছাড়িবে না মোর প্রাণ!
পরাণে পরাণ মিশায়ে রাখিবে,
থাকিবে হরষ গান।
থাকিবে তেমনি পূর্ণ কুটীর
ভুবন ভুলানো সুরে।
যা কিছু আমার সকলি রাখিব,
সুধু রবো আমি দূরে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

---

## রামগতির টপ্পা।

ময়মনসিংহের বিখ্যাত নিরক্ষর কবি রামগতি সরকারের টপ্পা এখন হারাধন বলিয়াই গণ্য হইয়াছে। সেই লুপ্তরত্নের উদ্ধার আর যে হইয়া উঠিবে এমন আশা হয়না। কি আশ্চর্য্য, কাব্য জগতে মণিমুক্তা ছড়াইয়া গেলেও দেশবাসী তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখে না। ইহা বাঙ্গালীর নৈতিক ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক। রামগতি সরকার ষষ্ঠী বর্ষেরও অধিক কাল জীবিত ছিল। শুনিতে পাই রামগতি প্রথম বয়সেই কবির ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। ২০ বৎসর বয়সে আরম্ভ ধরিলেও সে সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল তাহার টপ্পা নামক সঙ্গীত কুসুমে বঙ্গবাণীর অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছে। তাহার অভ্যুদয় যুগ কবিগানেরই যুগ ছিল। হরু ঠাকুর, রাম বসু, এণ্টনি সাহেব দ্বারা তখনই পশ্চিম বঙ্গ তোলপাড় হইতেছিল। সুতরাং রামু-রামগতিও যে তৎকালে কবিগানের দিক দিয়া যুগাবতার বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আদৃত হইতেছিল এ কথায় সন্দেহ করা যায় না। এ অবস্থায় কত সখি সংবাদ কত টপ্পা ইহারা রচনা করিয়া ছিল, সহজেই অনুমান করা যায়। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ সঙ্গীতই হারাধনের পর্য্যায় ভুক্ত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে 'সৌরভে' রামগতির টপ্পা সামান্য কয়টী প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্পাদকের আগ্রহাতিশয্যেও এতাবৎকাল কেহ 'সৌরভে' উহার যোগান দিতে

পারিলেন না! ইহাতেই মনে হয় রামগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার টপ্পাও সদ্‌গতি লাভ করিয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া যাহার অমৃত নিঃস্যন্দিনী বাণী বঙ্গীয় সমাজের প্রতি সুখ উৎপাদন করিল তাহা সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি কাহারই হইল না। কি দুর্ভাগ্য!

আমরা বহু দিনের চেষ্টায় ৪টী ভগ্ন পদ ও ৩টী টপ্পা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আজ তদ্বারাই কবির পরলোক গত আত্মার তর্পণ করিতেছি। প্রথমতঃ ভগ্ন পদ গুলিই উল্লেখ করা যাক।

একস্থানে প্রতিপক্ষের সরকার নিজে উগ্রসেন হইয়া রামগতিকে কৃষ্ণ বানাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 'কৃষ্ণ, তোমার যদুবংশীয় ও বৃষ্ণিক বংশীয় এতগুলি বীর থাকিতে সুভদ্রাকে অর্জুন বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া নিল, ইহা কলঙ্কের কথা নহে কি'? রাম গতি কৃষ্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—

স্বয়ং বরকে না চিনিলে কিসে হয় তার স্বয়ম্বর?
উগ্রসেন ঠাকুর দাদা এই তোমায় সাদা কথায় দি' উত্তর।

সুভদ্রার স্বয়ম্বর ঘোষিত হইয়াছিল এবং অর্জ্জুন যখন প্রতিদ্বন্দী ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে বিব্রত, তখন সুভদ্রা স্বয়ং অশ্বের বল্‌গা ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়া ছিলেন। সুতরাং স্বয়ং বরকে চেনার প্রমাণ উজ্জ্বল হইয়াই রহিয়াছে। কবি কি কৌশলে অনুপ্রাশের ছটায় তাহা বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিল দেখুন! কবি কথিত 'সাদা কথায় দি' উত্তর' কথাটার ও সার্থকতা আছে। অর্থাৎ উহা এত সহজ প্রশ্ন যে এক কথাতেই উত্তর হইল, প্রতিপক্ষের এ কথার পর আর কোন কথা কহিবার অবসর রহিল না। তাহার কথার পুঁজি ফুরাইয়া গেল। উগ্রসেন কংসের পিতা, সুতরাং কৃষ্ণের মাতামহ।

চান্দুরার শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গোস্বামী একজন সুরসিক লোক, তিনি একবার আড়ালে থাকিয়া প্রতিপক্ষের সরকারের পক্ষাবলম্বন করিয়া রামগতির বিপক্ষ আচরণ করিতে ছিলেন, রামগতি ইহা জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন ছিটা গুলি মারতে পারি ব্রহ্ম হত্যার আছে ভয়।

শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য প্রথমে মোক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে কবির ব্যবসায়ে প্রবর্ত্ত হন। শুনিয়াছি তিনি রামু-রামগতির আক্রমণে অনেক সময় কাঁদিয়া আসর হইতে বাহির হইয়া যাইতেন।* তাহার সঙ্গে বহু কাল উহাদের সঙ্গীত যুদ্ধ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস তিনি যদি উহাদের সঙ্গীত সংগ্রহে মনোযোগী হয়েন তবে রামু-রামগতি কি অলৌকিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল ভবিষ্যত বংশীয়েরাও তাহা অবগত হইতে পারে। ব্যবসায়ের দিক দিয়া তখন অবশ্যই প্রতি যোগীতা ছিল এবং তাহাদের হাড় জ্বালান কথায় রাগ দ্বেষও জন্মিয়াছিল কিন্তু এখন সেই সব তিরস্কার কে তিনি অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইলে বঙ্গের কাব্যামোদী লোক দিগের ধন্যবাদ ভাজন হইতে পারেন। তাহার সঙ্গে সেই সমস্ত টপ্পার মাত্র দুইটী ভগ্ন পদ আমাদের হস্ত গত হইয়াছে। একটী—

শুনিলাম আচার্য্য বিজয়, তুমি করলে বাংলা জয়,
হুতুমপুড়ে খেলে পরে পেঁচকেরে করতে জয়।

বিজয় আচার্য্যের বাড়ী বাংলা গ্রামে। করলে বাংলা জয় কথায় বুঝাইয়াছে শুধু নিজ বাংলা গ্রামেই তুমি কবিমন্য, এখনও গ্রামের বাহির হও নাই। হুতুম পুড়ে খেলে পরে পেঁচকেরে করতে জয় কথায় কণ্ঠ স্বরকে নিন্দাকরা হইয়াছে। ভগ্নপদ অ৯টী মোক্তারীতে হ'য়ে ফেল মুছে দিয়ে কেরাচিনের তেল।

উহাতে আরও অনেক রসাল কথা ছিল, দুঃখের বিষয় সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। ভগ্নপদ এই চারিটী।

সম্পূর্ণ টপ্পা ৩টী এই—

( ১ )

বঙ্গ চূড়া এই চান্দুরা
বর্ণিবার আমার সাধ্য কি?
আমি শুনেছি শাস্ত্রের উক্তি
গুরুতে রয় যার ভক্তি
তারে করেন মুক্তি সেই কমলাখি।
আমি সভার মাঝে হেরিতেছি
সারি সারি নারায়ণ,
বৃন্দাবন গোস্বামীর বাড়ী
তেমনি বৃন্দাবন।

---

* শেকের গাঁতি নিবাসী এক অশিতি পর বৃদ্ধের নিকট এই সংবাদটী পাইয়াছি।

মাঝ খানেতে অধ্যাপক
চা'রি দিকে বসে পাঠক
শাস্ত্র সব করেন অধ্যয়ন
যেমন কৃষ্ণচন্দ্র লীলা করেন
সঙ্গে লয়ে ভক্তগণ,
বৃন্দাবন গোস্বামীর বাড়ী
তেমনি বৃন্দাবন।

চান্দুরা নিবাসী স্বর্গীয় বৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামীর বাড়ী তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে রামগতি এই টপ্পাটী রচনা করিয়াছিল। রামগতি হয়ত বা ঐ গোস্বামী প্রভুদেরই মন্ত্র শিষ্য ছিল। তাহাতেই এই ভক্তি রসের প্রাবল্য। 'বৃন্দাবন গোস্বামীর বাড়ী তেমনি বৃন্দাবন' পদটীতে কি সুন্দর মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। "যেমন কৃষ্ণচন্দ্র লীলা করেন সঙ্গে লয়ে ভক্তগণ" এই পদটীতে অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রকেও ইঙ্গিত করিয়াছে। নিরক্ষর কবির এই অর্থালঙ্কার জ্ঞান কোথা হইতে জন্মিল? বিস্ময়ের বিষয় নহে কি? ঐ পদে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার প্রকাশ পাইয়াছে অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর সম্ভাবনা। ঐ এক কৃষ্ণচন্দ্রেই অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রকেও বুঝাইয়াছে

( ২ )

নায়েব মশাই চৌধুরী বাবুজী
বলি সুখ্যাতি,
তিনি ছিলেন চৌধুরী
হ'লেন মজুমদার,
বর্ণনাকি করবে আর
লেংড়া রামগতি।
তিনি শ্বশুর বাড়ী গাই পেয়েছেন
শিং ভাঙ্গা তার চোক কাণা,
লোকেতে শাশুইরা ব'লে
করে ঘোষণা।
যেমন আত্মতত্ত্ব পাসুরিয়া
রাম হয়েছেন শাশুরিয়া
জানেন দশ জনা,
তেমনি চৌধুরী বাবু খাস করেছেন
* * * * মাল খানা,
লোকেতে শাশুইরা ব'লে
করে ঘোষণা।

আঠার বাড়ীর জমিদার ৺ মহিমচন্দ্র রায় মহাশয়ের শ্বশুরের প্ররোচনা মতে তাঁহার নায়েবকে লক্ষ্য করিয়া রামগতি এই টপ্পা রচনা করে। টপ্পার ভাব সহজেই বুঝা যায়, তবে 'শ্বশুর বাড়ী গাই পেয়েছেন' কথাটায় একটু সামাজিক ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। পূর্ব্বে কোন ২ সমাজে বিবাহের পর নব জামাতাকে গাভী উপঢৌকন দেওয়ার রীতি ছিল। তাহারই সাহায্যে ঐ স্থলে শাশুড়ীকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 'চোখকাণা' কথাটাও অত্যুক্তি না হইতে পারে। শুনিয়াছি ঐ দিন রামগতি পায় কাঁটা ফুটিয়াছিল, তজ্জন্যই লেংড়া রামগতি পদের সৃষ্টি। অতঃপর নায়েবের প্ররোচনায় মহিম বাবুর শ্বশুরকে ব্যঙ্গ করিয়া সে যে টপ্পা দিয়া ছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

( ৩ )

মহারাজের শ্বশুর বলে আজ
বলতে করি ভয়।
দেখলাম সভায় বসে মনের হরিষে
নৃত্য গীতের প্রেম রসে মত্ত অতিশয়।
করেন শশি মণির বদন চে'য়ে
চক্ষে চক্ষে ইসারা,
দান করলো শশি মণি তোর
পাক্ না জামুরা।
দেখে তোমার চাঁদ বদন
কেমন কেমন করে মন
যায় না পাসরা,
আমি একলা ঘরে শুয়ে থাকি
বালিশ টানি রাত ভরা
দান করলো শশি মণি * তোর
পাক্ না জামুরা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

# আলোচনা।

## যোগী জাতি।

অনেক দিন হইতে সংবাদ পত্রাদিতে যোগীজাতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা হইতেছে। যোগী শব্দে যোগ অভ্যাসকারী বুঝায়। অনেক সাধক বা সিদ্ধপুরুষ 'নাথ' উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দু সমাজে ও সাধক ও সিদ্ধ পুরুষগণের শবদেহের সচরাচর সমাধি হইয়া থাকে। যোগীজাতির উপাধি নাথ; ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বে শবদেহ সমাধি করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সকল কারণে সহজেই মনে হয়, ইঁহারা পূর্ব্বে কোন সাধক সম্প্রদায় ছিলেন। শুনা যায় যে গোরক্ষনাথ, মীননাথ প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষগণ এই সম্প্রদায় মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন! অদ্যাপি এ অঞ্চলে রামায়ণ কীর্ত্তনের ন্যায় গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সাধুগণের কার্য্যাবলীর কীর্ত্তন হইয়া থাকে। পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই সম্প্রদায়কে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি শাখার অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন।

যোগীজাতি ধর্ম্মচর্চ্চা হারাইয়া অধঃপতিত হওয়ার পরে ন্যূনাধিক শত বৎসর মধ্যে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ইঁহারা শবদেহের সমাধির পরিবর্ত্তে দাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, একথা ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বেও অনেক প্রত্যক্ষ দর্শীর মুখে শুনা গিয়াছে। এখনও অনেক স্থানে সমাধি প্রথা প্রচলিত আছে।

বঙ্গদেশে সেন বংশীয় রাজগণের আগমনের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল ছিল। উক্ত বংশের আগমনের পরেও এদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি সামান্যই ছিল। ইহার পর মোসলমান বিজেতৃগণ তরবারি হস্তে আসিয়া প্রথমে বিহার ও তৎপরে পশ্চিম বাঙ্গালার বৌদ্ধ মঠ গুলির উচ্ছেদ সাধন করেন। উক্ত ধর্ম্মের গ্রন্থগুলি মঠেই রক্ষিত হইত; সে গুলি ভস্মীভূত হইল। সন্ন্যাসিগণের অধিকাংশ নিহত হইলেন; অল্প সংখ্যক প্রাণভয়ে নেপাল প্রভৃতি দেশে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থ গুলির অভাবে এ দেশে উক্ত ধর্ম্মের শিক্ষা বিলুপ্ত হইল এবং সন্ন্যাসিগণের বিনাশে শিক্ষাদানের লোকও কেহ রহিল না। কাজেই এদেশে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ ঘটিল। যাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণের কেহ সাম্যবাদী মোসলমান সমাজে, কেহ বা বৈষম্যবাদী হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিল।

যোগী সম্প্রদায় বহুকাল আপনাদের স্বতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতে ছিলেন। ক্রমে ইঁহারা একটি একটি করিয়া হিন্দু আচার গ্রহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা কেন যে সাম্যমূলক ইসলাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া হিন্দু সমাজের একটি জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন, তাহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে বহু জাতির আধার হিন্দুধর্ম্ম, জাতি ভেদের প্রকোপ রহিত সাম্যবাদী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মকে পরাজিত করিয়া তথায় জাতিভেদের বন্ধন ও প্রকোপ আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম্ম ভারতের কোথাও ইসলামকে পরাজিত করিতে পারে নাই। এ অবস্থায় যোগীজাতির হিন্দু সমাজে প্রবেশের কারণ কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

হিন্দু সমাজে শ্রেষ্ঠ জাতি নিকৃষ্ট জাতির অন্ন গ্রহণ করে না। ইহা হইতে এদেশে সাধারণের সংস্কার এই যে, যে জাতি অন্য জাতির অন্ন গ্রহণ করে না, সে জাতি শ্রেষ্ঠ; এবং যে জাতি অন্যের অন্ন খায়, তাহারা নিকৃষ্ট; খৃষ্টীয়ান সকল জাতির ভাত খায়, তাহারা সকলের ছোট। হিন্দু সমাজের কোন্ কোন আচার অনেক উৎকৃষ্ট। এই সকল কারণে যোগীজাতি হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছে কিনা, তাহা সাধারণের বিচারার্থ উপস্থিত করিলাম।

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

---

# সাহিত্য সংবাদ।

কালীপুরের স্বর্গীয় জমিদার ভারতভ্রমণ গ্রন্থ প্রণেতা ধরনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের "জাম্মু বা কাশ্মীর ভ্রমণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা।

---

আনন্দ

ASUTOSH PRESS, DACCA.

# সৌরভ
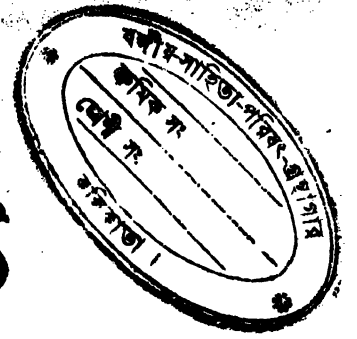


একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সন। | পঞ্চম সংখ্যা।

## গবর্ণমেণ্টের ঋণ ও ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যা।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানে প্রায় সমস্ত গবর্ণমেণ্টেরই অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য দরুণ যথেষ্ট ঋণ দাঁড়াইয়াছে। সেই ঋণের মাত্রাতিরিক্ত চাপ সহ্য করিতে না পারিয়াই ইদানিং বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর ঘোরতর অর্থ নৈতিক সমস্যা উপস্থিত। এই বিষয় সম্বন্ধে কতক পরিমাণে আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

ঋণ করার অর্থ এই নয় যে শুধু কতকগুলি মুদ্রাই ধার করা হইল। মুদ্রা উপলক্ষমাত্র। মুদ্রা নিজে আমাদের কোনও অভাব দূর করিতে পারে না: উহা আমাদের অভাব নিবৃত্তির উপযোগী জিনিসগুলি সরবরাহ করিয়া দেয় মাত্র। আমি একটা জিনিস দিতে পারি বলিয়া সমাজে সেই জিনিসের পরিবর্ত্তে আর একটা কিছুর দাবী করিতে পারি। মুদ্রা এই দাবী পূরণের মধ্যস্থ সাক্ষিগোপাল।

ঠিক এই প্রকার—ঋণ যখন করা হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, আপাততঃ আমার এমন কতকগুলি অভাব উপস্থিত হইয়াছে যে সেইগুলি পূরণ করিতে হইলে অন্যের নিকট হইতে আমার বর্ত্তমান ক্ষমতার অতিরিক্ত কতগুলি জিনিস গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার পর, যখন আমার উপস্থিত অভাব পূরণ হইবে. তখন সঙ্কোচ-সাপেক্ষ অভাবগুলির সঙ্কোচ সাধন করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব। সুতরাং এই যে আদান প্রদান, তাহা কতকগুলি চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রার নহে. কতকগুলি জিনিসের। এই বিষয়টাই আমাদের বিশেষ বুঝিতে হইবে।

আমাদের প্রকৃত অর্থ নৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইবে তখনই, যখনই আমরা দেখিতে পাইব যে গবর্ণমেণ্টকৃত ঋণ পরিশোধ করিবার কোনও সঙ্কোচ-সাপেক্ষ অভাব গবর্ণমেণ্টের সঙ্কোচ করিবার নাই। এরূপ অবস্থা ঘটিলেই গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হইয়া পড়ে। তখন উপায়হীন হইয়া গবর্ণমেণ্ট অবাধে কাগজমুদ্রা চালাইতে আরম্ভ করে। ব্যাপার যখন এইরূপ দাঁড়ায়, তখন রাজ্যের চলিত মুদ্রার মূল্য যথেষ্ট কমিয়া যায়; কারণ যে স্বর্ণ, মুদ্রার পরিমাপ—স্বর্ণমূল্যের বহুবর্ষব্যাপী তারতম্য না হওয়ার দরুণ এবং স্বর্ণের প্রায় অবিনশ্বরত্ব শক্তির প্রভাবে রাজ্যের মুদ্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখে, তাহা এই অবস্থায় একপ্রকার লোপ পায়। এবং চলিত মূল্যহীন কাগজের তাড়নায় দেশের প্রায় সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা দেশ হইতে বাহির হইয়া যায়। ফলে উত্তরোত্তর স্বর্ণমুদ্রার অভাবে ও কাগজ মুদ্রার ক্রম বিবর্দ্ধমান প্রভাবে মুদ্রার মূল্য যথেষ্ট কমিয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের বাজার সম্ভ্রমও (market credit) যথেষ্ট কমিয়া যায়।

এই প্রকার অবস্থা আধুনিক প্রায় অনেক গবর্ণমেণ্টেরই হইয়াছে। বিলাতের গবর্ণমেণ্টের ঋণের পরিমাণ এখন আটশত কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ একশত কুড়ি হাজার কোটী টাকা: তন্মধ্যে খুব বিশেষ ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া সেখানকার গবর্ণমেণ্ট মাত্র কিঞ্চিদূর্দ্ধ দশকোটী পাউণ্ড অর্থাৎ একশত পঁচাত্তর কোটী টাকা গত বৎসর শোধ করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে স্বীয় রাজ্যসম্পদের ক্ষমতার অতিরিক্ত ঋণ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের করিতে হইয়াছিল। ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াও যে হারে ঋণশোধ দিতে

হইতেছে, ঐরূপে তাহা পরিশোধ ক'। দীর্ঘকাল ব্যতিরেকে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কেবল এই ঋণের অঙ্ক দেখিলেই ইংলণ্ডের ঋণের পরিমাণ বুঝা যাইবে না। তাহার সঙ্গে অতিরিক্ত কাগজ মুদ্রার ( Paper currency ) বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে।

আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থা আরও শোচনীয়। ভারত ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী দরিদ্র; এই হেতু ভারতের করভার বহন ক্ষমতা অনেক কম। বর্ত্তমানে এই ভারতবর্ষের ঋণ ৫০০ কোটী টাকারও উপর। অথচ গবর্ণমেণ্টের আয়—নানাপ্রকার কর বৃদ্ধি করিয়াও ১৩৩৲ কোটীর বেশী হইতে পারিতেছে না। তন্মধ্যে প্রায় ৯২ কোটি টাকা এক সৈন্য বিভাগেই খরচ হয়; অবশ্য ইহার সঙ্গে যুদ্ধোপলক্ষে যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার সুদও ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের ঋণ ছিল মাত্র ২০ কোটি টাকা। এখন এই সৈন্য বিভাগের ব্যয় বাদে যাহা থাকে, তাহা দ্বারা ভারতগবর্ণমেণ্টের অন্যান্য ব্যয় সঙ্কুলন হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। ফলে, ঋণ শোধ না হইয়া এখন প্রতি বৎসর ঘাটতির ( Deficit ) পরিমাণই বৃদ্ধি হইয়া যাইতেছে। যদি এইভাবে চলিতে থাকে, তাহা হইলে ক্রমশঃই ঋণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি হইবে।

এখন স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা না হয়, তাহা হইলে ঋণের এই সুদ ও আসল পরিশোধ করিবার কি উপায় গবর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিতে পারেন?

এক উপায়, কাগজ মুদ্রা চালান। এইরূপ অবস্থায় অনেক গবর্ণমেণ্টই অনন্যোপায় হইয়া এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহা যে দেশের পক্ষে কত ক্ষতিজনক ও সর্ব্বনাশ সাধক, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

কোনও দেশের কাগজ-মুদ্রা সেই দেশের রাষ্ট্রশক্তির সীমার বহির্ভূত ভিন্নদেশে কিছুতেই চলিতে পারে না। তাই জগতের ভিন্ন দেশবাসীগণের মধ্যে আদান প্রদান নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এমন একটা মধ্যস্থ জিনিসের (Medium) সাহায্য প্রয়োজন যাহার মূল্য সমস্ত দেশেই সমান। ইহা এক স্বর্ণেতেই সম্ভব। অধিকন্তু স্বর্ণের মূল্যের পরিবর্ত্তন খুব ধীরে ধীরে হয়। তাহাতে দীর্ঘকালব্যাপী আদান প্রদানের মূল্যের তারতম্যও অনেকটা কম হয়। এবম্বিধ কারণে—বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক আদান প্রদানের কার্য্য এক স্বর্ণ-দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই কারণে যে পরিমাণে কোনও দেশের মুদ্রা স্বর্ণের পরিমাপ হইতে কম থাকে, সেই পরিমাণে সেই দেশের অবস্থা হীন। এই জন্য প্রত্যেক দেশের প্রধান মূল্য নির্দ্দেশক মুদ্রাটি স্বর্ণের। এই মুদ্রা যে পরিমাণে ইচ্ছা সেই পরিমাণে ব্যবহার্য্য এবং যথেচ্ছাক্রমে কোনও ব্যক্তিবিশেষ স্বর্ণের বিনিময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মুদ্রিত করাইয়া লইতে পারে ( Free coinage and unlimited legal tender )। এইরূপে আদান প্রদানের সাধারণ ও স্বাভাবিক গতি অনুসারে স্বর্ণমুদ্রা মুদ্রিত হয় এবং উহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয় এবং এই মুদ্রার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত অন্যান্য দৃষ্টমূল্য ( Token coin) মুদ্রার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

আমাদের ভারতবর্ষেও এই নিয়ম চলে, কিন্তু একটা কৃত্রিম হাত গড়ানো উপায়ে। আমাদের টাকা (Rupee) দৃষ্টমূল্য মুদ্রা। ইহার ধাতব মূল্য প্রকৃত বাজার মূল্য অপেক্ষা প্রায় ছয় আনা কম। ইহার মূল্যেরও একভাবে স্বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় এই সামঞ্জস্য রক্ষার নিয়ামক। আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ের বেলায় স্বর্ণের সঙ্গে আমাদের মুদ্রার একটা বাঁধা হার আছে। (এক টাকা এক শিলিং চারি পেন্সের সমান)।

আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ে যখন স্বর্ণের সঙ্গে আমাদের টাকার বাঁধা হারের ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ যদি টাকার মূল্য বাঁধা হারের চেয়ে কম হয় ( একটাকায় এক শিলিং চারি পেন্স হইতেও কম স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়) তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করেন। টাকার মূল্য কম হইবার প্রধান কারণ রপ্তানী বাণিজ্যের হীন অবস্থা; তখন রপ্তানীকারক বণিকগণের স্বর্ণ মূল্যের হিসাবে প্রস্তুত বিনিময় পত্রগুলির সংখ্যা কম হয় এবং সেই বিনিময় পত্রগুলি বাজারের প্রতিযোগিতায় সংখ্যাল্পতা দরুণ টাকার অঙ্কে বেশী টাকা দিয়া বিক্রয় হয়। বাঁধা হারের এই ব্যতিক্রম সমান করিবার মানসে

গবর্ণমেণ্ট Reverse-bill নামক একপ্রকার বিনিময় পত্র চালান। এই Reverse-bill রপ্তানীকারকগণের বিনিময় পত্রের সংখ্যাল্পতা দরুণ প্রতিযোগিতা অনেকটা কমাই। দেয় এবং যাঁহারা এই বিনিময় পত্র বিদেশে প্রেরণ করিয়া পাওনা মিটাইতে চাহেন তাঁহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হন না।

এই 'Reverse-bill' গুলি যখন ইংলণ্ডে পৌছে তখন "Gold standard reserve" নামে ভারত গবর্ণমেণ্টের যে একটী সঞ্চিত ধনাগার আছে, তাহা হইতে ভাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে আমাদের টাকার সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে রপ্তানী বাণিজ্যের বাহুল্যবশতঃ রপ্তানীকারিগণের প্রস্তুত বিনিময় পত্রের সংখ্যাধিক্যে আমাদের ভারতীয় টাকার মূল্য শিলিংএর হিসাবে বেশী হইলে বাধাহারও অনেকটা বাড়িয়া যাইবে।

ভারতের বাণিজ্যের অবস্থাও সাধারণতঃ অনেকটা এই প্রকারের, যদিও যুদ্ধের সময় ইহার যথেষ্ট ব্যতিক্রম হইয়াছিল। যাহাতে টাকার মূল্য অতিরিক্ত বাড়িতে না পারে তাহার জন্যে ইংলণ্ডে ভারতগবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ষ্টেট সেক্রেটারী "Council bill" নামে একপ্রকার বিনিময় পত্র বাহির করেন। ভারতে যাহারা টাকা পাঠাইতে ইচ্ছুক তাহারা বাধা হারে উক্ত বিনিময় পত্র ক্রয় করিয়া পাঠাইয়া দিলেই ভারতবর্ষে তাহার মহাজন ভারতগবর্ণমেণ্টের কোষাগার হইতে ভাঙ্গাইয়া লইবেন, এই জন্য ভারতেও একটি কোষাগার গবর্ণমেণ্টের আছে। বলাবাহুল্য ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থা অধিকাংশ সময় ভাল থাকায় এই পন্থাতেই আমাদের আন্তর্জাতিক আদান প্রদান অধিকাংশ সময় নিয়মিত হয়।

এখন যদি দেশে কাগজ মুদ্রার সংখ্যা প্রয়োজনাতিরিক্ত (দেশের পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদানের নিরপেক্ষ হইয়া) বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে মুদ্রার মূল্য কমিতে বাধ্য হইবে; এবং স্বর্ণের সঙ্গে যে ভাবে ইহার সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যবস্থা আছে সে সামঞ্জস্য কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না। তখন স্বর্ণ মুদ্রার হিসাবে আমাদের টাকার মূল্য খুব বেশী কমিতে থাকিবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যদি টাকার মূল্য কমে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট 'Reverse-bill' চালাইয়া ইংলণ্ডীয় Gold standard reserve' হইতে ভাঙ্গাইয়া দেন। কিন্তু টাকার মূল্য যদি অসম্ভব প্রকারে হ্রাস পায় তাহা হইলে উক্ত Gold standard reserveএ সঙ্কুলান হওয়া দূরের কথা, অন্য কোনও fund দ্বারাই কুলাইবে না। অতএব যে উপায়ে আমরা দেখিয়াছি স্বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে, তাহা আর হয় না। কাজেই আমাদের টাকার অবস্থাও জার্ম্মানীর মার্কের অনুরূপই হইবে।

ইহার ফলে যাহা ঘটিবার তাহা একবার বর্ত্তমান জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। ইহার ফলে আমদানী বাণিজ্য খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

আমদানী ও রপ্তানী পরস্পর নির্ভরশীল। আমদানী বাণিজ্যের ক্ষতি হইলে রপ্তানী বাণিজ্যের আপাতদৃষ্ট কতগুলি সুবিধা সত্ত্বেও তাহাও নষ্ট হইবে। ফলে জিনিস পত্রের মূল্য অসম্ভব প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তখন দেশের জনসাধারণের ন্যায় গবর্ণমেণ্টেরও খরচ অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইবে। গবর্ণমেণ্টের এই অবস্থা যদি উপস্থিত হয়, তবে হয়ত আবার করভার বৃদ্ধি করিতে হইবে, নতুবা আরও অধিকতর অবাধে কাগজ চালাইতে বাধ্য হইতে হইবে। এইরূপে চির ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তে পড়িয়া দেশ ধ্বংশোন্মুখ হইবে। বাস্তবিক বর্ত্তমান জার্ম্মানীর এইরূপ বিপদে পড়িয়াই এত দুরবস্থা। ইউরোপের অন্যান্য দেশও এই কাগজ মুদ্রার বিবেচনাশূন্য পরিচালনাতে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিতেছে।

আমাদের দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি আমাদের এই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানেরই উপযুক্ত উপদেশ দিয়াছেন। এখন গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে অবহিত না হইলে ভারতের অবস্থা যে কি হইবে তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। "কর বৃদ্ধি" অথবা "ব্যয় সঙ্কোচ" এই দুই উপায় ব্যতীত এই সমস্যা মীমাংসার অন্য উপায় নাই। দরিদ্র, ক্ষুধার্ত্ত, পীড়িত ও নিঃস্বের পক্ষে কোন্ ব্যবস্থা উপযোগী প্রকৃত সমাবস্থাপক, সময় থাকিতেই তাহার সুব্যবস্থা করণ।

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

## কে ?

আজ মরমে মরমে কাহার রাগিনী
ফুটিয়ে উঠিছে গো !
হৃদয়ে কাহার প্রেমের লহরী
নীরবে ছুটিছে গো !
সুখ ও শান্তি কাহার হাতে,
প্রেম ও প্রণয় কাহার সাথে,
কাহার বাসনা "মাধবী" হইয়ে
হৃদয়ে লুটিছে গো ?
আজি মরমে মরমে কাহার রাগিণী
ফুটিয়ে উঠিছে গো ?

কে মোর নয়নে প্রভাত স্বপন,
জীবন যৌবনে ফুল্ল ফুলবন,
কাহার 'পলাশ-পারুল' হাসিটী
নীরবে ফুটিছে গো !
কাহার অঙ্গে শিশিরের হার,
কাহার হৃদয় প্রেম পারাবার,
কার অনুরাগ "ভাঁমী" হইয়ে
পরাণে মিশিছে গো !
আজ মরমে মরমে কাহার রাগিণী
ফুটিয়ে উঠিছে গো !

গৃহের দীপটী বল কে জ্বালে ?
শান্তি মধুর সায়ান কালে,
কার মুখ খানি প্রেম আলো আঁখি
আঁধার টুটীছে গো।
আজ মরমে মরমে কাহার রাগিণী
ফুটীয়ে উঠিছে গো !

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

---

## স্মৃতির আবৃতি।

### সেকালের উচ্ছৃঙ্খল চিত্র।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। এই সহরের নৈতিক অবস্থা তখন অত্যন্ত কলুষিত ছিল। সে কালের তুলনায় বর্ত্তমান কালের যুবক ও প্রৌঢ় দিগের অবস্থা অনেক উন্নত। আমরা যে সময় এখানে প্রথম আসিয়াছিলাম। তখন ভদ্রলোকগণের মদ খাওয়া একটা সাধারণ রোগ ছিল। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়রা যে ধারায় সুরা পান করিতেন বলিয়া তাঁহার আত্ম জীবন চরিতে উল্লেখ করিয়াছেন, এ ধারা তেমন নহে, এ অত্যন্ত হীন, নিকৃষ্ট ধারা। এ মদ খোলা ভাটীর বাঙ্গলা মদ। ইহার সহিত আরও অনেক আনুসঙ্গিক উপকরণ জড়িত থাকিত। ফলে আমরা দেখিয়াছি, প্রায় প্রতি বাসাই 'বাও ও বাব্দীর" রোগীতে পূর্ণ। বর্ত্তমানে এই ব্যাধিটী একটী অত্যন্ত লজ্জা জনক ব্যারাম বলিয়া ভদ্র সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। সেকালে এই ব্যারামের নাম ছিল সিভিলিয়ানের ব্যারাম।

এস্থলে আমি পাঠকদিগকে এই বিভৎস্য ব্যারামের কথাই কেবল বলিব না, এই কলুষ ব্যাধি যে যে সমাজকে কি প্রকার সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং সেই সন্ত্রস্ত ভাব হইতে যে কিছুকিছু সাহিত্যও গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বিবৃত করিব।

তখন এই সহরের উরে, শিরে, বক্ষে সর্ব্বত্র বেশ্যাবাড়ী ছিল। সহরের অধিকাংশ পরিণত বয়স্ক যুবকেরা এবং প্রৌঢ়েরা সেই সকল পতিতালয়ে নিসা যাপন করিতেন। যে সকল বাসার কর্ত্তাদিগেরও স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল ছিল, তাঁহারা নিজ বাসাতেই চাঁদেরহাট জমাইয়া বসিতেন. বাসার স্কুলের ছেলেরা লজ্জায় মরিয়া যাইত ; কর্ত্তাদের কিন্তু ইহাতে লজ্জা বোধ হইত না।

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্ম জীবনীতে পড়িয়াছিলাম, সেকালে কোন একটি ভদ্র লোক অন্য একটি ভদ্র লোককে বন্ধুর নিকট পরিচয় করিয়া দিতে যাইয়া বলিতেছেন "উনি ইহার এক রক্ষিতাকে একখান পাকা কোঠা করিয়া দিয়াছেন।" এই

ভাবটি তখনকার বৃটিশ রাজধানী কলিকাতার যেমন গর্ব্বের বিষয় ছিল, মোগল রাজধানী ঢাকাতেও তখন এরূপ একটা ভাব খুব গর্ব্বের বিষয় ছিল। ঢাকাতে তখন যাহার একটি রক্ষিতার অভাব ছিল, এবং একটা বৈঠকখানা ছিল না, সে ঢাকার সমাজে মানুষ বলিয়া গণ্য হইত না। সুতরাং ক্ষুদ্র ময়মনসিংহ সহরের ভদ্রলোকদের এই আচরণ লজ্জার বিষয় হইবে না। ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

আজকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভায় গেলেই ছেলেদের প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় এই একটি কথা অত্যন্ত জোড়ের সহিত কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে রান্না করিয়া মসল্লা পিসিয়া থাকিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন! ইহা আজকালকার ননিগোপাল সদৃশ কোমল নাম যুক্ত অলস প্রকৃতির বালকদের নিকট নিতান্ত আশ্চার্য্যের বিষয় হইলেও সে কালের ঈশ্বরচন্দ্র, জগবন্ধু প্রভৃতি সদৃশ কঠোর নাম যুক্ত কর্ত্তব্যপরায়ন ছেলেদের নিকট একটুকুও আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। তখন সহরে বাবুরা গোপনে বেশ্যা গৃহে আহার করিলেও প্রকাশ্যে ঠাকুর চাকরের হাতের রান্না খাইতেন না, পরিবার রাখিবারও তখন প্রথা ছিল না। সুতরাং প্রায় সকল বাসাতেই এক কর্ত্তা ব্যতীত আর সকলকেই পালা ক্রমে রান্না করিতে হইত। বাসার ছাত্রদিগের আত্মীয় অভিভাবকদিগের এইরূপ আদর্শন হেতু ছাত্রদিগের শাসনের ভারও তখন বাসার "ভাণ্ডারি পুতি"দের হাতে ছিল। এরূপ অবস্থায় মসল্লাওয়ে সময় সময় না পিষিতে হইত তেমন নহে। আজ কালের ননি.মাখন,সচিন-নবীন প্রভৃতি কোমল নামযুক্ত ছেলেরা রাঁধিয়া খাইবেন দূরে থাক উনুনের নিকট বসিলেন উত্তাপে উনাইয়া যান; সুতরাং তাহাদের সহিত সেকালের বলভদ্র গদাধর, গঙ্গারাম ঈশ্বর চন্দ্র প্রভৃতি কঠোর নাম যুক্ত দৃঢ় কর্ম্মী ছেলেদের তুলনাই হইতে পারে না। ছেলেদের নামের কোমলতা ক্রমেই তাহাদের মনকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহকে ও বীর্য্যকে কেমল করিতেছে—দেহতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের এ যুক্তি অগ্রাহ্য করিবার নহে।

মোটকথা, ধনীর ছেলেদের এবং কর্ত্তার আদুরে দুই একটি পোষ্য ব্যতীত আর সকল ব্যক্তিকেই তখন পালা ক্রমে রান্না করিয়া খাইতে হইত। রান্না হইলে ভাণ্ডারি ঘণ্টার ধ্বনি করিত; এই ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া বাসার নিকট বর্ত্তী পতিতালয় গুলি হইতে আসিয়া বাবুরা চুপে চুপে আহার করিয়া যাইতেন। কর্ত্তার আহার্য্য তাঁহার নিজ শয়ন গৃহে যাইত।

এইরূপ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ছেলেরা যে কিরূপ প্রকৃতি গঠন করিয়া লইতে পারিত; সে চিন্তা একবার পাঠকগণ করিবেন।

ফলে সে সময় অনেক কিশোর বয়স্ক বালক মুখে গন্ধ মাখাইয়া মাতলামির ভান করিত এবং অনেক ধাড়ী ছেলে প্রকৃত পক্ষেই মদ খাইয়া স্কুল কামাই করিত। আমাদের বাসার চারিদিকের আমলা, হাকিম, মোক্তার, উকীল প্রভৃতির আচরণে আমরা ইহা প্রতি দিন লক্ষ্য করিয়াছি।

এইরূপ শোচনীয় অবস্থা যে কেবল সাধারণ আমলা, হাকিম, উকিল, মোক্তারদেরই ছিল তাহা নহে; শুনিয়াছি বড় বড় সাহিত্যিকগণও মজলিস করিয়া সেকালে সুরাধুনীর আরাধণা করিতেন, এবং বহু অনভ্যস্থ লোককে অনুরোধে ঢোক গিলাইয়া দলবৃদ্ধি করিতেন।

মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভবনে এরূপ মজলিস হইত। এই মজলিসের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া এক দিন ঘোষ বাহাদুরকে সত্যই ঢোক গিলিতে হইয়াছিল।

এই সহরের স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরি মহাশয় একজন সাহিত্য সেবী ছিলেন। তাঁহার গৃহের মজলিস এই সহরের বিখ্যাত মজলিস ছিল কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের মত বিবেকবান লোকও কেশব বাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি স্বমুখে আমাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন।

কেশব বাবুর মজলিসে এই সহরের সাহিত্যরস পীপাসুগণ এবং নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকগণ সম্মিলিত হইতেন। সম্মিলনে যে শ্রেণীর রসপীপাসুদিগের সংখ্যাধিক্য হইত, মজলিসের আলোচনার গতি সেই দিকে পরিচালিত হইত।

স্বর্গীয় অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার, উমাচরণ বাবু, স্কুল বিভাগের ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টর

বৈকুণ্ঠ বাবু প্রভৃতি কেশব বাবুর মজলিসে রীতিমত যোগদান করিতেন।

আমাদের এক পরম আত্মীয় ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, তিনি একদিন তাঁহার এক বন্ধুর সহিত কোন এক কার্য্যে কেশব বাবুর নিকট গিয়াছিলেন, সেখানে কার্য্য শেষ হইতে হইতে তাহার নিজের মৌতাতের সময় পার হইয়া গেল, তখন তিনি ভয়ানক ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর ভঙ্গি দীর্ঘ শ্বাস, চক্ষু ঢল্ ঢল্ ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া কেশব বাবু তাঁহাকে খুব অমায়িক ভাবে জিজ্ঞাসা করেন—ক্ষমা করিবেন, "মহাশয়ের কি আফিম্ অভ্যাস আছে ?"

তিনি লজ্জিত ভাবে বলিলেন—"আজ্ঞা হাঁ মহারাজ"। কেশব বাবু অমনি বাক্স হইতে কৌটাটী খুলিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—"নিন, আপনার যতখানি প্রয়োজন।"

তিনি সামান্য এক বিন্দু লইলে কেশব বাবু হাসিয়া কৌটাটী হাতে লইয়া প্রায় ১৫ দিনের পরিমাণ আফিম তাঁহাকে নিজ হাতে তুলিয়া দিলেন। এবং প্রতি দিন বিকালে তাঁহার নিকট আসিতে অনুরোধ করিয়া দিলেন। কেশব বাবুর বৈঠকে চব্য, চূষ্য লেহ্য পেয় পদার্থের বন্দোবস্ত থাকিত। বেগুনবাড়ীর সরু চিড়া, বগুড়ার হাটের ইক্ষুগুড়, তাঁহার নিজের বাগানের সাতাভোগ কলা, ও ডাব, মুক্তাগাছার মণ্ডা, কাশীর পেরা, বাটি ভরা দুগ্ধ। এরূপ প্রলোভন কজন ছাড়িতে পারে ?

দিনের দুর্য্যোগে যে দিন লোক কম হইত বা একেবারেই না হইত, সেদিন কেশব বাবু প্যাদা পাঠাইয়া লোক সংগ্রহ করিয়া এই ভক্ষ্য ভোজ্যের সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া যাঁহারা কারণ পান করিতেন, তাহারা নাকি স্বীয় স্বীয় করপল্লবের আবরণে পাত্রটী ঢাকিয়া রাখিয়া তাঁহাকে প্রচুর সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা গলাধঃ করিতেন। তামাক খাইবার বেলাও বাহির হইয়া গিয়া তামাক টানিতেন।

উচ্ছৃঙ্খলতায় সেকালের যুবকেরা সময়োপযোগী উচ্ছৃঙ্খল থাকিলেও বয়োবৃদ্ধ ও সম্মানীতব্যক্তির প্রতি আদবকায়দা প্রদর্শনে তাহারা হীনছিল না। এ হিসাবে এখনকার যুবকেরা অত্যন্ত হীন। তাহারা মদ খায় না বটে কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই চুরট ফুঁকিয়া মুখের পঞ্জীকৃত ধূম বৃদ্ধ পথিকের মুখের উপর ছাড়িয়া তাহাকে বিপন্ন করিতে অনুমাত্র শঙ্কাবোধ করে না।

দেশের আব্ হাওয়া এইরূপে দূষিত হইয়া যখন 'বাত' ও 'বাঘির' ব্যারামে বাঙ্গালার সহরগুলি ব্যাপ্ত হইয়া গিয়া পল্লীগুলি পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল, তখন বেশ্যা দমনের জন্য বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট একটা আইন করিতে বাধ্য হইলেন। এই আইন তখন 'দশ আইন' নামে পরিচিত হইয়াছিল। আইনের ব্যাখ্যা আমি করিব না। এই আইন পাস হইলে এ জেলার কি উপকার হইয়াছিল, জানি না। কিন্তু এই উপলক্ষে এই সহরের জনৈক রসিক কবি যে একখানা কাব্য পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, সাহিত্য স্মৃতির আলোচনায় তাহা অমূল্য বলিয়া মনে করি।

পুস্তক খানার নামছিল 'অবিদ্যার দশ আইন।' লেখকের নাম অপ্রকাশ। গ্রন্থখানা আমরা দেখিনাই; মুখে মুখে ইহার যতটা শুনিয়া স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিলাম, এখনও তাহাই স্মৃতিতে জাগিতেছে, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম।

পুস্তিকার প্রারম্ভ ভাগ গদ্য। তাহা এইরূপ—

"একদিন অপরাহ্নে প্রিয়বন্ধু সংজ্ঞানকে সহচর করিয়া ব্রহ্মপুত্র তটে বিচরণ করিতেছি, ইতিমধ্যে দক্ষিণাস্য হইয়া দেখিলাম, রাজবর্ত্মের সমীপবর্ত্তী বটমূলে পিঙ্গলকেশী বক্রদন্ত কোটরাক্ষী একটী রমণী বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে সে কহিল :—

দুঃখিনীর পরিচয়, শুন কহি সমুদয়,
শান্ত নামে ছিল নৃপবর।
অভাগিণী তাঁর কন্যা, রূপেগুণে ধরা ধন্যা;
বন্দ্যা মান্যা জগত ভিতর।
সুবিদিতা ধরাধামে, অভাগী অবিদ্যা নামে,
বিদ্যা নামে জ্যেষ্ঠা সহোদরা।
ইনিও সামান্যা নন, যার সুত কবিগণ,
আমার বিপক্ষ সদা তারা।
রঘুনাথ শিরোমণি, ভারতের শিরোমণি,
সে করিল দিগ্বিজয় প্রকাশ।
ভারত বিখ্যাত বর, সুপণ্ডিত গদাধর;
সে মোর করেছে সর্ব্বনাশ।

কালিদেশে সর্ব্বনেশে. কুক্ষণে ভারতে এসে
হেসে হেসে কবিতা রচিত।
দিদির সোহাগে ছেলে, মমদোষ বলে বলে,
অবিরত ভ্রমণ করিত।
বরাহ মিহির আদি, তারাও আমার বাদি,
যারা কালিদাসের অনুজ।
দিদি মোর জ্যেষ্ঠা হয়ে, আমার অকীর্ত্তি কয়ে
ফিরিতেন সদা দেশে দেশে,
আমার শাসিত দেশ, ছিলনা বিদ্যার লেশ,
ছিল সবে মম অনুগত।
মম সেনাপতি মদ, পাইয়া প্রধান পদ
পেটে যেয়ে প্রবেশিত যার,
করিত আমার ভক্ত সর্ব্ব কর্ম্মে অনুরক্ত
কার্য্যদক্ষ সেনানী আমার।
অহিফেন পেটে ঢুকে, সকল নেসার থেকে
সুসার করিয়া কামনিত।
তামাক ও মন্দ নয়, করিতে আমার জয়,
* * * *
বকসল (১) ধরিয়া ছল, দিল তার প্রতিফল,
ছমাস জেলেতে দিল তারে।
মোক্তার পাইল সাজা, এমন দুরন্ত রাজা
দেখিনাই ভবের ভিতরে।
নিষ্ঠুর শ্বেতাঙ্গগণ বলে মোরে অন্য জন
একেবারে করি পক্ষপাত।
আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে, বিদ্যার চরণে দিয়ে
পুরাইল নিজ মনসাধ ॥
জানকী (২) উমার (৩)দায়, ঘাটে পথে চলা দায়।
এদায় বিদায় হতে হলো।
গ্রন্থের শেষ ছিল বোধ হয় এইরূপ—
বাহির হ'ল ধণী, কাঁদিতে কাঁদিতে
দিন অবসান হলো দেখিতে দেখিতে।
অস্ত গেল দিনমণি মানব লোচন
* * *
হাম্বারবে ধেনুগণ নিজ গৃহে ধায়।
এরূপে অবিদ্যা দেবী হইলা বিদায় ॥

এই গ্রন্থের রচয়িতাকে, জানি না। স্বর্গীয় অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন, আড়িয়া নিবাসী স্বর্গীয় রামনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার প্রণেতা। আমরা শুনিয়াছি, কেশব বাবু এই পুস্তক পাঠ করিয়া এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয় তিনি নিজে বহন করিয়াছিলেন।

এইবার আর একটী অনুরূপ দৃশ্য উদ্ঘাটন করিয়াই বিরত হইব। এই দৃশ্যস্থান তখনকার ভারতমিহির পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক যুবক উকীল বাবু অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়ের আলয়।

সেখানে সেদিন 'নবমিহিরের' নবনিযুক্ত নবীন সম্পাদক "উদভ্রান্ত প্রেম" রচয়িতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বিদায় ভোজ দেওয়া হইবে। তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন—বাবু প্রাণকুমার দাস ও অন্যান্য হাকিমগণ, বাবু অমরচন্দ্র দত্ত, বাবু দীনেশচরণ বসু প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ ; বাবু জানকীনাথ ঘটক, বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রভৃতি উকীলগণ। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, এই বিদ্বজ্জন সমাগমেও যে সুরাধুনীর ঢেউ বহিল সে ঢেউএর বেগে নব্য সংস্কারকদলের প্রবল বিরুদ্ধ চেষ্টা তৃণ খণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর বাবু উত্তম গায়কছিলেন। তিনি এক চুমুকে বোতল নিশেষ করিয়া গান ধরিলেন—

"করে এত বেলা কেন এলে মেলেনিলো সই !
শিবপূজার সময় গেছে, কাজকিলো তোর ফুলের মালা ;
অনুভবে বুঝাগেছে, নূতন নাগর তোর জুটেছে,
আমার নাগর নাইকো দেশে ঘুম ভাঙ্গেনা
সকাল বেলা।

সেকালের রুচি প্রদর্শন জন্য এই গানটীর উল্লেখ করিলাম। বিষয়টী স্বর্গীয় অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট যেমন শুনিয়াছিলাম, ঠিক তেমনই লিপিবদ্ধ করিলাম।

সময়ের এই ভাব স্রোত ফিরাইবার জন্য সে সময় যে

---

(১) Boxwell তখন এখানে জয়েণ্টমাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার বিচারে অবিদ্যার ৬ মাস জেল হয় (১০ আইন মতে বোধ হয়)। মোক্তারেরও বোধ হয় সাজা হয়।

২। জানকী বাবু হার্ডিঞ্জস্কুলের হেড্ পণ্ডিত।

৩। উমাচরণবাবু জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার।

একদল লোক বদ্ধ পরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন—বাবু অমরচন্দ্র দত্ত।

এই সময় ছাত্রাবস্থায় অমরা অমরবাবুর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার স্নেহদৃষ্টি লাভে জীবনকে ধন্য করিয়াছিলাম।

অমরবাবুর চেষ্টায় এই সহরে একটী ম'দ্য পান নিবারিণী সভা, স্থাপিত হয়। এই সভার ফল যে কিছু হইয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই; বুঝিবার মত তখন বয়স ও ছিলনা। তবে এই পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, জেলা স্কুলে, ব্রাহ্ম দোকানে এবং নসিরাবাদ এণ্ট্রেন্স স্কুলে মাঝে মাঝে এইজন্য সভার অনুষ্ঠান হইত। সারস্বত উৎসবের সভায় বক্তৃতা হইত। স্থানে স্থানে মদ্য পানের বিরুদ্ধে সঙ্গীতও হইত।

এই সময় জেলা স্কুলের বার্ষিক উৎসবে অভিনয় জন্য স্বর্গীয় কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস যে, সুরাসুর বধ নাটীকা, লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার একটী দৃশ্য আজো স্মৃতির পর্দ্দায় স্পষ্ট খোদিত আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"সুরার উক্তি—নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়,
'অগস্ত্য গণ্ডূষ' কর পিপে সমুদয়।
গ্রামে গ্রামে খোলা ভাঁটি, আছে বেশ পরিপাটি,
জীবন-মুক্তির পথ বহুদূর নয়।
খাও ব্যাণ্ডী এক গ্রাস, কাটিবে ভবের ফাঁস,
আপনি সচ্চিদানন্দ হইবে চিন্ময়।
ভুলে যাও আত্মপর, দ্বেষ হিংসা পরস্পর,
করয়েছ যোগীর মত উদার হৃদয়।
কুকুরের গলা ধরি, থাক ভূ-শয্যায় পড়ি,
কর দোহে ভ্রাতৃভাবে নব পরিচয়,
নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়।

সুরাপায়ীগণ :—
জয় ব্র্যাণ্ডী স্যাম্পীন্, তুমি হুইস্কি তুমি জিন্
নাহি জানি তব পরিচয়।
ক্লারেট [illegible] শেরি তুমি রম্ ধান্যেশ্বরী,
খোলা ভাটি তুমি ব্রহ্মময়।
পামর পাষণ্ড যারা, তব নিন্দা করে তারা—
কে বলিবে কত পুণ্যে হয়।
তোমার পিপার গাছ তোমার বোতলে কাচ,
জয় সুরেশ্বরী জয় জয়।

সুরার উক্তি—
খাও হে আরেক গ্রাস— কিসের সংসার ?
বুজিলে চক্ষের পাতা কেবা থাকে কার।
করিলে চপেটাঘাত, করিওনা অশ্রুপাত,
ফিরাইয়া দিও অন্য কপোল তোমার।
প্রদানি মুখের গ্রাস, পরের পূরাও আশ,
যত সাধ্য পার কর, পর উপকার।
আপনার ঘর বাড়ী— পরেরে দিয়েছ ছাড়ি,
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা—প্রশংসা তোমার।
খাওহে আরেক গ্রাস—কিসের সংসার।

সুরার উক্তি :—কাঁদিবে জননী যদি কাঁদিবে কাঁদুক,
ভগিনী তোমার তরে যদি অশ্রুপাত করে,
সোদর ছুরিকা ঘাতে যদি চিরে বুক।
ক্ষতি লাভ কিবা তায়, দুদিনে ভুলিবে হায়,
এমন সংসারে বল আছে কিবা সুখ ?
সমুখে ব্রাণ্ডীর গ্রাস — — — দেওনা চুমুক।

সুরাদ্বেষীগণ : —
কি বলিলে রাক্ষসীরে ?— শুনিলে কি ভাই ?
খাইয়া বুকের রক্ত আশা মিটে নাই ?
আয় দেখি এক সাথে দূর করি পদাঘাতে,
মায়ের বুকের শেল দেশের বালাই!
ভাঙ্গিয়া বোতল গ্লাস, যাহা কিছু সর্ব্বনাশ,
ভারত সাগরে দিব ভাসাইয়া ভাই :
আয়রে এখনি গিয়ে, এখনি আগুন দিয়ে,
পোড়াইয়া খোলা ভাঁটী—করি ছাই ছাই।
মায়ের বুকের সেল দেশের বালাই।

শ্রীঃ

# অদৃষ্ট।

কূপ ছেড়ে সাগরেতে মিছে যাই ছুটে ;
ছোট মোর ঘটে জল বেশী নাহি উঠে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

# একটী আত্মপ্রচেষ্ট জাতির কথা।

অধীন দাস জাতির পক্ষে স্বাধীনতা যে সহজ-সাধ্য কল্পবৃক্ষের ফল নহে, তাহা আত্ম প্রচেষ্ট জাতি সমূহের নিকট অবিদিত নহে; তাই তাহারা সুখ নিদ্রা সম্ভোগের পর দিব্য প্রভাতে মৌতাতের চা পানের ন্যায় স্বরাজ পাইবার প্রত্যাশা কখনও করে না। এইরূপ সুখ সেব্য আরামের সঙ্গে সঙ্গে কোন এক নির্দ্দিষ্ট উষায় স্বরাজলাভের কল্পনা কেবল আমাদের ন্যায় নিশ্চেষ্ট জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

আজ আমরা এমন একটী স্বরাজ-কামী জাতির কথা বলিব, যে জাতি আরাম নিদ্রার অবসানেই—স্বরাজ লইয়া কোন মহাপুরুষ আসিয়া দ্বারে উপনীত হইবেন—কল্পনা করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অপেক্ষা করিতেছে না। পরন্তু তাহাদের যুগ যুগ ব্যাপী চেষ্টার নিষ্ফল প্রয়াসের ভিতর দিয়াই তাহারা নিজকে মনুষ্যত্বের আসনে টানিয়া তুলিয়া বিশ্বের সম্মুখে তাহাদের দাবীকে দেদীপ্যমান করিয়া তুলিতেছে।

এই আত্ম প্রচেষ্ট জাতি প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষস্থিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসী আইতা জাতির বাল্য জীবন নিউজিলেণ্ডের মাউরী জাতির বাল্যজীবনের ন্যায়ই প্রকৃতিগত ছিল। আদিম দ্বীপবাসীরা উলঙ্গ বিচরণ করিত, আম মাংস ভক্ষণ করিত; অগ্নির ব্যবহার জানিত না।

আইতা জাতি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তাগারণ ও বিষায়ণ। এই জাতির ভাষা যোজনান্তর প্রভেদ। প্রায় ২৫-৩০টী ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ লইয়া বর্ত্তমান ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জ গঠিত এবং ইহার এক একটী দ্বীপের ভাষা অসংখ্য; এক লুজন দ্বীপের অধিবাসীদিগেরই এক কুড়িরও অধিক ভাষা। এক এক দলের এক এক স্বতন্ত্র ভাষা হইলেও এই সমস্ত ভাষারই মূল এক। ঐ মূল ভাষার নাম টাগালা বা গালা।

ইহাদের প্রাদেশিক ভাষাগুলি এত দুর্বোধ যে এক দলের লোকের কথা অন্য দলের লোক বুঝিতে পারে না। এইজন্য ইহাদের দলও বিস্তর, দলপতিও বিস্তর। স্ব স্ব দলপতির কথা ইহারা অবনত মস্তকে গ্রাহ্য করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বয়োবৃদ্ধের ইহারা অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে।

ইহারা সর্ব্বাঙ্গে আলিপনার ন্যায় উল্কি পরিয়া থাকে।

এই জাতির মৃতদেহ সংকারের প্রথা অদ্ভুত। শব বাহীদিগকে আকাশ স্পর্শী চূড়া যুক্ত টুপি মস্তকে দিয়া সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়; তাহারা খচ্চরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মৃতের গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। সেই গাড়ীর পশ্চাতে ভিন্ন ভিন্ন গাড়ীতে মৃতের আত্মীয় স্বগণগণ অনুগমন করিয়া থাকে। শব দেহকে তাহারা প্রচুর সম্মান করিয়া থাকে।

মোরগ পোষা ও তাহা দ্বারা লড়াই করান এখানকার লোকের একটী মারাত্মক ব্যসন। এই ব্যসনে এই জাতির এত অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত হয় যে তাহার তুলনাই নাই। আমাদের দেশে ঘোড় দৌড় বাজিতে কেবল বাতিকগ্রস্ত সহরে লোক উচ্ছন্ন যায় কিন্তু ইহাদের এই ব্যসন দোষের ফলে গৃহে গৃহে হাহাকার উঠে। তথাপি তাহাদের ইহাতে নিবৃত্তি নাই। এই ব্যাপারের মোহের পরিচয় একটী কথাতেই দেওয়া যায় যে যদি কোন গৃহ অগ্নিসাৎ হয় সেই ভীষণ বিপদেও গৃহস্থ সর্ব্বাগ্রে তাহার মোরগের অনুসন্ধান করে; মোরগকে বিপদ মুক্ত করিয়া সে তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবারের প্রতি মনোযোগ দেয়। সৌখিন সভ্যতার আশ্রয় পাইয়া এইরূপ ব্যসনে যে জাতি মজিয়া থাকে, তাহার উদ্ধার করিতে ভগবানও অগ্রসর হন না।

এই দ্বীপ সমূহে খুব ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। চীন সাগরের টাইফুন ঝড়ও দ্বীপ সমূহের প্রচুর ক্ষতি করিয়া থাকে। এই সকল ক্ষতির সহিত তুলনা করিয়া জনৈক ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন—মোরগের লড়াই এই জাতির যে ক্ষতি করিতেছে,

ভূকম্প ও টাইফুনের ক্ষতি ইহার তুলনায় কিছুই নহে। এই ব্যসন শত শত লোককে পথের কাঙ্গাল করিয়াছে, দেশকে দস্যুতে পূর্ণ করিয়াছে।

আদিম ফিলিপাইন জাতির চুল কাল এবং খাড়া; ওষ্ঠ অধর ও চক্ষু আফ্রিকার নিগ্রোদিগের ন্যায়। ইহাদের পা ও পদাঙ্গুলী বক্রিম, মস্তক শরীরের পরিমাণ অপেক্ষা বৃহৎ।

ইহারা বিষাক্ত তীর ধনু ব্যবহার করে, তীরের সন্ধান অব্যর্থ।

ইহাদের প্রধান আহার মৎস্য ও গাছের মূল। পার্ব্বত্য ধান্যও ইহারা আহরণ করিয়া খাদ্যরূপে ব্যবহার করে।

এই দ্বীপপুঞ্জবাসীদের মধ্যে বহু বিবাহ নাই; তাহা সত্ত্বেও দলপতিরা বহু সংখ্যক উপপত্নী রক্ষা করিয়া থাকে। বৈধ বিবাহের প্রণালীটি এইরূপ।

প্রণয়ী প্রণয়িনীকে দৌড়াইয়া ধরিতে গেলে প্রণয়িনী দৌড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে প্রয়াস পায়। এবং ধরিয়া ফেলিলেও পুনরায় দৌড়িয়া পলায়ন করে। দ্বিতীয় বার ধরা পড়িলে জনৈক আত্মীয় বৃদ্ধ আসিয়া পাত্রকে লইয়া যায়; তখন জনৈক বৃদ্ধা আসিয়া পাত্রীকেও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গৃহে লইয়া যায়। সেখানে একটী ডাবের জল উভয়কে খাইতে দেওয়া হয়। উভয়ে তাহা পান করিলে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তাহাদিগের মাথা সম্মিলিত করিয়া দেয়। ইহাতেই তাহাদের বিবাহ হইয়া যায়। ইহার পর তাহারা স্বামী স্ত্রী বলিয়া পরিচিত হয়। অতঃপর সেইদিন হইতে তাহারা নিরুদ্দেশ

হইয়া পক্ষরাত্রি নির্জ্জনে বিহার করিয়া গৃহে ফিরিয়া আইসে। ইহাই তাহাদের মধু যামিনী বিহার।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীন দেশের লোক স্ব স্ব দেশে বাসস্থানের অভাব হেতু আসিয়া দলে দলে এই সকল দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের সহবাসে দ্বীপপুঞ্জবাসীরা অল্পে অল্পে আদিম উলঙ্গ ভাব পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষ বল্কলকে আবরণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

জাতি ভেদের দলাদলি আমাদের দেশে যেমন আছে, প্রায় সব দেশেই সেইরূপ বিদ্যমান্। পরাধীন জাতি দলাদলির ফলে দুর্ব্বল হয়, স্বাধীন জাতি তাহার ফলে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে। এই দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদিগের দলাদলির কথা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। তাগারণ ও বিষারণ জাতির মধ্যে দলাদলি এত প্রবল ছিল যে একজাতি অন্য জাতিকে একেবারে দেখিতে পারিত না। দেখিলেই হত্যা করিত। এইরূপ হত্যা এক সময় সেখানে অনবরত চলিয়াছিল।

দেশে যখন এইরূপ জাতি-বিদ্বেষ ও হত্যা চলিতেছিল, সেই সময় স্পেনের বিশ্ব ভ্রমণকারী নাবিক মেগেলিয়ান এই দ্বীপে উপনীত হন। ইহার পরেই জাতির এই আত্ম

বিরোধের ফল দেখা দেয়। আত্ম বিরোধের ফলে সাধারণতঃ জাতির ভাগ্য যেরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাদের ভাগ্যেও তাহাই হইল।

এই সময়ের জনৈক স্পেনীয় ভ্রমণকারী স্বীয় ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছেন—এই ইণ্ডিয়ান দ্বীপ পুঞ্জের অধিবাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর আকৃতি ছাগ-মনুষ্যের আকৃতি—অর্দ্ধাংশ ছাগ ও অর্দ্ধাংশ মনুষ্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক লাঙ্গুলধারী, তৃতীয় শ্রেণীর লোক সিন্ধু রাক্ষস বা নর রাক্ষস। যাহা হউক এই নর পশুরা ইহার পর স্পেনের ত্রাণ মন্ত্রের কৃপায় যে শৃঙ্গ ও পুচ্ছহীন হইয়া শিক্ষিত অধীন মনুষ্য শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিল ইহা বলাই বাহুল্য।

আগামী বার আমরা এই জাতির অধীনতার কথা এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে আত্ম বিসর্জ্জনের কথা বলিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

# রামায়ণী যুগের তক্ষণ শিল্প।

রামায়ণে তক্ষণ শিল্পকে বর্দ্ধকী শিল্প বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্দ্ধকী বলে সূত্রধর বা ছুতারকে। তক্ষণ বলা হইয়াছে করাতিদিগকে। যথা:—

কর্ম্মান্তিকা স্থপতয় পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ।
তথা বর্দ্ধকয়শ্চৈব মার্গিনো বৃক্ষতক্ষণাঃ॥

কাঠের উপর উচ্চরকমের কারিকরিকে তক্ষণ শিল্প বলা হইয়া থাকে। রামায়ণী যুগে এই শিল্পের প্রচুর আদর ছিল। অযোধ্যার প্রতি গৃহের কপাট-তোরণেই যে লতা-পত্র, ফল-পুষ্পাদি খোদিত ছিল, তাহা স্থপতি শিল্প প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। ঐ অধ্যায়ে রাম ভবনের যে বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, রাজগৃহের কপাট সমূহ মণি বিদ্রুম রাশিতে খচিত ছিল, এতদ্ব্যতীত নানা স্থানে—

সুকৃতেহা মৃগাকীর্ণ সুৎকীর্ণ ভক্তিভিস্তথা।

কাঠের উপর বিচিত্র চিত্র (ভক্তি চিত্র, আলিপনা) সমূহ উৎকীর্ণ ছিল এবং স্থানে স্থানে মৃগগণের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। ইহা উন্নত শিল্প জ্ঞানের পরিচায়ক।

এই তক্ষণ বা বর্দ্ধকী শিল্পের প্রচলন যে রামায়ণী যুগেই স্ফীত হইয়াছিল, তাহা নহে। বেদেও বর্দ্ধকী শিল্পের অস্তিত্বের ও আদরের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋক্ বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন সূত্রধারে বিচিত্র রথ নির্ম্মাণ করিতেন, নৌকা প্রস্তুত করিতেন। শিশু ও খদির কাষ্ঠে যান (গাড়ী) নির্ম্মিত হইত। উৎকৃষ্ট কারিকরগণ ক্ষোণী কর্করী প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিত। গৃহ কপাটে লতা পাতা অঙ্কিত করিতে পারিত।

সুতরাং কাঠের উপর উচ্চ শ্রেণীর কারিকরি বা তক্ষণশিল্প জ্ঞান যে ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত, তাহা বেদ হইতেও প্রমাণিত হইতেছে।

রামায়ণে যে স্থানেই প্রাসাদ, অট্টালিকা, দেবালয় প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সেখানেই উন্নত তক্ষণ শিল্পের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। স্থপতি শিল্প অধ্যায়ে আমরা সে সকলের কিছু কিছু বর্ণনা প্রদান করিয়া আসিয়াছি।

গৃহরচনা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও সে যুগে তক্ষণ শিল্পের উন্নত রীতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

লঙ্কায় একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিচিত্র ক্রীড়া পর্ব্বত ছিল। ইহা যে একটী বিচিত্র কারুকার্য্যে সম্পন্ন সামগ্রী—তাহা ইহার নাম হইতেই উপলব্ধি হইতে পারে।

রামায়ণের নানা স্থানে বিচিত্র যানাদির উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে একখানা শিবিকার বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা গেল।

দিব্যাং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাংস্যন্দনোপমাম্।
পক্ষীকর্ম্মভিরাচিত্রাং দ্রুমকর্ম্মবিভূষিতাম্॥২২
আচিতাং চিত্রপর্ত্তীভিঃ সুনিবিষ্টাং সমন্ততঃ।
বিমানমিব সিদ্ধানাং জালবাতায়নাযুতাম্॥২৩
সুনিযুক্তাং বিশালাঞ্চ সুকৃতাং শিল্পিভিঃ কৃতাম্।
দারু পর্ব্বত কোপেতাং চারু কর্ম্ম পরিষ্কৃতাম্॥২৪
(কিষ্কি—২৫ সর্গ)

এই শিবিকাখানা ছিল কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালীর। তাহা ছিল—পক্ষী ও বৃক্ষাদির চিত্রে চিত্রিত, জাল সমন্বিত বাতায়ন যুক্ত, কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্রীড়া পর্ব্বত শোভিত, ইত্যাদি।

রাবণের পুষ্পকরথ বা বিমান যানটী ছিল আর একটী উচ্চ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। উহাতে সুবর্ণের মৃগ ও রত্ন নির্ম্মিত বিহঙ্গ সমূহ খোদিত ছিল। এবং বিবিধ রত্নে খচিত ছিল।

এই শিবিকা ও পুষ্পকযান যে উন্নত শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

# ডেল্‌টন শিক্ষা প্রণালী

আজ সারা বিশ্বে উন্নতি ও স্বাতন্ত্র্যের সাড়া পড়িয়াছে। কেহই আর বসিয়া নাই। সকলেই জড়তা দূর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। সকলের সম্মুখেই অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্মের শেষ নাই, অবধি নাই, কর্ম্মের ভিতর কত বাধা, কত বিঘ্ন রহিয়াছে ; তবু যেন নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া আপন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতেই হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে চলিবে না। কর্ম্ম পূজাই ধর্ম্ম পূজা। কর্ম্মের ভিতর দিয়াই ভগবান আত্ম প্রকাশ লাভ করিয়া থাকেন। যেখানে ভগবানের স্বরূপ বিকাশ পায়, সেখানে কর্ম্মের মধুরিমা আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। আত্মা যখন আত্মহারা হইয়া এই মধুরিমা ভোগ করিতে চায়, তখনই মানুষের মুক্তি। আত্ম চেষ্টার ফলেই মানুষের ভিতর ইহা জাগিয়া উঠে। একবার জাগিলে আর বড় ঘুমাইতে চায় না। সেই আত্ম জাগরণ,—আত্ম স্ফুরণই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম।

ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী এই যুগ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের জনক রোসো বর্ত্তমান যুগের মানুষ না হইলেও তিনিই প্রথমে এই নূতন ধরণের শিক্ষা প্রণালীর সূচনা করিয়াছিলেন, প্রকৃতির লীলা নিকেতনে বসিয়া তাহার কার্য্য প্রণালীর ধ্যান ধারণা, পর্য্যবেক্ষণ ও বিধি নিষেধের মর্ম্ম উপলব্ধি করাই শিশু শিক্ষার প্রথম সোপান। প্রকৃতি-দত্ত শিক্ষার সাহায্যে মানুষের ভিতরের সত্যিকার সুপ্ত মানুষটাকে জাগাইয়া তোলাই রোসোর শিক্ষা প্রণালীর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ভাবপ্রবণ রোসো ইহাকে ততটা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কেবল সুকৌশলে কল্পনার জাল বুনিয়া "ইমিলির" একটা আদর্শ চিত্র আঁকিয়াছেন। পিষ্টা লটসি ইমিলি পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি রোসোর শিক্ষা প্রণালীকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া মনোবিজ্ঞানের গণ্ডীর ভিতর অনিবার চেষ্টা করিলেন। তাহার পরীক্ষা ও পর্য্য-বেক্ষণের ফলে শিক্ষা প্রণালী কতক'। উন্নত হইল। তাঁহার শিষ্য ফ্রোবেল ইহার উপর রং ফলাইয়া কুমার-কানন শিক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কার করিলেন। বর্ত্তমান যুগে এক অপূর্ব্ব নারী প্রতিভা ফ্রোবেলের শিক্ষা প্রণালীকে আরও এক ধাপ উপরে তুলিয়া দিয়াছে। সেই নারী—রোমের ম্যাডাম মেরিয়া মন্টিসরি। তিনি কেবল ফ্রোবেলের অনুসরণ করিয়াছেন এমন কথা আমরা বলি না। তাঁহার নূতনত্ব ও বিশেষত্ব যথেষ্ট আছে।

সভ্য জগৎ তাঁহার Didactic materials এর উপকারিতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাঁহার শিক্ষা প্রণালী তিন হইতে সাত বৎসর বয়সের বালক বালিকাগণের উপযোগী। কেবল পাঠশালায় ইহা কাজে লাগান যাইতে পারে, কিন্তু হাইস্কুলের ছাত্রগণের জন্য যুগধর্ম্মানুযায়ী শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। এই অভাবে পুরণের জন্য একদল শিক্ষা তত্ত্ববিদ্ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তন্মধ্যে ওনিল ( O'neill ), কল্ডওয়াল কুক ( Caldwell cook ), মেকমান ( Mac munn), মিস্ হেলেন পার্কাষ্ট (Miss Helen Purkkeurst) প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য।

মিস্ হেলেন পার্কাষ্ট হাইস্কুলের এই অভাব দূর করিবার জন্যই ডেল্টন শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি আমেরিকার মেসাচুসেটের অন্তর্গত ডেল্‌টন নগরের হাইস্কুলে সর্ব্বপ্রথম এই প্রণালীর পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন। সেইজন্যই উহাকে ডেল্টন শিক্ষা প্রণালী বলা হয়।

অনেকে মনে করেন—মিস্ পার্কাষ্ট মণ্টিসরির শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ডেল্‌টন শিক্ষা প্রণালী নামে প্রচার করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন—সুইফ্‌ট ( Swift ) "The mind in the making" নামক পুস্তকে যে শিক্ষা প্রণালীর বিবরণ দিয়াছেন, ডেল্‌টন প্রণালী তাহারই অনুকরণ। কিন্তু এই দুই মতের কোনটাই আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। মন্টিসরি ও সুইফটের নিকট মিস্ পার্কাষ্ট কোন কোন বিষয়ের জন্য স্বল্প বিস্তর ঋণী হইতে পারেন বটে, কিন্তু মানব মনের স্বাধীনতার অভিব্যক্তির উপায় উদ্ভাবনে তিনি বোধ হয় কাহারও নিকট খুব বেশী ঋণী নহেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক মানুষের ভিতর একটা সত্যিকার সুপ্ত মানুষ আছে। ইহাকে জাগাইয়া উঠানই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই আত্ম জাগরণ—আত্মস্ফুরণ—মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ গণতন্ত্রের ভিত্তি। এই কথাটা মিস্ পার্কাষ্ট তলাইয়া বুঝিয়াছেন বলিয়াই আমাদের মনে হয় যিনি যুগধর্ম্মের এই মূল সূত্রটা খুব ভাল করিয়া ধরিতে পারেন

যুগধর্ম্ম মূলক শিক্ষা প্রণালী আবিষ্কারে তাঁহার অন্তের নিকট খুব বেশী ঋণী হওয়ার তেমন প্রয়োজন হয় না।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে"—এই ভাবটা বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব। ইহাকে খুব সজীব ও সতেজ করিয়া উঠান—এবং ইহার ভিতর দিয়া স্বাধীন অথচ পবিত্র সংযত চিন্তা শক্তির বিকাশ করাই ডেল্‌টন শিক্ষা প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

এখন ইহার কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক; তাহা হইলে ইহার উদ্দেশ্য অনেকটা পরিস্ফুট হইবে।

এখন আমাদের দেশের হাই স্কুলে যেমন প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য এক একটা কামরা নির্দ্দিষ্ট আছে, ডেল্‌টন প্রণালীর ভিতর তেমন কামরাও নাই, তেমন শ্রেণী বিভাগও নাই। কেবল কাজের সুবিধার জন্য কতকগুলি গ্রেড্ আছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বা লেবরেটরিতে যেমন আবশ্যক যন্ত্র ও দ্রব্যাদি সাজান থাকে, এই প্রণালী অনুসারেও প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আবশ্যক পুস্তকাদি ও সাজ সরঞ্জাম এক একটা কামরায় সাজান থাকে। প্রয়োজন হইলে কোন কোন বিষয়ের জন্য দুই তিনটা কামরাও এইরূপ ভাবে সাজাইয়া রাখা হয়। প্রত্যেক কামরায় একজন শিক্ষক থাকেন। এখানে বসিয়া কাজ করিবার জন্য শিক্ষকগণের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। যখন যে পুস্তকের বা জিনিষের দরকার, ঐ কামরায় তৎক্ষণাৎ তাহা পাওয়া যায়। রিসার্চ স্কলার যেমন বড় বড় লাইব্রেরীতে বসিয়া যখন যে পুস্তকের দরকার হয় তাহা হইতেই উপাদান সংগ্রহ করে, এখানেও ছাত্রগণ ঠিক তাহাই করিয়া থাকে। পাঠ্য পুস্তকগুলি বিষয়ানুসারে প্রত্যেক কামরায় রাখিয়া দেওয়া হয়। যেমন ইতিহাসের কামরায় সমস্ত ইতিহাস, ভূগোলের কামরায় সমস্ত ভূগোল, এটলাস ও ম্যাপ ইত্যাদি সারি সারি সাজান থাকে।

এই প্রণালী অনুসারে ছাত্রগণ রোজের পড়া রোজ শিখিয়া এক বোঝা পুথি লইয়া গুরু মহাশয়ের কাছে হাজির হয় না। সম্বৎসরে ছাত্রগণ কোন্ বিষয়ে কতটুকু কাজ করিবে তাহা চুক্তি করিয়া লয়। আবার সম্বৎসরের কাজ কোন্ মাসে কোন্ সপ্তাহে কতটুকু হইবে, তাহাও ভাগ করিয়া লইতে হয়। যদি বৎসরে ১০ মাস স্কুল বসে, আর ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই পাঁচ বিষয় পড়িবার দরকার হয়, তবে প্রতিমাসে পাঁচ রকম কাজের চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতে হয়। অর্থাৎ সম্বৎসরে ৫০টি চুক্তিবদ্ধ কাজ করিতে হয়। এ ছাড়া, শারীরিক ব্যায়াম ও ললিত কলার চর্চ্চা করিতে হয়। সম্ভব হইলে এ গুলির জন্য চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতে হয়। ইহাদের অধ্যাপনার জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক রহিয়াছেন। ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বিকাল বেলায় সকলে একত্র হইয়া এই বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে পারে।

চুক্তিবদ্ধ কাজ করিবার জন্য ছাত্রগণ একমাসে ২০ দিন সময় পায়। এই ২০ দিন তাহারা নিজ নিজ সুবিধানুসারে কাজ করে। এত সময়ে এতটুকু কাজ করিতেহইবে—এমন কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই।

প্রতিমাসে কোন্ ষ্টাণ্ডার্ডের কোন্ ছাত্র কোন্ বিষয়ে কতটুকু কাজ করিবে, তাহা পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখা হয়। ছাত্রগণ নিম্নলিখিত রকমের একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া ঐ কাজ করিতে প্রতিশ্রুত হয়।

আমি অমুক ষ্টাণ্ডার্ডের অমুক ছাত্র অমুক বিষয়ে এতটুকু কাজ করিব বলিয়া চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতেছি।
তারিখ...... ।

প্রত্যেক গ্রেডের জন্য এইরূপ একটা চুক্তিপত্র থাকে।

অনেকে বলিতে পারেন,—এখনও শিক্ষকগণ নির্দ্দিষ্ট পাঠ পূর্ব্বদিন বলিয়া দেন, পরদিন ছাত্রগণ বাড়ী হইতে উহা তৈরী করিয়া আনে। এই চুক্তিবদ্ধ কাজও ঠিক সেইরূপ। তবে ইহার বিশেষত্ব কি?

প্রত্যহ ছাত্রগণকে যে কাজটুকু করিতে বলা হয়, তাহাতে ছাত্রগণ একমাস বা এক বৎসরে কোন্ কাজ কতটুকু কিরূপে করিবে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। শিক্ষক ছাত্রকে যে পথে চালায় সে সেই পথেই চলে। সে শিক্ষকের নিকট সাক্ষীগোপাল মাত্র। কিন্তু মাসের বা বৎসরের চুক্তিবদ্ধ কাজ এমনি ভাবে ঠিক করিয়া দেওয়া হয় যে কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ দেখিয়া ছাত্র বুঝিতে পারে তাহাকে কিরূপে কতটুকু কাজ করিতে হইবে; কোন কোন পুস্তক পড়িলে তাহার কাজের বিশেষ সুবিধা হইবে; কোন্ প্রশ্নের উত্তর

কিরূপে তৈরী করিতে হইবে; কোন্ কোন্ বিষয় অপেক্ষাকৃত কঠিন, কোন্ বিষয়ে সময় বেশী লাগিবে, মূল আলোচ্য বিষয় কি, কিসের উপর তাহাকে বেশী ঝোঁক দিতে হইবে। যখন তাহার কাজের এতটুকু বুঝিতে পারে তখন সে আর শিক্ষকের হাতে ছেলে খেলার জিনিষ নয়। সে বুঝে, সে মানুষ; তাঁর একটা পৃথক স্বত্বা আছে; তাঁর ভিতর কর্ম্মের প্রেরণা আছে; তাঁর কাজের বিশেষত্ব আছে, দায়িত্ব আছে। এইজন্য যেমনি ছাত্র চুক্তিপত্র সই করে, অমনি তাহার কাজের জন্য নিজকে দায়ী মনে করে। তারপর সে আপন মনে আপন কাজ করিয়া যায়। তার মনের ভিতর স্বাধীন চিন্তাশক্তি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে। বাহির হইতে তার মনের উপর কেহ কোন চাপ দেয় না, কেবল নেহাত দরকার হইলে স্বেচ্ছায় শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করে। সে কর্ম্মের ভিতর দিয়া নিজকে খুঁজিয়া লয়; নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে; দিন দিন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উন্মেষ সাধন করে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি ছাত্র শিক্ষকের নিকট স্বেচ্ছায় কিছুই জিজ্ঞাসা না করে, তবে কি শিক্ষক মহাশয়ের কোন কাজ থাকিবে না? তিনি কি অলসভাবে বসিয়া সময় কাটাইবেন? আমরা উত্তরে বলিব "না"। কারণ এখানে শিক্ষকের কাজ আরও গুরুতর, আরও বেশী দায়িত্ব পূর্ণ। শিক্ষকের বিদ্যা বুদ্ধি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার এমন একটা মোহিনী শক্তি থাকা চাই, যেন তাহাকে দেখিবামাত্রই ছাত্রগণের মনে বলবতী অধ্যয়ন স্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে। ছাত্রগণ কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে শিক্ষক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবেন। এখানে ভাবনা চিন্তা করিয়া কোন কিছু বলিবার সময় নাই। কাজেই শিক্ষক মহাশয়কে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়। কেবল জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ের সংবাদ সরবরাহ করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য নহে। সহজে কোন্ বিষয় কিরূপে শিখা যায় তাহাও শিক্ষক বলিয়া দিবেন। যে সমস্ত যন্ত্র ও পুস্তকাদি ছাত্রদের কাজে লাগে, তাহাদের কোন্টী কিরূপে ব্যবহার করিলে বা পড়িলে ছাত্রগণের পরিশ্রমের লাঘব ও কাজের সুবিধা হয়, তাহা শিক্ষক দরকার হইলে বলিয়া দিবেন।

কিছুদিন হইল মিলিসেণ্ট মেকেঞ্জি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেল্টন শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে অতি উপাদেয় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে এই প্রণালী অনুসারে শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বড়ই গুরুতর।

ডেল্টন প্রণালী অনুসারে প্রত্যহ ছাত্রগণের নাম ডাকার নিয়ম নাই। যে পথে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, সেখানে কে কখন আসে, তাহা লিখিবার জন্য একটা কাগজ টানাইয়া রাখা হয়। ছাত্রগণ স্কুলে ঢুকিবার সময় নিজেরাই ঐ কাগজে কে কখন আসে তাহা লিখিয়া রাখে। যদি কেহ বিলম্বে আসে, তবে কত মিনিট বিলম্ব হইল, তাহাও লিখিতে হয়।

কোন্ সময়ে কোন্ কাজ করিতে হইবে তাহারও কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। অর্থাৎ এই প্রণালীর ভিতর দৈনিক কার্য্যতালিকা ( Routine ) বলিয়া কোন জিনিষ নাই। ৪৫ মিনিট পর পর শিক্ষকগণের শ্রেণী ও বিষয় পরিবর্ত্তন করার বিধি নাই। ছাত্রগণ নিজের সুবিধা অনুসারে সপ্তাহের কাজগুলি যে দিন ইচ্ছা সেই দিন করিতে পারে। কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে একমাস কেবল এক বিষয়ের চুক্তির কাজ শেষ করিয়া সেই বিষয় পরীক্ষা দিতে পারে? অথবা সে সকল বিষয় প্রত্যহ কিছু কিছু পড়িয়া এক সময়ে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারে। প্রত্যেকেই এক মাসের কাজ শেষ করিয়া আর এক মাসের কাজের চুক্তি পত্র লিখিয়া দেয় যদি কেহ কোন অনিবার্য্য কারণে নির্দ্দিষ্ট কাজ শেষ করিতে না পারে, তবে তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। ভাল ছেলেরা তাড়াতাড়ি নির্দ্দিষ্ট কাজ শেষ করিয়া অনেক অতিরিক্ত কাজ করিতে পারে; কিংবা যে বিষয় তাহাদের খুব ভাল লাগে, সেই বিষয়ে মৌলিক গবেষণাও করিতে পারে। যাহারা তেমন ভাল ছেলে নয়, তাহারা ধীরে ধীরে আপন কাজ করিতে পারে। ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

আবার কতকগুলি কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। যেমন গীত বাদ্য, আবৃত্তি, ব্যায়াম প্রভৃতি। এগুলি সাধারণতঃ বৈকাল বেলায় হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে ছাত্রগণ দল বাঁধিয়া যাদুঘর, প্রদর্শনী ও বড় বড় কল কারখানা দেখিতে যায়।

প্রত্যেক কামরার ভিতর দেওয়ালের গায় একটা চার্ট ( Chart ) ঝুলান থাকে। প্রত্যেক গ্রেডের জন্য একটা চার্ট আছে, এই চার্ট দেখিলেই শিক্ষকগণ বুঝিতে পারেন—কোন্ গ্রেড্ কতটুকু কাজ করিয়াছে। কোন্ বালককে কতটুকু

সাহায্য করা দরকার। কেহ কেহ বলেন, প্রত্যেক কামরার ভিতর প্রত্যেক ছাত্রের কাজের মাত্রা বুঝিবার জন্য একটা গ্রাফ (Graph) থাকা দরকার। ইহার সাহায্যে প্রত্যেক ছাত্রের উন্নতি অবনতি বুঝিবার সুবিধা হয়। শিক্ষক যদি বুঝিতে পারেন—যে কোন ছাত্র পিছনে পড়িয়াছে। সে অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, তখন তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন।

ছাত্রগণ প্রায় ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত সাজান কামরায় (Laboratory) বসিয়া কাজ করে। তারপর এক ঘণ্টা শিক্ষক ও ছাত্রগণের সম্মিলন হয়। ইহাতে কোন্ বিষয় কিরূপে পড়িলে সুবিধা হয়, তাহার আলোচনা করা হয়, বিকাল বেলার ছাত্রগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

অন্যান্য প্রণালীর ন্যায় এখানেও একজন শিক্ষকের অধীনে যত কম ছাত্র থাকে, কাজ ততই ভাল চলে। এই প্রণালী অনুসারে একজন শিক্ষক সাধারণতঃ ২৫ জন হইতে ৩০ জন ছাত্রের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

এ জগতে নিখুঁত জিনিষ নাই। ডেল্‌টন প্রণালীও নিখুঁত বা নির্দ্দোষ নহে। ইহার প্রথম দোষ এই যে—অল্প বয়সে ছাত্রগণের ঘাড়ে অতিরিক্ত মাত্রায় দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়! মিস্ রোসা বেসেট (Miss Rossa Basset) বলেন এত কচি বয়সে ছেলেদের ঘাড়ে এত দায়িত্বের বোঝা চাপান যায় কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। * কারণ এমন অনেক ছেলে আছে, যাহারা বাহিরের কোন চাপ না থাকিলে, কখনই কোন কাজ করিতে চায় না; কেবল হেলায় খেলায় সময় কাটায়। যে কোন রকমে তাহাকে কাজ করিতে দেওয়া যায়, সে কাজ না করিয়া কেবল কার্য্যপ্রণালীর দোষগুণের বিচার করে; কিছুতেই যেন তুষ্ট হইতে চায় না।

এখনও ছাত্রদের নৈতিক জ্ঞান এতটা পাকিয়া উঠে নাই যে সকলেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিবেকের অনুমোদনে সব কাজ করিয়া ফেলিবে। আবার বাস্তব জগতে নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা নাই। কার্য্যক্ষেত্রে বা সমাজেই কোন না কোন এক জনের অধীনে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে। কাজেই ছাত্রগণকে নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা দেওয়া অথবা তাহাদের হাতে সব কাজ সঁপিয়া দেওয়ার বিশেষ কিছু সার্থকতা নাই। তবে কি না, কৌশলে কাজের ভিতর দিয়া যতটুকু আবেগ উৎসাহের প্রেরণা দেওয়া যায়, ততই কাজটা মনের আনন্দে করা যায়। কাজের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও আত্মপ্রসাদের মাত্রা এবং দায়িত্বজ্ঞান বাড়ানই ডেল্‌টন প্রণালীর বিশেষত্ব।

দ্বিতীয় দোষ এই যে ডেল্‌টন প্রণালীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দিনরাত ছাত্রগণের স্বাধীনতার কথা ভাবিতে ভাবিতে হয়ত শিক্ষক মহাশয় নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিতে পারেন। ইহা বাস্তবিক আশঙ্কার বিষয়।

তৃতীয় দোষ—যাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে চুক্তিবদ্ধ কাজ করিতে না পারে, তাহাদের কাজের বন্দোবস্ত করা বড়ই জটিল ব্যাপার। এখানে দৈনিক কার্য্যতালিকা (Routine) অনুসারে কাজ করা বৈ আর উপায় নাই। কাজেই বাধ্য হইয়া ডেল্‌টন প্রণালীর আইন ভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

৪র্থ দোষ—এই প্রণালী অনুসারে লিখিত পাঠ্যপুস্তকের নিতান্ত অভাব। বাজারে প্রচলিত পুস্তকে এই প্রণালীর কাজ চলে না। এই সমস্ত কারণেই ডেল্‌টন প্রণালী এখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। নানা অপূর্ণতা সত্ত্বেও শিক্ষাজগতে ইহার উপযোগিতা আছে। সকলেই স্বাধীনভাবে কাজ করে অথচ কেহই কাহারও অনুগ্রহে বঞ্চিত নহে। প্রয়োজন হইলে একে অন্যের সাহায্য করে, নির্ব্বিবাদে সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে। ইহার ফলে ছাত্রগণ বেশ বুঝিতে পারে যে ছাত্র সমাজের ন্যায়, মানব সমাজও পরস্পরের সাহায্য, সহানুভূতি না পাইলে চলিতে পারে না।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ বি, এ।

---

* "The Times"—Educational Supplement for March—1922

# সমালোচনা।

শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ—শীর্ষক এলবামখানা আমরা ২৪ নং বিডন ষ্ট্রিটস্থ ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব আর্ট হইতে সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। ইহাতে চিত্রশিল্পী হেমচন্দ্র নাথ মজুমদারের অঙ্কিত ১২ খানা চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। হেমেন্দ্রনাথ ময়মনসিংহের গৌরব। ময়মনসিংহ চিরদিনই চিত্রশিল্পে বাঙ্গালার গৌরব রক্ষা করিতেছে। স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর ও হেমভ্রাতৃদ্বয়ের নাম যেমন প্রতীচ্য ভূমিতেও গৌরবের সামগ্রী আজ হেমচন্দ্র নাথের নামও সেইরূপ স্বদেশ বিদেশ সর্ব্বত্র আদৃত। কলিকাতা বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতির শিল্প প্রদর্শনী সমূহে হেমেন্দ্র নাথের যে সকল চিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পুরস্কৃত হইয়াছে ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব আর্ট—"শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ" নামে সেই সমস্ত চিত্রই এলবাম আকারে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ আমরা তাহারই ১ম খণ্ড পাইয়াছি। হেমেন্দ্রনাথের চিত্রের তুলনা নাই। হেমেন্দ্র মেষ অঙ্কিত করিতে যাইয়া হরিণ অঙ্কিত করেন না, রক্ত মাংসের ঘোটক আঁকিতে কাঠের খেলনা আঁকেন না; বংশ পুঞ্জ তাঁহার হস্তে ইক্ষুক্ষেত্রে পরিণত হয় না। তাঁহার তুলিকার মোহন স্পর্শে যে কোন জিনিষ প্রাণবান হইয়া জীবন্ত হইয়া দর্শকের চিত্ত মুগ্ধ করে। সৌরভের পাঠকদিগের নিকট শিল্পী হেমেন্দ্রনাথের শিল্প সুষমা অপরিচিত নহে। আমরা আশীর্ব্বাদ করি শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথের তুলিকা অক্ষয় হউক। তাহার তুলিকা স্পর্শে বাঙ্গালার শিল্প ভবন সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য পুর্ণ হউক, আমরা ধন্য হই। এলবাম্ খানি সুবিখ্যাত ইউ রায় এণ্ড সন্সের দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

"রণডঙ্কা" শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য বার আনা ব্রজেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ গুলি আমরা যেরূপ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি বালকদিগের জন্য লিখিত এই রণডঙ্কাও তেমনি আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি এবং সুখের বিষয় যে তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি অনুভব করিয়াছি। "রণডঙ্কা" বঙ্গীয় বালকদিগের প্রাণে ডঙ্কা বাজাইয়া দিবে। গল্প গুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে; পুস্তকের বাঁধাই এবং ছাপাও সুন্দর।

বিক্রমপুর ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত নবকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কচুরী পানাকে কার্য্যে লাগাইয়া বিজ্ঞান রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। কচুরী বা জর্ম্মণ পানা উপদ্রবে দেশের লোক উপায়হীন, গবর্ণমেণ্ট বিব্রত! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণায় সেই দারুণ দেশ শত্রু নানাবিধ রঙ্গের ও কালির উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অদ্য আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়া তাঁহার নানারূপ রং ও কালি প্রস্তুতের প্রক্রিয়া দেখাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কালি, ষ্টাইলো, ফাউনটেইন প্রভৃতি-তেও ব্যবহার করা যায়। এই কালি বিদেশী কালি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সুলভ, বিশেষ সম্পূর্ণ স্বদেশী। কচুরীর এসিড ও হীরাকসের নানা পরিমাপের সংমিশ্রনদ্বারা নানা রঙ্গের কালি উৎপন্ন হইয়া থাকে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কালি "কহিনুর" কালি নামে বাজারে পরিচিত।

গৃহ শিল্প বা দরিদ্রের অন্নসংস্থান—শ্রীঅন্নদা প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রণীত মূল্য ॥০ আনা। গ্রন্থকার চরকা ও তাঁতের সাহায্যে কি প্রকারে দরিদ্রের অন্নসমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। দিন দিন অন্নসমস্যা যেরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে তাহাতে এই প্রকার পুস্তকের খুব বেশী প্রচার আবশ্যক।

স্বাস্থ্য, ধর্ম্মগৃহ পত্রিকা—৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট স্বাস্থ্য সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত, ইহাতে দিন পঞ্জিকার সহিত পদ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানা সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয় হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। লিখিলে বিনা মূলেই পুস্তক বিতরিত হইয়া থাকে।

প্রাণের কথা—শ্রীপ্রমথনাথ দাস প্রণীত মূল্য আট আনা। পুস্তকখানা পদ্যে লিখিত। সমালোচক কবি নহেন সেজন্যই বোধ হয় তাঁহার নিকট প্রাণের কথা ভাল লাগিল না। লেখক গদ্যে লিখিতে চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

# স্নেহের দান।

( ৮ )
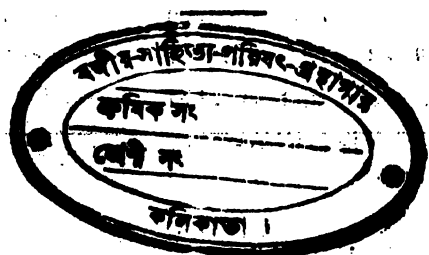
মাখনের সহবাসে আসিয়া মণি তাহার জমিদারী চাল ছাড়িয়া দিয়া একেবারে সাধারণ মানুষটী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা মণির মা হইতে আরম্ভ করিয়া বড় হিস্যার কাহারও চক্ষে ভাল ঠেকিতেছিল না। এইরূপ খামখেয়াল পিতা বর্ত্তমানে শোভা পাইয়াছে বলিয়া এখনও কি তাহা সম্ভব? এখন লোকের সম্মুখে তাহাকে দস্তুরমত চারিদিক বহাল রাখিয়া প্রকাশ পাইতে হইবে। জমিদারের পক্ষে আড়ম্বর চাই: বাহুল্য খরচ—ধুমধাম, চা-চুরট—সব চাই। ইহা সাধারণ লোকের চক্ষে তাক্ লাগাইয়া দিবার উপায়। কলিকাতা যাইয়া মণির এগুলি কিছু কিছু করিয়া আয়ত্ত হইতেছিল মাত্র, কিন্তু হঠাৎ সে সকল অভ্যাসে বাধা পড়িয়াছে।

মণি বাবুর এই পরিবর্ত্তনের কারণ মাখন; ইহা গোপী ভাণ্ডারীর প্রমুখাৎ জমিদার বাড়ীর কাহারও জানিবার বাকী ছিল না। এই কারণে মাখনকে বড় হিস্যার কোন একটী প্রাণীও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না; অথচ মণির ভয়ে এবং মাখন ছোট হিস্যার কর্ত্রীর বোনপুত পরিচয়ে—কেহ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতেও সাহস পাইত না।

মাখন জমিদার বাড়ীর এই বিচিত্র ভাব স্বর্গীয় কর্ত্তার বচনেও একদিন স্পষ্ট অবগত হইয়াছিল। মণির মার সহিত মণির বিবাহের আলোচনাতেও অনুভব করিয়াছিল। তাই মণির সহিত সমান ক্ষেত্রে চলিয়া যে তাহার পোষাইবে না, তাহা সেদিন একটু কড়া কথাতেও সে মণিকে বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। মণিও তাহার সে ব্যবহারকে একটু অসরলই মনে করিয়া দুঃখিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পরেই দুই বন্ধুতে পুনরায় ভাব হইয়া গেল।

যাহা হউক পুত্রহীন মাসীমার অকৃত্রিম পুত্রস্নেহের ভ্রাতৃহীন কনকের সরল ভ্রাতৃপ্রেম ও সলজ্জ ভালবাসার এবং যুবক বন্ধু মণিমোহনের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের যে আকর্ষণ ছিল, মাখন তাহার চারিদিকের এই পুঞ্জীভূত অবহেলা ও অশ্রদ্ধা-দৃষ্টিকে সে সকলের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য মনে করিয়া কয়েকদিন নীরবে কাটাইয়া দিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল।

কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে মাখন মাসীমাকে কনকের বিবাহ সম্বন্ধে পুনরায় প্রশ্ন করিল—"মণির মা বাঁশরী বাবুর ছেলের সঙ্গে কনকের বিবাহে তাঁহাদের গৌরব হানীর আশঙ্কা করেন; তাহা হইলে বাঁশরী বাবুর সহিত আর আলাপ করিব না?"

মাসীমা—"এদের গৌরবের জ্ঞান এরূপই বাবা; যাহা হউক, তোমার আর পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। মণির বিবাহের জন্য যে ঘটক যাইবে, তিনিই আমাদের সম্বন্ধও খোজ করিতে পারিবেন।"

মাখন—"ঘটকের কথাই কিন্তু চূড়ান্ত না মাসীমা!"

মাসীমা—"তুমি নিজে পাত্র দেখিয়া না পছন্দ করিলে আমি আর কারো কথায় পড়িব না; পূজার সময় আসিলেই সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিব।"

মাখন বলিল—"পূজায় আসিতে পারিব না, মাসীমা! আমি এম্ এ, পরীক্ষা না দিয়া আর কলিকাতা ছাড়িব না। এবার রাতদিন পড়িতে হইবে আড়াই বৎসরে দুটা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ঘটকের কার্য্যের সংবাদ আমাকে চিঠি দ্বারা জানাইবেন পছন্দ হইলে আমি অবসর করিয়া পাত্র দেখিয়া আসিব। কিন্তু মাসীমা, পাত্রটী কেবল জমিদার, এই একমাত্র গুণ—আমার নিকট গ্রাহ্য হইবে না; তোমাদের তেমন পছন্দ হইলে, আমাকে আর জানাইওই না।"

মাসীমা হাসিয়া বলিলেন—"কনকের বিবাহের সম্পূর্ণ ভারই তোমার উপর রহিল বাবা, তুমি ভগবানের ইচ্ছায় পরীক্ষা দিয়া আসিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করিবে সেইরূপ হইবে। বয়স তার আর এমনই কি বেশী হইয়াছে? আর বেশী হইলেই কি করা? অপাত্রেতো দিতেপারি না?"

কনকের সহিত সাক্ষাৎকালে কনক বলিল—"পূজায় না আসিলে কিন্তু দাদা আমি বড়ই কষ্ট পাইব।"

মাখন—"আমি আসিলেই বেশী সুখী হইবে, না পরীক্ষায় পাস হইলে বেশী সুখী হইবে?"

কনক—"আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি, আসিলে তুমি ফেল্ হইবে না। আসিবে এবং পাস করিবে—দুটাই তুমি করিবে।"

মাখন হাসিয়া বলিল—"তোমার বিবাহে আসিব।"

শুনিয়া কনকের মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে মাখনের মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মুখ নত করিয়া রহিল। এ দৃশ্য মাখনের নিকট নূতন ঠেকিয়াছিল এবং ইহা তাহার মনেও দারুণ আঘাত করিয়াছিল। মাখন পুনরায় কথা ফিরাইয়া বলিল—"তবে কি করিব দিদি?"

কনক ম্লান মুখেই বলিল—"যাহা করিয়া তুমি মনে সুখ পাইবে, তাহাই করিও।"

মাখন বলিল—"তুমি যাহা বলিবে, করিতে পারিলে তাহা করিয়াই সুখী হইব।"

---

# নানা মুণির নানা মত।

নানা মুণি যখন, তখন নানা মত তো হবেই হবে।
হ'লে পরও মূল ঘরের সেই বার্ত্তাটুকু ঠিকই রবে।
ব্রহ্ম রূপ চৈতন্য বস্তু এক যেমন সে একই আছে
ভ্রম দৃষ্টি জন্মেছে কেবল জগৎ সৃষ্টি হ'লে পাছে।
গ্রহাদিত্যের দীপ্তি যখন প্রকাশ পায়নি ঐ অম্বরে
ব্রহ্মা তখন ছিলেন স্থিত বাক্য মনের অগোচরে।
বহু হবার ইচ্ছাতে যেই আত্ম মায়ার নিলেন শরণ
ব্যক্ত হ'ল স্বভাব কর্ম্ম অদৃষ্টের সেই স্থূল আবরণ।
সত্য সত্যই সগুণ ব্রহ্মের সঙ সাজিবার স্বভাব আছে;
বিশ্ব ভরা এই বিভূতি একেতেই লীন হবে পাছে।
নির্গুণ আর সে নিরুপাধির স্থিতি নিত্য এক আধারে,
নানা মুণির না না মত হয় সগুণ ব্রহ্মের গুণ বিচারে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

---

# দর্প চূর্ণ।

(ক)

চল্লিশ টাকার মাষ্টার শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী যে কোন্ দুরভিসন্ধি মনে আটিয়া একটা কায়েতের ছেলেকে বিদেশে রাখিয়া তাহার বি. এ, পড়িবার সর্ব্বপ্রকার খরচ জোগাইতেছে, এই সমস্যাটা বাউলপাড়া গ্রামের নিষ্কর্ম্মা দলের মধ্যে বেশ একটুক মজ্‌লিসি ভাবেই আলোচিত হইত। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বক্তার মত কেহ কেহ মন্তব্য পাশ করিত, নিশ্চয়ই এতে বামুনের স্বার্থের গন্ধ আছে, নতুবা বামুন হয়ে কায়েতের ছেলের উপর এত দরদ, তা কি তোমরা বুঝ্‌তে পারছনা হে?'

কেহ কেহ উহা সমর্থন করিত, কেহবা অপর একটা নূতন কল্পনায় উপনীত হইয়া সগর্ব্বে বলিয়া ফেলিত—"তা আর বুঝ্‌বনা ভায়া, ছেলেটি এম, এ. বি, এল পাশ করবে, উকীল হবে, জজ হবে, তারপর শিশির চকোত্তির শেষ বয়সের খোরাক জোগাবে।"

বাস্তবিক শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী যে আনন্দপ্রসাদ মজুমদারের টাকার তাগিদ না আসিতেই তাহার নিকট মাসে মাসে ত্রিশটি টাকা করিয়া পাঠাইয়া দেন, একথা গ্রামের ভিতর কাহারও অবিদিত ছিলনা। গ্রামের আশে পাশের লোকগুলা পর্য্যন্ত এই খবরটাও সত্যরূপেই জানিয়া নিয়াছিল যে যদি কোন মাসে আনন্দ মজুমদার টাকার তাগিদ দিয়া আর্জেণ্ট চিঠি পাঠাইত, তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়া আশ্বস্ত হইতেন।

শিশির চক্রবর্ত্তীর আর্থিক অবস্থা যে খুবই ভাল, তাহা নহে; তবে গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, বাগানভরা ফল, গোয়ালভরা গরু—যথেষ্টই আছে। তাছাড়া মাষ্টারী করিয়া বাড়ীতে বসিয়া মাসে মাসে চল্লিশটি টাকা প্রাপ্তি—এটাকে উপড়ি পাওনা বলিলেও চলে। আনন্দ প্রসাদের চরিত্র ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে শিশুকাল অবধি পালন করিয়া আসিতেছেন।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাউলপাড়া আসিয়া আনন্দ মজুমদার শুনিতে পাইল, তাহার আগমনে মুক্তি কামনা

করিয়া নাকি কোন এক কন্যাদায়গ্রস্তব্যক্তি তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। অথচ ঐ অপরিচিত ব্যক্তির মনোগত অনুরোধটা যখন স্বয়ং শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তীর মারফৎ বাহির হইয়া আসিল, তখন আনন্দপ্রসাদ ঐ অনুরোধটিয় সদ্গতিই করিবে কিংবা অধোগতি করিবে, এই ভাবিতে ভাবিতে খানিকক্ষণ বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। শিশির বাবু বলিলেন "বুঝেছ আনন্দ, মনোরমী গ্রামের এই জনার্দ্দন বসু তোমারই পিতার বাল্যবন্ধু। এরই জ্যেষ্ঠা কন্যার কথা বলছি তোমাকে, মেয়েটি দেখতে শুনতে বেশ। এই এগারো বছর বয়সেই মেয়েটি গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ স্বহস্তে সম্পন্ন করতে শিখেছে। তাছাড়া সূচীকার্য্য, শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতিতেও বেশ চতুরা। রামায়ণ ও মহাভারত আমি নিজে পড়িয়ে শুনে এসেছি।"

আনন্দ মজুমদার শুধু শুনিয়াই যাইতেছিল। উহাকে নীরব দেখিয়া শিশির বাবু আবারও বলিতে লাগিলেন "উপার্জ্জনক্ষম হও নাই, তাই ভাবছ, না? সেই জন্যে তোমার চিন্তা করবার মোটেই দরকার নাই। তোমার বাপ মা যদ্দিন বেঁচে আছেন, দু'বেলা আহার জুটবেই। বুড়ো মানুষ, মেয়েটি দেখে, খুবই পছন্দ হয়ে গেছে তাঁর। একথাটা শুনাবার জন্যই তিনি সে দিন বাড়ীথেকে অতিকষ্টে আমার এখানে এসেছিলেন। আজ মেয়ের বাবাই স্বয়ং উপস্থিত।"

মেয়ের বিদ্যার দৌড় মোটেই রামায়ণ ও মহাভারত পর্য্যন্ত, এই ভাবিয়া আনন্দপ্রসাদ নিজের মনোভাবটি গুপ্ত রাখিয়া শিশির বাবুকে জানাইল যে এখনও তত ব্যস্ততার কারণ নাই।

তারপর আনন্দ বহরমপুরে আসিয়া প্রিন্সিপ্যালের নিকট হইতে পাশের খবরটা পাইয়া বরাবর ঢাকাতে চলিয়া আসিল। ইচ্ছা যে অবশিষ্ট পড়া ঢাকাতেই পড়িবে।

বি, এ পাশের খবরের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ খরচের জন্য লম্বা একটা ফর্দ এ যাত্রা যাহা আসিল, তাহা শিশির বাবুর হাতে না পড়িয়া দৈবক্রমে চক্রবর্ত্তী গৃহিণীর হস্তগত হইল। স্বামীর মেজাজ তিনি বিলক্ষণ জানেন, তাই একটু নরম সুরেই বলিলেন "—সারাজীবনটা এই ছেলের জগদ্দল খরচ জুগিয়ে শেষকালে কি তুমি ফতুর হতে যাবে নাকি? দেখছনা কত বড় লম্বা ফর্দ্দ! শার্ট চাই, কোট চাই, জুতো চাই, এম, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হবার ফিস্ চাই, বেতন চাই, আগামী মাসের খরচ, বইপুথির দাম, আইন কলেজের পড়া—আরো কত কী? এদিকে যে জগদ্দল ঋণের বোঝা—নিজের জমিজমাগুলো পর্য্যন্ত গ্রাস করতে বসেছে! অবস্থা বুঝেতো ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে? ছেলেপুলোগুলো হয়েছে এদের দিকেও তো তাকাতে হবে?"

পর্ব্বতের মত অটল, অথচ জলধির মত গম্ভীর শিশির বাবুর স্নেহ প্রবণ হৃদয়ে সে সমস্ত উপদেশ বাণী ব্যঙ্গে কথার সামিল গণ্য হইয়া বড় একটা আঘাত করিয়া উঠিতে পারিল না। আনন্দপ্রসাদ ঢাকার মেসে থাকিয়া যথাসময়েই সকল টাকা গণিয়া পাইল।

ঢাকা ইডেনগার্লস্ স্কুল হইতে সেবৎসর সুরীতিবালা পাল ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পনর টাকা জলপানী পাইয়াছে,—এই সাচ্চা খবরটা যেদিন তাহার সবজ্যান্তা বন্ধু হারাণ সোম বড় আড়ম্বরের সহিতই মেসের মধ্যে আসিয়া প্রচার করিয়া বসিল, সেদিন আনন্দপ্রসাদের নৈশভোজন ও রাত্রি নিদ্রা এই উভয়েরই পরিমাণ অপ্রত্যাশিত রূপে খাটো হইয়া পড়িয়াছিল। ভোজনের পরিমাণটি লক্ষ্য করিয়াছিল সেই মেসের নিরীহ পাচকটি, আর রাত্রিযাপন লক্ষ্য করিয়াছিলেন সর্ব্বদর্শী লেখক ভগবান্।

পরের দিবস হইতে সেই সবজ্যান্তা হারাণ সোমের সঙ্গে আনন্দপ্রসাদের বন্ধুত্ব, শীতকালের বরফরাশির মত অতি দ্রুত ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। 'মিস্ পালজা' মহাশয়ার গায়ের রংটি অপছন্দের কারণ হইলেও ইনি যে সর্ব্বাংশে আনন্দপ্রসাদের আনন্দদায়িনা হইবেন ইহাই উভয়ের পরামর্শে স্থিরীকৃত হইল এবং বিচক্ষণ হারাণ বাবুর ঘটকালিতে কন্যাপক্ষ এবং পাত্রপক্ষের সর্ব্ববিধ মত মীমাংসা হইয়া শ্রাবণ মাসের ভিতরেই শুভ কর্ম্মটি সম্পন্ন হইয়াগেল। এই বাবতে পাত্রপক্ষের যাহা কিছু খরচ সমস্তই শিশির বাবুকে বহন করিতে হইল।

( খ )

সুরীতিবালা পিতৃপ্রদত্ত খরচেই কোন কলেজে ভর্ত্তি

হইয়াছে। স্বামী এবং স্ত্রী চক্রবাক, চক্রবাকীর মত ঢাকা ও কলিকাতায় থাকিয়া নিজেদের সাধ্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। বাউলপাড়ার সেই নিষ্কর্ম্মার দলে যে সমস্ত আরবদেশীয় গল্প দৈনিক শতশাখা হইয়া বিস্তৃতিলাভ করিত, আনন্দপ্রসাদের এই আকস্মিক বিবাহ ব্যাপারটা সেই সমস্ত উপন্যাসের আরও সাজ সরঞ্জাম বাড়াইয়া দিল। গল্পকারীরা কতক কালের নিমিত্ত নূতন একটা খোরাক পাইয়া পুষ্ট হইল। আনন্দপ্রসাদ যে শিশির বাবুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া অবশেষে এমনই একটা কিছু করিবে ইহা নাকি তাহারা আগেই বলাবলি করিয়া রাখিয়াছিল। বিবাহের পর এখন আর আনন্দপ্রসাদের বিবেকের নাড়ী শিশির বাবুর প্রতি স্নেহবদ্ধ থাকিবে কিনা তাহা জানেন একমাত্র ভগবান্। তবু ভাল যে তাহার বৃদ্ধপিতা কতককাল আগেই পুত্রবধূর মুখদর্শনে চিরকালের নিমিত্ত নিস্পৃহ হইয়া অমরলোকের অতিথি হইয়াছেন।

ইহার এক বৎসর পর কার্ত্তিকমাসের শেষভাগে সহসা ঢাকা সহরে বসন্তরোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাবে স্থানীয় স্কুল কলেজগুলি তিন সপ্তাহের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। ১০১ ডিগ্রী জ্বরের উত্তাপ লইয়া আনন্দপ্রসাদ যখন নৌকাযোগে বাউলপাড়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শিশির বাবুর আহ্বানে তন্মুহূর্ত্তেই ডাক্তার বাবু আসিয়া জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দর শরীরের রংটাকে অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ দেখিয়া কি একটা গোপন কথা শিশির বাবুকে দূরে ডাকিয়া নিয়া তাহার কাণে কাণে বলিয়া গেলেন।

বিপদে ধীর শিশির বাবু আনন্দর বিধবা জননীকে আনিবার জন্য অবিলম্বে আনন্দর জন্মভূমিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং—আনন্দর জ্বর খুব বেশী, শীঘ্র আস—এই মর্ম্মে একখানা টেলিগ্রাম কলিকাতা বেথুন কলেজের ঠিকানায় সুরীতির নিকট পাঠাইলেন।

টেলিগ্রামের উত্তরে সুরীতিবালা যে একটা কৈফিয়ৎ পূর্ণ পত্র পাঠাইল, তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া শিশির বাবুর মনে যেমন ধারণাই হউক না কেন বাউলপাড়ার সেই আড্ডাধারী বৈঠকে পত্রটার বিষয়ে বেশ একটু বিস্তৃত আলোচনাই হইয়া গেল। সুরীতি লিখিয়াছিল, পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, অথচ বেথুন কলেজের বার্ষিকপরীক্ষাটা খুব একটু কড়া রকমেরই হইয়া থাকে, পরন্তু ক্লাস পরীক্ষায় পাশের নম্বর না রাখিতে পারিলে উপরের শ্রেণীতেই উঠা যায় না। তবে যদি সপ্তাহ কালের মধ্যেও—ভগবান না করুণ—আনন্দর জ্বরের অবস্থার কোনও পরিবর্ত্ত না হয়, তবে সে মেসের কর্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া নিশ্চয়ই একবার আসিয়া আনন্দকে দেখিয়া যাইবে। পরীক্ষার চেয়ে যে আনন্দপ্রসাদের জীবনের মূল্য বেশী তেমন একটা আন্তরিক আশ্বস্তির কথাও নাকি সেই পত্রের ভিতরের এক জায়গায় লেখা ছিল।

শিশির বাবুর শান্ত ব্যবস্থা, চক্রবর্ত্তী গৃহিণীর তত্ত্বাবধান ও আনন্দর বৃদ্ধা জননীর প্রাণপাত শুশ্রূষায় রোগীর অবস্থা আশাপ্রদ হইল। প্রথম টেলিগ্রাম করিবার পর সাত দিনের মধ্যেই শিশির বাবু দ্বিতীয় একখানা টেলিগ্রাম কলিকাতা পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে লেখাছিল—"আনন্দর শরীরে বসন্ত দেখা দিয়াছে, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।"

সুরীতিবালার পূর্ব্ব অজুহাতের উপর শিশির বাবু দ্বিতীয় টেলিগ্রামে উহাকে আর—"শীঘ্র আস" এই—কথাটুকু লেখা বিবেক সঙ্গত মনে করেন নাই। তাই সুরীতিও দ্বিতীয় টেলিগ্রামের—"আশঙ্কার কোনও কারণ নাই" এই কথাটিকেই মুখ্য মনে করিয়া নিজের ক্লাস পরীক্ষাই বজায় রাখিল।

( ৭ )

বড় দিনের ছুটিতে কলিকাতা আসিয়া আনন্দপ্রসাদ তাহার এক মাতুলের বাসায় আশ্রয় লইয়াছে। মামা মার অনুগ্রহে সুরীতিবালা দিন কয়েকের জন্য মেস ছাড়িয়া আসিলে যে ঐ কয়টা দিন সে কি ভাবে কাটাইবে তাহারই একটা কল্পনা মনে মনে আঁকিতেছিল। কিন্তু যখন শুনিতে পাইল যে আজই ভোরের গাড়ীতে সুরীতিবালা পুরী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে ঘরের একটা কোঠার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া খানিকক্ষণ উন্মনস্ক ভাবে কাটাইল, তারপর নিজকে সামলাইয়া লইয়া মেসের কর্ত্রীর নিকট যাইয়া নিজের পরিচয় জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল—আনন্দর চিঠি পত্র বা টেলিগ্রামের

বিষয় তিনি কিছুই জানেননা। মোটেই এক সপ্তাহ তিনি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্‌সিপ লইয়াছেন। X'mas উপলক্ষে পুরীর কন্‌সেসন্‌ জোগাড় করিয়া ছয়টি মেয়ে দরখাস্ত করিলে তিনি তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন; মেয়েরাও আজ ভোরের গাড়ীতে পুরী চলিয়া গিয়াছে। তবে তারা আস্‌ছে রবিবারই কলিকাতায় ফিরিবে এমন একটা আশ্বাস বাণী তাঁহার নিকট শুনিয়াও আনন্দরহৃদয়ে আনন্দ ফিরিয়া আসিলনা।

নিরানন্দ মনে গৃহে ফিরিয়া মামা মামিকে নানা অজুহাতে প্রবোধ মানাইয়া রাত্রি দশটায় আনন্দপ্রসাদ ঢাকা মেইলে চাপিয়া বসিল।

( ঘ )

বসন্ত হওয়ার দরুণ সে বৎসর এম. এ পরীক্ষা দিতে না পারিয়া পরের বৎসর এম, এ এবং বি এল উভয় পরীক্ষা একবারে দিবে বলিয়া আনন্দপ্রসাদ প্রস্তুত হইতেছিল। এই এক বৎসরের মাঝে সুরীতি যে কি মনে করিয়া একবারও বাবার টাকা খরচ করিয়া ঢাকাতে কিংবা বাউলপাড়া আসিয়া আনন্দর সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত করিলনা এই দুর্ভাবনাটুকু মাঝে মাঝে তাহার পরীক্ষার পড়ার ব্যাঘাত জন্মাইত। আনন্দ ভাবিত, সুরীতি বোধ হয় পুরী হইতে আসিয়াই লজ্জায় ম্রিয়মানা হইয়া দারুণ আক্ষেপে স্বামীর সঙ্গে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করিতেছেনা। কিন্তু সুরীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিঠি পত্রের ভিতর যখন ঐ সমস্ত লজ্জা, অনুশোচনা, আক্ষেপ বা সহানুভূতির কোন চিহ্নই সে পাইতেছিল না, তখন বস্তুতই তাহার মন দারুণ অবাধ্যতায় মত্ত হইয়া উঠিতেছিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা স্বয়ং শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী একখানা খোলা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আনন্দর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দ টেলিগ্রামখানা হাতে লইয়া দেখিল যে ঐ মর্ম্মে আর একখানা টেলিগ্রাম অদ্য ভোর বেলায় তাহার নিকটও আসিয়াছে। মেসের কর্ত্রী টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন যে সুরীতির 'ডাইরিয়া'।

পত্নীর এই জীবন মরণ সমস্যার কালেও আনন্দপ্রসাদের শিক্ষিত হৃদয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার দুর্ভাবনাটি প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহার সুবুদ্ধিটুকু লোপ করিতে বসিল।

সকল বিষয় শুনিতে পাইয়া শিশির বাবু যখন অনান্দকে খুব আচ্ছা করিয়া গালি দিলেন এবং বালিকাপত্নীর দেখাদেখি ভাবী এম. এ, বি, এলের পক্ষে এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণ যে নরব্যক্তিরই উপযোগী হইবে—তাহাও বুঝাইয়া দিলেন, তখন অতিবিষন্নচিত্তে আনন্দপ্রসাদ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল।

( ঙ )

নানা প্রকারের বিপদ আপদের মধ্য দিয়া আনন্দের আরও কতকগুলি মাস কাটিয়া গিয়াছে। তাহার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইতে না হইতেই বৃদ্ধা জননী পুত্রের উপার্জ্জন ভোগে বাতশ্রদ্ধ হইবা এবং কলেজের শিক্ষিতা পুত্রবধুর পরিচর্য্যায় পরাঙ্মুখ হইয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের চরণতল শরণ করিয়াছেন।

আনন্দ এখন জজ্‌কোর্টের উকিল হইয়া বসিয়াছে। সঙ্গে তার পত্নী সুরীতি বালা। দীর্ঘকাল ব্যারামে ভুগিয়া সুরীতি বি এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। এখানে সে সরকারী কাজের উমেদার।

একদিন অপরাহ্নে কাছারী হইতে আসিয়া জলযোগের পর আনন্দপ্রসাদ একখান নিমন্ত্রণের চিঠি সুরীতিবালাকে পড়িতে দিয়া তাহার মন্তব্য শুনিবার আশায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চিঠি পড়িয়া সুরীতি বলিল—"তা বেশত, শিশিরবাবুর মেয়ের বিয়ে—তুমি যাবে বৈ কি?"

"আর তুমি?"

"আমি? কেন? আমাকে এখানে রেখে যেতে বুঝি তোমার..."

কথাটা শেষ হইতে না হইতেই—সুরীতি যে কোন্‌কথায় কি মনে করিয়া বসে, তাহাই ভাবিয়া আনন্দপ্রসাদ তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—"তা—নয়, আমি বলিয়াছিলাম কি—এতকাল শিশির বাবুর স্নেহে প্রতিপালিত হয়েছি, এখন তাঁর এই আনন্দের সময়ে আমাদের দুজনারই সেই আনন্দের ভাগী হওয়া উচিত। এতে অন্ততঃ আমাদের মনের ভিতরের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পাবে।"

"আমার যা হা হবে কি প্রকারে বল! এই সপ্তাহের ভিতরেই যে আমার একটা এপয়েণ্টমেণ্ট আস্‌বার কথা। যদি এসেই পড়ে, তবে কি আমার 'ডিলে' করাটা ভাল

হবে? তা তুমিই আমার হ'য়ে আমার 'এপোলোজি' তাঁদিগকে জানাবে—ক্ষতি কি?"

"আচ্ছা, তাই যেন হলো, কিন্তু এসময়ে তাঁকে কিছু সাহায্য করতে পারি এমন কিছু সঙ্গে নিয়েতো যাওয়া উচিত। বড় মেয়ের বিয়ের সময়ে তাঁকে হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছিল। তখন আমি কিছুই সাহায্য করতে পারি নি; তখন আমার ছাত্র অবস্থা ছিল. অক্ষম ছিলাম। এই বিয়েতে অন্ততঃ শ চারি টাকা সঙ্গে নিয়ে যাব মনে করেছি। আজই রাত্রি নটার গাড়ীতে উঠব—কি বল তুমি? টাকাটা এই বেলাই বের করে দিলে—কিছু জিনিষ পত্তরও কিনতে হবে..."

সাহায্যের কথা শুনিয়া সুরীতির অন্তরাত্মায় চমক লাগিয়া গেল তারপর যখন সে শুনিল যে স্বামী চারিশত টাকার প্রার্থী, তখন সে কুঞ্চিত ভ্রূযুগল কপালে তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল—"বড় মেয়ের বিয়ের সময় অক্ষম ছিলে আর এখন বুঝি খুবই সক্ষম হ'য়েছ না? কি জ্বালাতনেই পড়েছুম গা; ঘরের লোকের প্রতি এত অবিশ্বাস—তা আমি কোথাও কখন শুনি নি। তোমার উপার্জ্জন থেকে আমি মাসে মাসে শ' শ' টাকা জমা করে রাখি. এই তোমার ধারণা, না?"

"তা নয়, তা নয় তবে কিনা—"

"তবে টবের কথা এর মধ্যে কিছুতেই আসতে পারবে না। বাসাতে চাকর রয়েছে, পাচক রয়েছে, ঝি আছে। এদের খরচ গুলি বুঝি মিনিটাকায়ই শোধ হয়ে যায়! তার উপর সুরঞ্জনের স্কুলের মাইনে, কাপড়, জামা, জুতো—তোমাকে না শুধিয়ে তো তাকে বাসায় ঠাঁই দিই নি। যে জিলার জজকোর্ট! তাতে আবার টাকা সঞ্চয়ের আশা?"

"ছি ছি, কথাটা না শুনে তুমি মেলাই বকে যাচ্ছ কেন? আমি ত অত কথা তোমার নিকট শুনতে চাই নি! বলছিলাম কিনা—ঐ যে আমার বাড়ী-বেচা সাত শ টাকা রেখেছিলাম..."

"বুঝেছি গো. আর বলতে হবেনা। আমার পরণের কাপড় খানা বুঝি পদ্মার জলেই ভেসে এল? কানের এই নূতন দুল, [illegible] গাউন, টুল, টেবিল চেয়ার, আলমারী—[illegible] আর পয়সা খরচ হয় নি! না?

( চ )

খুব জমকের সহিত শিশিরবাবু মেয়ে বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন। উপার্জ্জনক্ষম আনন্দপ্রসাদ নিশ্চয়ই এবার সহায়তা করিবে—এই ভরসায় তিনি আটশ একপঞ্চাশ টাকা বর-পণ কবুল করিয়া একটি বি, এস সি, পাসকরা পাত্রকে ভাবী জামাতা মনোনীত করিয়াছেন। পাত্রটি গেটিয়া ক্যামিক্যাল ওয়ার্কসের কর্ম্মচারী ও অংশীদার

তারপর বাউলপাড়ার সেই বৈঠকের লোকগুলা যখন জানিতে পারিল যে আনন্দপ্রসাদ নিজের পছন্দ মত বিবাহ-কর সেই শিক্ষিতা পত্নীর সমস্ত দোষ গোপন পূর্ব্বক নিজের অক্ষমতা জানাইয়া মোটেই দুই শ টাকার নোট প্রদান করিয়া শিশিরবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়াছে, অথচ সেই নোটগুলিও নাকি কোনও বন্ধুর, নিকট হইতে হাওলাত করা, তখন শিশিরবাবু ও আনন্দপ্রসাদ এই উভয়ের বিষণ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে সেই নিষ্কর্ম্মা বৈঠকের লোকগুলা পর্য্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে এই কায়েতের বেটা যে উপকারী ব্রাহ্মণের কোন প্রত্যুপকার করিবেনা, ইহা নাকি তাহারা আগেই বলাবলি করিয়াছিল।

এই আনন্দপ্রসাদের জন্যই যে শিশিরবাবুর ঋণভার আড়াইহাজার টাকার উপরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আনন্দপ্রসাদ পরোক্ষ ভাবে অনেকটা শুনিয়া থাকিলেও শ্রীমতী সুরীতিবালার সহায়তায় যে তাহার মনের ভিতরকার অভিলাষ কিছুতেই পূর্ণ হইবে না তাহা নিশ্চয়ই সে বুঝিয়াছিল। অথচ মনের কথা মুখ ফুটিয়া বাহির করিবার জোটি পর্য্যন্ত যে সে রাখে নাই। এই একগুঁয়েমির আগুনে শুধুই সে নিজে নিজে ভিতরে ভিতরে পুড়িয়া মরিতেছে। বিবাহাদি ব্যাপারে গুরুজনের আদেশ অমান্য করিয়া নিজের খামখেয়ালিকে প্রশ্রয় দেওয়াটা যে ঘোরতর অন্যায়—এই কথাটা সে এখন অবধি কিছু কিছু বুঝিতেছিল।

( ছ )

"সুরঞ্জন, ভাই, আজই তোকে বাউলপাড়া যেতে হবে। লক্ষ্মী ভাইটি আমার। আর কতকাল অপেক্ষা করব বল।"

"কেন দিদি, আমি না আগেই বলেছিলাম, টাকা দাও টিকেট কিনে বাউলপাড়া চলে যাই। তুমি তা তখন দিলে কৈ? কাল্ আস্‌ছে, পরশু আস্‌ছে, বলে চুপ করে রইলে! আনন্দবাবু যে কোথাও গিয়ে বসে থাকবার লোক নন, তা বুঝি তুমি আজ পর্য্যন্তও টের পাওনি! নিশ্চয়ই তাঁর অসুখ বিসুখ কিছু হয়ে থাকবে।"

"ছিঃ ভাই ওসব অলক্ষুণে কথা চিন্তা করতে নাই। তুই তবে আজই যাবি বল।"

"পরশু শনিবার গেল, তার আগের দিন ছুটিছিল তুমি তখনও আমার কথা শুনলে না। কালবাদে পরশু যে আসার এক্‌জামিন্ দিদি।"

"ওরে, একজামিন তোর পরে হবেরে, পরে হবে! আজ যে বিশ দিন চলে যায়!"

সুরঞ্জন সেই রাত্রিতেই গাড়ীতে উঠিয়া পরের দিন বাউলপাড়া পৌছিয়া দেখিল, সেখানে আনন্দপ্রসাদ নাই। শিশিরবাবুর নিকট জানিল, সে নাকি বিবাহের পরই তাঁহাদের বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আনন্দ প্রসাদ যে স্বস্থানে না গিয়া অপর কোথাও চলিয়া যাইবে, সেই ধারণাতো তাহার মনে স্থান পায় নাই। সুরঞ্জনের মুখে সকল সংবাদ শুনিয়া তিনিও এখন চিন্তিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী-গৃহিনী সুরঞ্জনের নিকট হইতে যতটা আদায় করা সম্ভব সমস্ত খবর জানিয়া লইয়া স্বামীকে বুঝাইয়াদিলেন নিশ্চয়ই এর ভিতরে গলদ আছে।

সুরঞ্জনের আগমনের কারণটা বাউলপাড়া গ্রামে জানাজানি না হইতেই সে তাড়াতাড়ি দিদির নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কৈ না, আনন্দ বাবুতো ফিরিয়া আসেন নাই। তবে গেলেন কোথায়?

সুরীতিবালা লেখা পড়া জানে, কাজেই সমস্ত লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া ছোট ভাইয়ের মারফৎ খবরের কাগজে ভগিনীপতির 'নিরুদ্দেশ সংবাদ" ছাপাইয়া ঐ সঙ্গে পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণাকরাও অশোভন মনে করিল না। কিন্তু কোথা হইতে কোন সংবাদই আসিলনা। দেশের লোক গুলা কি খবরের কগজও পড়েনা!

( জ )

ওকি? মজুমদারদী গ্রামের জনার্দ্দন বসুর বাড়ীতে এক রমণী আনন্দপ্রসাদের পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাটি ভাসাইতেছে? কে এ? সুরীতিবালা না? হাঁ তাইত বটে! নিশ্চল পাহাড়ের মত আনন্দপ্রসাদ খড়ো ঘরের মেজেতে দাঁড়াইয়া; আর তাহার পদতলে শ্রীমতী সুরীতি! অদূরে শ্রীমান সুরঞ্জন পাল ও বাসাবাড়ীর ঝি স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে খালের ঘাটে মাঝিরা নৌকা আগুলিয়া বসিয়া হুকার টানে শ্রান্তি অপনোদন করিতেছে।

স্বামীকে কোন কথাই বলিতে না দিয়া সুরীতি বলিয়া যাইতে লাগিল "তুমি যে এত পষাণ তাতো আগে একদিনের তরেও জান্‌তে পাইনি। আমি তোমার কাছে প্রতিমুহূর্ত্তে সহস্র অপরাধ করে এসেছি এখন শুধু সেই কথাগুলি মনে করেই বুক ফেটে কান্না বেরুতে চায়। বল, বল প্রিয়তম, তুমি আমায় ক্ষমা করলে!"

সুরীতির মুখে এই প্রথম প্রিয়তম সম্বোধন শুনিয়া নির্বাক আনন্দের মুখ হইতে একটিমাত্র কথা বাহির হইয়া আসিল—"এযে পরের বাড়ী, তোমার লজ্জা—"

বাধা দিয়া সুরীতি—"বলিল কি বলছ, লজ্জা! লজ্জা ও সরমের নিগ্রহ আমার কোষ্ঠীতে একুশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখাছিল না। খবরের কাগজে সংবাদ ছাপিয়ে তোমার সন্ধান করেছি, তাতেও আমার লজ্জা হয়নি। যদি হয়, তবে আজ থেকে হবে; না হয়তো চিরকালের তরে লজ্জা সরমের হতে এড়াতে হবে।"

আনন্দ উত্তেজিত স্বরে বলিল "একথাটা তোমার অন্তরের ভিতরকার নারীর মুখ থেকে বেরুচ্ছে কিনা তা, আমার বুঝে উঠা কঠিন হবে। তোমার সেই সুসময়ে পুরী বেড়ানো, আমার ব্যারামের টেলিগ্রাম গুলো মেসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবাকে জানিতে না দেওয়া, আর শিশিরবাবুর মেয়ের বিয়েয় দুশো টাকা ধার করা—এ সমস্তই আমার স্মরণশক্তির ভিতরে দৃঢ় গাঁথা থাকবে।"

"মনে যদি এতই ছিল, তবে কেন তুমি আমাকে সব কথা খুলে বলনি? আমি হাজার টাকা তোমার সঙ্গে দিতুম, আমাকে অনাথিনী করে তুমি নতুন সংসার গড়তে এখানে চলে আসবে—তা যদি জানতুম, তবে আমি নিজেই চেষ্টা করে তোমার এই দুর্ব্বলতাটাকে

বাড়তে দিতুমনা। এই বলিয়া সুরীতিবালা ক্ষিপ্রগতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া ঝির কোল হইতে একটী শিশুকে টানিয়া লইয়া আসিয়া উহাকে আনন্দের পায়ের তলে রাখিয়া দিল এবং সেই মুহূর্ত্তে বিজলার মত পশ্চিমের ঘরের দাওয়ায় যাইয়া কন্যাদায় গ্রস্ত জনার্দ্দন বাবুর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—"বাবা, আপনি এই হতভাগিনীর জীবন-সুখে কাঁটা ছড়িয়ে দিতে অগ্রসর হবেন না…"

কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ জনার্দ্দন বসু অবস্থা বুঝিতে পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন বাহিরের ঘরের ভিতরে আনন্দপ্রসাদ একটি দুগ্ধপুষ্য শিশুকে কোলে লইয়া বালকের মুখেরদিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

---

# সংবাদ।

## শোক সংবাদ

আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে সৌরভের প্রাচীন লেখক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ঈশ্বরচন্দ্র গুহ মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বর বাবুর ন্যায় উদ্ভিদতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ লোক ময়মনসিংহে কেন, সমগ্র বঙ্গে বিরল। তাঁহার সংগৃহীত উদ্ভিদ-বিশ্বকোষের পাণ্ডুলিপি তিনি আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। সে গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে যে তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের—সর্ব্বোপরি ময়মনসিংহের অতুলনীয় গৌরবের সামগ্রী হইত তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা আশা করি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র জীবন-মরণ পণ করিয়া হইলেও পিতার এই অমূল্য সম্পদ ও অতুলকীর্ত্তি রক্ষা করিবেন।

ঢাকা গেজেট সম্পাদক সত্যভূষণ দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা আর একটি শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু হারাইয়াছি। ভগবান ইঁহাদের আত্মার সদ্গতি বিধান করুণ।

## সাহিত্যসংবাদ।

ময়মনসিংহ জামালপুর হইতে 'শান্তিবার্ত্তা' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। আমরা আমাদের এই নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি। জামালপুর সদর ষ্টেসনে বোধ হয় শান্তিবার্ত্তাই প্রথম পত্রিকা। নূতন সহযোগীকে লইয়া ময়মনসিংহ জেলায় বর্ত্তমানে তিনখানা সপ্তাহিক, একখানা পাক্ষিক, দুইখানা মাসিক ও দুইখানা কলেজ ও স্কুল সম্বন্ধীয় পত্রিকা। সংখ্যার আধিক্য অপেক্ষা জীবনের দৈর্ঘ্য অধিক গৌরবের বিষয়।

---

সৌরভ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের নূতন উপন্যাস "শুভদৃষ্টি' বাহির হইয়াছে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আশুতোষ লাইব্রেরী এই গ্রন্থের প্রকাশক। মূল্য এক টাকা মাত্র।

---

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'সোনারবাংলা' সপ্তাহে সপ্তাহে বাহির হইতেছে। 'সোনারবাংলা' সোনার বাংলায় অমরত্ব লাভ করুন।

---

রাজসাহী সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক—ময়মনসিংহ—আশুজিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের "প্রাচীন শিল্প পরিচয়" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—রাজ সংস্করণ ২॥০, সাধারণ সং দুই টাকা।

---

চব্বিশপরগণার পক্ষ হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্যোগে ও ভট্টপল্লী, কাঁঠালপাড়া, নৈহাটী, গরিফা প্রভৃতি গ্রামবাসিগণের সমবেত চেষ্টায় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন আগামী ৮ই ৯ই আষাঢ় শনি ও রবিবার কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম ভবনে সম্পন্ন হইবে। উক্ত সম্মিলনের সাহিত্যশাখার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ দেশের সাহিত্যিকগণকে এই সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য এবং প্রবন্ধ প্রেরণ জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

ভাওয়ালের সন্ন্যাসী কুমার।

Asutosh Press, Dacca.
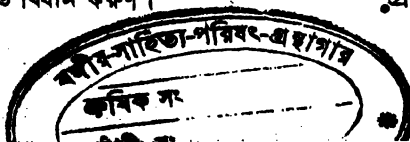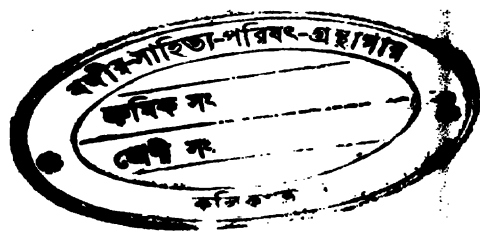
# সৌরভ

একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩৩০ সন। | ষষ্ঠ সংখ্যা।

## রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অভিব্যক্তি।

( ১ )

একটা বিশেষত্ব ভারতবর্ষের আছে। ভারতবর্ষই প্রথমে বস্তুর বহির্ভাগ ত্যাগ করিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; তাহারই ভাবস্রোত বিচিত্রের মধ্য দিয়া একের লক্ষ্যে বহিয়া চলিয়া গিয়াছে। খণ্ড জিনিষের ঠিক খণ্ডের মধ্য দিয়া অখণ্ডে পরিসমাপ্তি হইতে পারে, সীমার ভিতর অসীমতা আছে—ভারতবর্ষের আবিষ্কৃত এই তত্ত্ব। এবং আধুনিক কালেও রবীন্দ্র কাব্যের ইহাই মূল সুর।

বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জগতে এই গভীর তত্ত্বকে রসপূর্ণ করিয়া বিশেষভাবে স্বীয় কাব্যে চিরসুন্দর আকারে প্রকাশ করিতেছেন—উপনিষদের উদাত্তধ্বনি বৈষ্ণবের বেণুরবে আসিয়া তাঁহার কাব্যে সম্মিলিত হইয়াছে তৎসঙ্গে তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার প্রাচুর্য্যে পাশ্চাত্যের প্রবৃত্তিবেগও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যে "নব অভ্যুদয়ের" নক্ষত্রত্রয় মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র —কেবল ইঁহাদিগেরই অনুবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথ, ইহা বলিতে পারি না। ইঁহারা আংশিকভাবে প্রকাশিত; কোন একটী ভাব ইঁহাদিগের মধ্যে সমগ্রতা লাভ করে নাই। বরং কবি বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গলের' সঙ্গে রবীন্দ্রগ্রন্থের সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু 'মেঘনাদবধ', 'বৃত্রসংহার' বা 'রৈবতকের' পরেই রবীন্দ্রকাব্য আলোচিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতাই এই স্থলে, যে তিনি দ্বিধাকৃত বঙ্গসাহিত্যকে একত্র করিয়াছেন—অতীত বৈষ্ণব আদর্শের সহিত বর্ত্তমান Romantic আদর্শকে যুক্ত করিয়া তিনি উহাদিগকে উপনিষদের নিগূঢ়তায় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। এইরূপে তিনি শুধু বাংলা সাহিত্যেরই ঐক্যসম্পাদন করেন নাই, বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞাতিত্ব স্পষ্টতর করিয়া জাগাইয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অবধান করিতে হইলে তিনি যে অতীত ভারতবর্ষের অপরাপর সকল কবিরই উত্তরাধিকারী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি। বিশ্বের সৌন্দর্য্যবোধে তাঁহার আবেগভরা মানস শতধা বিচ্ছুরিত হইয়া কবিতায় ছড়াইয়া পড়ে। অথচ তিনি নাট্যভাব বর্জ্জিত নহেন। হৃদয়বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতকে, জীবনের পরিবর্ত্তন আবর্ত্তনকে ও পারিপার্শ্বিকের ছায়াপাতকে তিনি এত সূক্ষ্ম, এত তীব্র, এত উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন যে নাটকেই তাহা সম্ভবে। প্রকৃত পক্ষে নাটকেরই এইটী প্রধান গুণ—অভিভূত করা—যাহা আমরা রবীন্দ্রনাথের অনেক তথাকথিত গীতি কবিতাতেও অনুভব করি। রবীন্দ্রনাথের সুর এক নহে। তিনি বহু সুরে গাহিয়া থাকেন। আমরা যাহাকে তাঁহার কাব্যের মূল সুর বলিয়া আসিয়াছি, তাহা এই সমস্ত সুরের বিপুল একতান। তাঁহার কাব্যের ঐ গূঢ়তত্ত্ব তদীয় কাব্যরচনাতেও ধরা দিয়াছে। তাঁহার এক একটী পৃথক্ কবিতা স্ব স্ব পূর্ণতার মধ্যেও অপূর্ণতা-ছাওয়া। আবার তাঁহার অনেকগুলি কবিতা একত্রে এক অপরিমেয়তার সমাপ্ত। নানা ছন্দের নানা ভাবের কবিতা তাঁহার। মহাকাব্য ব্যতীত সকল প্রকার রচনাতেই তিনি

এ পর্য্যন্ত হাত দিয়াছেন—নূতন রচনা প্রচলিত করিয়াছেন, সকল রচনাই তাঁহার—হস্তে নব শোভায় মণ্ডিত।

প্রতিভার প্রমাণ মৌলিকত্ব। হয়তো কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন—রবীন্দ্রনাথে যদি ভারতের পুরাতন রাগিণী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভার মৌলিকত্ব কোথায়? আমি উত্তর দিব,—তিনি বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি, ইহাই তাহার মৌলিকত্ব। সমাজের দিক হইতে মানুষের আলোচনা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে অতি বিরল। তাঁহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সার বস্তুকে ভারতের ভারতবর্ষত্বকে এমন করিয়া—এমন সুন্দর করিয়া অপর কেহ গদ্যে ও কবিতায় সংসারের চক্ষে উৎঘাটিত করেন নাই। ভারতের পুরাতন রাগিণীতেই তিনি গান করিয়াছেন—

"তপস্যা বলে, একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া,
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল,
একটী বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সেই আরাধনায়
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥"

একমাত্র তিনিই ডাকিয়াছেন—

"এস হে আর্য্য এস অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ
এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধর হাত সবাকার।
এস হে পতিত, কর অপনীত
সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গল ঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা—তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥"

আমরা কালিদাসের কাব্যে এত বড় আহ্বান পাই নাই। কবিরকেও ঠিক এইরূপ বলিতে শুনি নাই। বহু জাতির সম্মিলনে এই ভারতবর্ষ—

"হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক, হুনদল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'ল লীন"

বহু ধর্ম্মপথ দ্বারা এদেশ আচ্ছন্ন। বহু শ্রেণীতে ইহা বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ এই বহুকে এক বলিয়া এই বহুরই জয়গান করিয়াছেন—বহুর বহুত্ব নষ্ট করিয়া নহে, জাতীয়তার অংশ চিহ্নকে লুপ্ত করিয়া নহে, ধর্ম্মপথ সকলকে এক করিয়া নহে, শ্রেণী বিভাগকে অবহেলা করিয়া নহে, অথবা নীচকে সর্ব্বদা নীচু করিয়াও নহে; কিন্তু একের মধ্যে বহুর স্থূল বজায় রাখিয়া, মানুষের মনুষ্যত্ব রাখিয়া, জাতি সমূহের যথার্থ বিশিষ্টতাকে জাগ্রত রাখিয়া এবং তাহাদিগের আবাস-ভূমি যে এক—ইহা স্মরণ রাখিয়া। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার বৈচিত্র্যেরই সমাবেশ এই ভারতে। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতবর্ষের মর্ম্ম কথার প্রচারক। এই কারণে তাঁহার নিকট হইতেই সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ কথা জানিয়া সংসারেরই আসল কথাকে আমরা সহজে বুঝিতে পারি। বাস্তবিক, তাঁহাকে একই সঙ্গে জাগতিক ও সম্প্রদায়িক কবি বলা যায়। তাঁহার কাব্যে বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন মানবের উচ্ছাস উৎসারিত। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের কবি এইরূপে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনকে মানব জীবনের ন্যায় তিন অংশে বিভক্ত করা চলে, যথা, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্য। এই তিন অংশের প্রতি কবিতাই সময় হিসাবেও যে যথাক্রমে রচিত হইয়াছে, তাহা নহে। ভাবপ্রবাহের গতি অবলম্বন করিয়াই ইহাদিগের স্থান নিরুপণ করা যায়। এক সময় ৺ মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় অনেকটা এইভাবে কবিবরের কবিতাগুলিকে সজ্জিত করিয়া জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই আলোচনায় আমরা তাঁহার প্রদর্শিত পথেই কবি-জীবনের অনুসরণ করিব।

শ্রীসুধীরচন্দ্র ভাদুরী এম, এ,।

# রামায়ণী যুগের বয়ন শিল্প।

বয়ন শিল্প ভারতের একটী অতি প্রাচীন শিল্প সম্পদ। বেদের বহু প্রাচীন সূক্তে তাহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। বৈদিক কালে কার্পাস দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হইত এবং এই বস্ত্র বয়নে রমণীগণ পুরুষের সাহায্য করিতেন। (১) ঋক বেদের একটী ঋক্ এবিষয়ে অতি পরিষ্কার। তাহাতে আছে—বস্ত্রা পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি। ৫।৪৭।৬

বয়ন শিল্পও ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। কালে রামায়ণী যুগে আমরা বয়ন শিল্পের প্রভূত উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হই।

রামায়ণের বহুস্থানে ক্ষৌম (২) ও কৌশেয় বসনের উল্লেখ আছে। তাহা কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টবস্ত্র।

তিসির অন্যনাম ক্ষুমা। ক্ষুমার তন্তু হইতে সে কালে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা ক্ষৌম বস্ত্র নামে পরিচিতছিল।

অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ আর্য্যেরা ভারতে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহারা তিসির সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিতেন। আর্য্যদের যে শাখা পশ্চিম অভিমুখে গিয়াছিলেন তাঁহারাও পাশ্চাত্য দেশে যাইয়া তিসির সূতারই বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেন। (২)

(১) ঋক্ বেদ ২।৩।৬

(২) ইয়ুরোপে এই বস্ত্র এখন সাটিন নামে পরিচিত। প্রচীন মিসরিয়েরা তিসির বস্ত্রকে খুব পবিত্র বলিয়া মনে করিত। সেজন্য তাহারা মিসরের সমাধি মন্দির গুলির গাত্রে তিসির গাছকে পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া সযত্নে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। তিসির কাপড়কে মিসরীয়া পবিত্র বস্ত্র (Coffin Cover) রূপে ব্যবহার করিত।

ক্ষৌম বাস অতি প্রাচীন কালে চীন দেশেও উৎপন্ন হইত। চিনারা ক্ষুমাকে বলিত 'চুমা'। এই চুমাবাসই চীনাংশুক বা চীনাংশুক নামে এ দেশে পরিচিত ছিল। কবিকালিদাস চানাংশুক বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারত হইতে একদিন এই বস্ত্র শিল্পটী উঠিয়া গিয়াছিল, তখন চীন হইতে ভারতে চীনাংশুক আমদানী হইত। এই সময়ের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনৈক ইংরেজ লেখক ভারতীয় হিন্দুদের উপর কিস্তি দিয়া লিখিয়াছিলেন—no trace of linen cloth made from flax is to be found in Manu or any other earlier works of the Hindoos & it is probable that flax has never been made from the linseed plant for the manufacture of yarn.

লেখক মহাশয় বোধ হয় রামায়ণ দেখেন নাই, অথবা রামায়ণোক্ত ক্ষৌমবসনের অর্থ জানিতে পারেন নাই।

আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া কার্পাস বস্ত্র বয়ন করিয়া ব্যবহার করিতে থাকেন; ক্ষৌম বসন তখন অপেক্ষাকৃত উচ্চ সম্মানের যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

রাম লক্ষণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ বিবাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহাদের ভ্রাতৃগণ ক্ষৌম বাস পরিধান করিয়া আসিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বধূদিগকে বরণ করিয়াছিলেন। (১)

ক্ষৌম বাস নানা বর্ণের ছিল। মন্থরা কৈকেয়ীর ধাত্রীকে পাণ্ডুবর্ণ ক্ষৌম বাস পরিহিত দেখিয়াছিল। (২) কৌশল্যা শুক্লবর্ণ ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়া পুত্রের যৌবরাজ্যাভিষেকের জন্য মঙ্গলাচার করিতেছিলেন। (৩) সীতার বিবাহে জনক রাজা স্বীয় কন্যাদিগকে অন্যান্য দান সামগ্রীর সহিত বহু ক্ষৌমবস্ত্র, এককোটী সাধারণ বস্ত্র ও বহু মূল্য কম্বল প্রদান করিয়াছিলেন।

কম্বলাঞ্চ মুখ্যানাং ক্ষৌমান্ কোট্যম্বরাণিচ। ৪ (বা—৭৪ সর্গ।)

ডাঃ হিরেণ্ তাঁহার Indian Research গ্রন্থে মুখ্য কম্বলকে উৎকৃষ্ট শাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গন্ধারের উৎকৃষ্ট মেষলোম হইতে এই মুখ্য কম্বল প্রস্তুত হইত। গান্ধারের মেষলোমের উল্লেখ ঋক্ বেদেও আছে। (৪)

কৌশেয় বসন কোশকীটের তন্তু হইতে প্রস্তুত হইত। এই কোশকীট ভারতের পূর্ব্বদিকস্থিত কোশকার ভূমি নামক গুটিপোকার জন্মস্থানে উৎপন্ন হইত। (৫) কেহ কেহ আসাম প্রদেশকেই সেকালের কোশকার ভূমি বলেন।

বর্ত্তমানেও আসাম প্রদেশে কোশকার পোকার তন্তু হইতে কৌশেয় বসন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সীতা কৌশেয় বসন পরিধান করিতেন। রাম লক্ষণ প্রভৃতি রাজপুত্রেরা সর্ব্বদা সাধারণ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেন।

রামলক্ষণ কৈকেয়ীর নির্দ্দেশ মত নিজ নিজ পরিধেয় সূক্ষ্মবস্ত্র ত্যাগ করিয়া মুনিঋষি দিগের পরিধান যোগ্য চীর গ্রহণ করিলেন—

সূক্ষ্মবস্ত্রমবক্ষিপ্য মুনিবস্ত্রাণ্যবস্তহ।৭ অযোধ্যা ৩৭ সর্গ

(১) আদিকাণ্ড ৭৭ সর্গ ১২ শ্লোক।

(২) অযোধ্যাকাণ্ড ৭ সর্গ ৭ শ্লোক।

(৩) অযোধ্যাকাণ্ড ২০ সর্গ ১৫ শ্লোক।

(৪) ১ মণ্ডল ১২৬ সূক্ত

(৫) কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০ সর্গ ২৩ শ্লোক।

সীতা সেরূপ করিতে লজ্জা বোধ করায় রাম

চীরং ববন্ধ সীতায়াঃ কৌশেয়স্যোপরিস্বয়ম্ ॥১৪

সে কালের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া যজ্ঞক্রিয়াদি সম্পাদন করিতেন।

মুখ্যকম্বলের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি ; মু্্য কম্বল ব্যতীত অন্য নানাবিধ কম্বলও তখন প্রচলিত ছিল। পর্য্যঙ্কের উপর শয্যাস্তরণ রূপে তখন এক প্রকার চিত্রকম্বল ব্যবহৃত হইত। (১) লঙ্কায় লোমজ কম্বল ব্যবহৃত হইত (২)।

কোন কোন বৈদেশিক সমালোচক বলেন বাল্মীকির যুগে ভারতীয় সমাজে সূচীর ব্যবহার বা সিবন শিল্পের প্রচলন ছিল না। তখনকার রাজারা নাকি কেবল উত্তরীয় মাত্রই ব্যবহার করিতেন।

এ ধারণা ভুল। তখন সম্ভ্রান্তব্যক্তিরা অঙ্গে অঙ্গরক্ষা বা কঞ্চুকী ব্যবহার করিতেন। কঞ্চুকী আপাদ গ্রীবা লম্বিত হইত।

তখন সূচি দ্বারা পট্ট ও কৌশেয় বস্ত্রাদির উপর ফুল পত্র চিত্রিত করা হইত। সাধারণ বস্ত্রকে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া (আজকালকার ঢাকাই জামদানীর ন্যায়) বিচিত্র করিয়া তুলিবার উল্লেখ রামায়ণে আছে। (৩)

"মণি কাঞ্চন ভূষিতম্ পরমাসনম্।" ৩৪

এইরূপ আসন কি সূচি শিল্পের সাহায্য ব্যতীরেকে প্রস্তুত হইতে পারিত।

তখন উষ্ণিষের প্রচলন ছিল. শত সলাকাযুক্ত ছত্র, ওচর্ম্মপাদুকার প্রচলন ছিল। (৪ এগুলি সিবন শিল্পে অজ্ঞ সমাজ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে কি ?

রামায়ণে রাজা রাজরাদের সাজ পোষাকের কথা আছে। রাম ভরতকে বলিতেছেন—"তুমি রাজ বেশ পরিধান করিয়া রাজ সভায় প্রবেশ করিয়া থাকতো!" কিন্তু কোন স্থানেই পোষাকের পৃথক পৃথক নাম নাই। বোধ হয় এই ক্রটী হইতেই এই অভিযোগের উৎপত্তি হইয়াছে।

বাস্তবিক পক্ষে রামায়ণী যুগে সীবনশিল্প প্রচলিত ছিল এবং রামায়ণে প্রদত্ত শিল্পীর তালিকায় সীবনকারের উল্লেখ আছে। যথা—

"রজকাস্তুন্নবায়াশ্চ গ্রামঘোষমহত্তরাঃ।" ১৫

অযোধ্যাকাণ্ড ৮৩ সর্গ

তুন্নবায় অর্থ দর্জ্জী। রামায়ণে সূচির উল্লেখও আছে। যথা

বিব্যথে ভরতোহতীব ব্রণেতুন্নেবসূচিনা ১৭

(অযোধ্যাকাণ্ড ৫৭সর্গ)

দর্জ্জির কার্য্য বৈদিক কালেও প্রচলিত ছিল। ঋক বেদে সীবন করা বস্ত্রের উল্লেখ আছে। তখন বস্ত্র কাটিয়া সূত্রের ও সূচের সাহায্যে যে তাহা দ্বারা পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা হইত তাহা উইলসন সাহেব তাঁহার অনুদিত ঋক্ বেদে প্রতিবাদকারীদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন।*

তখন মুক্তাবস্ত্র দ্বারাও বস্ত্র প্রস্তুত হইত। (১) উর্ণাতন্তু দ্বারাও সূক্ষ্মবসন ও উত্তরীয় বা উড়না প্রস্তুত হইত। (২) বল্কল হইতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহার নাম ছিল অজিন।

রাক্ষস পুরী লঙ্কায় বোধ হয় চর্ম্ম বসন ব্যবহারই অধিক হইত। তথায় শয্যায় নানাবিধ চর্ম্মাস্তরণ ব্যবহৃত হইত। অর্যভ চর্ম্ম (৩) রঙ্কু চর্ম্মাসন, (৪) ব্যাঘ্র চর্ম্মাসন প্রভৃতির উল্লেখ লঙ্কার বর্ণনায় অনেক স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃদুল উর্ণাযু চর্ম্মের উল্লেখও আছে।

লঙ্কার প্রতি ঘরে মেঝের পরিমাণ মত চতুষ্কোণ মেঝ আস্তরণ ছিল। (সু—৯)

রাঙ্কব বা রঙ্কু লোমজাত কম্বলেরও তখন যথেষ্ট প্রচলন ছিল।

পট্টবস্ত্র, কৌশেয় বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্র শিল্পের ভূরি ভূরি প্রমাণের উল্লেখ বৈদিক গ্রন্থাদি হইতে চলিয়া আসিতে থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতে যে বস্ত্রশিল্পের দুর্দ্দশা ছিল, সীবনকারের অভাব ছিল—ইত্যাদি দুর্নাম প্রচার করিবার মত লোকের অভাব ছিল না ; এখনও নাই।

---

(১) অযোধ্যাকাণ্ড ৩০ সর্গ। (২) লঙ্কাকাণ্ড ৭৪ সর্গ (৩) সুন্দরাকাণ্ড ১০ সর্গ ও অযোধ্যাকাণ্ড ৭০ সর্গ। (৪) অঃ ৯১ সর্গ

*Wilson's Rigveda II page 28 & Vol IV page 60.

(১) বালকাণ্ড ৪ সর্গ। (২) লঙ্কাকাণ্ড ৭৪ সর্গ (৩) সুন্দরাকাণ্ড ১ সর্গ। (৪) লঙ্কাকাণ্ড ১১২ সর্গ (৫) লঙ্কা ৭৪ সর্গ। সুন্দরাকাণ্ড ১০ সর্গ।

# আত্মহত্যা।

হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে আত্মঘাতীর পারলৌকিক সদ গতি একরূপ অসম্ভব। আত্মহত্যাকারীর শব দাহ করিলে বা বহন করিলে অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এমন কি আত্মঘাতীর অশৌচ গ্রহণ করা পর্য্যন্ত পুরাণ এবং স্মৃতিকারেরা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে যেপ্রকার আত্মহত্যা বৈধ বলিয়া-পরিগণিত তাহা ক্রোধাদির উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য হইয়া সাহসিক মৃত্যু নয়। বৈধ মৃত্যু—ধীর স্থিরভাবে শাস্ত্রবিধান-অনুসারে মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক সংযত চিত্তে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া বরণ করিতে হয়; নচেৎ তাহা অবৈধ ও প্রথমোক্ত প্রকারের জঘন্য আত্মহত্যার মধ্যে গণ্য হইবে।

এইপ্রকার বৈধ মৃত্যুর নানা ভেদ আছে—

(১) প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ; (২) মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন (রামায়ণোক্ত কবন্ধ শবরী প্রভৃতি রামচন্দ্রের সম্মুখে প্রজ্জলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া এইরূপে দেহত্যাগ করিয়াছিল।) (৩) শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান করিয়া পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া মৃত্যুকে বরণ; (৪) মহাপাতক জন্য তুষানলে প্রাণত্যাগ; (৫) এইরূপ মহাপাতকের জন্য উত্তপ্ত সুরা পান দ্বারা মৃত্যু বরণ; (৬) গুরুপত্নী গমন জন্য উত্তপ্ত লৌহ স্ত্রী আলিঙ্গন দ্বারা মৃত্যু; (৭) স্বামীর সহিত সহমরণ ইত্যাদি।

আধুনিক সময়ে উল্লিখিত প্রকারের শাস্ত্রোক্ত বৈধ মৃত্যুর কথা আদৌ শ্রুত হওয়া যায় না। কিন্তু অবৈধ আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

আমাদের সংগৃহীত তালিকায় অধিকাংশই স্ত্রীলোক আত্মহত্যাকারী। স্ত্রীলোক সংসারে নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়া ভীষণ মনঃক্লেশে আত্মহত্যা দ্বারা শান্তি লাভের চেষ্টা করে। "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক আত্মহত্যাকারীর-একটা তালিকা বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে—"বঙ্গে পুরুষ অপেক্ষা শতকরা ৩০ জন অধিক স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সকল জেলার মধ্যে যশোহর জেলার লোক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আত্মহত্যা করে। ঐ জেলায় ৩১২ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছে—অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গে যত লোক আত্মহত্যা করে, শতকরা তাহার দশভাগ যশোহর জেলাতেই ঘটিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত যশোহরে পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে।" নিম্নে পূর্ব্বোক্ত পত্রিকার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

"বঙ্গে স্ত্রীলোক আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| বর্দ্ধমান | ৩৭ | খুলনা | ১৩৫ | ঢাকা | ১৫৪ |
| বীরভূম | ২১ | রাজসাহী | ৯৫ | ময়মনসিংহ | ১৩৫ |
| বাঁকুড়া | ৫৫ | দিনাজপুর | ৩৯ | ফরিদপুর | ১৪৯ |
| মেদিনীপুর | ৩৫ | জলপাইগুড়ি | ৬ | বাখরগঞ্জ | ৭৮ |
| হুগলী | ৪০ | দার্জ্জিলিং | ৪ | চট্টগ্রাম | ১২ |
| হাবড়া | ৫২ | রঙ্গপুর | ৩০ | নোয়াখালী | ১৭ |
| ২৪ পরগণা | ১৪১ | বগুড়া | ৪৪ | ত্রিপুরা | ৫২ |
| নদীয়া | ১০৫ | পাবনা | ৪৫ | | |
| মুর্শিদাবাদ | ৫০ | মালদহ | ১৭ | সমগ্র বঙ্গ | ১৭৩১ |
| যশোহর | ২০২ | | | | |

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের যে মৃত্যু তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, তথায় স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ বেশী আত্মহত্যা করে। ইউরোপের কোন কোন সমাজহিতৈষী ব্যক্তি পুরুষের মধ্যে বেশী আত্মহত্যার—কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অবাধ প্রেমকেই বেশী পরিমাণে দায়ী করিয়াছেন।

ইউরোপের পুরুষ আত্মহত্যাকারীর অধিকাংশই প্রেমে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীর অতিরিক্ত স্বাধীনতা, দুশ্চরিত্রতা প্রভৃতিও স্বামীর আত্মহত্যার কারণ হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে স্বামী নিজস্ত্রীর ফ্যাসান ও ফরমাইস যোগাইতে অসমর্থ বশতঃ স্ত্রীর বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এরূপ ঘটনাও শ্রুত হওয়া যায়।

আবার আমেরিকার আত্মহত্যা ও তাহার কারণ—সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ও কৌতুহলোদ্দীপক। সেদেশে দেখা যায়, সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তি—বিচারক, উকিল, অধ্যাপক, ব্যাঙ্কার, ধর্ম্মযাজক প্রভৃতিই বেশী আত্মঘাতী

হয়। আমেরিকা এখন ধন ও বিলাসের লীলাভূমি। তাই বোধ হয়—ভোগ বিলাসে জর্জ্জরিত হইয়া সেদেশের উচ্চস্তরের লোক আত্মঘাতী হয় এবিষয়ে "শান্তিবার্ত্তায়" লিখিত হইয়াছে :—

"সম্প্রতি আমেরিকা হইতে গত বার মাসের আত্মহত্যা'র যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মোট আত্মহত্যার সংখ্যা—১২০,০০০ হাজার। তন্মধ্যে কোটিপতি ৭৯ জন, ধনবতা নারী ৪৬, ব্যাঙ্কার ৮৮, মোট আত্মহত্যার সংখ্যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক, একজন শতবর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা প্রপিতামহী এবং এই তালিকার মধ্যে একটা পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুও আছে। ৩০৮ জন কলেজের ছাত্র, ৫০ জন অধ্যাপক ও মষ্টার, ১৯ জন ধর্ম্ম যাজক, ৫২ জন হাকিম ও আইনব্যবসায়ী ৮৪ জন চিকিৎসক, ১৯০ জন বড় কারবারের কর্ত্তাও এই তালিকার অন্তর্ভূক্ত। ইহাদের মধ্যে একটী নারী দুইবার গাড়ী ফেল্ করায়, একটী পুরুষকে গল্‌ফ্ খেলিতে না দেওয়ায়; এবং অপর একজন বিড়াল লইয়া ঝগড়া করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে! আমেরিকার সবই অদ্ভুত!"

ইউরোপেও আজকাল ঐ ধরণের আত্মহত্যার বিবরণ শুনা যাইতেছে। প্রেমঘটিত আত্মহত্যা ভিন্ন অন্য কারণেও ইউরোপে আত্মহত্যা কম হয় না। কথায় কথায় আত্মহত্যা করা ইউরোপের একটা ফ্যাসান ও বীরত্বের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

কারবারে দেউলিয়া হইয়া আত্মহত্যা, যুদ্ধে হারিয়া সেনাপতির আত্মহত্যা, হঠাৎ গরীব হইয়া আত্মহত্যা, সাধারণে জঘন্য অপবাদ গ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যা, পরস্ত্রীকে ভুলাইয়া নিয়া দুইজনে একত্র আত্মহত্যা বিলাতী খবরের কাগজে প্রায়ই শ্রুত হওয়া যায়।

বিলাতী নাটক নভেলে অনেক প্রেমিক প্রেমিকার আত্মহত্যার বিষয় রোমান্সের আকারে সমাজ দেহে বিষক্রিয়া করিতেছে। ঐ অনুকরণে রচিত আমাদের দেশেও বহু নাটক নভেলে এই বিলাতি বিষ ছড়ান আরম্ভ হইয়াছে, আর তরুণ তরুণীরা রোমান্সের রঙিন নেশায় মত্ত হইয়া ঐ বিষ পান করিতেছে।

উক্ত বিষের ক্রিয়া ইতি মধ্যেই সমাজে কি ভাবে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত সত্য ঘটনাটী আলোচনা করিলেই বুঝা যায়।

অতি অল্পদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে এদেশী একটা আত্মহত্যার ঘটনা প্রকাশ হয়। কলিকাতার কোনও প্রফেসরের স্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয়াসক্ত হইয়া কোনও যুবক প্রেমিকার সহিত অবাধ মিলনের সুযোগ না পাইয়া বিলাতী ধরণে উভয়ে একত্র আত্মহত্যার আয়োজন করে, এবং রান্নার কোঠার সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দুইজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহা সম্পূর্ণ বিলাতী ধরণের রোমান্টিক মৃত্যু। ইহা বিলাতী নাটক নভেলের অনুকরণে রচিত এদেশীয় নাটক নভেল পাঠের বিষময় ফল!!

১৩০৭ সনের আষাঢ় মাসের ভারতীতে "সাহিত্যে-আত্মহত্যা" নামকপ্রবন্ধে এবিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা আছে। উক্ত প্রবন্ধ লেখক প্রথমে লিখিতেছেন :—

"বাঙ্গালা গল্প সাহিত্যে বা উপন্যাসে নায়ক নায়িকার আত্মহত্যাদ্বারা জীবনের অবসান করাটা একটা ফ্যাসান রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে?"

"তাহার বাহ্য কারণগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট—আফিং এর প্রচুর প্রচলন ও ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়।" যুবক দিগের আত্মহত্যার অন্যতমকারণ সম্বন্ধে লেখকের মত প্রনিধাণ যোগ্য :—

"স্কুল কলেজের ছাত্রগণ প্রায়ই উদ্ধত ও অপরিমিত অহমিকা পূর্ণ, তাহাদের অনেক ক্রিয়া কলাপ স্বেচ্ছাচার ও হঠকারিতা প্রণোদিত। সুতরাং গুরুজনের ভর্ৎসনা তাহাদের সহ্য হয় না......পরস্পর বুঝিবার ভুলে দেশে অনেক আত্মহত্যা সংঘটিত হয়।"

হিন্দুসমাজের স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার তালিকা—আমরা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তন্মধ্যে কিশোরী অপেক্ষা যুবতীর সংখ্যা অনেক বেশী; প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধার সংখ্যা তদনুসারে অনেক কম। অবিবাহিতা বালিকারা প্রায়ই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা ও আত্মীয় জনের তাড়নায়, অনাদরে ও কুবাক্যে জর্জ্জরিত হইয়া আত্মহত্যা করে। বিবাহিতা যুবতীরা অধিকাংশক্ষেত্রে শ্বশুর, শাশুড়ী ননদ ও অন্যান্য আত্মীয়ের

অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অসহ্য ক্লেশের তাড়নায় আত্মহত্যাকরে। হিন্দু সমাজের পতিদেবতারা ঐ সব অভাগিনীর অনেক সময়ই রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হইয়া থাকেন।

অতি অল্পদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে কলিকাতার একটি বধূ আদালতে তাহার যে মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহাতে বিচারালয়ের কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই। অবশ্য বিচারে শাশুড়ী, ননদ ও স্বামীর জেল হইয়াছে কিন্তু আদালতের অগোচরে এরূপ কত নারী যে অরন্তুদ যাতনা ভোগ করিয়া অকালে দেহত্যাগ করিতেছে তাহার সংখ্যা কে নির্ণয় করিবে? সমাজ এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, কেবল উদাসীন নয় সেই সব হত্যা কারীর খোসামোদকারী, প্রশ্রয় দাতা।

তবে সর্ব্বত্রই যে স্ত্রীলোক অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াই আত্মহত্যা করে, তাহা নয়। অনেকে সামান্য কারণে অভিমান করিয়া আত্মহত্যা করে। আমাদের জ্ঞাত ঘটনার মধ্যে কেহ কেহ স্বামীকে জব্দ করিবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে। কেহ কেহ শুধু ভয় দেখাইবার জন্য আত্মহত্যার উদ্যোগ করিয়া মরার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণ রক্ষা করিতে পারে নাই। স্বামীর প্রতি অভিমান করিয়া আত্মহত্যার উদ্যোগের অনেক ঘটনা শ্রুত হয়।

বর্ত্তমানে দারুণ অর্থ কষ্টেও বহু লোক আত্মহত্যা করিয়া থাকে। আমাদের দেশের অনেক পুরুষ স্ত্রীলোকের মনোবৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। তাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান ভাব প্রবণতা প্রভৃতি কোন কোন পুরুষ অগ্রাহ্য করেন, ফলে তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্রলোকের মধ্যেও স্ত্রীর সহিত ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে অতি বিসদৃশ হয়। নিম্নলিখিত সত্য ঘটনাটী পাঠ করিয়া আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার যে আর একটা দিক্ আছে, তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইবে।

এক ভদ্রলোক তাহার প্রৌঢ়া স্ত্রীকে অতি সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাগত জামাতার সমক্ষে প্রহার করে। উক্ত বর্ষীয়সী মহিলা নিজ নূতন জামাতার সমক্ষে স্বামী কর্ত্তৃক এইরূপ লাঞ্ছিতা হইয়া তৎনই স্থানান্তরে যাইয়া দারুণ মনঃ ক্লেশে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। এই ঘটনা ভিন্ন প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা স্ত্রীর আত্মহত্যা সম্বন্ধে আরও অন্য প্রকার কারণ শুনা যায়। বৃদ্ধা শাশুড়ী পুত্রবধূ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা উৎপীড়িতা হইয়া এমনকি প্রহার প্রাপ্ত হইয়া আত্মঘাতী হইয়াছে, এবং বৃদ্ধামাতা স্ত্রীর পক্ষসমর্থনকারী পুত্রহস্তে প্রহৃতা হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এরূপ ঘটনাও কয়েকটী শ্রুত হ য়া যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত রাজকীয় উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির মাতা পুত্রের ঔদাসীন্যে মলিন বস্ত্রে বাটীর নিকটস্থ কূপ হইতে কলসীতে জল আনিতেছিলেন, সেই সময় পুত্রের বন্ধুবর্গের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় পুত্র মাতাকে ঝি বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। পুত্রের তাদৃশ উক্তি বৃদ্ধা মাতার কর্ণগোচর হয় ও মাতা মনের বিষম যাতনায় কূপে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করে। পরের গলগ্রহ বিধবা অর্থনৈতিক কারণে ও নিজের অসহায় অবস্থা ভাবিয়া বিষম হতাশায় আত্মহত্যা করিয়াছে এরূপ ঘটনা অনেক দৃষ্ট হয়। এসব ক্ষেত্রে বিধবা স্ত্রীলোকের অসহায় অবস্থা ও পরাশ্রয়ে বা নিজ আত্মীয়ের আশ্রয়ে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগই আত্মহত্যার প্রধান কারণ। তদ্ভিন্ন সধবা স্ত্রীলোক কোন কোন স্থলে দুশ্চরিত্র বা অক্ষম স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া অর্থনৈতিক কারণে নানা ক্লেশ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে—এইরূপ ঘটনাও কয়েকটী অবগত হওয়া যায়।

নিম্নলিখিত ঘটনাটী আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে।

কোনও ধনাঢ্যগৃহে যুবতীবধূ শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর বিষ নজরে পরে। স্বামী দুশ্চরিত্র সে বারাঙ্গনা গৃহেই কাল যাপনকরে। স্বামীর কোনও ঘনিষ্ট আত্মীয় উক্ত বাড়ীতে থাকিত, সে বধূটীর সর্ব্বনাশ করার জন্য নানাপ্রকারে উত্যক্তকরে, বধূটী শ্বশুর, শাশুরী ও স্বামীকে একথা জানায় কিন্তু তাহারা উক্ত আত্মীয়ের কথায় বউটীকে উল্টা তিরস্কার করে। কাহারও নিকট সাহায্য নাপাইয়া এবং ধর্ম্ম রক্ষার পথ পাইয়া উপায়ন্তর অভাবে বধূটী আত্মহত্যা করে। এরূপ আরও কয়েকটী ঘটনা জানাগিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবর প্রভৃতির

আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া এবং বাড়ীর অপর লোকদিগকে এই অত্যাচারের বিষয় বিশ্বাস করাইতে না পারিয়া বউ নিজ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে এরূপ ঘটনা খুব বিরল নয়।

নৈতিক দূষিত চরিত্র বা অবৈধ প্রণয় প্রকাশিত হওয়ায় দারুণ লজ্জায় অনেক স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে।

আত্মহত্যার সংখ্যাবৃদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ বর্ত্তমানে ধর্ম্মবন্ধনের শিথিলতা। বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাই এই শিথিলতার অন্যতম প্রধান কারণ। বর্ত্তমান প্রথায় যত বেশী শিক্ষা বিস্তার হইতেছে, ততই প্রাচীন মজ্জাগত ধর্ম্মভাব শিথিলতা প্রাপ্ত হইতেছে। বর্ত্তমানে তথাকথিত শিক্ষিতের মধ্যেই বেশী প্রতারক দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরে সন্দিহান না হইলেও ধর্ম্ম বা পরলোক সম্বন্ধে উদাসীন মানুষের সংখ্যাই বর্ত্তমানে বেশী সুতরাং পরলোকের অধোগতি হিসাবে অতি গর্হিত আত্মহত্যা এখন বিভীষিকা প্রদ নয়। এইজন্য ক্রমশঃই আত্মহত্যার সংখ্যাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

এই ক্রমবিবর্দ্ধমান আত্মহত্যা সম্বন্ধে আলোচনাও খুব কমদৃষ্ট হয়। হিন্দুসংসারের স্ত্রীলোকের ব্যারাম সম্বন্ধে "আপনিই সারিয়া যাইবে, চিকিৎসার আবশ্যক নাই" নীতিটী এক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইয়াছে। অনেকে আবার ইহার আলোচনায়ও ভয় পান; পাছে আলোচনায় এই ব্যাধি আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু সমাজ দেহের এই নালাঘা ঢাকিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই আরো অধিক বিষময় ফল প্রসব করিবে। সুতরাং এই ক্ষত ধুইয়া মুছিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; ঢাকিয়া রাখিলে ক্ষতের বৃদ্ধিতে সমস্ত সমাজদেহের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

যে সব স্ত্রীলোক সমান্য কারণে, সামান্য অভিমানে বা দূষিত চরিত্র লইয়া আত্মহত্যা করে, বা যেসব ছেলে পরীক্ষায় ফেল করিয়া অথবা পড়াশুনার জন্য ভর্ৎসিত হইয়া আত্মহত্যা করে, তাহারা কিছুতেই সহানুভূতির যোগ্য নহে। ইহারা বাঁচিয়া থাকিলেও দেশের বা সমাজের কোনও লাভ হইতনা। ইহারা সম্পূর্ণ ঘৃণার পাত্র।

কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোকের আত্মহত্যা জন্য অর্থাৎ যেসব অত্যাচার ও ব্যবহারের জন্য অনেক স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। সেসব অত্যাচারীকে শাসন না করার জন্য সমাজ দায়ী। সুতরাং এ সমস্যার মীমাংসার জন্য যথেষ্ট আলোচনা দরকার ও সামাজিক শাসনের বন্দোবস্ত দরকার। প্রতিবিধানযোগ্য আত্মহত্যার মূল কারণ নির্ণয় করিয়া ইহাকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইলে শিক্ষা প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন ও ধর্ম্ম শিক্ষার বন্দোবস্ত আবশ্যক।

ভবিষ্যৎ লেখক দিগকে অতি সতর্কতাবে বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যেরূপ ভাবে কুৎসিত, জঘন্য নাটক নভেলে দেশ ছাইয়া যাইতেছে, তাহাতে আইন করিয়াও এই প্রকারের জঘন্য ও বিষময় গল্প উপন্যাস লেখা বন্ধ করা উচিত।

অর্থ নৈতিক উন্নতির চেষ্টা দ্বারা স্ত্রীলোকের প্রধানতঃ বিধবাদের অসহায় অবস্থা হইতে তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করার বন্দোবস্ত করাও আবশ্যক।

আধুনিক সময়ে শিক্ষিত পুরুষেরা ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে ধর্ম্ম চর্চ্চায় ও ধর্ম্মালোচনায় উদাসীন। ইহা সংক্রামিত হইয়া অন্তঃপুরেও প্রবিষ্ট হইতেছে। ফলে ধর্ম্মভাব বা পরলোক চিন্তা আজকাল স্ত্রীসমাজেও শিথিল হইয়াছে। পরকালের চিন্তামুক্ত পুরুষ বা স্ত্রী জীবনসংগ্রামের ঘাত প্রতিঘাতে অবসন্ন হইয়া তাহা হইতে মুক্তির সোজাপথ আত্মহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মহত্যার সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে চিন্তাশীল সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই এ সমস্যায় বিচলিত হইবেন। আমরা সকলেই নিজ চিন্তায় বিব্রত, হুজুগেমত্ত, এদিগে একবারও দৃষ্টিপাত করি কি?

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ, জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

---

## বীজ ও তরু।

বীজ হতে তরু কিংবা তরু হতে বীজ
জানিতে যে পারিয়াছে এর তত্ত্ব বীজ;
সেইত প্রকৃত যোগী সৃষ্টি-লয় জ্ঞাতা,
অসার সংসারে সে-ই সাকার দেবতা॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

# একটী আত্ম প্রচেষ্ট জাতির কথা।

পৃথিবী ব্যাপি আজ যে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিয়াছে তাহা নূতন নহে। যুগে যুগে এই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার এবং উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধীনতা পাশে বদ্ধ জাতিসমূহের প্রাণেও এক সাড়া পড়িয়াছে; বর্ত্তমান পৃথিবীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য করিলেই তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোক সংখ্যা এখন এক কোটীর বেশী হইবে না। ভারতবর্ষের তুলনায় এই মুষ্টিমেয় লোক সংখ্যা স্বাধীনতার সংগ্রামে যাহা করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। শুধু সংখ্যাধিক্যে কোন কার্য্য হয় না; কর্ম্মবীর একজনে যাহা করিয়া তুলিতে পারে, অকেজো শতাধিক লোকে তাহার কিছুই করিতে পারে না।

১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনিয়েরা এই দ্বীপপুঞ্জ প্রথম আবিষ্কার করেন। অতঃপর স্পেনের রাজা ফিলিপের রাজত্বকালে

শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত ফিলিপাইন যুবতী।

১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বীপপুঞ্জে স্পেনের আধিপত্যের সূত্রপাত হয় এবং ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে উহা স্পেনের রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজেরা একবার এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পর বৎসর পারিস নগরের সন্ধির পর দ্বীপপুঞ্জ পুনরায় স্পেনের হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। তদবধি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ দ্বীপে স্পেনের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

"সর্ব্বমত্যন্তম্ গর্হিতম্"। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি—কি সমাজ শাসন, কি রাজ্য শাসন, সকল বিষয়েই এই নীতি বাক্য প্রযোজ্য। কোন বিষয়ে মাত্রাধিক্য হইলেই তৎফল প্রায়ই বিষময় হইতে দেখা যায়। যে স্পেন তিন শতাধিক বৎসর যাবৎ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপর শাসন দণ্ড চালাইয়া আসিতেছিল হঠাৎ তাহার পতন কেন হইল, উপর্য্যুক্ত নীতিবাক্যই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। শাসন যখন শোষণে পরিণত হয়, তখনই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। স্পেন যখন শাসন নীতির দোহাই দিয়া ফিলিপাইনবাসির উপর অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই তাহার পতনের সূত্রপাত দেখা যাইতে লাগিল। স্পেনীয় রাজ কর্ম্মচারীগণ যখন ক্রমাগত পীড়ন করিয়া দ্বীপবাসী প্রজাসাধারণের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিতে লাগিল, অযথা রাজ কর ধার্য্য করিয়া এবং ধর্ম্মের ভান করিয়া অন্যায় অত্যাচারে যখন লোকের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইল; এবং যখন রাজদ্বারে প্রজার সহস্র আবেদন নিবেদন নিষ্ফল হইতে লাগিল; তখন হইতেই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজনৈতিক গগনে কৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হইয়া ভীষণ প্রলয়ের আভাস প্রদান করিল।

১৮৯৬ সনের এক ভীষণ কাণ্ডে দেশে যে আতঙ্কের ভাব জাগিয়া উঠিল সেই আতঙ্কই সেই অসভ্য জাতিকে জাতি গঠনে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। ১৮৯৬ সনে ফিলিপাইন বাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া ১৯৬ জন অধিবাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া মাটীর নীচে নির্ম্মিত একটি মাত্র গবাক্ষ বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ফলে ১৯৬ জনের মধ্যে ৪৫ জন আবদ্ধ হইবার দিন রাত্রিতেই দমবন্ধ (Suffocation) হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। অবশিষ্ট জীবিত বন্দীগণকে পর দিবস গুলি করিয়া হত্যা করা হইল। এই ঘটনার পর আবার একদিন রাজকর্ম্মচারিগণ আরো ১৩ জন ভদ্র লোককে ধরিয়া আনিয়া গুলি করিরা হত্যা করিলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ হত্যাকাণ্ডে দেশে অশান্তির প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোক আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল।

এখন তাহারা আর সেই আদিম অসভ্য ভাবাপন্ন নহে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ফিলিপাইন বাসীরা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ, এক নেতার গৃহে একত্র মিলিত হইয়া দেশের দুর্দ্দশার বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল। সভা জমিয়া উঠিয়াছে, এমনই সময় সশস্ত্র সৈন্যদল আসিয়া যথেচ্ছ ভাবে গুলি চালাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল।

এইরূপে—অত্যাচার দিন দিন যতই বাড়িতে লাগিল, দেশের লোকের প্রাণে আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ততই জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আগুইনাল্ড এবং যোশী রাইজেল নামক দুইটী মহাপ্রাণ ব্যক্তি এই সময় দেশের নেতারূপে দণ্ডায়মান হইলেন—স্পেনের অত্যাচার হইতে দেশকে উদ্ধার করিয়া দেশে আত্মশাসন প্রতিষ্ঠা কল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন।

আগুইনাল্ড যখন দেশের কাজে ব্রতী হন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর মাত্র। ফিলিপাইনের এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম। দেশপ্রেমিক আগুইনাল্ড তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দ্বারা দেশের লোককে উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। জীবন মরণের ভীষণ সংগ্রামে প্রস্তুত হইবার জন্য দেশবাসীকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। দেশের লোক তাঁহাকে দলপতি বলিয়া মানিয়া লইল এবং সকলেই আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এইরূপে যখন আগুইনাল্ডের নেতৃত্বে দ্বীপবাসী বীর মদে মাতোয়ারা হইয়া স্পেন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, তখন গভর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া পড়িলেন।

এই সময় আমেরিকার সহিত কিউবা লইয়া স্পেন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং কোন প্রকারে আগুইনাল্ডকে হস্তগত করিবার জন্য রাজপক্ষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আগুইনাল্ড এবং তৎসম্পর্কিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে উৎকোচ প্রদান করিয়া নিরস্ত করিবার জন্য রাজ সরকার হইতে ২০ লক্ষ ডলার (এক ডলার তিন টাকার উপর) মঞ্জুর হইল। আইগুনাল্ড তখন ভাবিলেন, শত্রুর নিকট হইতে যাহা কিছু আত্মসাৎ করিতে পারা যায়, তাহাই লাভ। বিশেষতঃ সে সময় দেশের কাজের জন্য প্রচুর টাকারও দরকার। তিনি এই সুযোগে এক ঢিলে দুইশিকার ধরিবার সঙ্কল্প করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ করিলেন এবং স্বদেশ বহিষ্কৃত হইয়া হং কং সহরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভিতরে ভিতরে বল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

আগুইনেল্ড দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে রহিলেন, যোশীরাইজেল। এইবার সংক্ষেপে রাইজেলের কথা বলিব। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এক ধনবানের ঘরে রাইজেলের জন্ম হয়। তাঁহার শৈশবকালীন কার্য্যকলাপেই বুঝাগিয়াছিল যে উত্তরকালে তাহাদ্বারা দেশের কোন মহৎ কাজ সাধিত হইবে। তিনি সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারিতেন এবং একজন সুলেখক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ২১ বৎসর বয়সের সময়
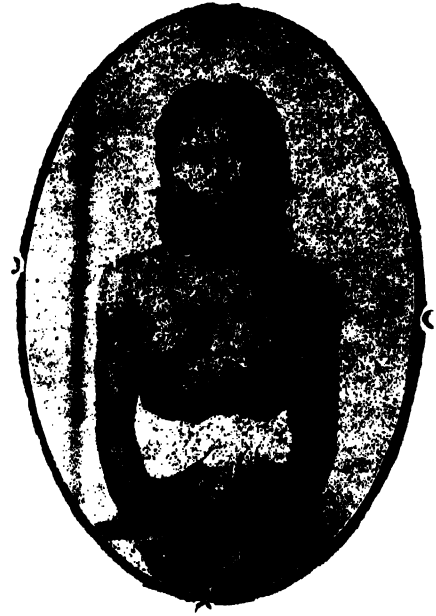
শিক্ষিত স্বকর ফিলিপাইন বালক।

তিনি ইউরোপে গমন করেন। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ডাক্তারী, এবং নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আইসেন। এই সময় ফিলিপাইনে স্পেনের অত্যাচার প্রবল ভাবে চলিতেছিল। দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া রাইজেল বক্তৃতাদ্বারা এবং প্রবন্ধ লিখিয়া দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধরিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। অবস্থা বুঝিয়া তিনি পুনরায় দেশ ছাড়িয়া জাপান চলিয়া যান এবং তথা হইতে লণ্ডন সহরে গিয়া কিছুকাল বাস করেন। রাইজেলের পুনরায় বিদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, স্পেনের অত্যাচারের কথা সভ্যজগতে প্রচারিত করা।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় দেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্পেনের অত্যাচার হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইনে বিদ্রোহের সূচনা হইলে গভর্ণমেণ্ট সুযোগ বুঝিয়া সেই সময় রাইজেলকে গ্রেপ্তার করিবার পরোয়ানা বাহির করিলেন। রাইজেল ধৃত হইয়া প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

হত্যার দিন এক অপূর্ব্ব ঔপন্যাসিক রহস্য উপস্থিত হইল। মিস্ জোসেফাইন ব্রাকেন নাম্নী এক যুবতীর সহিত রাইজেলের পূর্ব্ব হইতেই প্রণয় ছিল। কিন্তু বিবাহের সুযোগ এত দিন ঘটিয়া উঠে নাই বলিয়া বিবাহ হয় নাই। রাইজেলের প্রাণ-দণ্ডাদেশ শুনিবামাত্র ব্রাকেন দৌড়িয়া আসিয়া বধ্যভুমিতে উপস্থিত হইল এবং তাহার জীবনের শেষ সাধ রাইজেলের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার সময় ভিক্ষা চাহিল। রাজকর্ম্মচারীগণ যুবতীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। সেই শ্মশান ভূমিতেই ব্রাকেনের সহিত রাইজেলের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রেমাস্পদকে ঠিক ঠিক অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে স্থান দিয়া যে ভালবাসিতে পারিয়াছে, মৃত্যু ভয়ে সে ভালবাসার তিলমাত্র সঙ্কোচ ঘটিতে পারে না। স্বার্থান্ধ মানবই স্বার্থ দেখিয়া ভালবাসার ভান করে।

একদিকে নবদম্পতীর হৃদয় ভেদী দীর্ঘশ্বাস, অন্যদিকে রাজ কর্ম্মচারিগণের বিকট আনন্দোচ্ছাস; সেই বীভৎস, দৃশ্যের মধ্যে গুলির আঘাতে রাইজেলের প্রাণ পাখী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এক মহাপ্রাণ মহাপুরুষ স্বদেশের সেবায় এইরূপে প্রাণদান করিলেন।

প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসানলে রাইজেল পত্নী ব্রাকেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ফিলিপাইন হইতে স্পেনের উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি দ্বীপবাসীকে নানারূপ বক্তৃতা দ্বারা যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং নিজে অসি হস্তে রণসাজে সজ্জিত হইলেন। দেশীয় দলের সহিত স্পেনীয়দলের সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। রমণী ব্রাকেন প্রিয় প্রাণপতির অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য দেশবাসীকে উত্তেজিত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তিনি জাপান আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে গিয়া বল সঞ্চয় ও অস্ত্র সংগ্রহে চেষ্টিত হইলেন; শুধু তাহাও নহে। তত্তৎদেশ সমূহে স্পেনের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করিয়া সভ্যজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ই নূতন দ্বীপভূমি কিউবা লইয়া স্পেনের সহিত মার্কিন যুক্তরাজ্যের বিবাদ বাধিয়া উঠিল। স্পেনের অত্যাচারে জর্জ্জরিত ফিলিপাইন দ্বীপবাসীর দেশ হইতে এইবার স্পেন গভর্ণমেণ্টকে বিতাড়িত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া লাগিলেন। দেশের আভ্যন্তরিন গোলযোগের বিষয়ে জানিতে পারিয়া যুক্তরাজ্যের তখনকার প্রেসিডেণ্ট ম্যাকিন্‌লিন স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে) এডমিরাল ডিওয়েকে একদল নৌসেনার অধিনায়ক করিয়া

ফিলিপাইন যোদ্ধা।

ফিলিপাইন দ্বীপের অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। ম্যানিলা উপসাগরে উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং সে জলযুদ্ধে মার্কিনেরই জয়লাভ ঘটিল।

ডিওয়ে তখন ক্রমশঃ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অভ্যন্তরে প্রবেশের অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময় আগুইনল্ড ও ব্রাকেন আসিয়া ডিওয়ের সহিত মিলিত হইলেন। আগুইনাল্ডের সহিত ডিওয়ের কথা হইল, স্পেনীয় দিগকে ফিলিপাইন দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলে, মার্কিন যুক্তরাজ্যের অধীনে, ফিলিপাইন দ্বীপে সাধারণ তন্ত্র রাজ্য শাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে এবং আগুইনাল্ড প্রথম প্রেসিডেণ্ট

নির্ব্বাচিত হইবেন। ডিওয়ের এই পরামর্শানুসারে আগুইনাল্ড স্পেনীয়দিগের সহিত স্থল যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফলে স্পেনীয়েরা পরাজিত হইয়া ফিলিপাইনদ্বীপ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অত্যাচারীর শাসননীতি এইরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু হায়, এত করিয়াও ফিলিপাইন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিল না। মার্কিন নৌ সেনাপতি ডিওয়ে আগুইনাল্ডকে যে আশা ভরসা এবং প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ পরে সে প্রতিশ্রুতি কিছুই রক্ষিত হইল না। স্পেনীয়েরা ফিলিপাইন দ্বীপ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুইনাল্ড ফিলিপাইন সাধারণ তন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট বলিয়া ঘোষিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন প্রেসিডেণ্ট ভাবে থাকিতে হইল না। ডিওয়ে কিছুদিন পরেই কৌশল ক্রমে আগুইনাল্ডকে বন্দী করিলেন। ফিলিপাইনের ভাগ্য হইতে অধীনতা দুঃখ ঘুচিল না।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর পারিস নগরের সন্ধিসর্ত্ত ক্রমে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিনের অধিকার ভুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইল। তদবধি আজ পর্য্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জ মার্কিনের শাসনাধীনই রহিয়াছে। তবে স্পেনের শাসনে দ্বীপবাসী যেরূপ নিগ্রহ ভোগ করিতেছিল, মার্কিনের শাসনে আসিয়া সে সব অত্যাচার কিছুই নাই। মার্কিন ফিলিপাইনে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এখন বড়ই সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন।

ফিলিপাইনে এখন শিক্ষিতের সংখ্যা গড়ে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁহারা নাকি দেশ শাসনেরও উপযুক্ত হইয়াছে; তাই যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট উইলসন ঘোষণা করিয়াছিলেন ফিলিপাইনকে স্বরাজ দেওয়া হউক। প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং তদনুসারে যে কমিশন পাঠাইয়াছিলেন, সে কমিশনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে—'এখনও সম্পূর্ণ সাবালকত্বে ফিলিপাইন উপনীত হয় নাই—তবে হবু হবু হইয়াছে।'

যাহা হউক, এই আত্মপ্রচেষ্ট জাতিটী যে সুদূরেই হউক আর অদূরেই হউক, স্বীয় অদম্য চেষ্টার ফল লাভ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে চেষ্টা করে ভগবান তাহাকে সাহায্য করেন। এমন কি, রাজাও তাহাকে সম্মান করেন। ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

---

# বান্ধব।

যখন মৌলিকতায় বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, পাশ্চাত্যের ভাবানুবাদে যোগেন্দ্রবিদ্যাভূষণের আর্য্যদর্শন, অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণ দাসের জ্ঞানাঙ্কুর, বঙ্গীয় পাঠকগণের হৃদয়ে নিত্য নূতন ভাবের লহরী তুলিতেছিল, তখন চিন্তাশীলতায় কালীপ্রসন্নের বান্ধব বঙ্গসাহিত্যে নবযুগের অবতারণা করিল। নৈষধের পদলালিত্য-

বান্ধব সম্পাদক।

ভারবীর অর্থগৌরব, বার্কের ওজস্বিতা, কার্লাইল ও স্পেনসারের চিন্তাশীলতা বঙ্গভাষায় ফুটিয়া উঠিতে পারে কি না, সে বিষয়ে বোধ হয় অনেকেরই মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। বান্ধব সে সন্দেহ ভঞ্জন করিল। এই বান্ধবের গর্ভেই প্রভাত চিন্তা, নিশীথচিন্তা, ও নিভৃত চিন্তার চিন্তারাশি এবং ভ্রান্তিবিনোদের রস কৌতুক ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

তখন বান্ধব সম্পাদক পূর্ব্ববঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের একছত্র অধিপতি। তিনি ইতঃ পূর্ব্বেই "শুভ সাধিনীর" সম্পাদকতা করিয়া,

নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়া, ও নানা সভা সমিতিতে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাজেই বান্ধবের জন্মের সময় সম্পাদক জজকোর্টের সামান্য একজন কেরাণী হইলেও ঢাকা সহরের পদস্থ লোকের দরবারে তাঁহার অবাধ গতি-বিধি ছিল। ঢাকার কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ প্রভৃতি রাজপুরুষগণ সকলই তাঁহাকে আদর করিতেন, তাঁহার সহিত মিশিতেন।

বাঙ্গালীদের মধ্যে কমিশনারের পার্সনেল এসিষ্টেণ্ট রায় অভয়াচরণ দাস বাহাদুর, স্কুল ইন্‌স্পেক্টার বাবু দীননাথ সেন, ঢাকার প্রাচীন উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

শুনিয়াছি, একদিন কালীপ্রসন্ন তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিলেন, এমন সময় চাকর আনিয়া সেদিনকার ডাকের কাগজপত্র টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। তিনি তখনই ডাকের কাগজ হইতে "বঙ্গদর্শন" খানা লইয়া খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরেই তিনি সে বঙ্গদর্শন খানা সঙ্গে লইয়া অভয় বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন এবং হাতের বঙ্গদর্শন দেখাইয়া বলিলেন, "বঙ্গদর্শন পড়িতে পড়িতে আজ একটা কথা মনে হইল—কাঁটালপাড়া নেহাৎ পাড়াগাঁ, সেখান হইতে যদি বঙ্গদর্শন বাহির হইতে পারে, তবে আমরা কি ঢাকায় থাকিয়া এমন একটা কিছু করিতে পারিনা?" অভয় বাবু উত্তরে বলিলেন, "হাঁ আপনি ইচ্ছা করিলে পারেন বটে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে লেখক কোথায়?" কালীপ্রসন্ন আবেগভরে বলিয়া ফেলিলেন, "পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে লেখক সৃষ্টি করাই হইবে আমাদের উদ্দেশ্য। যদি ঢাকা হইতে বঙ্গদর্শনের ন্যায় একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা যায়, তবে এখানে যাহারা সাহিত্য সেবা করিতে ইচ্ছুক, তাহারাই যে লেখক হইয়া উঠিতে পারিবেন। তখন ঢাকায় সাহিত্য চর্চ্চার নূতন তরঙ্গ উঠিবে।"

এইরূপ আলোচনার পর অভয়বাবু কালীপ্রসন্নের কথায় সায় দিলেন। ইহার পর দীন বাবু এবং আনন্দ বাবুও সম্মতি দিলেন। এইরূপে বান্ধব চতুষ্টয়ের পরামর্শে "বান্ধব" বাহির করিবার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। অচিরে এই কর্ম্মী সম্প্রদায় তাঁহাদের স্ব স্ব সাহিত্যিক বন্ধুদিগকে পত্র দ্বারা তাহা জানাইলেন এবং বান্ধবের সাহায্যে সাহিত্য সেবায় অগ্রসর হইতে আহ্বান করিলেন।

ইহার পরই অবতরণিকা লিখিত হইল। কালীপ্রসন্ন অবতরণিকা লিখিয়া অনেককেই পড়িয়া শুনাইলেন। এইরূপ উদ্যোগ আয়োজন শুনিয়াছি ১২৮০ সালের ফাল্গুণ মাসে হইয়াছিল এবং বৈশাখেই "বান্ধব" বাহির হইবে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

বান্ধবের পাণ্ডুলিপি চৈত্রমাসে প্রেসে প্রেরিত হইলেও নানা প্রতিকূল বিভ্রাটের জন্য বান্ধব সঙ্কল্পিত সময়ে বাহির হইতে পারিল না। যখন বান্ধবের সূতিকাগৃহ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছিল, তখন হইতেই বান্ধবকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনের জন্মকালীন সুযোগ-সুবিধা বান্ধবের হয় নাই। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যেমন ঘোর ঘটা করিয়া সম্পাদক ও লেখকগণের নাম সহ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, বান্ধবের ভাগ্যে বোধ হয় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সেরূপ হইয়া থাকিলেও তাহার কোন নিদর্শন আমরা পাই নাই। বঙ্গদর্শন প্রকাশে বঙ্কিম আত্মীয় স্বজন এবং রাজধানীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের সে সৌভাগ্য ছিল না। কেন না, ঢাকায় তখন তেমন সাহিত্য সেবী কেহই ছিলেন না।

কেবল সাহিত্য সেবীর অভাবই যে সঙ্কল্পিত সময় বান্ধব প্রকাশের অন্তরায় হইয়াছিল তাহা নহে। তখন ঢাকায় মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কাজের ভিড়ে কোন মুদ্রাযন্ত্রই কোন কাগজ সময় মত ছাপিয়া দিতে পারিতনা। কাজেই ঢাকার সাময়িক পত্রিকাগুলিই যথাসময়ে বাহির হইত না। সম্পাদক আশা করিয়াছিলেন ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখ বান্ধবের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। দেখিতে দেখিতে বৈশাখ মাস কাটিয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি নিজেই প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ১২৮১ সালের আষাঢ় মাসে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা মুদ্রাযন্ত্রের কঠোর কবল হইতে বাহির হইয়া আলোক দর্শন করিল। প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি বাহির হইয়াছিল :—(১) অবতরণিকা, (২) শক্তি, (৩) মনুষ্যের জীবন চরিত, (৪) কুলবধূ, (৫) বাদল কবিতা। অবতরণিকায় কালীপ্রসন্ন বান্ধবের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন :—

"শিক্ষিত সমাজের সহিত দেশের সকল শ্রেণীস্থ লোকের শিক্ষাগত যোগ স্থাপন নিমিত্ত যে সকল উপায় কল্পিত হইয়াছে, প্রবন্ধময় সাময়িক পত্রিকা প্রচার তন্মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহা তাঁহাদিগের অধ্যয়ন ও চিন্তার ফল গৃহে গৃহে বিতরণ করে, সকলের সহিত তাঁহাদিগের কথোপকথনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, এবং মাতৃভাষার সেবারূপ সৎকার্য্যে সকলকেই অনুরক্ত করিয়া তুলে। ইহার আর এক প্রধান উপকারিতা এই, সাহিত্য সমাজ বলিলে যাহা বুঝায়, এইরূপ বহু পত্র দ্বারাই তাহা গঠিত হইয়া থাকে, ইদানীং অনেকে এই উপায় অবলম্বন করিয়া, বঙ্গদেশের সেবাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। বান্ধবও ঐ পথের পথিক।"...

বান্ধবের প্রথম সংখ্যা পড়িয়া শিক্ষিত জনসমাজ মুগ্ধ হইলেন। তখনকার নামজাদা সাময়িক পত্রিকায় বান্ধব সম্বন্ধে সম্পাদকগণের অভিমত বাহির হইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে লিখিলেন, "ইহা একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র। ... রচনা অতি সুন্দর, এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে বাঙ্গালার একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্র মধ্যে গণ্য হইবে এ বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।', ৪ঠা শ্রাবণের সাধারণীতে সূক্ষ্ম সমালোচক অক্ষয় সরকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "কালীপ্রসন্ন বাবুকে আমরা জানি না, তবে তাঁহার বান্ধবের সহিত আলাপেই বোধ হইতেছে যে তিনি নিজে কৃতবিদ্য, সুরুচি সম্পন্ন, সুলেখক ও ভাষাজ্ঞ।" কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় লিখিলেন, "ইহার প্রবন্ধ কএকটি সরল সৌন্দর্য্যমিশ্রিত চিন্তাপ্রসূত। ... ... ইহাতে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলি আমাদের বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছে।" ১৫ই শ্রাবণের অমৃতবাজারের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বাহির হইল—"ইনি যেরূপ গম্ভীরভাবে কাগজ চালাইতেছেন, এরূপ যদি চালাইতে পারেন তবে প্রকৃত বান্ধবের কার্য্যই করিবেন।" এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ভূদেব বাবু লিখিলেন, "প্রবন্ধগুলি পাঠে তৃপ্তিলাভ হইল।" পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার সোমপ্রকাশে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যেমন হৃদয়হারিণী, কালীপ্রসন্নর প্রবন্ধমালাও তেমন হৃদয়হারিণী।" বান্ধবের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভারত সংস্কারক সম্পাদক বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিলেন, "কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইমার্সন্" বাঙ্গালা-ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখক বলিয়া যিনি একদিন লাট দরবারে সর্ব্বোচ্চ গৌরবের আসন লাভ করিয়াছিলেন সেই "মধ্যস্থ" সম্পাদক মনোমোহন বসু এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বান্ধবের সমালোচনা করিয়া পরিশেষে লিখিলেন, "বাঙ্গালায় এমন লেখা ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই।" এমন কি গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা গেজেটে পর্য্যন্ত মন্তব্য বাহির হইল—"লিপি নৈপুণ্যে ও ভাবগাম্ভীর্য্যে বান্ধব বাঙ্গালাভাষার একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকা"। এইরূপে বান্ধব ভূমিষ্ট হইয়াই তখনকার সাহিত্য-সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

বাঙ্গালী আপনার স্বরূপে রাজনৈতিকও নহে, অর্থনৈতিকও নহে। বাঙ্গালী ভাবুক, বাঙ্গালা চিন্তাশীল দার্শনিক। কোমত, কার্লাইল, স্পেন্সার, ক্যাণ্ট, স্পিনোজা প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের ভাবরাজি তখন বাঙ্গালীর স্বভাবসুলভ চিন্তাশীলতার উপকরণ সরবরাহ করিতেছিল। এমন কি অনেক উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী কোমতের প্রত্যক্ষবাদ পড়িতে পড়িতে তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। এইরূপে তখন প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীই পাশ্চাত্য দর্শনবিজ্ঞানের কোন একটা মত আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিলেই নিজকে চরিতার্থ মনে করিতেন; আর মনে মনে ভাবিতেন, বাঙ্গালাভাষায় যদি পাশ্চাত্য দর্শনের এই ভাবগুলি ফুটিয়া উঠিত তবে তাহাদের জীবন কতই না সুখের হইত। উপন্যাসে ভরপুর বঙ্গদর্শন বোধ হয়, তখনকার এই শ্রেণীর বাঙ্গালী পাঠকের ভাব প্রবণতার উপকরণ যোগাইতে পারে নাই; কেবল ইংরেজী নাটক নভেলের আদর্শে গঠিত পাঠকগণের তৃপ্তিসাধন করিতেছিল। কাজেই ভাবুক বাঙ্গালীর উচ্চাঙ্গের চিন্তাশীলতার তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য তখন বান্ধবের ন্যায় সাময়িক পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই যুগ-প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই বান্ধবের জন্ম। এই কারণেই সাহিত্য-সমাজে মফস্বলের বান্ধব এত গৌরব, এত প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল!

বান্ধব বঙ্গসাহিত্যে যুগধর্ম্মের এই পূর্ণতা সাধন না করিলে তখনকার সাহিত্যিক যুগ এতটা গৌরবান্বিত হইত কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে! কাজেই বান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া সেই যুগের নাম-করণ করিলে, বাস্তবিক বান্ধব এবং ইহার সম্পাদক উভয়ের প্রতি অবিচার করা হয়। সেই জন্য

আমরা ইহাকে বঙ্গদর্শনের যুগ বা বঙ্কিম যুগ না বলিয়া বঙ্গদর্শন-বান্ধবের যুগ অথবা চট্টঘোষিক যুগ বলিব।

এই যুগে সাময়িক পত্রিকার পাঠক পল্লীগ্রামে একপ্রকার ছিল না বলিলেও চলে। সহরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙ্গালী সাময়িক পত্রিকা পাঠ করিতেন। সেই সময়ে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও খুব কম ছিল। এখনকার ন্যায় ঘরে ঘরে গ্রাজুয়েট মিলিত না; বেকার অবস্থায় সময় কাটাইবার উদ্দেশ্যে সাময়িক পত্রিকার সরল তরল প্রেমের গল্প খুঁজিয়া পড়িবার কেহই ছিল না। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে তখনও এমন অনেক "এজু" বাঙ্গালী ছিলেন, যাহারা বাঙ্গালাভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। আবার যে অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে মানব সাহিত্যের ভিতর স্বদেশের সনাতন প্রাণবস্তুর সন্ধান পায় বাঙ্গালী বোধ হয় তখনও সেই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া যে জাতীয় প্রাণপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল, সে কথাটা তলাইয়া বুঝিবার ক্ষমতাও বুঝি তখনও সকল বাঙ্গালীর জন্মায় নাই। এই সকল কারণেই জাতীয় সাহিত্য হিসাবে সাময়িক পত্রিকা পড়িবার গ্রাহক তখন খুব বেশী ছিল না। কাজেই এখনকার প্রবাসী-ভারতবর্ষের ন্যায় তখনকার বঙ্গদর্শন-বান্ধবের যে সাত আটহাজার গ্রাহক হইবে এমন আশা করা যায় না।

বান্ধবের প্রথম বর্ষের প্রতি সংখ্যা কত কপি ছাপা হইত, আমরা ঠিক বলিতে পারি না। তবে ১৮৭৮ সালের ২৪ জুলাইর কলিকাতা গেজেটে আমরা দেখিতে পাই—বালক বন্ধু ২০০০, বঙ্গদর্শন ১৮০০, বান্ধব ১৫০০, আর্য্যদর্শন ১০০০, ভারতী ১০০০, বীণা ৫০০, পথিক ৫০০, কমলিনী ৫০০, বঙ্গমহিলা ৪০০ কপি ছাপা হইত। কাজেই সব সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে বান্ধব প্রচারের হিসাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। কেশব বাবুর পাক্ষিক বালকবন্ধু ছাত্রগণের জন্যই বাহির হইত, কেশব বাবুর অলৌকিক বাগ্মি প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বহু ছাত্রই ইহার গ্রাহক হইয়াছিল। নব্য শিক্ষাভিমানী সকল বাঙ্গালীই উহা সাগ্রহে পাঠ করিত। সেইজন্য বালকবন্ধুর গ্রাহক সব চেয়ে বেশী ছিল।

বান্ধব যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন বঙ্গদর্শনের তৃতীয়বর্ষ চলিতেছিল। সম্পাদক বঙ্কিমবাবু ইতঃপূর্ব্বেই দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহারা প্রায় সকলই বড় বড় সাহিত্যরথী ছিলেন। কিন্তু বান্ধবের লেখকগণের মধ্যে সম্পাদক ব্যতীত আর সকলই এক প্রকার অজ্ঞাত নামা ছিলেন। আবার বঙ্গদর্শন কিছুদিন কাঁঠালপাড়া হইতে বাহির হইলেও কলিকাতার মত বড় সহরের শিক্ষা দীক্ষার আবহাওয়ার মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজধানীর সাহিত্য সম্পদ্ কলিকাতার সাহিত্য সেবিগণ সর্ব্বদাই বঙ্গদর্শনকে সাদরে উপহার দিয়াছেন। এই সমস্ত অনুকূল ঘটনার যোগাযোগেই বঙ্গদর্শনের গ্রাহক সংখ্যা বান্ধবের চেয়ে কিছু বেশী ছিল।

বান্ধব সঙ্কল্পিত সময়ে বাহির হইলে, উহা আর্য্যদর্শনের সমানে এক সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করিত। পণ্ডিত যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের আর্য্যদর্শন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে বাহিরহইয়াছিল। কাজেই বান্ধব বয়সে তাহা হইতে দুই মাসের বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও বান্ধবের আসন আর্য্যদর্শনের অনেক উপরে ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ দাসের জ্ঞানাঙ্কুর তখন বেশ গৌরবের সহিত চলিতেছিল। কিন্তু বঙ্গদর্শনের যশে যেন ইহার যশঃ অনেকটা ঢাকা পড়িয়া গেল। বান্ধবের চতুর্থ বৎসরে ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ঠাকুর বাড়ীর ভারতী বাহির হয়। বাগ্দেবীর লীলা নিকেতন ঠাকুর বাড়ীর সাহিত্যিকগণের গৌরবে ভারতী অবশ্যই গৌরবান্বিত। রাজকৃষ্ণ বাবুর বীণা তখন কেবল কবিতার ঝুড়ি লইয়া বাহির হইত। ইহাতে গদ্য স্থান পাইত না। মোটের উপর বঙ্গদর্শন ব্যতীত তখনকার অন্য কোন সাময়িক পত্রিকা বান্ধবের সমকক্ষ ছিল না।

বান্ধবের প্রতিষ্ঠার আর একটা বিশেষ কারণ ছিল।—কালীপ্রসন্নের অসাধারণ বাগ্মিতা শক্তি। তাহার বক্তৃতার এমনই একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে শুনিত, সেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার পুত্র সত্যপ্রসন্ন বাবুর নিকট শুনিয়াছি—একবার কালীপ্রসন্ন কলিকাতায় বক্তৃতা দিতে গেলে তখন কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শৈল বিহারে ছিলেন। বান্ধব সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের বক্তৃতা হইতেছে শুনিয়া কবিবর শৈল শিখরের সুখ শীতল আবহাওয়া পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ইংরেজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তিন ভাষায়ই বক্তৃতা দিতেন। একবার সারস্বত সমাজের উপাধি ও পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে ঢাকা বিভাগের

কমিশনার বিমস্ সাহেব সভাপতি ছিলেন। বিমস্ বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার নিজেরও মনে খুব একটা অহঙ্কার ছিল। তিনি ভাবিলেন পণ্ডিতের সভায় সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দিবার এই একটা শুভ সুযোগ। উপাধি ও পুরস্কার বিতরণের পর বিমস্ কালীপ্রসন্নকে বক্তৃতা দিতে বলিলেন। বিমস্ মনে করিয়া ছিলেন কালীপ্রসন্ন ইংরেজী অথবা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা দিবেন। কিন্তু বক্তা সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ বক্তৃতা হইল। পণ্ডিতগণ ইংরেজী নবিসের উদ্দীপনাময়ী সংস্কৃত বক্তৃতা শুনিয়া অবাক হইলেন। বিমসের সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার সাহস হইল না। তিনি হিন্দী ভাষায় সামান্য কিছু বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। তিনি উপসংহারে বলিলেন—"যেখানে কালী প্রসন্ন বাবুর মত লোক উপস্থিত সেখানে আমার সভাপতি হওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।"

যাঁহারা বান্ধব সম্পাদকের গুরুগম্ভীর বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন তাঁহারাই বান্ধবের গ্রাহক হইতেন।

নিরপেক্ষ নির্ভীক সমালোচনা বান্ধবের ছিল আর একটা বিশেষত্ব। ইহা বান্ধবের প্রতিষ্ঠালাভে কম সাহায্য করে নাই। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "পলাশীর যুদ্ধ কাব্য" বঙ্কিম বাবুর নিকট সমালোচনার জন্য প্রথম প্রেরিত হইয়াছিল। এইরূপ একটা কথা প্রচলিত আছে যে বঙ্কিমচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধকে পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গাল কবির কাব্য বলিয়া না পড়িয়াই আবর্জ্জনার ঝুড়িতে (Waste paper basket) ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের বান্ধবে বান্ধব সম্পাদক স্বয়ং পলাশীযুদ্ধের নিরপেক্ষ অথচ সারগর্ভ সমালোচনা করিলে বঙ্কিমবাবু সেই সমালোচনা পড়িয়া বঙ্গদর্শনের ঝুড়ি খুঁজিয়া পলাশীর যুদ্ধ বাহির করিলেন এবং তাহা পাঠ করিয়া ১২৮২ সালের কার্ত্তিক মাসের বঙ্গ দর্শনে তাহার সমালোচনা বাহির করিলেন। এতদিন যাহার কাব্য সমালোচনার যোগ্য বিবেচিত হয় নাই, এখন তাহাকেই বঙ্গদর্শন সম্পাদক বঙ্গের বায়রণ পদে অভিষিক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহাতেই বান্ধবের সমালোচনার মূল্যও মর্য্যাদা কতটুকু, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

"যমুনালহরীর" কবি ৺ গোবিন্দচন্দ্র রায় বান্ধবে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার "যমুনালহরী" বান্ধবেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক সঙ্গীত "কতকাল পরে, বল ভারত রে" আজও বাঙ্গালীর কণ্ঠে শুনিতে পাওয়া যায়। রায় মহাশয় ঢাকার স্বনাম ধন্য উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি আগ্রায় থাকিয়া ডাক্তারী করিতেন। প্রবাসে থাকিতেন বলিয়া বান্ধবে প্রকাশিত তাঁহার কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধের নীচে "প্রবাসী" এই সাক্ষর থাকিত।

নারায়ণগঞ্জ স্কুলের তদানিন্তন হেড মাষ্টার "ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য" প্রণেতা জগবন্ধু ভদ্র বান্ধবের একজন লেখক ছিলেন। হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের হেড পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি বান্ধবে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি বঙ্গদর্শনেরও একজন খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। ঢাকার ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার সুপণ্ডিত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বান্ধবেরও লেখক ছিলেন। তখন বঙ্গদর্শনে তাহার "বাল্মীকিও তৎ সাময়িক বৃত্তান্ত" আর্য্যদর্শনে "গ্রীক ও হিন্দু" এবং বান্ধবে "তর্কদর্শন" বাহির হইতেছিল। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা ঐতহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বান্ধবের একজন লেখক ছিলেন। তাহার পানিণি" ধারাবাহিকরূপে বান্ধবে বাহির হইয়াছিল। "তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনার" কবি দীনেশচরণ বসু প্রাঞ্জল ভাষায় 'মরমের' গভীর ভাব ব্যক্ত করিয়া বান্ধবের পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বান্ধবে লিখিতেন। তাঁহার "মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়" বান্ধবেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন বান্ধবে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার অবকাশ রঞ্জিনীর অনেক কবিতা বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় বান্ধবে হেমচন্দ্রের "দশ মহাবিদ্যার" সমালোচনা করিয়াছিলেন। এমন সূক্ষ্ম অথচ হৃদয়গ্রাহী সমালোচনা বঙ্গ সাহিত্যে বিরল। অনেকেরই* এখনও ধারণা যে ইহা বান্ধব সম্পাদকের নিজের সমালোচনা।

* ১৩২৬ সালের ঢাকা রিভিউও সম্মিলনে 'কালীপ্রসন্ন প্রসঙ্গে' স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়, "কালীপ্রসন্ন স্মৃতি"তে রায় জলধর সেন বাহাদুর এবং ১৩২৭ সালের ঐ পত্রিকায় "স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ" প্রবন্ধে যোগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ঐ ভুলটী করিয়াছেন।

বান্ধব কতবৎসর বাঙ্গালার জলবায়ুর প্রভাব সহ্য করিয়া টিকিয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না।† বান্ধব সম্পাদকের কর্ম্মান্তর গ্রহণই যে বান্ধবের তিরোভাবের প্রধান কারণ তাহা অনুমান করা যায়। তাহার আর একটী কারণ লেখকগণের প্রবন্ধের জন্য পারিশ্রমিক দাবী। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নিজ নিজ প্রবন্ধের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ দাবী করাতে শেষ সম্পাদক নিরুপায় হইয়া বান্ধব বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। বঙ্গদর্শনেরও নাকি এই অবস্থা ঘটিয়াছিল।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ বি,এ,।

## অভিমান।

চাইনা তোমার আধেক চাওয়া
চাইনা তোমার আধেক কথা;
এজগতে আমি থাকিয়া ভুঞ্জিব
জন্ম জীবন বিরহ ব্যথা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

## স্নেহের দান।

(৯)

তহবিল ভাঙ্গার মোকদ্দমা দায়ের করা লইয়া মাতা পুত্রে মত ভেদ হইয়াছে।

মণিমোহন বলিয়াছিল—'নালিস করিয়া টাকা আদায় হউক বা না হউক, আমার নিকট এরূপ অপরাধ করিলে তাহার যে ক্ষমা নাই, ইহার দৃষ্টান্ত রাখিবার জন্যই নালিস করিতে হইবে।"

মণি ম্যানেজারবাবুকে এরূপ আদেশ দিলে, অপরাধী নায়েব মহাশয় হরকুমার, বৃদ্ধগোপী ভাণ্ডারী এবং অন্যান্য পাঁচজন কে লইয়া যাইয়া বড় কর্ত্রীর শরণাগত হইলেন।

সকলেই নায়েবের নিকট হইতে যথাযথ দস্তুরি খাইয়া একবাক্যে বলিল—গরীব তাঁবেদার, রাজ সংসারের না খাইয়া যাইবে কোথায়? খাইবে কোথায়? স্বর্গীয় কর্ত্তা মহারাজার আমলেই এই তহবিল ভাঙ্গা হইয়াছে। তিনি তাহা জানিতেন; অনেক গুলি টাকা তাঁহার মৌখিক আদেশেও খরচ লিখা হইয়াছে। তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ; তাঁহার এ-সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে নজর একেবারেই ছিল না। মণিবাবুরও নজর ক্ষুদ্র নহে, তবে এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন দোষ নাই, যত কিছু ঘটনা ঐ মাখন ছোকরার পরামর্শে ঘটিতেছে। সে ছোকরা নেহাৎ অল্পপ্রাণ, ক্ষুদ্র প্রকৃতির; তাহার কথাতেই ছোট কর্ত্তা নালিস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এখন আপনি—রাণী মা, যদি রক্ষা করেন। আপনি রক্ষা করিলে ছোট কর্ত্তা নালিশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন।

এরূপ নালিস হইলে যে মফস্বলের সকল নায়েবই একবারে কর্ম্ম ইস্তাফা দিয়া যাইবেন এবং তাহা হইলে যে আদায় তহবিলের পথে কিরূপ বিভ্রাট ঘটিবে তাহারও দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া তাহারা কর্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলেন।

গোপীর মন্ত্রণায় ও চক্ষের ইঙ্গিতে নায়েব বেচারা বড় কর্ত্রীর পায়ে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বড় কর্ত্রীর জীবনে এই প্রথম বিচার মিমাংসার দায়িত্ব উপস্থিত হওয়ায় তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। নায়েব বেচারার কাতর ক্রন্দন, মফস্বলের নায়েবদের কর্ম্ম ইস্তাফার ভাবি বিভ্রাট আশঙ্কা, দশের অনুরোধ, ছেলের জিদ—এই সমস্ত চিন্তায় তিনি উপস্থিত বুদ্ধি স্থির করিতে না পারিয়া হরকুমারের সহিত অনেকক্ষণ পরামর্শ করিলেন, তারপর সে দিন আর কোন আদেশ না দিয়া সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন।

মণির মার মন দশের কথায় ও নায়েবের কান্নায় নরম হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তিনি কি করিবেন? মণি যে এই ব্যাপারে প্রতিবাদী।

সকলে চলিয়া গেলে মণির মার মনে জাগিতেছিল—ছেলের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের কথাটাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

মণি ছোট বেলা অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির ছিল। কাহারও শাসন মানিত না। জমিদারের একমাত্র

---

† শ্রীযুক্ত শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ আমাকে লিখিয়াছেন ১২৮৫ও১২৮৬ সালে সম্পাদকের চক্ষুরোগের জন্য বান্ধব বাহির হয় নাই। ১২৯১ সালে বান্ধবের অষ্টম বর্ষ এবং তাহাই ছিল তাহার শেষ বর্ষ।" তাঁহার কথা বোধ হয় ঠিক নহে, কেননা সৌরভ আফিসে আমরা ১২৮৫। ৮৬ সালের কোন কোন সংখ্যা এবং ১২৯২।১২৯৩ সালের দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত বান্ধব দেখিয়াছি।

ছেলে বলিয়া কেহ কিছু বলিতেতো পারিতই না বরং অত্যধিক আদর করিত। সেই অন্যায় ও অপরিমিত আদরে পিতামাতার প্রতিও সে প্রচুর উদ্ধত ব্যবহার করিত।

কলিকাতা যাওয়ার পর হইতেই তাহার এই ব্যবহারে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার পর হইতে সে সকলকেই গ্রাহ্য করিয়া চলে, কাহাকেও কোন উচ্চ কথা বলে না হরকুমার প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনও সেই হইতে তাহার অন্যায় আচরণের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইয়াছে ; দাস দাসীদিগের প্রতি তাহার যে কড়া শাসন ছিল, তাহা একেবারে লয় পাইয়া গিয়াছে। এগুলি ব্যতীত তাহার অন্যান্য আচরণও সকলের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।

কড়া ও বদ মেজাজী শাসককে লোকে যতটা ভয় করে, নিরীহ ও মেজাজ শূন্য লোককে তেমন লোকে ভয় করেনা। মণির চাল চলনের প্রকৃতি নিরীহ ও মেজাজ শূন্য হইয়া যাওয়ায় এ সংসারে যে-ই যখন কোন ত্রুটী করিত, তাহা যে মণির মৃদুস্বভাবের ফলে করিত, তাহা বলিতে লোকে ত্রুটী করিত না।

মণির এই নিরীহ প্রকৃতির প্রশ্রয়েই জমিদার বাড়ীর দাস দাসী হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মীয় স্বগণ—সকলেরই প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া অল্পে অল্পে তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছিল। ইহা মণির মায়ের দৃষ্টিতে মোটেই প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছিল না। ঠিক এই সময়ে নায়েবের তহবিল ভাঙ্গা সম্পর্কে মণির এইরূপ আদেশ মায়ের মনে অনেকটা সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিল।

মা, ছেলে কড়া শাসক হউক—ইহাই আশা করিতেছিলেন। মণি মেজাজ গরম করিয়া চলুক ; জমিদারী প্রকৃতি বজায় রাখিয়া একটু এদিক সেদিক যাতায়াত করুক ; খরচ-পত্র হৈ চৈ, যাহা একজন জমিদারের পক্ষে প্রজার চক্ষে তাক্ লাগাইবার জন্য প্রয়োজন, তাহা করিতে তাহার মোটেই আপত্তি ছিল না। সেই জন্যই নায়েবের সম্বন্ধে মণির আদেশকে তিনি মনে মনে সমর্থনই করিয়াছিলেন।

এই আদেশের ভিতর যে মাখনের প্রভাব আছে তাহা অবগত হইয়া তিনি তাঁহার মনকে কোন রকমেই সান্ত্বনায় আনিতে পারিলেন না। পরের পরামর্শে রাজত্ব চলিতে পারে না ; তাহা আজ সুফল দিলেও কালই হয়ত বিষম বিভ্রাট ঘটাইয়া বসিবে।

মণির মা এই সকল চিন্তা করিয়া মাখনের প্রভাব হইতে এই উপলক্ষে মণিকে মুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময় জীবানন্দ স্বামীর শিষ্য দীনানন্দ স্বামী গুরুর আদেশে নাম কীর্ত্তনের জন্য পুনরায় সেই অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। জীবাশ্রমেই তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মণিমোহন সে দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জীবাশ্রমে গিয়াছিল। সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আসিলে তাহার মা তাহাকে ডাকাইলেন।

মা বলিলেন—"মৃজাপুরের নায়েব আজ বিকালে আসিয়া হত্যা দিয়াছিল।"

মণি—'আমি শুনিয়াছি।'

মা—"তোমাকে কে বলিল ?"

মণি—"তোমাকে যে সজাগ থাকিতে বলে, আমাকেও সেই চুরী করিতে বলে জমিদার বাড়ীর কোন কার্য্যই গোপন থাকেনা মা, সুতরাংই আমি জানিয়াছি।"

মা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"তুমি কখন শুনিলে, কে বলিল ?"

মণি—"আমি জীবাশ্রমে থাকিয়াই। শুনিয়াছি কে কে আসিয়াছিল, কি কি কথা বার্ত্তা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে নায়েবের কি পর্য্যন্ত অপদস্থ হইয়াছে—সবই আমার কাণে গিয়াছে। কে বলিয়াছে, তাহা শোনা নিষ্প্রয়োজন। মণি তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই করিও। আমি এত গুলি টাকা ছাড়িয়া দিয়া চুরির প্রশ্রয় দিবার পক্ষপাতী নাই।'

মা -"টাকা নাকি অনেক গুলিই স্বর্গীয় কর্ত্তার আমলের ভাঙ্গতি এবং তাঁহার মৌখিক আদেশে খরচ হইয়াছে।"

মণি -"এরূপ কথা বলিলেই চলিবে না, প্রমাণ চাই। কর্ত্তার আদেশে যদি খরচই হইয়া থাকে, সে জন্য ছোট হিস্যার খুড়ী মা কেন তাহা ছাড়িয়া দিবেন ; তাঁহার পক্ষেরও তো আদেশ থাকা প্রয়োজন ?"

মা—"তথাপি যখন স্বর্গীয় কর্ত্তার নামের দোহাই দেয়—আর কাটাই বা কত ?"

মণি বলিল—"সে তোমার ইচ্ছা। ইচ্ছা হইলে তুমি রিয়াৎ দিতে পার। টাকা খুব সামান্য নহে। দেউলিয়া ষ্টেট; এখন একটু সাবধানে চলা খুব দরকার; পয়সাটিকে টাকাটীর ন্যায়, টাকাটিকে মোহরটীর ন্যায় দেখা উচিত।"

মা বলিলেন—"এরূপ অবস্থায় অযথা আরো কতগুলি টাকা বৃথা মোকদ্দমায় ঘর হইতে দেওয়া কি সঙ্গত?"

মণি—"ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য সঙ্গত। আর টাকা যে একেবারেই কিছু আদায় হইবে না, তাহা নয়; নায়েবেরও বাড়ী-ঘর-সম্পত্তি আছে।

মা—"শাসন কর কিন্তু কাহারও অন্ন মারিও না। গরীবের অভিশাপ বড় ভয়ানক, বাবা।"

মণি—"একটু কঠোরই আপাততঃ হইতে হইবে মা! খরচ নানা দিক হইতে কমাইতে হইবে। ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করা আমার এখন সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য; সে জন্য ইহা অপেক্ষা আরো অনেক অপ্রিয় কার্য্য করিতে হইবে!"

মণি মার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি নীচের দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিতে লাগিল—"যাঁহারা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া খাইতেছেন, তেমন আত্মীয় স্বগণকে এখন ছাড়িতে হইবে। দাস দাসী কমাইতে হইবে—আমলার সংখ্যা কমাইয়া, নূতন করিয়া সব বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এগুলি ইহা অপেক্ষা অনেক কঠোর; অথচ না করিলে এখন আর উপায় নাই। ঋণ রক্তবীজের ন্যায় বৃদ্ধি হইয়া যাইতেছে, তাহার মূলোচ্ছেদ না করিতে পারিলে সম্মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা কিছুই বজায় থাকিবে না; এগুলিতে তুমি বাধা দিও না।"

মণির মা স্বীয় বাম হস্তের তর্জ্জনী নাসিকার নিম্নে স্থাপন করিয়া বলিলেন—"বলিস কি? এরা সব গরীব লোক যাইবে কোথায়? এরূপ করিলে লোকে যে তোর অখ্যাতি করিবে। এত হীন দৃষ্টিতে কি মান মানসাৎ বজায় থাকে?"

মণি—"কেন, দাদাকে বলনা মীর্জ্জাপুরের নায়েবী লইতে। বসিয়া নিষ্কর্ম্মা-কুমন্ত্রণা করার চেয়ে বেশ নিজের খাইয়া নিজের পার উপর ভর করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবেন ইহাতে অসম্মানের বিষয় কি? এত গুলি টাকা যদি তিনি তদ্রূপ করিতেন, তবেও আজ সান্ত্বনা পাইতাম। অনেকের মস্তিষ্ক কুমন্ত্রণার হাঁড়ী। আমিও আর বসিয়া থাকিবনা; আমাকে পুনরায় পড়িতে হইবে। আমি কলিকাতা যাইব, সেজন্য আমাকে মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার বেশী দিতে হইবে না। চার পাঁচ বৎসরে ঋণ শোধ করিব, ইহাই আমার আপাততঃ কল্পনা। জল খাইয়া পয়সা করিলে, মা শেষটায় দুধ খাইলেও সে পয়সা ফুরায় না।"

মণির মা পুত্রের কথায় রাগ দেখাইয়া বলিলেন "তোমার এ কল্পনা কিছুতেই আমি হইতে দিব না। তোমার এখন আর পড়িবার সময় নয়। পড়িয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইবারও তোমার দরকার নাই তোমাকে আর মাখনের সংশ্রবে কিছুতেই যাইতে দিব না। তোমার সহিত তাহার সংসর্গেই হইয়াছে যত সব ছোট নজরের কল্পনার সৃষ্টি। কোথায় শুনিয়াছ, ঋণ না থাকিলে রাজা জমিদারের সম্মান থাকে? কোন জমিদার আত্মীয় স্বগণ তাড়াইয়া, চাকর-নফর, দাসী বাঁদির ভাত মারিয়া, আমলা ফয়লা বিদায় দিয়া, নিজে থানের ধুতি ও চাদর গায় দিয়া ছোট লোকের মত চলিয়া ঋণ শোধ করে? যত ছোট লোকের খেয়াল! এ কিছুতেই হইবে না। আমার এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় নাই যে জল খাইয়া পয়সা জমাইব।"

মাখনের উপর মার তীব্র মন্তব্য মণিকে মায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিজকে সংযত করিল এবং কোন উত্তর না দিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

মাখনের বিরুদ্ধে মণির মা যে আজই মণিকে শুনাইয়া সর্ব্ব প্রথম প্রকাশ্য মন্তব্য করিলেন, তাহা নহে। মাখনের সংসর্গের বিরুদ্ধে জমিদার বাড়ীতে গোপী ভাণ্ডারীর অভিযোগের পর হইতে যে সকল ছোট বড় মন্তব্য গোপনে ও প্রকাশ্যে চলিতেছিল গুপ্তচরের কল্যানে মণি সকলই শুনিতেছিল। এই সে দিনও দুই বন্ধুর মধ্যে বিবাহের তর্কে মণির মা মাখনকে লক্ষ্য

করিয়া যে তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা মণির সম্মুখেই করিয়াছিলেন। মণি তাহাঁতে নিজ হৃদয়ে আঘাত পাইলেও মাতৃ হৃদয়ে সে জন্য আঘাত দেয় নাই। আজও দিল না। নিজের হৃদয়েই সে ক্ষত বহন করিয়া লইয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

মণি পুকুরের ঘাটলার একটা বাঁধা আলিসায় হেলান দিয়া বসিয়া মনের দুঃখ গোপন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না; মাখনের সেই মন্তব্যটী তাহার মনে পড়িল। মাখন সেদিন মণির মার মুখ হইতে তীব্র মন্তব্য শুনিয়া অন্য একটা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিল ভগবান আমাদিগকে ভাষা দিয়াছেন, আমাদের মনের প্রকৃত অসংযত ভাবগুলিকে সংযত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য; কিন্তু অশিক্ষিত লোকের নিকট এই উক্তি খাটে না। ভাব গোপন করা শিক্ষারই ফল। প্রকৃতিকে দশের সম্মুখে ভদ্র বেশে উপস্থিত করিতে হইলে যে শিক্ষার দরকার আমাদের স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে সেটী নাই।

মণি সে সময়ে কথাটী ভাবিবার অবসর পায় নাই; আজ মাতার তীব্র মন্তব্যে মাখনের প্রতি এই পরিবারের সকল মন্তব্য ও ব্যবহার একে একে তাহার স্মৃতিতে উদিত হইতে লাগিল। সে ভাবিল, তাহার পক্ষে মাখনকেই ছাড়া উচিত, না বাড়ীর এই জঘন্য সংশ্রবই ত্যাগ করা উচিত। মা যেরূপ ভাবে প্রতিবাদ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তিনি যে প্রাচীন দাস দাসী আমলা ফয়লা ও আত্মীয় স্বজনকে সহজে ছাড়িবেন, তাহার কিছুতেই সম্ভাবনা নাই। অথচ মনের শক্তি অপচয় করিয়া কুসংসর্গে বাস করা কিছুতেই হইবে না। অপর দিকে বিবাদ বিসম্বাদও সঙ্গত নহে; তাহাতেও কুলোকের প্রশ্রয় মাতাপুত্রে বিবাদ বাঁধাইয়া কতগুলি হীন প্রকৃতির লোক সংসার লুটিয়া লইবে।

মণিমোহন অনেকক্ষণ বসিয়া চিন্তা করিল। সে কিছুতেই মাতার সহিত মতের অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া ও তদ্বারা চতুর্দ্দিকে আন্দোলন সৃষ্টি করার সমর্থন করিল না।

মাখনের সংসর্গ যে তাহার পক্ষে যথার্থ সৎসংসর্গ—এ সম্বন্ধে তাহার মনে কণামাত্রও সংশয়ের বিষয় ছিল না। সুতরাং সে চারিদিক চিন্তা করিয়া মত স্থির করিল – মা বা মাখন কেহই অবহেলার পাত্র নহে, এবং কর্ত্তব্য যাহা তাহা অবশ্য করণীয়।

কর্ত্তব্য স্থির করিয়া মণি নিজেই ম্যানেজারের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে তাহার যথার্থ আদেশ জ্ঞাপন করিয়া তাহা যথাসম্ভব সুব্যবস্থার সহিত ধীরে ধীরে কার্য্যে পরিণত করিতে উপদেশ দিল। তারপর নিজ শয়ন কক্ষে আসিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া রহিল।

মণি নিঃশব্দে ঘর হইতে চলিয়া গেলে মণির মাও ছেলের কথাই ভাবিতে ছিলেন। তিনি ছেলের মনে কষ্ট দিয়া বড়ই অশান্তিতে ছিলেন। ছেলে ঘরে আসিয়াছিল, কোথায় তিনি তাহাকে আদর করিয়া বসাইবেন, মাতৃস্নেহে আপ্যায়িত করিবেন, ছেলের ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি করিবেন, তাহা না করিয়া তাহার প্রাণে আঘাত দিয়া তাহাকে বিমুখ করিয়া দিলেন।

অশান্তি ও অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া মা আজ নিজেই ছেলের আহার প্রস্তুত করিলেন। তারপর তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মণি যখন শয্যায় শুইয়া এ পাস ওপাস করিতেছি, তখন ভৃত্য যাইয়া তাহাকে মায়ের আহ্বান জানাইল। মণি বিনাবাক্য ব্যয়ে ভৃত্যের অনুসরণ করিল।

আহারে বসিলে মা বলিলেন—"নায়েবের নামে নালিস করিতে হইলে তাহাই কর।"

মণি বলিল—"তুমি নিজে যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর; বাজে লোকের পরামর্শে কোন কাজ করিও না। আমি আর সংসার সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না—কোন সম্পর্কও রাখিব না। ঋণ না শোধ হওয়া পর্য্যন্ত তোমার এ বিভব আমার প্রাণে একটুও শান্তি দিতে পারিবে না; এরূপ জমিদারী ও সম্মানে আমার কোন প্রয়োজন নাই"

ইহার পর মাতা অনেক কথা বলিলেন। "হাঁ" "না" ব্যতীত কোন কথারই আর মণি বিশেষ উত্তর প্রদান করিল না। (ক্রমশঃ)

# ভাওয়ালের সন্ন্যাসী কুমার।

১৩০৯ সালে ভাওয়ালের যে কুমার দার্জ্জিলিঙ্গে কুমার লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, এক যুগ পরে সেই কুমারই সন্ন্যাসীর বেশে ঢাকায় আবির্ভূত হইয়াছেন—এই গল্প আজকাল বাঙ্গালা দেশের ঘাটে-পথের গল্প হইতে বার লাইব্রেরীর নিত্য আলোচনার পর্য্যন্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এহেন গল্পের বিষয়ীভূত নায়ক, সন্ন্যাসী কুমারকে দেখিবার সাধ কার না হয়? বিশেষ যদি জীবিত কালে সে ব্যক্তির সহিত সূত্র-সংশ্রবেও পরিচয় থাকিবার বিষয় থাকে।

ভাওয়ালের মধ্যম কুমারকে আমি চিনিতাম। তিনিও অবশ্য আমাকে চিনিতেন তবে বড় লোকের কথা স্বতন্ত্র; এই যা কিছু তফাৎ।

সন্ন্যাসী কুমার এখন তাঁহার ভগ্নির বাসা বাড়ীতে ঢাকা, আর্ম্মানীটোলা বাস করিতেছেন। পূর্ব্ব বঙ্গীয় জমিদার সভার অধিবেশনে আসিয়া কার্য্যশেষান্তে আরো কয়েকদিন ঢাকায় ছিলাম। একদিন সে দুর্দ্দমনীয় কুতূহল নিবারণার্থে একেবারে যাইয়া আর্ম্মানীটোলায় হাজির হইলাম।

প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল। দারোয়ান আমাকে কিছুতেই গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না। কৌতূহল এই ব্যাপারে আরো বৃদ্ধি হইল। সুতরাং নিরস্ত হইলাম না। সেই দিনই (২২বৈশাখ) সন্ধ্যার পর পুনরায় গেলাম। তখন একজন ভদ্র লোক আমাকে জানাইলেন "রাত্রিতে দেখা হইবে না, আপনি কাল প্রাতে আসিবেন"। আমি বলিলাম "কাল আমি চলিয়া যাইব; সুতরাং আজই আমাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে।"

তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে আমি পরিচয় দিতে অসম্মত হইলাম। আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া নিজ কৌতূহল নিবৃত্তি করিব, সে জন্যই আমার এ উদ্দম; সুতরাং আমি পরিচয় দিলাম না।

এই সময় আর একটী ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে বলিলেন "আসুন আপনার যাইতে কোনই বাধা নাই।"

বোধহয় তিনি আমাকে চিনিয়াছিলেন, তাই আপ্যায়নে ক্রটী রাখিলেন না।

আমার মাথায় পাগড়ী ছিল। যাইয়া দেখি, সেখানে বহুলোক; অথচ আমার যাইবার পথেই আপত্তি উঠিয়াছিল। মনে মনে বুঝিলাম, বিশেষ পরিচিত ব্যতীত আগন্তুক মাত্রকেই সেখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এখন এই মামলা মোকদ্দমার সময় এ সাবধানতার ব্যবস্থা অসমীচীন মনে হইল না।

সন্ন্যাসী নিজেই আমাকে তাঁহার পার্শ্বের আসন দেখাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। উপবিষ্ট ভদ্রলোকেরাও আমাকে বসিতে বলিলেন।

আমি উপবেশন করিয়া সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করিলাম "আমাকে আপনি জানেন কি?"

তিনি অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"না, মনে হয় না।"

আমি আমার মাথার পাগড়ীটা খুলিয়া লইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন আমাকে চিনিতে পারিতেছেন কি?"

সন্ন্যাসী এবার আমার দিকে চাহিয়াই বলিলেন "আপনি পূর্ণঠাকুরের মাতুল ভ্রাতা।"

আমি এই উত্তরে, বিস্মিত হইলাম। উপস্থিত ভদ্রলোকগণ সকলেই আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভাওয়াল রাজ পরিবারের গুরু, আমার পিস্তুত ভ্রাতা। আমি তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম, যখন সন্ন্যাসী প্রথম আসিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই সময় পূর্ণ তাঁহাকে দেখিতে গেলে কেহ তাহার পরিচয় দেওয়ার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী-কুমার গুরুর পদে প্রণত হইয়া তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ণের যে ধারণা হইয়াছিল উপস্থিত ব্যপারে আমারও ধারণা ঠিক সেইরূপই হইল। সন্ন্যাসীর চেহারার, চুলের ও চক্ষুর বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া আমার আর মনে কোন সন্দেহই রহিল না।

ইহার পর সন্ন্যাসী কুমারের সহিত আমার আরও কোন কোন বিষয়ে আলাপ হইল।

আমি তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় রাজা রজেন্দ্রনারায়ণ রায় জীবিত থাকিতে অনেকবার জয়দেবপুর গিয়াছি; কুমারদের আমলেও গিয়াছি। শেষ সাক্ষাৎ তাঁহার সহিত

কবে হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"আপনি আপনার ভ্রাতার বিবাহে একবার হাতী চাহিয়াছিলেন। তারপর জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বে একবার দেখা, বোধহয় সেটাই শেষ দেখা।"

হাতীর কথাটা আমার মনেই ছিল না। তাঁহার যে এত খুটীনাটী কথাও স্মরণ আছে—ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তাঁহার উল্লেখের পর আমার সেই হাতী চাওয়ার কথা মনে হইল।

আমি বলিলাম—"যাহার বিবাহে হাতী চাহিয়াছিলাম, সে এখন বি, এল, পাস করিয়া ময়মনসিংহ জজকোর্টে ওকালতি করিতেছে। সে কি আজকার কথা! বিশ বৎসরের প্রাচীন কথা!"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"পঁচিশ বৎসর হইয়াছে।"

তাঁহার কথা ঠিক, কি আমার কথা ঠিক, তাহা নিরূপণের জন্য সেখানে কোন প্রমাণ উপস্থিত ছিল না; সুতরাং আমি সে বিষয়ে আর কোন তর্ক উপস্থিত করিলাম না। পরে বাসায় আসিয়া ধলার শ্রীমান দিগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট জানিলাম আমার ভ্রাতার বিবাহ চব্বিশ বৎসর হয় হইয়াছে, দিগেন্দ্রের সেই তারিখটী স্মরণ থাকিবার বিশেষ কারণ ছিল। তখন আমার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ বিস্ময় সন্ন্যাসীর স্মৃতি শক্তির বিষয় ভাবিয়াই হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী সকল কথা বলিলেন কিন্তু আমার নামটী বলিতে পারিলেন না। সেখানে উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে আমায় বিশেষ বন্ধু স্থানীয় পত্রিকা চারুমিহির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি, এল, মহাশয়ও ছিলেন। তিনি আমার পূর্ব্বেই সেখানে গিয়াছিলেন; সুতরাং আমাকে আগন্তুক দেখিয়া আমার কোন পরিচিত লোক সন্ন্যাসী কুমারকে আমার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছিলেন কি না, তাহা তিনি জানিতে পারেন। আমি কিন্তু সন্ন্যাসী কুমার সম্বন্ধে সন্দেহহীন বিশ্বাস লইয়াই বিদায় হইলাম। সাকার ভূতেও আমার বিশ্বাস আছে; ভেল্কিতেও অবিশ্বাসী নই। এখন দেখা যাউক—কোথাকার মড়া কোথায় যাইয়া ভাসে!

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

# বিধির বিধান।

## প্রথম পরিচ্ছেদ—বিধাতা নির্দ্দয়।

অন্ধ কালাচাঁদ গোস্বামী স্বীয় দক্ষিণ হস্তটী উঠাইয়া ডানে বামে হাতড়াইয়া ডাকিলেন "হরি"!

"আমি এখানেই।"

"তুমি করিতেছ কি হরিপ্রিয়া?"

"আপনার পূজার আয়োজন করিতেছি।"

"একটু কাছে, আরো একটু কাছে আসিয়া কর হরি—দেখি ....."

বলিয়া গোস্বামী দক্ষিণ হস্তটী পূর্ব্বের ন্যায় উঠাইয়া স্ত্রীর উদ্দেশে ইতস্ততঃ খুজিতে লাগিলেন।

হরিপ্রিয়া গোস্বামী ঠাকুরের ভার্য্যা; পরম রূপসী। গোস্বামী ঠাকুর অন্ধ হইবার পূর্ব্বেই হরিপ্রিয়াকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন। হরিকে পাইয়া কালাচাঁদ যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছিলেন; কিন্তু অদৃষ্টের দুর্জ্জয় পরিহাস তাহার সকল সাধে বাদ সাধিল। বিবাহের অল্পকাল পরেই গোস্বামী প্রভু হটাৎ তাঁহার অমূল্য চক্ষুরত্ন হইতে চির বঞ্চিত হইলেন।

স্বামীর ডাকে পত্নী কাছে আসিলে কালাচাঁদ তাহাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া তাহার কুসুম কোমল মসৃণ দেহে সন্তর্পণে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রেম গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"হরি ভগবান কি নির্দ্দয় দেখ দেখি! তিনি তোমাকে কত সুখের কোলে রাখিতে পারিতেন? আমার আর কিসের অভাব? তোমার এই উদ্দাম যৌবন—অনিন্দ্যরূপ—কে বলে তিনি দয়াময়? তিনি যদি দয়াময়, তবে নির্দ্দয় কে? আমি এমন কি অপরাধ তাঁহার নিকট করিয়াছি, যাহার জন্য আমাকে আজীবন এরূপ মনস্তাপ ভোগ করিতে হইবে? হরি তোমার কি দুঃখ হয় না ইহার জন্য?"

হরি উত্তর করিল—"হয় বৈ কি?"

"কেন হয় বল দেখি?"

"আপনার জন্য হয়, আপনাকে অন্ধ করিলেন তিনি সেই জন্য হয়।"

"তোমার নিজের জন্য হয় না?"

"আমাকে তো তিনি কোন দুঃখ দেন নাই!"

"কেন, আমার অন্ধত্ব কি তোমারও দুঃখের কারণ নয়?"

"সে জন্য দুঃখ করিলে ফল কি? ভগবানের উপর রাগ করিলে দুঃখের উপসম হইবে কি?"

"তোমার মনে তবে সান্ত্বনা আছে; বেশ!" বলিয়া অন্ধ স্বামী পত্নীকে সাদরে টানিয়া লইয়া সোহাগ দেখাইলেন।

হরিপ্রিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"পূজার আয়োজন রাখিলাম, আমি এখন আখা ধরাই গিয়া; বেলাতো দুপর হইতে চলিল।"

"আর এক কলিকা তামাক দিয়া যাও। এই আমিও মালা রাখিলাম। হরিপ্রিয়া, সম্বল আমার এখন তুমি, আর জপের মালা; লাঠি, আর এই হুকা। দাও, আর একটা ছিলুম দাও; তারপর তৈল দাও, স্নানে যাই। মালা জপিয়া আর সান্ত্বনা পাই না হরিপ্রিয়া! নির্দ্দয় ভগবান—নির্দ্দয়......"

হরিপ্রিয়া স্বামীর হস্ত হইতে মালার ঝুলীটা লইয়া তুলিয়া রাখিয়া তাঁহার হস্তে হুকাটী দিল; তারপর কলিকাটী আনিয়া হুকার মাথায় চাপাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কানাচাঁদ দীর্ঘ নিশ্বাসে মর্ম্মযাতনা প্রকাশ করিলেন —"হরি কে বলে তুমি দয়াময়।"

তারপর একাগ্র মনে হুকার সেবা করিতে লাগিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—স্বপ্ন-মঙ্গল।

গোস্বামী প্রভুর বড় বড় শিষ্য সেবক ছিল; বিস্তর জোত ব্রহ্মোত্তর জমিও ছিল। সুতরাং অন্ধত্ব ব্যতীত তাঁহার আর কোন বিশেষ দুঃখের কারণ ছিল না। কিন্তু এই এক দুঃখই তাহাকে সময় সময় এত উত্তেজনা করিত যে তখন তিনি ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না।

আজ বেহারার স্কন্ধে আরামে শয়ান থাকিয়াও গোস্বামী প্রভু তাঁহার অন্ধত্বের জন্য ভগবানকে অজস্র অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন, এবং সেই চিন্তায় তন্ময় হইয়া ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

নিদ্রার আবেশে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—দূর আকাশ হইতে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ স্বয়ং যেন নামিয়া আসিয়া তাঁহার করুণ করস্পর্শে গোস্বামীর চক্ষু তারকা দুটী আশুগের ফুলকীর মত জ্বালাইয়া দিয়া কহিলেন—বৎস, সুখ দুঃখ কিছুই নহে; তাহা মনের ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। তুমি যাহাকে দুঃখ মনে করিতেছ, তাহাই তোমার হয়ত বাঞ্ছিত, আর তুমি যাহাকে সুখ কল্পনা করিতেছ, তাহা তোমার জীবনের মহা বিপদের কারণ। এ জগতে কেহই নিজের জন্য আইসে নাই, আমার সৃষ্টি বিকাশের জন্যই কর্ম্মের বিধান তোমরা কর্ম্মী মাত্র। এ বিধান কর্ম্মীকে মানিতেই হইবে। এবং এ বিধান মানাতেই তাহার সুখ। যাহা হউক—আজ তোমার ইচ্ছাই পরীক্ষিত হউক। দেখা যাউক—বসুমতীর যৌবন শ্রী তোমাকে কত তৃপ্তি দান করিতে পারে!"

পাল্কীর ঝুঁকিতে গোস্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পাল্কী গন্তব্য স্থানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। শিষ্য গণ গললগ্ন কৃত্তবাস পাল্কীর সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া আছেন। গুরুগোঁসাই পাল্কীর ভিতর হইতে স্বীয় পদদ্বয় বহির্গত করিয়া ধরিলেন; শিষ্যেরা তাঁহার পায়ের পাতা ললাটে ও জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গৃহে বরণ করিয়া লইল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিধাতা মঙ্গলময়।

শিষ্য গৃহে গুরুর কার্য্য শেষ হইয়া গেলে গোঁসাই প্রভুর প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এমন সময় এক শিষ্য ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিল—"গুরুগোঁসাই-কর্ত্তা-প্রভুর আদেশ হইলে একজন চক্ষু চিকিৎসক আসিয়াছেন—তাহাকে একবার দেখাইতে পারি।"

স্বপ্নের কথা তখন গোস্বামীর স্মরণ হইল। তিনি ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়া উদ্দেশে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের প্রতি ভক্তি দেখাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন—"প্রভো, মঙ্গলময়, তোমার মঙ্গল আদেশ পূর্ণ হউক! ডাক দেখি তোমাদের চক্ষু চিকিৎসককে।"

চিকিৎসক আসিল এবং গুরু গোঁসাইর অনুমতি লইয়া তাঁহার চক্ষে অস্ত্র প্রয়োগ করিল। স্বপ্ন ও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের আবির্ভাব আজ গুরু গোঁসাইকে ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে ধ্রুব বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে।

সম্পূর্ণ দিন ও রাত্রি চক্ষু বাঁধিয়া রাখিয়া পর দিন প্রভাতে যখন চিকিৎসক তাঁহার চক্ষের বন্ধন মোচন

করিয়া দিল, তখন গুরু গোঁসাই বসুমতীর নবীন যৌবন শ্রী দর্শন করিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শিষ্যের গৃহ উৎসব ক্ষেত্রে পরিণত হইল। চিকিৎসকের যশোগীতিতে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইল।

গুরু শিষ্যকে বলিলেন "বৎস আমাকে বিদায় দাও, তোমাদের মা গোঁসাইকে নিজে যাইয়া আমি আমার এ নব জীবনের পুণ্যবার্ত্তা জ্ঞাপন করিব। আহা, তাঁহার তাহাতে কত আনন্দ—কত সুখ হইবে। তোমরা আজ আমার জীবন দান করিয়াছ; আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে একত্র আসিয়া তোমাদিগকে তাহার প্রতিদান করিব— আমাদের যুগ্ম হৃদয়ের অনাবিল আশীর্ব্বাদ দান করিব।"

তাহাই হইল। পাল্কী আসিল; গুরু গোঁসাই দৃষ্টিলাভ করিয়া গৃহে—পত্নী সম্ভাষণে চলিলেন। এ সংবাদ পত্নী হরিপ্রিয়াকে সর্ব্বাগ্রে না জানাইয়া গ্রামের আর কাহাকেও তিনি দিবেন না। কি আনন্দেই না আজ হরিপ্রিয়া উৎফুল্ল হইয়া তাহার চক্ষুষ্মান্ স্বামীকে হৃদয়ে ধারণ করিবে। সে যখন দেখিবে, আমি তাহাকে অন্যান্য দিনের ন্যায় না ডাকিয়াই, তাহার সাহায্য পাইবার অপেক্ষা না করিয়াই তাহাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছি, তখন না জানি সে কতই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে। তারপর যখন শুনিবে...

গোস্বামীর হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। স্বপ্নে ভগবান বলিয়াছিলেন, বসুমতীর যৌবন শ্রী উপভোগ করিতে। বসুমতীর যৌবন আমার চক্ষুর কোন্ তৃপ্তি দান করিবে? প্রিয়া সম্ভাষণের পূর্ব্বে আমার দৃষ্টি কোন শ্রীর সম্ভোগেই বৃথা ব্যয় করিয়া দুর্ব্বল করিব না। গৃহে যাইয়া বিশ্রম্ভালাপে হরিপ্রিয়ার পূর্ণ যৌবন সুষমা নিঙরাইয়া ভোগ করিবার জন্য তাহা রাখিব। এ দৃষ্টি তাহার জন্য, বসুমতীর সৌন্দর্য্যশ্রী দর্শন জন্য নহে। গোস্বামী পাল্কীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। পাল্কী চলিতে লাগিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ—দর্পচূর্ণ।

বেহারারা তাঁহার আদেশ পালন করিয়া, দ্বিপ্রহরের নীরবতাকে অটুট রাখিয়া, নিঃশব্দে আনিয়া পাল্কীখানা গোস্বামীর বাহের বাড়ীতে রাখিল। গোঁসাই ধীরে—অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

"ভগবান, একি দেখাইলে প্রভো?"

গোস্বামী মাথায় হাত দিয়া থর্‌থরি কাঁপিতে লাগিলেন।

হরিপ্রিয়া স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া বিচলিত হয় নাই। অন্ধ স্বামী, চক্ষুহীন—দৃষ্টিহীন স্বামী, অন্যান্য দিনের ন্যায় যষ্টিতে ভর করিয়া, হাতে হাতড়াইয়া যেমন আসিয়া থাকেন, আজো সেইরূপ আসিয়াছেন,—ভাবিয়া সে নিত্যকার মত তাহার প্রেমাস্পদের সহিত বিশ্রম্ভালাপ সম্ভোগেই মগ্ন রহিল। দৃষ্টিহীন স্বামী যে নির্দ্দয় ভগবানের করুণ কৃপাস্পর্শে বসুন্ধরার শ্রী সম্ভোগের জন্য দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া প্রিয়া সম্ভাষণে আসিয়াছেন, তাহা তাহাদের কেহই বুঝিতে পারে নাই তাই নির্ব্বিকার ভাবে তদবস্থ থাকিয়াই হরিপ্রিয়া স্বামীর সম্ভাষণ করিল—

"এত বিলম্ব হইল যে? কাল সমস্ত দিন কি যে ভাবনায় গিয়াছে আমার .."

কালাচাঁদের কর্ণে সে সম্ভাষণ প্রবেশ করিল না। তাঁহার সদ্য প্রস্ফুটিত ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে ধরিত্রী যেন লাটিমটীর ন্যায় ঘুরিতেছিল। যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার এই সুদীর্ঘ কাল তাহার চক্ষের সম্মুখে বিরাজমান ছিল, আজ মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সেই পুঞ্জিকৃত অন্ধকার পুনরায় আসিয়া তাহার দৃষ্টি লয় করিয়া দিল। কালাচাঁদ বুঝিল, আজ ভগবান তাঁহার দর্পচূর্ণ করিবার জন্যই তাহাকে চক্ষু দান করিয়াছেন।

অন্ধ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ভগবানকে ডাকিল— "ভগবান সাধ পূর্ণ হইয়াছে,—এখন নেও প্রভো! মৃত্যু চাই,—আর কোন কামনা নাই;—একমাত্র মৃত্যুই বাঞ্ছিত। তুমি মঙ্গলময়; তোমার মঙ্গল বিধান পূর্ণ হউক।"

কালাচাঁদ দৌড়িয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

পরদিন গ্রামের পঞ্চায়েৎ ও চৌকিদার আসিয়া বাড়ীর ভগ্ন ই দারা হইতে গোস্বামীর শবদেহ উত্তোলন করিল।

গ্রামের লোক গোঁসাইর দৃষ্টি প্রাপ্তির সংবাদ জানিত না; তাই কেহ আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল "বোধ হয় রাত্রিতে একা বাহির হইতে হইয়াছিল, অন্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।—যা হবার তাই হইয়াছে।"

কেহ বলিল—"বিধির বিধান।" কেহ বলিল.........

(বিলাতী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

Asutosh Press, Dacca.
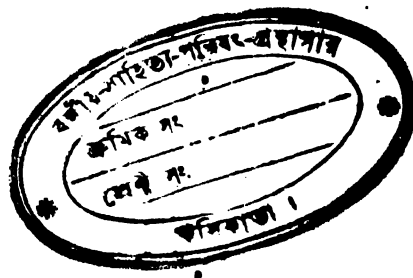
# সৌরভ

একাদশ বর্ষ। ময়মনসিংহ, শ্রাবণ ১৩৩০ সপ্তম সংখ্যা।


## রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অভিব্যক্তি।

নির্ঝর যেমন প্রচণ্ডবেগে নামিয়া আসিয়া নদীর শান্ত বিস্তৃতিতে পরিণত হয় ও অবশেষে ধীরে ধীরে মহাসাগরের অপার ঔদার্য্যে মিশিয়া পড়ে—কবির কাব্য-জীবনও সেই নির্ঝরেরই অনুরূপ।

তাঁহার যৌবনাংশের কবিতাবলীতে যৌবনের মত্ততাই লক্ষিত হয়। প্রৌঢ়াবস্থার কবিতাবলীতে মনঃসংযোগ ও গাম্ভীর্য্য প্রতীত হয় বার্দ্ধক্যের কবিতাবলীতে বৃদ্ধের ভক্তিপ্রবণতাই দৃষ্ট হয়।

'যাত্রা'য় সে জীবনের আরম্ভ। যৌবনের প্রথম আশা ভরসায় কবির প্রাণ ভরপুর। তিনি কাহারও প্রতীক্ষা না করিয়া, কিছুই না লইয়া, আদর্শের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অনির্দ্দেশের মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়াছেন—

'কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া,
বাহির হনু তিমির রাতে,
তরণীখানি বাহিয়া।'

তাঁহার মনোবৃত্তিগুলি আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত হইতেছে। তাঁহার বিশ্বাস এত দৃঢ় যে, যদি উহারা না-ই প্রস্ফুটিত হইত তথাপি এ যাত্রাপথে তিনি নিবৃত্ত হইতেন না—

'না যদি উঠে না যদি ফুটে
তবুও আমি চলিব ছুটে
তোমার মুখে চাহিয়া।'

"তপ্ত প্রাণের তীর্থ স্নানের সাগরে" তিনি স্নান করিতে চলিয়াছেন। অসংখ্য যাত্রী তাঁহার সাথে। কেহই জানেন না, সে সাগর কোথায়—

"আর কত দূরে আর কত দূরে—
সেইত সুধাই সবে।"

দিনের দাহ বাড়িয়া উঠিতেছে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে তাঁহারা তাহা ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না—মনে করিতেছেন—

"সাগরের স্নান হবে সমাধান
নূতন প্রভাত হলে।"

অপর সকলের ন্যায় তিনিও জগতে সুখ শান্তি খুঁজিয়া স্বীয় আদর্শকে পাইতে বেড়াইতেছেন। বিপদের জাল তাঁহাকে ঘিরিতেছে; দিন তাঁহার ফুরাইয়া যাইতেছে কিন্তু তবু তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না—জীবনে দুঃখ আছে, বিফলতা আছে। যৌবনের প্রারম্ভে মানবপ্রাণের এ বিশেষ ভাবটী কবির 'যাত্রা' কবিতাবলীতে চিত্রিত। ইংরেজী সাহিত্যে Wordsworthএর Stepping Westward নামক একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক্ষুদ্র কবিতাতেও এইভাব পাইয়াছিলাম—বাধা বিপদ যতই থাকুক না কেন, রিক্ত হস্তে কেবল মাত্র আদর্শকে মনে রাখিয়া মানব-হৃদয়ের সাহচর্য্যে জগতে ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্য দিয়া অজানার দিকে অগ্রসর হইতে তিনিও ভয় পান না, ইহা কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন—

"Yet who would stop or fear to advance
Though home or shelter he had none
With such a sky to lead him on?"

কিন্তু এই মর্ত্ত্যসংসারে কতদিন মানুষ দুঃখকে— অপূর্ণতাকে অস্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে?

কবিকেও তাই নৈরাশ্যের এস্রাজ বাজাইতে হইয়াছে। ইহাই তাহার জীবনের প্রথম নৈরাশ্য। আশাভরা সতেজ সুকুমার প্রাণ লইয়া মানুষ যখন সংসারে প্রবেশ করে, তখন তাহার কল্পনায় সমস্তই নানা রঙে রঞ্জিত, সকলের উপরেই তাহার সরল বিশ্বাস। এইরূপ সংসারে যে যাহা চায়, তাহাই পাইতে পারে। কবিও মনে করেন, আমার যাহা কামনা তাহা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। সুখশান্তি খুঁজিতে আদর্শ পাইতে সে বাহির হইয়াছে; কিন্তু হায়, জগতের কোথায়ও এক জায়গায় পৃথক্‌ভাবে সুখশান্তি জড় হইয়াতো নাই—কোথায়ও তাহার আদর্শের মত কিছুই নাই। প্রথম প্রথম সে এই কথা বাধা বিপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অগ্রাহ্য করে। তাহার পরে একদিন সংসারের সকল ক্ষুদ্রতা দীনতা একত্র আসিয়া তাহার সে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দেয়। সুখশান্তি নাই, আদর্শকে পাইবে না—এরূপ তাহার মনে হয়; তাহার হৃদয় ব্যকুল হইতে থাকে। ক্রমে মনে নানা দ্বিধা জন্মে। মানুষ কি কেবল সুখশান্তিই খুঁজে? সে কি সত্যই স্বকল্পিত বিশেষ কোনও আদর্শকে পাইতে চায়! নানা সন্দেহে তাহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সে কিছুই বুঝিতে পারে না।

"কহিছে সে হায় হায়
কোথায় আমি যাই, কারে চাইগো
না জানিয়া দিন যায়।"

কখনও প্রকৃতিমাধুর্য্যে কখনও বা কল্পনা সৌন্দর্য্যে নিজকে সে ভুলাইয়া রাখিতে প্রয়াস পায়; কিন্তু ভুলাইতে পারে না। আশারদীপ নিবিয়া যায়। আপন আদর্শকেই সে হারাইয়া ফেলে; অবশেষে তাহার মনের ব্যাকুলতা আর্ত্তনাদে কাঁদিয়া উঠে। মানব মনের এই একটা অবস্থার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের "হৃদয় অরণ্য" শীর্ষক কবিতাবলীতে পাওয়া যায়। তাহার "তারকার আত্মহত্যা"র "সুখের বিলাপে" "পরাজয় সঙ্গীতে" এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা অফুরাণ তৃষ্ণা গুমরিয়া কাঁদিতেছে।

"মনে হইতেছে আজ, জীবন হারায়ে গেছে
মরন হারায়ে গেছে হায়,
কে জানে এ কি ভাব! শূন্যপানে চেয়ে আছে
মৃত্যুহীন মরণের প্রায়!"

যৌবনের এই নৈরাশ্যের বর্ণনা আমরা অনেক সাহিত্যেই পাইয়া থাকি। অসীমের মধ্যে মিশিবার জন্য অসীমের এই আর্ত্তনাদ।

এই স্থলে বলিয়া লই—কবি রবীন্দ্রনাথে বেদনা আছে; কিন্তু তাঁহার আর্ত্তনাদে তীব্রতা নাই। তাঁহার কবিতায় আবেগ আছে, কিন্তু সে আবেগে মাদকতা নাই। একটা উচ্ছৃঙ্খল আকুলতায় তিনি কদাচিৎ কাঁদিয়াছেন। কিম্বা যখন কাঁদিয়াছেন কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি হাসিয়াই ফেলিয়াছেন, খুব কাঁদিয়া হয়ত ঘুমাইয়াই পড়িয়াছেন। তিনি মিলনেরই কবি, বিরহের নহেন।

যাহা হউক, মানুষের মন যৌবনের এই স্বাভাবিক নৈরাশ্যে চিরকাল আবদ্ধ থাকে না। যৌবনের আবেগ শীঘ্রই এই নৈরাশ্যের বাঁধকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া আপনাকে দিয়া জগৎ প্লাবিত করে। তখন—

" × × সকল আকাশ
সকল আলোক সকল বাতাস
তোমার হইয়া গাহে সঙ্গীত—বিরাট কণ্ঠ তুলি।"

কবি "হৃদয় অরণ্যে'র মধ্যে নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার আত্মবোধ স্পষ্ট হইয়া উঠে। 'হৃদয় অরণ্য' হইতে তিনি নিষ্ক্রান্ত হন। তাহার এই নিষ্ক্রমণ নৈরাশ্যকে দূরে নিক্ষেপ, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' অবাধ উন্মুক্ত উৎসাহে উদ্গীত হইয়াছে—

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
উথলি উঠেছে বারি
(ওরে) প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

* * *

আমি—ঢালিব করুণাধারা
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ কারা
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরণে, হাসি ছড়াইয়া
দিবরে পরাণ ঢালি।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খল্ খল্ গেয়ে কল্ কল্
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
নব নবদেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান।
যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবেনা আর প্রাণ।

কবির এত কথা—এত গান—এত প্রাণ—এত সুখ—এত সাধ! ভাষা ইহার চাইতে আর কি বেশী প্রকাশ করিতে পারে? সবই তাঁহার নিকট মধুর হইয়া আসিয়াছে—ঋষির ভাষায় কবি বলিতেছেন—

"মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব
মধুর মধু আলো মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বহে যায়"।

তিনি আপনাকে জানিতে পারিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির কাছে, সকলের কাছে আবার ফিরিয়া গিয়াছেন। এখন হইতে—

"জগত হয়ে রব আমি একেলা রহিব না
মরিয়া যাব একা হলে একটী জলকণা"।

আদর্শের মূর্ত্তি ধীরে পুনরায় তাঁহার মনে জাগিতেছে। আদর্শেরই উদ্দেশে তিনি ভাবিতেছেন—

"তোরি মোহময় গান, শুনিতেছি অবিরত
তোরি রূপ কল্পনায় লিখা
করিস্‌নে প্রবঞ্চনা, সত্য করে বলদেখি
তুই ত নহিস্ মরীচিকা?
কতবার অর্ত্তস্বরে শুধায়েছি প্রাণপণে
অয়িতুমি কোথায় কোথায়
অমনি সুদূর হ'তে, কেন তুমি বলিয়াছ
কেজানে কোথায়।"

সুদূরত্বের আকর্ষণ এইরূপে কবি অনুভব করিলেন; তাঁহার জীবন-আবেগও সুদূরের দিকে তাঁহাকে ভাসাইয়া চলিল।

আত্মবোধের এই প্রকার পরিপূর্ণ বিকাশ, জীবনের এইরূপ ব্যগ্র অনুভূতি জগৎ সাহিত্যে আর আছে কিনা জানিনা। ভিক্টর হিউগোর তেজোদীপ্তময় কাব্য পড়িয়াছি, সিলারের মেঘমন্দ্রে অবাক্ হইয়াছি, বায়রণের তড়িৎ ভাষায় ব্যথিত হইয়াছি, রুষ জুস্কোভ্‌স্কির "There is life and love beyond the Grave" বাণীতে পরম আনন্দিত হইয়াছি, আমাদের দেশের অপর কবিদের গীতিকবিতায় উৎফুল্ল হইয়াছি, কিন্তু রবি বাবুর "নিষ্ক্রমণের" কবিতাগুলির মত এত প্রাণপূর্ণ লেখা আর দেখি নাই। আনন্দ-বিস্ময়ে আমাদেরও ইচ্ছা করে, কবির সাথে "হেসে খল্ খল্ গেয়ে কল্ কল্ তালে তালে দিব তালি।" আমরা দেখিয়াছি কবি সুদূরের আকর্ষণে ভাসিয়া গিয়াছেন—

আমি উন্মনা হে
হে সুদূর আমি উদাসী?"

'নিকট' কে তিনি আপন ভাবিতে পারেন নাই—সুদূরের জন্য। তিনি প্রবাসী সাজিয়াছেন। বিশ্বের দিকে তিনি ছুটিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বের মধ্যেই আপনাকে দেখিতে পাইয়া অবশেষে বলিয়া উঠিয়াছেন—

প্রবাসীর বেশে ফিরি হায়
চিরজনমের ভিটাতে।

ফুল, ফল, মাটী, জল, সকলের ভিতরই তিনি আপনাকে বোধ করিতেছেন, বিশ্বকেই তিনি এখন আপন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার—

কিছুতেই নাই ভাবনা
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

ধূলার ভিতর আনন্দ ও প্রেম দেখিতে পাইয়াছেন। তদুপরি এই সমস্তের মধ্যে তিনি এক নিত্যবস্তুর সন্ধান জানিয়াছেন। এখন ইহারই পূজা করিতে কবির চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে; কবি বলিতেছেন—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক বিশ্ব বাজনা!
উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা!
টুটুক বন্ধ মহা আনন্দ
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ।
হৃদয়-সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক্ নবীন বাসনা!

কবির বিশ্ববোধ জন্মিয়াছে। সমগ্রের মধ্যে পূর্ণকে দেখিয়া খণ্ডের মধ্যেও তিনি পূর্ণকে বুঝিতে যাইতেছেন। বসুন্ধরাকে কবি অনুরোধ করিতেছেন—

আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র-সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপন পুরে
আমারে লইয়া যাও—রাখিওনা দূরে।

"বিশ্বের" কবিতা সকলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সর্ব্বানুভূতির "সা" টানিয়াছেন। 'নিষ্ক্রমণে' সীমার অসীমতায় মিশিবার স্ফূর্ত্তি—"বিশ্বে" সীমার অসীমতায় মিলনাভাসে আনন্দ। যৌবনের অগাধ প্রেমে মানুষ যখন দূরকে আপন করে, তখন সে নিকটকেও ভালবাসিতে শিখে—"বিশ্বের" 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবির ইহাই ইঙ্গিত। কবি "জীবনধাত্রী জননীর কাজ" পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মানব কেন, কিসের জন্য দুঃখ ক্লেশে জর্জ্জরিত হয়, ভাবিতে ভাবিতে, নিজের আদর্শকে কতদূর অনুসরণ করিয়াছেন ও কতদূর অগ্রসর হইলে পাইতে পারেন, চিন্তা করিতেছেন; 'বিশ্বের' সর্ব্বশেষ কবিতায় আমরা ইহা জানিতে পারি। এই আদর্শকে মূর্ত্ত করিয়া আকুল আগ্রহে বুকে টানিয়া লইতে তাহার ইচ্ছা—'সোণারতরী'তে ইহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। বিশ্ব সৌন্দর্য্যের ভাষাহীন সুরের সহিত মিলাইয়া তিনি আদর্শমূর্ত্তিকে বহির্জ্জগতে চিনিয়া লইতেছেন। কিন্তু যাহাকে তিনি হৃদয়ের সেই অধীশ্বরী বলিতে চাহেন; সে যে কেবল "যাহা ছিল নিয়ে গেল" শুধু "নতমুখে গেল চলি"। তিনি কত বিনাইয়া বিনাইয়া তাহাকে ফিরিতে বলিতেছেন—সেকি ফিরিবে না? তাঁহার অভিমান হইতেছে—

দুয়ার জুড়ে কাঙ্গাল বেশে
ছায়ার মত চরণ দেশে
কঠিন তব নুপুর ঘেঁসে
আর বসে না রৈব,
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।

কিন্তু তাহার ভয় হয়—

"যেথা হতে যাই; যাই কেঁদে
এমনটী আর পাব কি আবার
সরে না যে মন সেই খেদে।"

আবার তাই তিনি তাহাকে সাধিতে গিয়াছেন, বলিতেছেন—

"যেমন আজ তেমনি এস
আর করোনা সাজ।"

বিশ্বপ্রেমের স্পন্দনে মানবপ্রাণ যখন মানবপ্রাণে মিশিয়া যাইতে চায়, তখনকার মূক আকুলতাকে কবি "সোণার তরী"র এই 'অস্ফুট ভাষায়' ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। এই কবিতাগুলি আভাসময়। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা-গুলির উপর দিয়া পাশ্চাত্য বায়ুর ভাবহিল্লোল হয়ত একটু বহিয়া গিয়াছে, যাহাকে Mysticism বলে। কিন্তু তাহাতে আমাদের দেশেও যে রূপ ও অরূপের মিলনরসাত্মক রচনা-স্রোতের ধারা যুগ যুগ ধরিয়া আপনভাবে বহিয়া চলিয়াছে তাহা ভুলিবার কোনো কারন নাই। এই কবিতাগুলির বিশিষ্টতা ইহাদের অনুভূত বিষয়ে; যাঁহাদের এইরূপ অনুভূতির অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহারা ইহাদের পদলালিত্যে আকৃষ্ট হইলেও ভাবগ্রহণে কখনও সক্ষম হয়েন না। এবং এই জন্যই এই সব কবিতা তাঁহাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য।

'সোনার তরী' হইতে কবি 'লোকালয়ে' আসিলেন। কল্পনাকে বাস্তব করিয়া লইতে, আদর্শকে বুঝিয়া দেখিতে। লোকালয়ের এই জন-সঙ্ঘে ও বিশ্বদেবের আবির্ভাব কবি দেখিতে পাইয়াছেন এবং ব্যগ্রকণ্ঠে জানাইতেছেন—

"হে রাজন! তুমি আমারে
বাঁশী বাজাবার দিয়াছ যে ভার
তোমার সিংহ দুয়ারে—
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই।"

কবি মানুষের জন্যই—আমাদের কবিও সে কথা ভুলেন নাই। তিনি মানুষের মনুষ্যত্বকে দেবতার দেবত্ব অপেক্ষা বড় মনে করিতে চাহেন—পৃথিবীকে স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী বলেন—'সে যে মাতৃভূমি'।

"স্বর্গে তব বহুক অমৃত
মর্ত্ত্যে থাক সুখদুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি।"

'লোকালয়ের' প্রায় কবিতাতে কবি খণ্ডের মধ্যেই পরিপূর্ণতা পাইয়া অখণ্ডের চাইতেও খণ্ডকে বৃহৎ মনে করিতেছেন। 'লোকালয়ে' যৌবনের মুগ্ধনেত্রে নারীর মহিমা দেখিয়া কবি পুলকিত হইয়াছিলেন। কবির মনে হইতেছে—বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যের সারাংশেই যেন নারী সৃজিত। তাহার হৃদয় কত গভীর; তাহার দেহ কত সুন্দর। সংসারে সমস্ত কর্ম্মক্লেশের পরে ওগো নারী, তুমি আসিয়াই—

> "ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
> জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন,
> সুন্দর কর সার্থক কর
> পুঞ্জিত আয়োজন"।

ওগো নারী, সংসারে তুমিই প্রকৃত পূজা করিয়া থাক।—

> "অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ,
> খোল হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
> এলোকেশ পাশে, শুভ্র বসনে
> জ্বালাও পূজার বাতি।"

"উর্ব্বশী" কবিতায় গৌরবভরা চিত্তে কবি বিশ্ব সৌন্দর্য্যকে এই নারীরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা জগৎ সাহিত্যের একটী শ্রেষ্ঠ গীতি। কল্পনার প্রাখর্য্যে ইহা শেলীর Hymn to Beauty এবং কাট্‌স্‌এর Ode on a Greecian Urnকে ম্লান করিয়াছে।

কবির অভিলাষ ছিল কল্পনাকে বাস্তব আকারে দেখিতে। এখন নারীকে দেখিয়া তাঁহার সাধ পূর্ণ হইয়াছে। তিনি তাহার সম্বন্ধে বলিয়া উঠিয়াছেন—

> 'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা'।

কবি পতিতার মধ্যেও নারীত্ব বিদ্যমান দেখিয়া স্বর্গের দেবী স্থানে প্রণাম করিয়াছেন।

> 'আনন্দময়ী মূরতি তোমার
> কোন দেব তুমি আনিলে দিবা
> অমৃত সরস তোমার পরশ
> তোমার নয়নে দিব্য বিভা'।

কবি রবীন্দ্রনাথের এইস্থলে নূতনত্ব আছে। নারীকে এমন করিয়া সম্মান করিতে আর দেখি নাই। কল্যাণময়ী নারীর জন্যই তিনি বলিয়াছেন,

> 'সর্ব্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
> আছে তোমার তরে'।

বিশ্ব প্রকৃতি খণ্ডের মধ্যেও আপন সৌন্দর্য্যে বিকশিতা, ইহাই "নারীর" কবিতা সকল আমাদিগকে জানায়।

নারী তাঁহাকে কল্প লোকে লইয়া গিয়াছে 'কল্পনায়' তাই দেখিতে পাই কবি তাঁহার আদিশদেবীকে সকলের অন্তরালে নিভৃতে নীরবে গোপনে চিনিতে চাহিতেছেন—

> 'তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে
> চিনিব সজল আঁখির পলকে
> চিনিব বিরলে নেহারি
> পরম পুলকে'।

বিশ্ব প্রকৃতির সহিত খণ্ড সৃষ্টির, অসীমের সহিত সসীমের রহস্যময় পরিচয়ই এই 'কল্পনা' শীর্ষ কবিতাবলীতে আমরা বুঝিয়াছি; 'লীলা'তেও তাহাই দেখিয়া থাকি।

কবি বলিতেছেন,

> —'তোমারে পাছে সহজে বুঝি
> তাইকি এত লীলার ছল
> বাহিরে যবে হাসির ছটা
> ভিতরে থাকে আঁখির জল,
> বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
> ছলনা।
> যে কথা তুমি বলিতে চাও
> সে কথা তুমি বলনা।

হাস্য কৌতুকেই কবি তাঁহার আকুল আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্ত প্রেম তাঁহার আরাধ্যাকে জানাইয়াছেন। কারণ

> গভীর সুরে গভীর কথা
> শুনিয়ে দিতে তোরে
> সাহস নাহি পাই।
> হাল্কা তুমি কর পাছে
> হাল্কা করি তাই,
> আপন ব্যথাটাই।

"কৌতুকে'র" অনেক কবিতায় প্রেমের মিথ্যা ছায়াকে পরিহাস কটাক্ষে 'সরমে' দূর করিয়া কবি প্রেমের যথার্থতা অপরোক্ষভাবে তাঁহার জীবনাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দেখাইতেছেন।

"যৌবন স্বপ্নে" কবি কিন্তু তাঁহার এক অর্দ্ধপুরাতন অর্দ্ধ নূতন আবেশমোহে মুহ্যমান।—

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

হাস্যপরিহাস ছাড়িয়া কবি এখন তাঁহার আদর্শ মূর্ত্তির আবেশে জড়ান স্বপ্ন দেখিতেছিলেন কত সুধা কত সৌরভ যে সে মূর্ত্তি তাঁহার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, তিনি তাহার অন্ত পাইতেছেন না। কিন্তু কখনও তাঁহার মনে হইতেছে, এই সব যে স্বপ্ন মাত্র—এখন পর্য্যন্ত ত তিনি আদর্শ মূর্ত্তিকে আপন করিয়া লইতে পারেন নাই। আকুল আন্দোলনে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেছেন—ইচ্ছা হইতেছে এই "আকাশ কুসুম বনে স্বপ্নচয়ন" ত্যাগ করিয়া জগতের অপর সাধারণের মত চঞ্চল সংসারের সুখদুঃখের মধ্যে তিনিও জীবন কাটান। তাই কবির সর্ব্ব মুখে ঐ নিরাশার সুর।

কিন্তু তিনি প্রেমের ভেলায় আশ্রয় লইতে পারিয়াছেন। তাই তাহার মনে হইতেছে যেন—

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগণে!

পরেই তাহাকে গাহিতে দেখি

সুন্দরী ওগো সুন্দরী!
শতদল দলে ভুবন লক্ষ্মী।
দাঁড়ায়ে রয়েছ, মরি মরি!
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে
অচল তোমার রূপরাশি
নানা দিক হতে নানা দিন দেখি,—
পাই দেখিবারে ঐ হাসি!

তিনি আরাধ্যাদেবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন; হর্ষে, উল্লাসে কবিহৃদয় তাঁহাকে ধরিতে গিয়াছে—কিন্তু সে তো আকাঙ্ক্ষার ধন নহে। কবি তাই আপন মনে বলিতেছেন।

নিবাও বাসনা বহ্নি নয়নের নীরে
চল ধীরে ঘরে ফিরে যাই!

তবুও তাঁহার মনের অতৃপ্তি সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া রহিল। রুদ্ধবক্ষে কবি তাঁহার আরাধ্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—সেও কি তাঁহাকে ভালবাসে? কিন্তু, আবার আপনার বাসনা মলিন চিত্ত দেখিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কবি আপনাকে সকল রূপ হইতে বিছিন্ন করিতে চাহিলেন—তাঁহার হৃদয়াকাশে তাঁহার আরাধ্যার দেহহীন জ্যোতই যেন জাগিয়া রহে। এইরূপে কামনা তাঁহার দূরে অপসারিত হইল। ফলে প্রেমাস্পদের পূর্ণতায় তিনি নিজকে হারাইয়া ফেলিলেন—জগতে আর কিছুরই সন্ধান তিনি জানেন না। তাঁহার মনে পড়িল,

তোমাকেই যেন ভাল বাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে, অনিবার।

তাঁহার এই এক প্রেমের স্মৃতিতে জগতের সকল প্রেমের স্মৃতি ডুবিয়া গিয়াছে। আর এই অপার স্মৃতিতে নিজকে তিনি ঘিরিয়া রাখিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এরকম সুরে আরও গাহিতে শুনিয়াছি। Mrs Browning এর Sonnets form the Portugaese এক দিন এই সুরেই নাচিয়াছিল। ইহাই সসীমের অসীমে মিলন গাঁথা।

"কবি কথায়" কবি তাঁহার আপনার কথাই আবার পাড়িয়াছেন। তিনি যে কিরূপ অলস জীবন কাটাইবেন বীণার ঝঙ্কারে কাহার কথা শুনাইবেন, ইহাই তিনি জানাইতেছেন। কবিকথায় তাহার মানস-সুন্দরীকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। (আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীসুধীরচন্দ্র ভাদুরী।

## দিবা ও রজনী

"বৃথা জন্ম রাত্রি তব ঘন অন্ধকারে
মলিনা মূরতি মতি হেরিতে কে পারে?
নিশাচর নিশাচরী তব—প্রিয় প্রিয়া
নিয়ত কুকাজে রত আত্মবলি দিয়া;
তুমি পাপ, আমি পুণ্য উজ্জ্বল আলোক
আমায় লভিতে সদা ব্যস্ত সর্ব্বলোক।"
বলে নিশা, "গর্ব্ব তব শোভা নাহি পায়,
আমি আছি বলে তুমি আছ মহিমায়।
রাত্রি-দিন পাশাপাশি না থাকিত যদি
কে তবে চাহিত দিবা-আলো নিরবধি?"

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

# বিবাহ।

মানব সমাজে বহু প্রকার বিবাহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রকারভেদ পরে হইয়াছে। পূর্ব্বে বিবাহ ছিল না, ছিল সংগ্রহ। স্ত্রী পুরুষ প্রাপ্তির তাড়ণায় আপনা আপনি সঙ্গত হইতে পারিত। সেটাকে স্বেচ্ছাচারিতার যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। ক্রমে পৃথিবীতে যখন নর নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, তখন ঐ সংগ্রহই বিবাহ রূপ ধারণ করিল। বিবাহ কিন্তু প্রণালী বিশেষের দিক দিয়া যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়; উহা স্বেচ্ছাচার মূলক না হইয়া যখনকার যেরূপ সামাজিক অবস্থা, তাঁহার বিধি অনুযায়ি হইলেই হইল। সংগ্রহ যুগের সময় সমাজ স্থাপন হয় নাই, সুতরাং বিধি নিষেধেরও গণ্ডী প্রস্তুত হয় নাই। উদার আকাশ তলে অদম্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া মানুষ উদ্দাম গতিতে বিচরণ করিত।

মনুষ্য-সমাজ ঈশ্বর সৃষ্ট নহে। সামাজিক বিধি বিধানেও ঈশ্বরের কোন হাত নাই। উহা প্রয়োজনের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ মণীঋষিগণ দ্বারা সৃষ্টি হইয়া সমাজ রক্ষার সাহায্য করে। স্ত্রী পুরুষ একীকরণের মূল নিদান প্রণয়নে এক অচিন্ত্য শক্তির অস্তিত্বাভাস থাকিলেও পরস্পর পরস্পরকে সংগ্রহে লৌকিক কর্ত্তৃত্বেরই পরিচয় পরিস্ফুট। ইহা আদি মধ্য অন্ত্য—একই ভাবে নির্ব্বাহিত হয় নাই। আদিম অবস্থাতেই এক, বিপ্লব ও শান্তি শৃঙ্খলার সময়ই এক—আকারধারণ করিয়া থাকে।

মূল বেদে বিবাহের একটীও পূর্ণাঙ্গ চিত্র দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন আর্য্যজাতি কতটুকু দাম্পত্য সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন, বেদে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি দেবতাদিগের নিকট তাহারা যে সকল প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাতে পারিবারিক সম্বন্ধ সূত্রের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তদ্দারা বৈদিক যুগের বিবাহ ইতিহাসের পূর্ণতা সাধন হয়না। স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি যেখানে, সেইখানেই আবার পুরুষান্তর গ্রহণের প্ররোচনা। অর্থাৎ মৃত ভর্ত্তার শ্মশান চুল্লিতে শায়িতা রমণীকে তাহার আত্মীয়েরা সহ মরণ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তর গ্রহণের পরামর্শ দিতেছেন। তবে একথাও স্বীকার্য্য যে বেদের অর্থ পরিগ্রহে কেহই বলিতে পারেন না - আমি অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হইয়াছি। বেদকে অপৌরুষেয় বলার মূল তাৎপর্য্য এই যে বেদ কত কালের তাহা নিশ্চয় করিয়া উঠা যায় না; বেদের ভাষা যেন বিশ্বাত্মার আদি বাণী। এই জন্য পরবর্ত্তীকালে পণ্ডিতেরা অধিকাংশ স্থলে উহার প্রকৃতার্থ গ্রহণে পরাঙ্মুখ। ঐ স্থলে সতীত্ব ও দ্বিচারিণীত্ব দ্বৈত মতের সংঘর্ষ। যাহা হউক, আমরা কিন্তু ঐ দ্বৈত মতেরও একটা সামঞ্জস্য খুজিয়া পাইতেছে; তৎকালে আর্য্য জাতিদিগের সহিত অনার্য্য জাতিদিগের প্রতিনিয়তই সংঘর্ষ চলিত। যুদ্ধ আর মহামারী—উভয়েই নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি। যে প্রদেশে জাতির অস্তিত্ব নাশের আশঙ্কা হইয়াছে সেই প্রদেশে বসিয়া সমাজ সংস্থাপকেরা মৃত ভর্ত্তৃকার পুরুষান্তর গ্রহণের প্রস্তাব পাশ করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে। আমরা স্ব স্ব রুচির মাপ কাঠিতে সবদিক মাপিতে গিয়া অনেক সময় প্রকৃত তত্ত্বকেও বিস্ময়ের পথর চাপা দিয়া বসি। বাস্তবিক আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে এ সংসারে মনুষ্য সংস্থানের পরের কথাটাই হইবে সমাজ সংস্থান, ঐ দুইটাই অতি বড় কথা। জাগতিক উন্নতির দিক দিয়া পিঠা পিঠি ভাবে দণ্ডায়মান।

বিবাহ, উপময়, পরিণয় প্রভৃতি শব্দ পরে উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ তিনটী শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ পরস্পর রূপে বহা নিবৃত্ত হওয়া, ও সম্পূর্ণরূপে পাওয়া। এই শব্দার্থের দ্বারাও বুঝা যায়যে জগতে প্রাণী সংপ্রবাহের দ্বারে প্রথমত ইচ্ছা শক্তিকে রোধিবার কোনই চেষ্টা হয় নাই। পরে যখন বিপুল মনুষ্য সমাগমে জনপদের পর জনপদ সৃষ্টি হইতে লাগিল তখন আবশ্যক হইল সমাজ। বিবাহ, উপযম পরিণয় এগুলি সমাজ সংহিতারই পরিভাষা।

সেই অপৌরুষেয় শ্রুতি যুগ অবসান হইয়া যখন ঋষি যুগ প্রবর্ত্ত হইল তখনও কিন্তু যৌন সম্বন্ধ সুনিয়ন্ত্রিত হইল না। সে চিত্র পুরাণে সুসংযত ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিলাম না। তখন পুত্র কামনায় যে কোন পুরুষের সহিত সঙ্গত

হওয়া যাইত। সকামা স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করাও পাপ বলিয়া গণ্য হইত। অন্যদিকে পুরুষেরাও অবাধে সম্ভোগ তৃষ্ণা চরিতার্থ করিয়া ফিরিত। এতবড় যে ছিলেন জমদগ্নি, তাঁহার পত্নী রেণুকাকেও অন্য কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইতে হইয়াছিল। যদিও সেখানে শাসন দণ্ডের তাণ্ডব লীলায় তৎপুত্র পরশুরামকে মাতৃহত্যার পাতকে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, তবু একবিংশৎবার নিঃক্ষত্রিয় করার ফলে সেই পরশুরামের পরশুই পরবর্ত্তী কালে মৃত ভর্ত্তৃকাদিগের পুরুষান্তর গ্রহণের কারণ হয়। জনপদ ধ্বংসী বিপ্লবে সমাজ আবার নব ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া উঠে। তখন পুরাতন সমাজ বিধানের প্রতি লক্ষ্য বড় থাকে না, যেরূপে আশু লোকোৎপত্তি হইয়া ধ্বংশ স্থান পূর্ণ করিয়া তোলে তৎপ্রতিই সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি পতিত হয়। যুগে যুগেই ইহা প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে।

মহাভারতে শাপগ্রস্ত পাণ্ডু পত্নীকে অপত্যোৎপাদন প্রবৃত্তি দিতেগিয়া বলিয়াছেন "পূর্ব্ব কালে স্ত্রীগণ অবারিতা ছিল। তখন তাহারা স্বতন্ত্রা অর্থাৎ ভর্ত্রাদির অনিবার্য্যা হইয়া সাস্তাপ সুখাভিলাষে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত"। শ্বেতকেতু-উদ্দালক সংবাদেও উহা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ ঋষি যুগের সময়ই দুইবরে পৃথিবীতে অত্যধিক লোক ক্ষয় কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। একবারের নায়ক পরশুরাম, অন্যবারের নায়ক কুরু-পাণ্ডব। ঐ দুইবারই বিবাহ রূপ সৃষ্ট প্রথার রূপান্তর সাধন করিতে হইয়াছে। মহাভারতকার কাব্যকলার ভিতর দিয়া তাৎকালীক যে সমাজ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তৎসাহায্যেই উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। দ্বাদশ প্রকার পুত্রের প্রথাও মহাভারতে উল্লেখ আছে।

ঋষি যুগের পর ব্রাহ্মণ যুগ। ঋষি বচনের তখন খুব আদর। উহাই স্মৃতিনামে অভিহিত হইল। স্মৃতি শাস্ত্রের নাগ পাশে সমাজকে বাঁধিয়া ফেলা হইল। চলিতে, বলিতে, খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে তখন স্মৃতির উপদেশ ছাড়া সমাজের গত্যন্তর নাই। ঋষি যুগে ব্রাহ্ম, আর্য্য প্রাজাপত্য, দৈব, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ,—বিবাহের এই অষ্ট বিধ ক্রম নির্দেশ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ যুগে অন্যগুলি উঠাইয়া দিয়া ব্রাহ্ম অর্থাৎ শুল্ক হীন ও আসুর অর্থাৎ শুল্ক যুক্ত বিবাহের আদর আরম্ভ হইল, এতাবৎকাল প্রায় অধিকাংশ স্থলে তাহাই চলিতেছে।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক প্রাচীন যৌন সম্বন্ধের কথা বিবৃত করিতে গিয়া স্ত্রী পুরুষের পশু পক্ষীর ন্যায় অবাধ মিলনের ইঙ্গিত করিয়াছেন প্রধানতঃ ওসিয়ানিয়া মলয়াসিয়া দেশ নিগ্রো ও মঙ্গলো জাতির দিক দিয়া আলোচনা চালিলেও সমগ্র য়ুরোপের আদিম চিত্র উহাতে প্রতি ফলিত হইয়াছে। অদ্যাপিও স্ত্রী স্বাধীনতার দিক দিয়া সেই সেই দেশ বাসিরা নিগূঢ় সন্তানোৎপাদনের সমর্থন করিতেছে। কোরাণ বহু বিবাহ ও পুরুষান্তর গ্রহণের আদি হইতেই পক্ষপাতী। বাইবেল প্রথমে না হউক পরের সংস্করণে বহু বিবাহের প্রশ্রয় দিয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্ম ও মুশলমান ধর্ম্মপ্রচারে লোকক্ষয়ই যে ইহার কারণ নহে, তাহা কিসে মনে করা যাইতে পারে? স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন আর বহু বিবাহ উভয়ই জনতা বৃদ্ধির অনুকূল। প্রত্যেক বিপ্লবের পর সমাজ ঐ দুইটিকে যে প্রকারেই হউক আশ্রয় করে। বিগত মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জর্ম্মনী প্রভৃতি দেশে জনন সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে যে বিবাহের রূপান্তর কল্পনা চাহিয়াছিল তাহাও আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের অনুকূল।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

---

## পতঙ্গ ও মশক।

(১)

পতঙ্গ কবির মত সৌন্দর্য্যে আকুল!
রূপের সাগর মাঝে ডুবে যেতে চায়!
আগুনে পুড়িয়া মরে, ভাঙেনা তো ভুল!
তাহাদের তবু তাহে বিরতি কোথায়?
শোভায় মেটে না ক্ষুধা তবু তা'রে চায়!
নিয়ত ব্যাকুল রূপ-সুধার ক্ষুধায়!

(২)

মশক বিষয়ী বড়, কত সূক্ষ্ম জ্ঞান!
সুষমা চাহেনা, সদা স্বার্থ চিন্তা তার;
তোষামুদে গানে আগে হরে মনঃ প্রাণ,
হুলটি ফুটালে ভয়ে কাঁপি বার বার!
চোষে রক্ত, বোঝে রূপ অসার অসার!
রক্ষা কর, ভগবান্! বড় অত্যাচার!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

# স্মৃতির আরতি।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

শোক-সন্তপ্ত চিত্তে আজ বাল্যের শিক্ষা গুরু, উমেশ পণ্ডিত মহাশয়ের কথা বলিব। গত ৯ আষাঢ় রাত্রি আট ঘটিকার সময় সন্ন্যাস রোগে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৫ হইতে ৮০র মধ্যে।

সে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা—নসিরাবাদ এণ্টেন্স স্কুল স্থাপিত হইলে তিনি সেই স্কুলের হেড্ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। আমরা সেই স্কুলে তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলাম। পণ্ডিত মহাশয় ছেলে দিগকে আদর করিয়া "বাবা" বলিয়া ডাকিতেন। এই দুরন্ত বাবার দল সময় সময় তাঁহার এত অনিষ্ট করিত যে তাহা অকথ্য।

স্কুলটী নদীর পাড়ে অবস্থিত ছিল; পণ্ডিত মহাশয়ের বাসাও স্কুলের সম্মুখের সড়কের অপর ধারে ছিল; সুতরাং ছেলেদের সারা দ্বিপ্রহরের অত্যাচার গুরু-পত্নীকে অস্থির করিয়া তুলিত। স্কুলের জলের ঘর পৃথক থাকিলেও আমরা তাহাতে যাইয়া জল পান করিতে পারিতাম না; জলের ঘরের কলসি প্রায় প্রতি দিন ভাঙ্গিয়া যাইত। শেষ ইহার জন্য বেত্র দণ্ডের ব্যবস্থা হইলে ছেলেরা পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে যাইয়া জল পানের ব্যবস্থা করিল।

যাঁহারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করেন, অত্যাচারের পরিমাণ তাঁহাদের উপর গুরুতর হয়। গুরুপত্নীকে শুধু যে ছেলেদের জল যোগাইতেই হইত তাহা নহে, হুকা কলকি এবং তামাক টিকারও ব্যবস্থা করিতে হইত!

সে কালে অনেক ধাড়ী ছেলে তামাক টানিত এক দিন একটা ছেলে তামাক টানিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের চালা খানাতে আগুণ ধরাইয়া দিল। স্কুলের সময় ঘটনা ঘটিয়াছিল সুতরাং বিপদ বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না। অপরাধীর পৃষ্ঠে বেত্র বর্ষিত হইল। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণ শেষ বয়সে পুত্র কন্যা জামাতার শোকে পাষাণ হইয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু যৌবনে সেরূপ ছিল না। তাঁহার প্রাণ মানুষের অন্যায় আব্দারেও গলিয়া যাইত; ছেলেদের কান্নাতো তিনি দেখিতেই পারিতেন না। অপরাধীর পৃষ্ঠে যখন বেত্র পড়িল, তাহার উচ্চ চীৎকারে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণ গলিয়া গেল, তিনি দৌড়িয়া গিয়া ছেলেটাকে রক্ষা করিলেন এবং পুত্রশোকাতুর পিতার ন্যায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ইহার পর ছেলেরা জল খাইতে বিদায় চাহিলেই পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন "বাবা একটু নুয়াইয়া' জলটা খাইও, গরীব পণ্ডিতেরো ঘরটা বাঁচিবে, তোমাদের ও পিঠটা ......।"

এই সময় ময়মনসিংহের লুপ্তকীর্ত্তি "ভারত মিহির" বাঙ্গালার একখানা শ্রেষ্ঠ পত্রিকা রূপে ময়মনসিংহ হইতে পরিচালিত হইত। "ভারত মিহিরের" স্বত্যাধিকারী স্বর্গীয় কালীনারায়ণ সান্যাল মহাশয় গুণীর গুণ বুঝিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিত্য তাঁহার নিকট সাদরে অভিনন্দিত হইল; তিনি তাহা কর্ম্মোপযোগী করিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কালীনারায়ণ বাবুর সাহায্যে পণ্ডিত মহাশয় শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার অনুদীত 'বিষ্ণুপুরাণ' মাত্র আমাদিগের নিকট আছে; পুরাণ গ্রন্থাবলী ব্যতীত এই সময় তিনি 'ব্যাকরণ মঞ্জুষা', 'বাচ্যান্তর দীপিকা', 'কবিতা কৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থও বাহির করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ মঞ্জুষা আমরা স্কুলে পড়িতাম, কবিতা কৌমুদীর একটী কবিতার কথা আর একদিন উল্লেখ করিয়াছি।

পণ্ডিত মহাশয়ের জীবন দারিদ্র্যের কঠোর নিপেষণের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার প্রাথমিক যৌবনের জীবন সংগ্রাম সম্বন্ধে যাহা একদিন বলিয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি পৌত্তলিক হিন্দুর পুত্র। পিতা মাতা বাল্যেই আমাকে বিবাহ করাইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের কুসংস্কারপূর্ণ রীতি পদ্ধতি গুলি সময় সময় এতই আমার প্রাণে আঘাত করিত যে তাহা দমন করিয়া রাখা আমার পক্ষে কঠিন হইত। ফলে আমি একদিন বাড়ী হইতে যশোহর যাইবার পথে সঙ্গী সতীর্থদিগের সহিত জেদ করিয়া আবদ্ধ সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিলাম—আমি মুসলমান মাঝির অন্ন গ্রহণ করিলাম।... কলিকাতায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া শেষ এক দিন নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শরণ লইলাম। তখন রবীন্দ্রনাথ,

হেমেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বালক। আমি ইংরাজী জানিনা, সংস্কৃত বিদ্যা ছিল নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিকের। ঠাকুর বাড়ীর বালক বালিকাদিগকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়াইতাম।...... কলিকাতায় কিছুদিন পুলিশের চাকুরীও করিয়াছিলাম।... কলিকাতায় যখন এইরূপ মনের মত চাকুরীর অভাবে আজ এটা, কাল সেটা লইয়া ঘুরিতেছিলাম তখন গোলকপুরের পরলোকগত রাজা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমাকে প্রীতির সহিতই গ্রহণ করেন এবং আমাকে সপরিবারে ময়মনসিংহ লইয়া আইসেন।...দুঃখ যাহার সহিত চির সখ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল তেমন সখার সাহচর্য্য হইতে মুক্তির আশা দুরাশা! আমার ভাগ্যে তাহাই হইল, রাজ সরকারে আশ্রয় পাইলাম না। তখন চন্দ্রকিশোর আমাকে আশ্রয় দিল। তাহার নূতন স্কুলে হেড্ পণ্ডিত বহাল হইলাম। নসিরাবাদ আমার স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।"

এই স্কুলেই আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের ছাত্র ছিলাম। এই স্কুলটা যখন আগুনে পুড়িয়া লুপ্ত হইয়া যায়, তখন ইহার অভাব পুরণ জন্য মহাত্মা আনন্দমোহন বসু ময়মনসিংহ ইনিষ্টিটিউসন স্থাপন করেন ইনিষ্টিটিউসনের কর্ত্তৃপক্ষও পণ্ডিত মহাশয়কে হেড্ পণ্ডিত রূপে স্কুলে গ্রহণ করিয়াছিলেন।....

পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণটী ছিল জমাট বরফের মত, একটু আঘাত পাইলে বা উত্তাপ পাইলেই গলিয়া পড়িত। ছেলেদের জন্য তাঁহার প্রাণ যে কিরূপ কাঁদিত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ফলে ছেলেরাও আপন বাপ খুড়ার অপেক্ষা তাঁহার নিকট অধিক আব্দার করিত। যেমন অধিক আব্দার করিত, তেমনি অধিক সম্মানও করিত। আজ খেলার ছুটী চাই, ধর পণ্ডিত মহাশয়কে। একটী ছেলের থাকিবার স্থান নাই, চল যাই পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট। অংকের আটআনা জরিমানা, আন পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধ পত্র। যদু বেতন দিতে পারে না, দরিদ্র, চল পণ্ডিত মহাশয়কে নিয়া হেড্ মাষ্টারের বাসায় যাই। ব্যাপার ঠিক এইরূপ ছিল। পণ্ডিত মহাশয়েরও আপত্তি নাই। এইরূপ পণ্ডিত মহাশয় যে কেবল নিজ স্কুলের ছেলের প্রিয়পাত্র ও উপকারী বন্ধু ছিলেন,—তাহা নয়; তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন; অন্নহীনের অন্নদাতা ছিলেন। ১৮৲ টাকার দরিদ্র পণ্ডিত হইয়াও অন্তঃকরণের হিসাবে তিনি দাতার অগ্রগণ্য ছিলেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের একটী দোষ— এবং সেই দোষ তাঁহার প্রধান দোষ রূপে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল। তিনি নিজের সিদ্ধান্তে ত্রুটী দেখিতেন না। নিজের মতের সহিত মত না মিলিলেই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। নিজ মত রক্ষাকে আত্ম মর্য্যাদা রক্ষার প্রধান উপায় মনে করিতেন।

হটাৎ এক দিন ইনিষ্টিটিউসনের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত অতি সাধারণ একটী কথা লইয়া মত ভেদ হওয়ায় ক্রোধ ভরে চীৎকার করিয়া তিনি স্কুল ত্যাগ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দেড় শত ছাত্র বাহির হইয়া আসিল। ময়মনসিংহে আর একটী নূতন স্কুল স্থাপিত হইয়া গেল।

কয়েক বৎসর পরে এই নূতন স্কুলটিও কিনিয়া লইয়া ইনষ্টিটিউসনের কর্ত্তৃপক্ষ এই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই নূতন স্কুলটী উঠিয়া গেলে আমাদের সহিতও পণ্ডিত মহাশয়ের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ আপাততঃ লুপ্ত হইয়া যায়।

১২৯৩ সালে আমরা কতিপয় যুবক মিলিত হইয়া 'কুমার' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলাম। এই পত্রিকায় লিখিবার জন্য একদিন পণ্ডিত মহাশয়কে ধরিয়াছিলাম। তখন পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন—তিনি মোক্তারী পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইতেছেন। ইহার পর এখানে তিনি মোক্তার হন, আমরাও কেরাণী হই। পুনরায় কার্য্য কর্ম্মে পুরাতন সম্পর্ক নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে।

মোক্তারী করিতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয় যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই অর্থে তিনি তাঁহার জীবনের এক মাত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা জানি—তিনি কোন মাসেই ৪।৫ শত টাকার কম পাইতেন না। সেই অর্থ তিনি আর্য্য সাহিত্যের আলোচনায় ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ "সারস্বত গেহম্" সকাল বিকাল বেদ ধ্বনিতে মুখরিত হইতে লাগিল।

পণ্ডিত মহাশয়ের পরিবারে বহু লোক ছিল। ৭।৮ টী ছেলে মেয়ে ব্যতীত ২।৪টী নিরাশ্রয় ছেলে মেয়েকেও তাঁহার নিয়ত প্রতিপালন করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত দরিদ্রের

প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অসাধারণ ছিল। আট আনা পাইলে যে সন্তুষ্ট, টাকাটী ভাঙ্গাইবার গোলমালে চিন্তা ও সময় বৃথা নষ্ট হইবে দেখিয়া তাহাকে টাকাটিই দিয়া বিদায় করিয়াছেন; এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দিনই দেখিয়াছি। ইহাও আবার তাঁহার নিজ মুখ হইতে অনেক দিন শুনিয়াছি, "আজ হাতে পয়সা নাই, তাই বাজারের জিনিস আনিতে পারে নাই।"

পণ্ডিত মহাশয় উপার্জ্জনের নগদ পয়সা দিয়া পোষ্টাফিসের দেনা শোধ করিতেন। প্রতি মাসে বহু টাকার পুস্তক ভিঃ পিঃ পার্শ্বেলে তাঁহার নামে আসিয়া ডাকঘরে মজুত হইত। তখনকার বাঙ্গলা পত্রিকাও প্রায় সমুদায়ই তাঁহার নিকট আসিত। সুতরাং বাজে ব্যয় ও অন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় হাওলাত-বরাত ও ধার-করজে চলিত। এইরূপ করিয়াই পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার উপার্জ্জন-বহুল জীবনকেও অতি কষ্টের ভিতর দিয়া আনিয়া পবিত্র সারস্বত জীবনে পরিণত করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহের দানশীলা ভূম্যধিকারিণী স্বর্গীয়া বিদ্যাময়ী দেবী একবার তাঁহার মুক্তাগাছার বাড়ীতে মহাভারত পাঠ করাইয়া ছিলেন। সেই উপলক্ষে রাজধানীতে দ্রাবিড় মহারাষ্ট্র উৎকল বারাণসী প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের বেদবিদ পণ্ডিতাগ্রগণ্যগণ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই সমাগত বুধ মণ্ডলীর সহিত বেদ বিচার জন্য পণ্ডিত মহাশয় যাইতে উদ্‌যোগী হইয়া তাঁহার কতিপয় অকৃতি শিষ্যকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। গোলামির নাগ পাস ছিন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া সে দিন তাঁহার অনুগমন করিতে পারিনাই। পরদিন প্রত্যুষে তাঁহার বাসায় যাইয়া শুনিলাম—তাঁহার সহিত পণ্ডিতগণ বেদের বিচার করিতে অনুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই; বরং তাঁহাকে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন বেদ বিদ্বেষী বলিয়া অভিহিত করিয়া দিয়াছেন। তাহার কারণ, পণ্ডিত মহাশয়ের পায়ে ছিল বুট জুতা, আর তাঁর বেদ বেদান্তের গ্রন্থগুলি—যাহা তিনি দুটা ঘোড়ার গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন—ছিল সব গুলি চামড়ায় বাধাই!

ইহার পর দিন সন্ধ্যার সময় পণ্ডিত মহাশয় সংবাদ পাঠাইলেন—সন্ধ্যার পরেই আমার বাসায় বেদের বিচার হইবে, অবশ্য অবশ্য আসিও।

সংবাদ পাইয়াই কবি মনোমোহন সেনকে সঙ্গে লইয়া "সারস্বত গেহমে" চলিয়া গেলাম। যাইয়া দেখিলাম—সেখানে পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রভৃতি আরো বহু লোক উপস্থিত। শুনিলাম—সেদিন যাঁহারা পণ্ডিত মহাশয়কে ম্লেচ্ছ বলিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন, সেই কাশি-কাঞ্চি কলিঙ্গ-বিদর্ভের পণ্ডিতেরাই আজ মুক্তাগাছা হইতে আসিয়া রেল ধরিতে না পারিয়া নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এই সারস্বত গেহমে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় অতিথির জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া করযুড়ে দণ্ডায়মান।

পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত বিচার বিতর্ক হইল। তাঁহারা তাঁহার বেদ অধ্যয়ন গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন; পরন্তু বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থকে চামড়া দিয়া মোড়াইয়া অস্নাত স্পর্শও ব্যবহার যে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তাহাও বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। এই মন্তব্যের উপর পুনরায় তর্ক উপস্থিত হইল। পণ্ডিত মহাশয় শত শত বেদ সূক্তের উল্লেখ দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন, এই জ্ঞান ভ্রান্ত। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা নিস্ফল হইল; পণ্ডিতেরা তাঁহাকে জয়পত্র দিয়াও তাঁহাদের সেই সংস্কারটী যে কুসংস্কার, তাহা কিছুতেই স্বীকার করিলেন না।

'বাসনা' পত্রিকা বাহির করিবার জন্য অগ্রসর হইলে ব্যাকরণের বিচার আবশ্যক হইয়াছিল। স্বর্গীয় কবি ও চিত্রকর রজনী চৌধুরী মহাশয় 'বাসনার' ব্লক কাটিতে গিয়া দণ্ড ন কে ণত্ব ণ করিয়া ফেলিলেন। ব্লকটী কিন্তু বড়ই সুন্দর হইল। ণত্ব ষত্ব বিবর্জ্জিতের দল 'চুণের জন্য দুর্গোৎসব পণ্ড' করিবার পক্ষপাতী হইলাম না; ব্লক ও কাপি প্রেসে দিয়া প্রথম সংখ্যা ছাপাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলাম। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের প্রুফ দেখিতে যাইয়া বিভ্রাট ঘটাইয়া বসিলেন। 'বাসণা"র ণত্ব ণর মাত্রাহীন দীর্ঘ শীর্ষ তাহার চক্ষে হুল ফুটাইয়া দিল। কিছুতেই তিনি বর্ণাশুদ্ধির প্রশ্রয় দিলেন না। ইতিমধ্যে আমাদের ষত্ব ণত্বের বিচার চলিতে থাকা কালেই ভীষণ ভূমিকম্পে প্রেসবাড়ী ভূমিষাৎ হইয়া আমাদের কম্পোজ করা ষ্টেভিং ফর্ম্মা নষ্ট হইয়া গেল। বাসণার উগ্র বাসনা বিপদের ভীষণ তাড়নায় একেবারে লয় পাইয়া গেল

"আরতি" বাহির করিবার সময় পণ্ডিত মহাশয়কে সম্পাদক করিয়াছিলাম। তিনি প্রথম সংখ্যায় "বেদ অপৌরুষের নহে" এই সংস্কার বিরোধী প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদিগকে মহাবিপদে ফেলিয়াছিলেন; হিন্দু সমাজের নেতাগণ "আরতি"র বিরুদ্ধে দল সৃষ্টি করিলে আমরা অনন্যোপায় হইয়া যাইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে এইরূপ ধর্ম্ম ও সংস্কার বিরুদ্ধ প্রবন্ধ লিখিতে নিষেধ করি। পণ্ডিত মহাশয় জেদ ধরিলেন—আমাকে প্রতি সংখ্যায় এইরূপ কুসংস্কার উচ্ছেদী প্রবন্ধই লিখিতে হইবে, পত্রিকা এইরূপ নূতন মত লইয়াই সুপরিচিত ও সম্মানিত হইবে।"

নিরুপায় হইয়া আমরা কোনরূপে এক বৎসর চালাইয়া পরে সম্পাদক পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে আত্মসম্মান রক্ষার উগ্রজেদ ও নিরাশ্রয় পোষণের কোমল মনোবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই দরিদ্র পণ্ডিতটীও ঠিক সেইরূপ দৃঢ় ও কোমল—ঠিক বিপরীত দুটী বৃত্তি সমভাবে পরিচালন করিয়া চারিদিগের নিন্দা স্তুতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সুদীর্ঘ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

সম্মানের উপকরণ অর্থ ও পদ। উমেশ পণ্ডিতের যদি এ দুটীর একটীও অন্ততঃ থাকিত, জগৎ তাঁহার কার্য্যাবলী আজ অন্য রকমে দেখিত।

প্রতি মাসে গড়ে পাঁচশত টাকা উপার্জ্জন করিয়াও ময়মনসিংহ ত্যাগের সময় তাঁহাকে ঋণ পরিশোধের জন্য যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া একেবারে রিক্তহস্তে যা তে হইয়াছিল।

পণ্ডিত মহাশয় সকলকেই প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ফলে বিশ্বাস ঘাতকের সংখ্যা তিনি এত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, যে শেষটায় নিজকে আপনার নিতান্ত বিশ্বস্ত জনের হাতেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় একদিন উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—"বাবা, আমার ভগবানতো কোনদিনই নাই; তোমাদের ভগবান যদি থাকেন, তাঁহার যদি বিচার ক্ষমতা থাকে, তিনি বিশ্বাস ঘাতকের বিচার অবশ্যই করিবেন"

গত পূজার পূর্ব্বে তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। এই তাঁহার ময়মনসিংহে শেষ পদার্পণ। তিনি যখন শুনিয়াছিলেন তাঁহার সেই বিশ্বস্ত অনুচর উন্মাদ হইয়াছে, তখন তিনি চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি তখন ভিক্ষার্থী। আপন শিষ্যদিগের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এই অবস্থায়ও তিনি বলিয়াছিলেন "আমার যদি এখন হাতে কিছু থাকিত, সেই হতভাগাকে কিছু সাহায্য করিতাম।"

মাইকেল, হেমচন্দ্র যে ভাবে গিয়াছেন - প্রিয় কবি গোবিন্দদাসের দুর্ব্বহ জীবন যে ভাবে গিয়াছে উমেশ পণ্ডিত সেই ভাবেই গিয়াছেন। কিন্তু জীবনের অপরাহ্নে ইঁহার উপর যে গুরুতর আঘাত আসিয়াছিল, অতি অল্প লোকের অদৃষ্টেই এরূপ শোচনীয় পরিহাস দেখা যায়। এ গুলিও নিতান্ত অচিন্তনীয় ব্যাপার নয়।

অচিন্তনীয় বলিয়া মনে করি আমরা তাঁহার বেদ বিদ্যায় পারদর্শিতাকে। আমরা যখনই ভাবি, তখনই আশ্চর্য্যান্বিত হই যে কি করিয়া একটা নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পাস অতি সাধারণ পণ্ডিত, গুরু ব্যতিরেকে, কেবল মাত্র নিজ একাগ্র চেষ্টার ফলে, বেদ বেদান্তের জটিল তত্ত্ব এইরূপ সহজে আয়ত্ত করিয়া একজন দিগ্বিজয়ী বেদবিদ পণ্ডিত বলিয়া ইয়ুরোপীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের নিকটও পরিচিত হইয়াছিলেন। শ্রী—

---

## সমালোচনা।

**আর্ট ও সাহিত্য**—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ১৲

বর্ত্তমান সময় অসংযত গল্প-উপন্যাসের প্রচার বাহুল্য দেখিয়া সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই আতঙ্কিত হইয়াছেন. শক্তিশালী যুগ প্রবর্ত্তক ও সংস্কারক লেখকের প্রভাবেই সমাজে চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে। সমাজে কুসাহিত্য সৃষ্টি হইলে সেই সমাজের লোক অধিক পরিমাণে কুচিন্তা করিবে, ইহা অচিন্তনীয় বিষয় নহে। শিক্ষিত বাঙ্গালার ষোলআনা চিন্তা, যদি কুসাহিত্য প্রচারের মিসনে ব্যাপৃত হয়, তবে তাহার ফলে বাঙ্গালার সমাজ কিরূপ ধারায় পরিবর্ত্তিত হইবে—সুখের বিষয় এমনও অনেক লোকেই তাহা ভাবিয়া থাকেন। এই ভাবনার কথা, চিন্তার কথাই "আর্ট ও সাহিত্যে" যেন মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

গ্রন্থকার প্রথমে অতি নিপুনতার সহিত আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আর্টের কেন্দ্রে ভগবানকে স্থাপন করিয়া ও স্বাভাবিকতায় আর্টের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আর্টকে অতি উচ্চ স্তরে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার নিম্নলিখিত কথাগুলি আমরা বর্ত্তমান গল্প উপান্যাস লেখক দিগের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় বলিয়া মনে করি।

"যে আর্টের ফলে আমাদের আত্মা জীবনলাভ করিতে পারে তাহাকেই আমরা প্রকৃত আর্ট বলিব। ভেংচিকাটা আর্ট অথবা শ্লীলতার বা স্বাভাবিকতার মুলচ্ছেদক আর্টকেও পারিভাষিক ভাবে আর্ট বলবার অধিকার থাকিবে না এমন কোন কথা নাই। কিন্তু সেই আর্ট মানুষকে নীচের দিকে—অধোগতির পথে লইয়া যায় বলিয়া তাহাকে প্রকৃত আর্ট বলা যায় না।"

গ্রন্থকার অতি নিপুনতার সহিত সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবি সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিরও কোন কোন গ্রন্থের ক্রটী প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের অসংযত ভাব কি প্রকারে বঙ্গ সাহিত্যের ধারা বদলাইয়া দিয়াছে, তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন। পরিশেষে গ্রন্থকার মহাশয় অতি দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন :—

"আমরা যতই এ বিষয়ে আলোচনা করি ততই দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ি যে বঙ্কিম বাবুর মত সুক্ষ্মদর্শী লেখক ও "বন্দেমাতরং" গানের রচয়িতাও তাঁহার সুনীল আকাশের ন্যায় সুনির্ম্মল দেবী চৌধুরাণীর অনুরূপ আরও অনেক উপন্যাস লিখিবার পরিবর্ত্তে পঙ্কিল ডোবা হইতে বিষবৃক্ষ সংগ্রহ করিবার জন্য পঙ্কে ঝাঁপ দিলেন! হায় হায়!! যে রবীন্দ্র নাথের দেশহিতৈষণা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শান্তি নিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই রবীন্দ্র নাথও রাজর্ষির ন্যায় ধূপ ধূনার মঙ্গল গন্ধবাহী উপন্যাস না লিখিয়া "নষ্টনীড়" চোখের বালি (ঘরে বাইরে না কেন?) প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন!! ...

শক্তিশালী নবোদিত সুলেখক সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া "চরিত্রহীন" প্রভৃতির মধ্যেই মনস্তত্ত্ব আবিষ্কারে সমস্ত আত্ম শ্রীশক্তি প্রয়োগ করিলেন। গৃহে শ্রী আনিবার পরিবর্ত্তে "গৃহদাহ" করিবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন!!"

পুস্তকখানি বেশ উপাদেয় এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। আমরা আশা করি বঙ্গের সুধীবৃন্দ এ গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর করিবেন এবং নবীন লেখকেরা এই পুস্তকের উপদেশ অনুসরণ করিয়া সমাজ বিপ্লব হইতে দেশকে রক্ষা করিবেন। গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয়। ভূমিকাটিও বেশ মনোজ্ঞ এবং উপদেশ প্রদ হইয়াছে।

**প্রাচীন শিল্প পরিচয়**—শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ। কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই কৃত ভূমিকা সংযুক্ত, রাজসাহী হইতে শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য সাধারণ সং ২৲, রাজ সং ২॥০

এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই পূর্ব্বে বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই সময়ই লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ গ্রন্থকার বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, দর্শন, তন্ত্র, নাটক প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে যে শিল্প সম্ভারের পরিচয় পাওয়া যায়, বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাহাই অতি নিপুনতার সহিত এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার পক্ষে ইহা একখানা অমূল্য সাহায্য পুস্তক এবং বঙ্গ সাহিত্যের একখানা বিশিষ্ট সম্পদ। বঙ্গীয় পাঠক সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ উত্তম।

**আপ্তবাক্য প্রবোধিনী ১ম খণ্ড**—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন প্রণীত। মূল্য একটাকা মাত্র।

ময়মনসিংহ ধর্ম্ম সভার আচার্য্য ও দর্শন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় বেদান্ত দর্শনের মূল সূত্রের এই টীকাখানা বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও বেদান্তের বহুভাষ্যটীকা বর্ত্তমান আছে, তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ। বেদান্তরত্ন মহাশয়ের এই টীকা প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হওয়ায় পাঠার্থী মাত্রেরই পক্ষে সহজে এই দুরূহ বিষয় অবগত হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বঃ

# স্নেহের দান।

( ১০ )

ষ্টেট সম্বন্ধে ম্যানেজারের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া মণি পুনরায় জীবাশ্রমে নিয়মিতরূপে যোগদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাতে যায়, দ্বিপ্রহরে আসে; আবার বিকালে যায়; রাত্রে কোন দিন আসে, কোন দিন আসে না। সেখানে দীনানন্দের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা শুনে এবং পরম ভক্তরূপে প্রতিকার্য্যে ও চিন্তায় তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে। সে এখন দীনানন্দ স্বামীর অনুগত শিষ্য।

সে দিন মণির সঙ্গে ছিল তাহার আত্মীয় রমেশ। রমেশ মণির মার নিকট হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইয়া ঢাকা কলেজে এম, এ পড়িতেছিল।

মণি রমেশকে লইয়া গুরুর নিকট আসিয়া বসিলে গুরু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মণির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বৎস এই জগৎকে যে সৃষ্টিকর্ত্তা জীবের ভোগের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।"

মণি বলিল—"আপনি প্রাশ্চাত্য মত বলিতেছেন; ত্যাগ প্রধান প্রাচ্যে এ মত খুব সম্মানিত নহে। ভারতবর্ষের মত, সুখ-ভোগে নহে, সুখ—ত্যাগে; সুখ—আত্ম প্রতিষ্ঠায় নহে, সুখ—আত্ম বিসর্জ্জনে—"

দীনানন্দ—"এই জন্যই আমরা পরাধীন! যে জীব ঐহিক সুখকে তুচ্ছ করে, সংসারটা কিছু না বলিয়া যে জাতিকে শিশুকাল হইতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা দমিত রাখিবার শিক্ষা দেওয়া হয়, সে জাতির ইহকালের বর্ত্তমান তো নাই-ই, ভবিষ্যৎ ও সে জাতির গড়িয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং এই কর্ম্ম ও ভোগের জগতে সেই ত্যাগী ও জ্ঞানীর স্থান নিতান্ত নিম্নে; নাই বলিলেই হয়।"

মণি—"তবে আপনি নিজে সংসার ত্যাগ করিলেন কেন?"

দীনানন্দ—"ত্যাগ করি নাই; ভোগ দ্বারা ত্যাগকে গঠন করিব বলিয়া আপাততঃ যতখানি ত্যাগের প্রয়োজন, তাহাই করিয়াছি। এখন ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সাধন করিয়া ধ্যান-জ্ঞান-ময় প্রাচ্য সাধনা অপেক্ষা ভোগ কর্ম্ম রূপী প্রাশ্চাত্য জীবনের ধারাই যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রচার করিতে চেষ্টা করিব। ইহাই দ্বন্দ্ব মীমাংসার শ্রেষ্ঠ উপায়; ধর্ম্ম ও শক্তি প্রতিষ্ঠার মূল উপাদান।"

রমেশের নিকট কথাটা ভাল লাগিল না; সে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, মণির ইঙ্গিতে থামিয়া গেল।

মণি বলিল—"অনেক মহাপুরুষের জীবনইতো ত্যাগের মাহাত্ম্যে গরীয়ান; তাঁহারা ভোগের স্পৃহায় বিতশ্রদ্ধ ছিলেন কেন?"

দীনানন্দ—"ধর্ম্ম দর্শন তর্কের ব্যাপার; ন্যায়ের জটিল কুহেলিকায় তাহার সত্য মীমাংসার পথ রুদ্ধ। জগতের মনুষ্য বুদ্ধিও বিচিত্র। মহাপুরুষদের মধ্যে মতভেদও বিচিত্র এবং পদে পদে; সুতরাং কোন্ পন্থা যে ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পন্থা, তাহার মীমাংসা এ পর্য্যন্ততো হয়ই নাই, হইবে ও যে কখন তাহারও সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজন যেন গতঃসঃ পন্থা।":—এই বাণী আলস্যপরতন্ত্র ভারতবাসীকে আরো জড় প্রকৃতির করিয়া ফেলিয়াছে; কর্ম্মশূন্য ও চিন্তাশূন্য করিয়া আরও গতানুগতিক ও নিশ্চেষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।"

মণি—"ধর্ম্ম সাধনের জন্য তবে কোন পন্থা অবলম্বন করার উপদেশ হয়? ত্যাগী হইয়া, না ভোগী হইয়া; গার্হাস্থ্য ধর্ম্মরক্ষা করিয়া, না সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া?"

দীনানন্দ—"জটিল প্রশ্ন! বড়ই জটিল, কিন্তু সহজে বুঝিতে চেষ্টা করিলে মীমাংসা সরল। সকল ত্যাগ করিয়া যিনি কেবল ধর্ম্ম চান, তিনি, স্রষ্টার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে চান। সৃষ্ট জীবের উদ্দেশ্য ত্যাগ হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং ভোগের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম সাধনই সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। আমি তোমাকে তাহাই করিতে উপদেশ দিতেছি। দীক্ষা লইয়া তুমি তাহাই কর।"

রমেশ যতদূর সম্ভব বিনীতভাবে বলিল—"ধর্ম্ম জিনিসটার আপনি কি ব্যাখ্যা দেন, আপনার মতে ধর্ম্ম কি?"

দীনানন্দ উত্তর করিলেন—"অত বড় কথার আলোচনা এখন অনাবশ্যক, যখন প্রয়োজন হইবে, তাহ বুঝিবার তোমার অধিকার জন্মিবে, তখন আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে। অধিকারী ভেদ প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই নির্দ্দিষ্ট

আছে। সাধারণতঃ গুরুর উপদেশ পালনই ধর্ম্ম, ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিয়া চলাই ধর্ম্ম পথে চলা। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, কল্পনার আশ্রয় ব্যতীত আর কিছুই নহে; অনেক স্থলেই এরূপ তর্কে ভগবানের অস্তিত্বও লয় পাইয়া যায়।"

রমেশের নিকট এই ব্যাখ্যাও ভাল ঠেকিতে ছিল না; বিশেষ দীনানন্দ তাহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ না জানিয়াই যে তাহাকে অনধিকারী সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে তাহার উচ্চ অভিমানে একটু আঘাত লাগায় সে আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মণি বলিল—"তবে কি বড় বড় মুনি ঋষিদের ধর্ম্ম ব্যাখ্যার কোন মূল্যই নাই ?"

দীনানন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"পর্ব্বতোবহ্নিমান্ ধূমাৎ—" এই যে ধূমের অস্তিত্ব হইতে অগ্নির অস্তিত্ব প্রমাণিত সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে—সকল মানবই কি এই উক্তিকে এক বাক্যে স্বীকার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিবে? যদি করিত, তবে বিভিন্ন মতের এত বাহুল্য দেখা যাইত না। ঠাণ্ডা জল হইতেও ধূম নির্গত হয়, সাক্ষাৎভাবে অগ্নির অস্তিত্বই কি তাহার কারণ? একটী গল্প মনে হইল। একটী বালককে পণ্ডিত মহাশয় বেত্রাঘাত করাতে বালকটীর কাপড় নষ্ট হইয়া যায়। বালকের পিতা লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে বলিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে আক্রমণ করায় পণ্ডিত দর্শন শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন—

ইদং কাষ্ঠং হরিতকী—রেচকত্বাৎ।

অর্থাৎ বালকের যে কাপড় নষ্ট হইয়াছে তাহা গুরুতর প্রহার জন্য নহে, পরন্তু প্রহারের যন্ত্রটী রেচকত্ব গুণ বিশিষ্ট হরিতকী কাষ্ঠের শাখা বলিয়া। আমাদের সমস্ত ধর্ম্ম দর্শনের ব্যাখ্যাই এইরূপ কল্পনা প্রসূত। এই কারণে আমাদের জাতটাও কল্পনা প্রিয় বেশী। প্রত্যক্ষের দিকে না যাইয়া কেবলি কল্পনা লইয়া জল্পনা করিয়া মরে।"

মণি—"যাহা প্রত্যক্ষ করিব না, তাহাই কি বিশ্বাস করিব না? তবে ভগবানকে বিশ্বাস করিব কি প্রকারে?

দীনানন্দ—"সেও বৎস ধর্ম্মেরই ন্যায় জটিল প্রশ্ন। সৃষ্টি দেখিয়া যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে হয়, তাহাতে ও তার্কিকের তর্কের বহু অবকাশ থাকে। এইজন্যই, খৃষ্টানেরা যিশুকে, মুসলমানেরা মহম্মদকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন; এবং হিন্দুরা গুরুবাদ স্বীকার করেন। গুরুই প্রত্যক্ষ ভগবান—তাঁহার উপদেশ ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ। দীক্ষা লইয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলেই, সে জ্ঞান তোমার জন্মিবে। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ছেলে জমিদার পরিবারে অসম্ভব। পূর্ব্বে রাজা জরাসন্ধ এদানিং রাজবল্লভ—তোমার সিদ্ধি আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।"

স্বামীজীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া মণি রমেশকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন বুঝিলে রমেশ দা, স্বামীজীর কথা বার্ত্তা? আমার নিকট কিন্তু বড়ই মিষ্টি বোধ হয়।"

রমেশ মণির অনুগ্রহ প্রার্থী মণির যাহা মিষ্টি লাগিয়াছে তাহা তাহার নিকট মিষ্টি লাগাই স্বাভাবিক; না লাগিলেও অন্ততঃ তাহার কথায় সায় না দিলে পাছে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় সে ভয় ভাবিয়াও রমেশ বলিল "বেশতো বলেন।"

কথাটা বলিয়াই রমেশের মনে পড়িল, তার প্রতি স্বামীজীর তাচ্ছল্য ভাবের কথা। সে—"বলিল পড়া শোনা খুব আছে বলিয়া মনে হইল না; কথা গুলি রচা কথা, এবং ভাসা ভাসা বোধ হইল।"

মণি রমেশের কথার দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল—"আমি তাঁহার নিকট মন্ত্র লইব; তুমি লইবে কি?"

রমেশ—"কুল গুরুকে ত্যাগ করিয়া মন্ত্র লইতে বাবা মত দিবেন না। বিশেষ বিবাহ না করিয়া মন্ত্র লওয়া আমাদের কুল প্রথা নহে।"

সে দিন রমেশের সঙ্গে মণি বাড়ী চলিয়া আসিল। ইহার কয়েক দিন পরেই মণি দীনানন্দের নিকট হইতে যথা রীতি মন্ত্র লইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিল।

মণির মা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—"কুল গুরু ত্যাগ করিলে মহা পাপ হয়, এমন কুকাণ্ড তুই কখনও করিস্ না।"

মণি উত্তরে বলিয়াছিল—"গুরু ঠাকুর মহাশয়—বৎসর বৎসর আসিতে কষ্ট হয় বলিয়া যখন এককালীন কয়েক বৎসরের বার্ষিক অগ্রিম লইয়া গিয়াছিলেন তখনই আমি বলিয়াছিলাম, গুরুর অদর্শনে যদি শিষ্যের মন তাহার প্রতি বিমুখ না হইবার কারণ হয় এবং অর্থই যদি গুরু শিষ্যের

মধ্যে প্রীতি রক্ষার এক মাত্র কারণ হয়, তবে তাহাই হইবে। সে হিসাবে আমার এই ত্যাগ, গুরু ত্যাগ নহে; কেন না, তাঁহার অর্থের দাবী তিনি চিরদিনই করিতে পারিবেন, আমরাও না হয় জমা খরচে তাঁহাকে গুরু বলিয়াই লিখিয়া লইব।"

মণি ইহার বেশী আর কোন তর্কে আসিল না। মাও সুতরাং আর তাহার মত ফিরাইতে পারিলেন না।

মণি মন্ত্র গ্রহণ করিলে পর একদিন স্বামীজী বলিয়াছিলেন—"বৎস, ভোগের মধ্য দিয়া যে ভগবান কে পাওয়া, তাহাই যথার্থ পাওয়া।"

উত্তরে মণি প্রশ্ন করিল—"ভগবান কে কি প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়?"

স্বামীজী—"চিন্তা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।"

মণি—"তাহা কি প্রকারে?

স্বামী—"আত্মস্থ হইয়া চিন্তা করিলে হৃদয়ে যে রসের ভাব হয়—রসো বৈ সঃ—তাহাই ভগবৎ অনুভূতি।

মণি—"আত্মস্থ কি প্রকারে হইতে হইবে?"

স্বামী—"ইহাতেও মতভেদ আছে। —বেদবিভিন্না স্মৃতয়োবিভিন্না নাসৌমুণি যস্য মতং ন ভিন্নঃ—এইরূপ। আমার মতে—কারণ গ্রহণই আত্মস্থ হইবার উৎকৃষ্ট বিধান। তোমাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।"

ইহার পর হইতে মণি মন্ত্রপুতঃ কারণ পান করিতে আরম্ভ করিল। মণি প্রথম সঙ্কোচ বোধ করিলে স্বামীজী বলিলেন—"বৎস সঙ্কোচ ভাবটা দোষ স্পর্শে কলুষিত। 'কারণ' গ্রহণ ধর্ম্মের একটি অঙ্গ; সুতরাং তুমি কদাপি মনে কলুষ ভাব স্থান দিওনা। একই পদার্থ—উদ্দেশ্য ভেদে পৃথক পৃথক ফল প্রদান করিয়া থাকে। মনের ভিতর উদ্দাম সুখের সৃষ্টিই ভগবৎ অনুভূতি। ভোগেই সে অনুভূতির তৃপ্তি। আত্মাই ভগবান। ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিয়া আত্মার উপর অত্যাচার করা, ভগবানের উপরই অত্যাচার করা।—এসকল ব্যাপার—সিদ্ধির সোপান আরম্ভ—তোমার ক্রমে হইবে।"

মণি উত্তরে বলিল—"ভগবান নিত্য, কিন্তু সুখ সম্ভোগ প্রভৃতি তো অনিত্য; অনিত্য সুখের সহিত নিত্য ভগবানের তুলনা?"

কথায় বাধাদিয়া স্বামীজী বলিলেন—"বৎস মানুষ ও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান এক পদার্থ। মানুষ যদি অনিত্য হয়, তাহার ভগবানও অনিত্য, তিনি নিত্য হইবেন কোন উপাদানে? ভগবানকে নিত্য স্বীকার করিতে হইলে সুখেরও নিত্যতা স্বীকার করিতে হইবে। সত্যং শিবং সুখং সুন্দরং—নিত্য কল্পনা করিতে চাও, নিত্যই পাইবে? অনিত্য মনে কর, অনিত্যই হইবে। এ দ্বৈতবাদ—কল্পনা জল্পনার কারসাজি মাত্র। যাহা হউক বৎস, ভগবান লইয়া কোন তর্ক উপস্থিত করা কস্মিন কালেও উচিৎ নহে। তাহা হইতে সর্ব্বদা অতি সাবধানে বিরত থাকিবা। কালে এ সমস্যা মীমাংসা—শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং—আপনা হইতেই হইয়া যাইবে।"

মণি যখন এই রূপে ক্রমে গুরুর পদে আত্ম সমর্পণ করিয়া ভগবৎ উপলব্ধির পন্থা অনুশরণ করিতে ব্যস্ত ছিল, তখন এক দিন তাহার নিকট ডহর হইতে খবর আসিল—তাহার মাতার সহিত ষ্টেটের কার্য্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ায় ম্যানেজার কার্য্যে ইস্তিফা দিয়াছেন। তিনি এখনও চলিয়া যান নাই। খুব সম্ভব তিনি ছোট হিস্যার চাকুরী গ্রহণ করিবেন; সম্প্রতি সেই খানেই আছেন।

সংবাদ শুনিয়া স্বামীজী মণিকে বলিলেন—"আমি তোমাকে সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে কখনও উপদেশ দেই নাই; তোমার এইরূপ শৈথিল্য ব্যবহারে যদি সংসার নষ্ট হয়, তবে ধর্ম্মও নষ্ট হইবে। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জনে পৌরুষ নাই। আশক্তি ও ভোগের ভিতর দিয়াই ত্যাগের মহিমা প্রচার করিতে হইবে। চল বরং রাজধানী যাইয়াই বাসকরা যাউক; জমিদারী রক্ষাও চলিবে, ধর্ম্ম সাধনও হইবে।"

মণি সানন্দে স্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মত হইল। পর দিনই শিষ্য ও শিষ্যাগণ সহ স্বামীজীর আসন জমিদার বাড়ীর মধ্যখণ্ডে স্থাপিত হইল। স্বামীজী যুগপৎ জমিদারী শাসন ও সাধন ভজন সমন্বয়ে মনোযোগী হইয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

# আলোচনা।

## চণ্ডীর দেবতা।

বঙ্গদেশের শাক্ত সম্প্রদায়ে চণ্ডীর প্রচার বহুল; দুর্গোৎসব কালে ঘরে ঘরে চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে। এই চণ্ডীর দেবতা কে, অথবা কি, তাহার মীমাংস করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই উদ্দেশ্য।

কেহ কেহ মনে করেন, চণ্ডী শিবের স্ত্রী। উক্ত গ্রন্থের দুই এক স্থানে পার্ব্বতী, শিবা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার বিশেষণ রূপে আছে। অন্যত্র বিপরীত ভাবের উক্তি না থাকিলে এই সকল শব্দের প্রয়োগ শিবাণী অর্থে হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারিত। কিন্তু গ্রন্থের প্রারম্ভেই অর্গলা স্তবে আছে—"হিমাচল-সুতা নাথসংস্তুতো পরমেশ্বরী।"—ইহাতে শিবপত্নী হিমাচল-সুতা এবং চণ্ডীর দেবতা যে অভিন্ন নহেন, তাহা স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই দেবতা মহিষাসুর বধার্থ একবার এবং তৎপরে শুম্ভ নিশুম্ভ বধার্থ আর একবার আবির্ভূত হইয়া কার্য্য সমাপনান্তেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধকালে দেবীর অধীনা এক দেবশক্তি বা নায়িকা শিবকে দূতরূপে অসুরগণ সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন; এইজন্য তিনি শিবদূতী নামে খ্যাতা। এই সকল আলোচনা করিলে এই দেবতাকে শিবের স্ত্রী বলিয়া মনে করার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায়না।

দেবী চণ্ডীকা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছেন, তিনি জগতের সৃষ্টি ও পালন কারিনী, শিব ব্রহ্মা এবং অনন্ত ভগবানও তাঁহার অতুল প্রভাব ও শক্তি বলিতে সমর্থ নহেন। (নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্ব মিদং ততম্। * * তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বম্ জগৎ এতচ্চরাচরম)। (যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ। সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায় নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥) আবার কোথাও সেই দেবী মায়া, মহামায়া বা বিষ্ণুমায়া নামে কথিতা (যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা)। এই সকল হইতে বুঝা যাইতেছে যে চণ্ডীর মতে মায়া হইতেই জগতের সৃষ্টি। উক্ত গ্রন্থে শ্রেষ্ঠজ্ঞানী অর্থে ব্রহ্মবিৎ শব্দের উল্লেখ আছে। সুতরাং ব্রহ্মও আছেন; কিন্তু তিনি জগতের কারণ নহেন। মায়া বা মহামায়াই আদ্যাশক্তি বা জগতের কারণ।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে যুদ্ধকালে দেবীর কোপের উল্লেখ আছে যিনি জগতের কারণ, তাঁহার কোপ কি সম্ভব? মহিষাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত স্বর্গভ্রষ্ট দেবীগণ ব্রহ্মাকে লইয়া বিষ্ণু ও শিবের নিকট গমন ও অসুর দিগের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করিলে ক্রোধে তাঁহাদের উভয়ের মুখ হইতে তেজোরাশি নিঃসৃত হয়। তৎপরে অন্যান্য দেবগণের দেহ হইতেও তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইলে তেজঃসমষ্টি দেবীমূর্ত্তির আকারে একীকৃত হয়। এই দেবীই মহিষাসুরকে বিনাশ করেন; এবং দেবগণের স্তবে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভকেও বধ করেন। দেবগণের তেজ হইতে যাহার উৎপত্তি তিনি কিরূপে জগৎ কারণ হইতে পারেন বুঝিতে পারিলাম না।

গ্রন্থে এই দেবীকে করুণাময়ী বলা হইয়াছে। মহিষাসুর বধান্তে দেবগণ তাঁহার স্তব করিয়া বলিতেছেন—"দারিদ্র্য দুঃখহারিণি কা ত্বদন্যা সর্ব্বোপকার করণায় সদার্দ্র চিত্তা॥ এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্। সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রযান্তু মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি॥**** ত্রৈলোক্যমখিলং রিপু নাশনেন ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা নীতং দিবং রিপুগণা—" ইত্যাদি। অর্থাৎ তোমার সমান পরোপকার কে করিতে পারে? অসুর বিনাশ করিয়া তুমি জগতের ত্রাণ করিয়াছ, অন্যদিকে পাপাচার অসুরেরা নরকে যাইত; তুমি দয়া করিয়া তাহাদিগকে বধ করাতে, তাহারা স্বর্গে গমন করিয়া ত্রাণ পাইয়াছে।

এখানে স্বভাবতঃ কয়েকটী প্রশ্ন আসিতেছে। (১) দৈত্যেরা বাহুবলে স্বর্গ অধিকার করিয়া সেখানে স্বাধীন ভাবে বাস করিতেছিল। মরিয়া স্বর্গে গিয়া স্বর্গাধীপ ইন্দ্রের অধীনে বাস করায় লাভ কি হইল? ইহার উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে যে দেবীর হাতে মৃত্যুতে পাপের ক্ষয় হইয়া প্রকৃত সর্গ সুখের অধিকারী হইয়াছে। একথার প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় প্রশ্নটি আসিয়া পড়ে। (২) দেবীর হাতে মৃত্যুতে পাপক্ষয় কেন হয়? তাহার যুক্তি কি? চিত্তশুদ্ধি দ্বারাই মুক্তি, স্বর্গপ্রাপ্তি বা উর্দ্ধগতি ঘটে।

তৎপূর্ব্বে কাহারো মৃত্যু হইলে কিরূপে পাপের ক্ষয় বা স্বর্গলাভ ঘটিতে পারে? বাস্তবিক এই মতটি প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিলনা। কালী, কৃষ্ণ বা রামের হাতে মরিলে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিবে, পৌরাণিক যুগে এই মত প্রচারিত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তর কাণ্ড মূলগ্রন্থের দীর্ঘকাল পরে রচিত। সেই উত্তর কাণ্ড রচনার সময়েও এইমত প্রচারিত হয় নাই। উক্তকাণ্ডের একটি আখ্যায়িকা এই—কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ সদ্যমৃত শিশু সন্তানের শব লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলে রাম প্রতিকার মানসে অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিতে পান এক শূদ্র স্বর্গ কামনায় তপস্যা করিতেছে। শূদ্র তপস্যার অনধিকারী এবং এই অনধিকার প্রবেশই দ্বিজপুত্রের অকাল মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া ধার্ম্মিক রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদ করেন, ইহাতেই দ্বিজ পুত্র পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। (উত্তর কাণ্ড একোননবতি সর্গ।) কিন্তু এখানে রাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়া যে শূদ্র তপস্বী স্বর্গের অধিকারী হইল, এমন কোন কথা লিখিত নাই। বরং ইহার বিপরীত কথাই আছে। শূদ্র হইয়া স্বর্গ কামনা করিয়াছিল; রাম তাহার শিরশ্ছেদ করাতে সে স্বর্গে যাইতে পারিল না। এই কারণেই দেবগণ রামকে সাধুবাদ করেন এবং বর প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন।

কালিদাসের সময়ে বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। রঘুবংশ পঞ্চদশ সর্গে ৫৩ সংখ্যক শ্লোকে মহাকবি বলিতেছেন

কৃতদণ্ডঃ স্বয়ং রাজ্ঞা লেভেঃ শূদ্র সতাং গতিম্।
তপসা দুশ্চরেণাপি ন স্বমার্গ বিলঙ্ঘিণা ॥

অর্থাৎ, তপস্যার অনধিকারী শূদ্র কঠোর তপস্যা করিয়াও যে ফল লাভ করিতে পারিত না, রামের হস্তে নিহত হইয়া সেই ফল লাভ করিল।

আনুষঙ্গিক আর একটা প্রশ্ন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। স্বর্গলাভ যদি সুকৃতির ফল হয়, তবে সেই স্বর্গ কিরূপে অসুরেরা বল পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইতে পারে? ইন্দ্র যম প্রভৃতির অধিকার অর্থাৎ রাজকার্য্য যদি বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে তাহাই বা কিরূপে অসুরেরা বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে? যজ্ঞ করিলে সুকৃতি হয় এবং সেই যজ্ঞ ভাগ দেবতারা পাইয়া থাকেন, ইহা যদি বিধাতার বিধান, তবে অসুরেরা কিরূপে সেই যজ্ঞ ভাগ বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারে? চণ্ডীতে লিখিত আছে যে অসুরেরা স্বর্গ অধিকার এবং দেবতাদিগের অধিকার ও যজ্ঞ ভাগ বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল। বিচার প্রার্থনীয়।

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

---

# ভাই ভাই।

(অ)

বি, এ, পাশ-করা উপযুক্ত ভাই যখন জোর করিয়াই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মনোমোহন ভট্টাচার্য্যকে বাড়ীর বড় ঘরটি হইতে বাহির করিয়া দিয়া ছোট এক খানা খড়ের ঘর দেখাইয়া দিল, তখন পর্য্যন্তও পাড়ার সব লোক তাহাদের বাড়ীতে একত্র হয় নাই। কিন্তু মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের পুত্র কমলাকান্তের আকুল ক্রন্দনে ক্ষণপরেই একে একে পাড়ার লোক সব জমায়েৎ হইতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে এই ভট্টাচার্য্য বাড়ীটাই নাকি শিক্ষিত পরিবার। দুই ভাই গ্রাজুয়েট, এক ভাই পণ্ডিত, অপর ভাই যাজনিক ব্যবসায়ী পুরোহিত এবং চতুর্থ ভাই জিলা কংগ্রেস কমিটির প্রচারক ও বক্তা। ইনি অধিকাংশ সময়েই সহরে বাস করেন।

আজ যে-সময়ে সহসা এই গৃহ-বিচ্ছেদের প্রকাশ্য অভিনয়টা হইয়া গেল, তখন বাড়ীতে দুই ভাই ভিন্ন অপর কোনও সমর্থ পুরুষ উপস্থিত ছিলেন না। জ্যেষ্ঠ মনোমোহন স্মৃতিগিরি এবং তৃতীয় ভাই কালীমোহন ভট্ট চার্য্যই বাড়ীতে উপস্থিত। পাড়ার লোক একত্র হইয়া মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের অবস্থা দর্শনে মর্ম্মাহত হইল। শুধু দুই একজন নবীন বয়সী বন্ধু কালীমোহনের বন্ধুত্ব মর্য্যাদা বিস্মৃত না হইয়া—ভাল হউক মন্দ হউক—তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিল। শাস্ত্রে বলে বিপদ কালে যে সহায় সে-ই প্রকৃত বন্ধু। কিন্তু এইক্ষেত্রে কালীমোহনের যে বিপদটা কি, তাহা এখন পর্য্যন্তও জানিতে বাকী আছে।

বৃদ্ধ রামসুন্দর নন্দী সমবেদনার সুরে বলিয়া উঠিল হ্যা, বল কি মনো! ছোড়াটা তোমার গায়ে আঘাত পর্য্যন্ত করেছে? ছি ছি ছি! বড় ভায়ের গায়ে হাত-তোলা

সে-না লেখা পড়া শিখেছে, এই কি তার পরিচয় ? হা, হা, তাইত হে, পিঠটা যে তোমার রাঙা হ'য়ে ফুলে উঠেছে ! খুব বেশী লাগেনিতো, ব্যথা হচ্ছে কি ?"

মনু উত্তর দিবে কি ছাই ! তাঁহার চক্ষুতে দরবিগলিত ধারা। তার উপর নন্দী মহাশয়ের সমবেদনায় মন্দাকিনীর ধার, ত্রিস্রোতা হইয়া চলিয়াছে ; মুখে কথা বলিবার শক্তি নাই ।

( আ )

"বেলা যে শেষ হ'য়ে এল, ছেলে মেয়ের মুখে কিছু দিতে হবে ত ? আমরা বরং উপোসই কল্লুম ।" এই বলিয়া পত্নী স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকাইয়াই অধোবদন হইলেন ।

"তাত বুঝ্‌তে পারছি ব্রাহ্মণি ! কিন্তু উপায় কি বল ? এতখানি বয়স হ'য়েছে, কারুর দ্বারেত ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরুইনি। আজ কি তাও করতে হবে ? জানি বটে, ভিক্ষা মাগ্‌লে ব্রাহ্মণের সম্মান লাঘব হয় না ; কিন্তু তুমিও আজ পনেরো বৎসর যাবৎ দেখে আস্‌ছ মনোমোহন স্মৃতিগিরিকে সকলে পা-ধরেই যার যার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছে—ভিক্ষা মেগেতো কারুর দ্বারে উপস্থিত হইনি ।"

"সে সব কথা ভেবে কি হবে বল ? এখন এই কচি শিশুদের মুখেত কিছু দিতে হবে। ঘরে যে কিছুই নেই ।"

"কিছুই নেই ?—কেন, আমি কি চালের গোলাটার পাঁচ ভাগের ভাগ পাবনা ? ও বুঝেচি, এই অভিপ্রায়েই ছোড়া আমাকে বড় ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ।—তা যাক্‌গে ; আচ্ছা, দেখ দিকিন ওই কলসটাতে কিছু রয়েছে কিনা ?"

গৃহিণী কলস অনুসন্ধান করিয়া তাহাতে যে কিছু খৈ পাইল, উহা সারাদিনের উপবাসী পুত্র ও কন্যাকে বণ্টন করিয়া দিল ।

পণ্ডিত মনোমোহন আজ নিজ গ্রামে ভিক্ষার্থে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু অদৃষ্ট অপ্রসন্ন থাকিলে গ্রামের লোকও অসহায় হইয়া দাঁড়ায়। গ্রামে প্রবেশ করিয়া তিনি বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিলনা। নিঃস্ব ব্যক্তিকে যে কেহই বিনা প্রত্যু-পকারের আশায় অর্থ সাহায্য করেনা, ইহা আজই তিনি নিজের জীবনে প্রথম উপলব্ধি করিলেন। পরে চাউল ভিক্ষা করিবেন মনস্থ করিয়া পুনর্ব্বার বাড়ীতে বাড়ীতে হাটিলেন, কিন্তু একমুষ্টি চাউলও মিলিল না। শুনিতে পাইলেন, গুণধর ভ্রাতা কালীমোহন নাকি গ্রামবাসীকে শাসাইয়া গিয়াছেন গ্রামের ভিতরে যে-কেহ ঐ মৎলববাজ, ধরীবাজ, লোভী, স্বার্থপর স্মৃতিগিরিকে সাহায্য করিবে তাহাকে তিনি সহরের হোটেলের ভাত না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না। গ্রামের ভিতরে কালীমোহনের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। আসে পাশে দশমাইলের ভিতর সেই প্রথম বি, এ পাশ করিয়া জজ ম্যাজিষ্টর হইয়া বসিয়াছে। পরন্তু সময় সময় আইন শাস্ত্রের ইংরেজী বুলি গুলিও সে গ্রামবাসীদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া শুনাইয়া দেয়। এইসকল কারণে গ্রামবাসিগণ স্বভাবতই ভীত ; তদুপরি স্মৃতিগিরির পক্ষাবলম্বন করিলে কোন্ দুর্ঘটনায় যে কি ফ্যাসাদ বাঁধিয়া বসিবে সেই ভয়েই সকলে ত্রাহি ত্রাহি ।

বিপন্নের বন্ধু ভগবান্। মনোমোহন ভট্টাচার্য্য সারা দুপুর ঘুরিয়া এক সের চাউল ধার আনিলেন। অবস্থা দেখিয়া ভীত ব্রাহ্মণের সরল অন্তঃকরণে ভয় লাগিয়া আছে ; একসেরের বেশী চাহিলে যদি কিছুই কেহ না দেয়, অথবা এক সেরের বেশী আনিয়া তিনি যদি তা সাত দিনের ভিতরে পরিশোধ করিতে না পারেন ! বরং প্রাণত্যাগও শ্রেয়ঃ, তথাপি যেন বাক্য লঙ্ঘন না হয়। হায়,এই বিপদের সময়েও তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান ধুইয়া যায় নাই।

( ই )

রাত্রি কাটিয়া গেল। পরের দিবস বেলা প্রায় একপ্রহর, কি যে উপায় হইবে আজিও তাই নিয়া স্বামী ও স্ত্রীতে পরামর্শ চলিতেছে। উভয়ের বিষণ্ন মুখ দেখিলে অতি পাষাণের হৃদয়ও গলিয়া যায়। ওদিকে কালীমোহনের ঘরে রান্না চড়িয়া গিয়াছে ; সম্ভারের গন্ধে দিক্ আমোদিত ! ভগবানে মনোমোহনের অচলা ভক্তি। অথচ কালীমে হন মনে করে ওসব ভক্তি টক্তি নাকি সবই ভণ্ডামী। শুধুই চোরের না'য়ে সাধুর নিশান। কালীমোহনের এই অবিশ্বাসই গৃহবিচ্ছেদের কারণ। বড়দাদা বাড়ীতে থাকিয়া গোপনে গোপনে কয় হাজার

টাকা লগ্নী করিয়া বসিয়া পায়ের উপর পা রাখিয়া ছোট-ভাইদের উপরে ছড়ি ঘুরাইতেছে, তাহা প্রবাসী কালীমোহন কাগজে পত্রে হিসাব রাখিত না বটে, কিন্তু মনে মনে একটা প্রকাণ্ড ধারণাই পুষিয়া রাখিয়াছিল। তার উপর, এক দিবস মেজো দাদা কাশীমোহন যখন ছোট ভাইয়ের সন্দেহটাকে বিবিধ স্তোক-বাক্যে আরও গভীরতর করিয়া দিয়াছিল তখন হইতে কালীমোহন বড়দাদার উপর মনের ঝাল মিটাইবার সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিল। সুখের বিষয় সেই শুভ বনাম অশুভ দিনটাতে কাশীমোহন বাড়ীতে ছিলেন না, যাজনিক ব্যাপারে গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। পরের দিন ভোরের বেলায় বাড়ীতে আসিয়া কাশীমোহন কালীমোহনকে উৎসাহিত করিল এবং বড় দাদা যে যজমান বাড়ীর বড় বড় কাপড় গামছা গুলি আত্মসাৎ করিয়া বাক্সজাত করিয়া রাখে, তাহা ছোট ভাইকে বুঝাইয়া দিয়া মনকে আশ্বস্ত করিল। কিন্তু এত দুঃখের সময়েও নির্ব্বিকার মনো ভট্টাচার্য্যের মনে চাঞ্চল্য নাই। ভগবান রয়েছেন ত!

কমলাকান্ত খেলিতে গিয়াছে। মেয়েটিও থালা বাসন মাজিবার জন্য নদীর ঘাটে গিয়াছে। এখনই যে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া খাবারের জন্য হয়রান হইবে, ইহা ভাবিয়া পিতার মন উতলা হইয়া পড়িয়াছে। আজও তিনি কোন প্রাণে যে আবার ভিক্ষায় বাহির হইবেন তাহাই চিন্তা করিতেছেন। মানীর অপমান যে মাথাকাটার চেয়েও বেশী মর্ম্মান্তিক, তাহা তিনি ছোট ভায়ের ব্যবহারে উত্তম বুঝিতে পারিয়াছেন।

"বাবা, আপনার নামের পরিচয় জিজ্ঞেস করে একজন ভদ্রলোক এ দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন; আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি; তামাক দিয়ে আসিগে।"

মনো ভট্টাচার্য্যের মাথায় কে যেন একটা দণ্ডাঘাত করিয়া গেল। পুত্রের কথাটা শেষ না হইতেই তাহার মনে হইতেছিল "সর্ব্বনাশ করেছিস্ কমলাকান্ত, সর্ব্বনাশ করেছিস্।" কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখ হইতে মনের কথাগুলি বাহিরে ফুটিয়া আসিল না। তিনি পুত্রের প্রশ্নে হা বা না উত্তর না দিতেই নয় বৎসরের কমলাকান্ত গৃহ হইতে হুকা ও কল্‌কি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। আহা, শিশু জানে না, অতিথির পরিচর্য্যা আজ কি ভাবে সম্পন্ন হইবে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন "ওগো শুন্‌ছো বাড়ীতে অতিথি এসেছে।" ব্রাহ্মণী পুত্রের কথাগুলি পূর্ব্বেই আড়ালে থাকিয়া শুনিয়াছিলেন, কিন্তু নীরবে অশ্রুপাত ভিন্ন তার গতি ছিলনা। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন "আমি বেরিয়ে পড়ি চালের জন্যে, তুমি জল চড়িয়ে দাও।" ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন একটা কথা শোনো, চালের জন্যে তোমাকে এ বেলা কোথাও যেতে হবে না। ও বাড়ীর ক্ষেমীর মা লুকিয়ে আমাকে একসের চা'ল দিয়ে গিয়েছে। এ বিপদের কালে আমি তা প্রত্যাখ্যান করিনি। ওতেই তোমাদের চারিজনার হবে। আমার যে আজ সোমের উপোস্। পার যদি খানিক লঙ্কা নুন ও তেলের জোগাড় দেখ।"

ব্রাহ্মণ, বাড়ী হইতে বাহির হইবেন এমন সময় কন্যা সুদক্ষিণা হাতে একটা রুই মাছ লইয়া আসিয়া সানন্দে গদগদ স্বরে বলিয়া উঠিল—"এই দেখ বাবা! নদীর ঘাটে কেমন একটা বড় মাছ পেয়েছি। আমি বসে বসে বাসন মাজ্‌ছিলাম, আর—কাল রাত্রে মায়ের পাতের ভাতগুলিতে বিড়ালে মুখ দিয়েছিল কি না—সে ভাত গুলি জলে ফেলে দিয়ে মাছের তামাসা দেখ্‌ছিলাম। হঠাৎ কিনা এই মাছটা লাফ দিয়ে এসে আমার পায়ের তলে পড়ে গেল, আর আমি অম্নি থপ্ করে দুহাতে —"

বালিকার কথা শেষ না হইতেই ব্রাহ্মণ মহানন্দে মেয়ের শিরশ্চুম্বন করিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শত সহস্র ভবিষ্যৎ আশীর্ব্বাণী প্রয়োগ করিলেন। কালে যে এই সুলক্ষণা মেয়ে রাজরাণী হইয়া একশ বছর 'প্রমাই' পাইবে তাহাও পিতার মুখ হইতে বাহির হইল। পণ্ডিত মহাশয় মেয়ের হাত হইতে মাছটি গ্রহণ করিয়া নিজে যাইয়া ব্রাহ্মণীর কাছে দিলেন এবং মেয়েকে কাছে দেখিতে না পাইয়া তাহার প্রশংসা করিতেও ছাড়িলেন না।

( ঈ )

সুদক্ষিণার শুভ লক্ষণেই হউক বা ব্রাহ্মণ দম্পতীর ব্রহ্ম—ভক্তিতেই হইক, অতিথিসেবা সুচারু রূপেই সম্পন্ন হইল। তারপর দিবস পাড়ার লোকে যখন শুনিতে পাইল, বরুণার জমিদার বাড়ী হইতে এক ঘটক ব্রাহ্মণ অতিথি

রূপে আসিয়া স্বয়ং জমিদার পুত্রের জন্য দরিদ্রের কন্যা সুদক্ষিণাকেই পছন্দ করিয়া গিয়াছেন, তখন আর তাহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেশের মধ্যে একমাত্র লক্ষপতি জমিদার বরুণার বাবু, অথচ তাঁহার পুত্রবধূ হইবে এক দরিদ্র কন্যা? অসম্ভব কথা!—কেহ আলোচনা করিল অসম্ভব; কেহবা মন্তব্য প্রকাশ করিল,—অসম্ভব নয়হে, খুবই সম্ভব।

ঘটক মহাশয় বাড়ী হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন অবধি কাশীমোহন ও কালীমোহনের মুখচ্ছবি কালিমালিপ্ত হইয়াছে। তাহারা ভাবছে 'তাইত!'

(উ)

ঘটকের আগমনে অন্যে যে যা বলে বলুক, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কিন্তু উহাতে ততদুর আস্থা কিছুই ছিল না। তাহারা যেমন কাঙ্গাল, তেমন কাঙ্গাল ভাবেই ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছিলেন। এখন যে তাহাদের অন্ন চিন্তাই চমৎকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; মেয়ের বিয়ে ত পরের কথা।

রাত্রি প্রভাত হইল, পরের দিন আবার সেই দৈন্য আসিয়া ব্রাহ্মণ দম্পতীকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে! শিষ্য বা যজমান বাড়ীতে কোন ব্রত পার্ব্বণ উপস্থিত নাই। ব্রাহ্মণের অন্তরের মাঝে বিবেক পদার্থটা মাথা খাড়া করিয়া সজোড়ে নাগড়া পিটাইতে সুরু করিয়াছে। সেই নাগড়ার তালে ব্রাহ্মণ একবার ভাবছেন, হীনতাকেই বরণ করবেন অথবা মন-গড়া মর্য্যাদাকেই মাথায় তুলবেন। ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা যে ভিক্ষা বৃত্তিতেই ভূমিসাৎ হইয়া চুরমার হইয়া যায়না—এই কথাটি যেন তিনি আজ বুকের কাছটায় মাথা হেলাইয়া—অতি মৃদুস্বরে শুনিতে পাইলেন। ভিক্ষাবৃত্তির মাঝেও যে ইতর বিশেষ বিদ্যমান, তাহা তিনি আজই নূতন বুঝিলেন। নামাবলি খানা কাঁধে ফেলিয়া, ছাতা হাতে করিয়া স্মৃতিগিরি হুকাতে শেষ টানটি দিয়াছেন এমন সময় "গুরুগোসাই, পেন্নাম হই" বলিয়া পাঁচঘাটের সনাতন মাঝি মাটিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ হইল। কুশলাদি প্রশ্নের পর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া সনাতন বলিল "কত্তা, একখানা ব্যবস্তার জন্য আইসাছি, পাতি দিতে অইবে।"

"কিসের ব্যবস্থা, কিসের পাতি, তাই বল।"

"আজ্ঞে পরাক ব্রতের একখানা পাতি।" এই বলিয়া মাঝি কাপড়ের খোঁট হইতে দুইটি টাকা খুলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের পদতলে রাখিয়া পুনর্ব্বার ভক্তি করিল। স্মৃতিগিরি ভাবিলেন "ভগবান্, কে বলে তুমি নাই? নাস্তিক, নাস্তিক, ঘোর নাস্তিক তারা। সনাতন মাঝি উপলক্ষ্য মাত্র। মূলে যে তোমারি অসীম করুণা নিহিত রয়েছে ভগবান্। পরাক ব্রতের জন্য আট আনাতেই আমরা পাতি দিয়ে থাকি, আর তুমি পাঠিয়ে দিয়েছ দুই টাকা! বিপন্নের সহায় তুমি—" আরও কতকি ব্রাহ্মণ ভাবিলেন। তারপর ধীরে সুস্থে পাতি লিখিয়া দিয়া মাঝিকে বিদায় করিলেন। ব্রাহ্মণের আনন্দ আর গায়ে ধরেনা। তিনি ছাতা ও নামাবলি রাখিয়া দিয়া ব্রাহ্মণীর কাছে যাইয়া ভগবানের করুণা জানাইলেন, এবং ইহাও বলিলেন, একটাকার চাউল কিনিয়া দিয়া বাকী একটাকা সম্বল করিয়া তিনি কল্যই বরুণা গ্রামে যাত্রা করিবেন। ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্য।

ভগবান্ সকলই মঙ্গলের জন্য করেন বটে, কিন্তু বাহির বাড়ীতে যে আর একটি বিষম অমঙ্গলের সূত্রপাত হইতেছে, তাহা তিনি এখন পর্য্যন্তও টের পান নাই।

কাপড়ের আঁচলে মুখ মুছিতে মুছিতে বৃদ্ধ সনাতন মাঝি বাহিরের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "কি অধর্ম্ম! পাতিখানা হাতে লিয়ে আমি যাইছিলাম, অমনি কি না আপনকার ভাই কালীমোহন কত্তা কাগজখানা দেখতে চাইল, তারপর পাতিখানার উপর চোক্ বুলাইয়াই সপাং সপাং ছিঁড়িয়া ফেলিল। বল্লেক কিনা, ওটা নাকি শুদ্ধ বিশুদ্ধ কিছুই হয় নাই। আর কত কি রংরাজী বুলি বল্লেক। গুরু গোসাঞি, এখন মুই কি করমু বলেন।"

"তাতে তুমি ভাবছ কেন সনাতন, আমি আবার তোমাকে পাতি লিখে দিচ্ছি।"

"আজ্ঞে কর্ত্তা ভাবছি কেন তাই শোধাচ্ছেন না?—ছোট ভাই হয়ে বড় ভাইকে গালি, তা যে মুই বামুনের বাড়ীতে আর কহনো শুনি নাই ঠাকুর! বয়স আমার তিন কুড়ি পার হ'য়েছে। আর আমায় বলে কি না পাজি শূয়োর গাধা! আপনকার ভাই কি পাগল অইছে নাহি? আমাকে বলে পাজি শূয়োর? একটাকার জায়গায় দুই টাকা দিলাম, তার উপর তিনিও আবার দুই টাহা চান!

ব্রাহ্মণ আর একখানা পাতি লিখিয়া দিলেন, মাঝি এবার হুসিয়ার হইয়া চলিয়া গেল।

( উ )

হাতে মাত্র একটি টাকা সম্বল, তাই মণ্ডিত মহাশয় রেলের ভরসায় চাহিয়া না থাকিয়া পদব্রজে বরুণা চলিয়াছেন। এ পথশ্রম তাহার নিত্য কর্ম্ম।

যথা সময়ে তিনি জমিদার রাধামাধব রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। কাছারী ঘরের বারান্দায় পদক্ষেপ করিয়া ভিতরে চাহিয়াছেন অমনি তিনি চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, তাঁহারই কনিষ্ঠ কালীমোহন অপর দরজা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। স্মৃতিগিরির অন্তরাত্মায় কে যেন একটা মুগুরের আঘাত করিয়া তাহার হর্ষোদ্দীপ্ত মুখে এক ভাড় কালি ঢালিয়া দিল। দুই ভায়ে পরস্পর আলাপ বন্ধ, তাই তিনি সহসা কালীমোহনকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। কালীমোহন ও অবজ্ঞাভরে চোরের মত বাহির হইয়া গেল। একরক্তে গড়া ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি আজি আচারে ব্যবহারেও বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঘনিষ্ঠের শত্রুতা বুঝি এতই প্রবল! শত্রুতা যে শুধু এইখানেই শেষ হইল, তাহা নহে; ঘটক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের পর স্মৃতিগিরি যখন জানিতে পারিলেন পাত্রী সুদক্ষিণার যত নম্বর দোষ না আছে, পাত্রীর মাতামহ বংশে নাকি তার চেয়ে ও বেশী নম্বর দোষ রহিয়াছে; অথচ পাত্রীর পিতা স্বয়ং একজন ঘোর দাগাবাজ, ধড়ীবাজ, মৎলববাজ ইত্যাদি, তখন পাত্রীর পিতা মূর্চ্ছা সামলাইতে পারিলেন না, ফরাসের উপর ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন। একেত পূর্ব্বদিবসের একাহারে ও অল্পাহারে দুর্ব্বল শরীর, তদুপরি অদ্যকার সমগ্র দিনের অনাহার, তাহার উপর দীর্ঘ রাস্তা পরিভ্রমণ।

( ঋ )

তিন দিবস পরে বাড়ীতে আসিয়া মনো ভট্টাচার্য্য দেখেন এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত। সর্ব্ব কনিষ্ঠ রাসমোহন টেলিগ্রাম পাইয়া বাড়ী আসিয়াছে, বাট বণ্টনের লেখাপড়া হইবে। চতুর্থ ব্রজমোহন বড় বৌদির প্রেরিত লোকমুখে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া কংগ্রেসের কার্য্য হইতে পাঁচ দিনের ছুটি লইয়া বাড়ীতে আসিয়াছে। ভায়ে ভায়ে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত। একা ব্রজমোহন একদিকে আর অপর তিন ভাই একদিকে। ব্রজমোহন ও রাসমোহন উভয়েই অবিবাহিত। চব্বিশ বৎসর পূর্ণ না হইলে ব্রজমোহন বিবাহ করিবে না এই হেতুতে জ্যেষ্ঠের বিবাহের দায়ে কনিষ্ঠ রাসমোহনের বহু বিবাহ-প্রসঙ্গ বাতিল হইয়াছে, তাহাতে অনেক লাভেরও আশা ছিল। ব্রজমোহনের শরীরে অসুরের বল। কংগ্রেসে বক্তৃতাকালে সে প্রায়ই ফাঁক বুঝিয়া ভারতীয় আশ্রম ধর্ম্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের অশেষ প্রশংসা করে। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য ও অস্তেয় না থাকিলে যে আমাদের জাতির উদ্ধার কখনও হইবে না এই কথাই সে লম্বা গলায় বলিয়া থাকে। আর ঐ অহিংসা কথাটি যে মহাত্মা গান্ধী পাতঞ্জল দর্শন হইতেই সংগ্রহ করিয়া যোগধর্ম্ম ও যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত করেন, তাহাও সে সুন্দর রকমেই ব্যাখ্যা করে। মুক্তি, মোক্ষ, স্বরাজ, আত্মলাভ ও নির্ব্বাণ প্রভৃতি যে একই পর্য্যায়ভুক্ত এবং স্বরাজলাভ যে চঞ্চলমতি যুবকদের অধিগন্তব্য নহে তাহাও ব্রহ্মচর্য্যের বক্তৃতা প্রসঙ্গেই বর্ণনা করে। আজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-পত্নীর প্রতি কনিষ্ঠের কটূক্তি শুনিয়া ব্রজ-শার্দ্দূলের রক্ত পিপাসা বর্দ্ধিত হইয়াছে। কংগ্রেসের বক্তাকেও আজ আত্মরক্ষাচ্ছলে প্রকাণ্ড এক লগুড় দণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ব্রজমোহন ক্রোধারক্ত নয়নে অপর তিন ভাইর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, এমন সময় মনোভট্টাচার্য্য বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। একা আসিলে তত কিছুই লজ্জার কারণ ছিলনা, কিন্তু সঙ্গে যে বিদেশীয় দুইটি ভদ্রলোক এই বিসদৃশ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন, ইহা ভাবিয়াই স্মৃতিগিরি মহাশয় থ বনিয়া গিয়াছেন। মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগের পর যে রাসমোহনকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করিয়া তাহার বি, এস্‌ সি পাঠ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার খরচ জোগাইয়াছেন, চাইকি, পত্নীর একমাত্র স্বর্ণালঙ্কার মোহনমালার ছড়াটি পর্য্যন্ত বন্ধক রাখিয়া নিজে ঋণী হইয়াছেন, আজ সেই রাসমোহন কি না কালীমোহনের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃসমা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর অঙ্গে পাপহস্ত উত্তোলনে উদ্যত! ধিক তাহার শিক্ষায়। শিক্ষা যদি সুকোমল চরিত্রকে শুভ্র করিয়া গড়িয়া না তুলিয়া উহাকে লোহার মত দৃঢ় করিয়া দেয়, তবে সে শিক্ষার মর্য্যাদা কোথায়?

আর কালীমোহন?—কালীমোহনের মনে অহঙ্কার আছে সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর বাড়ী হইতে এক কপর্দ্দক ও খরচ গ্রহণ করে নাই। শ্বশুরের অর্থে পরিপোষিত হইয়া তাহার মনে দৃঢ় ধারণাই জন্মিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাদের বড় দাদা বাড়ীর সমস্ত সম্পত্তির অংশ তিলে তিলে সঞ্চয় করিয়া তাল পাকাইয়া গোপনে কোথাও লগ্নী করিয়াছে, অথবা কোথাও মাটির নীচে পুতিয়া রাখিয়াছে। সম্পত্তির মধ্যেত অই; তুইখানা জমি, পঞ্চাশ ঘর শিষ্য আর শতেক ঘর যজমান। পরের ধনে যাহারা প্রতিপালিত—বিশেষতঃ শ্বশুরের ধনে—তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বুঝি পত্নীর বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরই বুদ্ধির ন্যায় প্রলয়ঙ্করী হইয়া দাঁড়ায়। আত্মবিক্রয় আর কাহাকে বলে?

মনো ভট্টাচার্য্যের সঙ্গীয় ভদ্রলোক তুটী ঐ বাড়ীতে একদিবস বাস করিয়াই কালীমোহন প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষ্য করিলেন এবং একই রক্তমাংসে যে কি প্রকারে দেবতা ও অসুরের সৃষ্টি হয় ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। স্বয়ং স্মৃতিগিরি ভাইদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বিদেশীয় ভদ্রলোকদের কর্ণগোচর করেন নাই। কিন্তু ভদ্রলোকগণ গ্রামবাসীদের নিকট এমন একটা অস্পষ্ট সংবাদ ও পাইয়াছিলেন—একদিন নাকি বি, এস্, সি ভ্রাতার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নিকট উহাদের কুলগুরু শিবনাথ শর্ম্মার শাস্ত্রীয় তথ্য পরাজিত হওয়ায় গুরুমহাশয় বাড়ী হইতে লাঞ্ছিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছিলেন; তখন আর তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, পাত্রী সুদক্ষিণা-ঘটিত যত নশ্বর এবং পাত্রীর মাতামহ বংশে তার চেয়ে ও অধিক যত নশ্বর দোষ তাঁহারা শুনিয়া ছিলেন, সেই সমস্তই ভুঁয়া কথা। যিনি স্বয়ং যোগেশ্বর ভোলানাথ, যাঁহার পত্নী যে অশেষ গুণবতী পার্ব্বতী, তাঁহার কন্যা যে লক্ষ্মী না হইয়া যায় না, এই ধারণাই তাহাদের পাকা হইয়া গেল।

যথাকালে দরিদ্র মনোমোহন ভট্টাচার্য্য কন্যা সুদক্ষিণাকে দারিদ্র্যের দক্ষিণা স্বরূপ জমিদার রাধামাধব রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্প্রদান করিয়া সোয়াস্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

# রামায়ণী যুগের চিত্র শিল্প।

রামায়ণী যুগে চিত্র-শিল্প কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা মহর্ষির বর্ণনা হইতে বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায় না। চিত্র যে সৌন্দর্য্য জ্ঞানের দিক দিয়া সেখিন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় রামায়ণের বর্ণিত গৃহাদির ও চিত্র ভবনাদির বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়।

অযোধ্যায় রামের গৃহ চিত্র-ভূষিত ছিল। কৈকেয়ীর ভবনেও একটী চিত্রগৃহ ছিল। (২।১০।১৩) লঙ্কার বর্ণনায়ও চিত্র এবং চিত্রশালার উল্লেখ আছে।

"লতা গৃহাণি চিত্রাণি চিত্রশালা গৃহাণিচ।" ৫।৬।৩৬

এই চিত্রশালার উল্লেখ বর্ত্তমান যুগের 'পিকচার গেলারীর' কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে কিন্তু এই সকল চিত্র-গৃহ বা চিত্রশালা কি প্রকারের চিত্রে শোভিত ছিল আর্ষ রামায়ণের কোন স্থানেই তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বালীর যে শিবিকার কথা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ২৫শ সর্গে উল্লেখ আছে, ঐ শিবিকা পক্ষী ও বৃক্ষ লতাদির চিত্রে চিত্রিত ছিল।

"দিব্যং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাং স্যন্দনোপমাম্।
পক্ষিকর্ম্মভিরাচিত্রা দ্রুমকর্ম্ম বিভূষিতাম্॥ ২২

রামায়ণে ভাস্করের নির্ম্মিত মূর্ত্তির কথা থাকিলেও কোন চিত্রিত মনুষ্য মূর্ত্তির উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

সুন্দর কাণ্ডের সপ্তম সর্গে একটী লক্ষ্মী মূর্ত্তির কল্পনা প্রদত্ত হইয়াছে। পদ্মসরোবরে পদ্ম হস্তে লক্ষ্মীমূর্ত্তি, হস্তীসমূহ সেই মূর্ত্তিকে অভিষেক করিতেছে; এ কল্পনা বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরের—খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর। ইহাকে বৌদ্ধ শ্রীমূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। এই শ্রীমূর্ত্তির চিত্র সাঞ্চিস্তূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রীই নাকি পৌরাণিক যুগে লক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।

রামায়ণীযুগে আর্য্য ভারতে দেবদেবীর কোন মূর্ত্তি কল্পিত হয় নাই। রামায়ণের দেবতা শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি; সুতরাং দেব দেবীর কোন মূর্ত্তি তখন চিত্রের বিষয় ছিল না। রাম-ভবনের স্থাপত্য ও ভাস্কর শিল্প প্রসঙ্গে আমরা যে সকল কাঞ্চন মূর্ত্তির ও মৃণ্মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, বোধ হয় সেই সকলের চিত্রই অঙ্কন উপযোগী স্থানে অঙ্কিত হইত।

ভাস্করের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রয়াসের পূর্ব্বেই যে চিত্রকরের কল্পনা সফলতা লাভ করিবে, এই অনুমানের মূলে কোন সন্দেহের সূত্র নাই। কেননা, মূর্ত্তিটী কল্পনা না করিয়া ভাস্কর তাহা খোদাই করিতে পারে না। ইহা সভ্যতার ক্রম বিকাশের ধারার একটী অভ্রান্ত সত্য সিদ্ধান্ত। সুতরাং যে স্থলে ভাস্করের মূর্ত্তি শিল্পের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থলে যে আলেখ্য অঙ্কন বিদ্যা উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা রামায়ণে মনুষ্য অঙ্কনের কোন উল্লেখ না থাকিলে ও অনুমান করা যায়।

তাহা হইলে এখন জিজ্ঞাস্য—রামায়ণে কোন্ মনুষ্য মূর্ত্তি অঙ্কনের আভাস বা উল্লেখ নাই কেন? সেকালে কি মনুষ্য মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত না? যাহারা রামায়ণকে বৌদ্ধ যুগের কাব্য গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চান, তাঁহাদিগের পক্ষে এ বিষয়টী বিশেষ আলোচনার বিষয় বলিয়া মনে করি। বৌদ্ধ যুগে ভারতে ভাস্কর্য্য অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মূর্ত্তি-চিত্রাঙ্কন রীতিও প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বের গ্রন্থ পাণিনিতেও প্রতিকৃতি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

পাণিনির একটী সূত্রে আছে "ইবে প্রতিকৃতৌ" ৫।৩।৯৬

রামায়ণে ভাস্কর্য্য নির্দ্দেশক 'প্রতিমা' শব্দ আছে কিন্তু চিত্র শিল্পের আভাস দ্যোতক প্রতিকৃতি বা এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশক কোন শব্দ নাই। তবে কি সেই সুপ্রাচীন যুগে চিত্র শিল্পে লতা, পাতা, ফুল পক্ষী ও নানারূপ আলিম্পন ব্যতীত মনুষ্য চিত্র অঙ্কনের নিয়ম ছিলনা?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঠিক তাহাই বলেন। "বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর" গ্রন্থেও কতকটা এই ভাবের আভাস আছে। অতি প্রাচীন কালে আর্য্য জাতির মধ্যে মনুষ্য মূর্ত্তি চিত্রণ প্রথা প্রচলিত ছিলনা। পরে মনুষ্য মূর্ত্তি অঙ্কন বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু তখনও মূর্ত্তির চক্ষুদান বিধি শাস্ত্র বিরুদ্ধ ছিল। ক্রমে প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইত বটে কিন্তু সকল স্থানেই যেকোন মূর্ত্তি বা চিত্র অঙ্কিত হইতে পারিত না। বাস গৃহে যাহা অঙ্কিত হইতে পারিত, রাজ সভা গৃহে তাহা পারিত না; রাজ সভা গৃহে যাহা অঙ্কিত হইতে পারিত, চৈত্য গৃহে তাহা রাখা যাইতে পারিত না। এইরূপ ক্রম বিকাশের পথে আসিয়া অন্যান্য যাবতীয় চিত্রের ন্যায় মনুষ্য চিত্রও উন্নত পর্য্যায়ে পঁহুছিয়াছিল। ইহার পর বৌদ্ধ যুগে পাশ্চাত্য প্রভাবের সংস্পর্শে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের গতি পরিবর্ত্তিত হয়।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে কিন্তু তাহা নহে। এ বিষয় আর্য্য ভারতের সুনাম সভ্যতা গর্ব্বিত প্রতীচ্যেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন।

রামায়ণের রচণাকাল যে পাণিনি রচনারও বহু পূর্ব্বের পরন্তু পাশ্চাত্য শিল্প প্রভাবে সমুন্নত বৌদ্ধ যুগের নয়, রামায়ণে ভাস্কর্য্যের প্রভাব ও প্রতিকৃতি চিত্রন নৈপুণ্যের অভাব—তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতীয় চিত্র শিল্প সম্বন্ধে "The Oracle Encyclopædiar" মতটী পাঠকগণের আলোচনার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি চিত্র সম্বন্ধে সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে যে নিষেধ-বিধি ছিল, তাহাই যে ভারতীয় শিল্পকে মনুষ্য প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কন বিষয়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহাই যে বাল্মীকির ন্যায় মহাকবির কল্পনাকেও মূক করিয়া দিয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায়। উক্ত গ্রন্থের Painting প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"of the Arts of India, China, Persia and Japan it is unnecessary here to speak as they are sculptural and archetectural or decorative, rather than pictorial."

আমাদের মনে হয় বৈদিক যুগের সন্নিহিত সেই সুপ্রাচীন রামায়ণী যুগেও প্রতিকৃতি চিত্রনের বিধি ছিল না; সেই জন্যই আমরা কোন চিত্র গৃহেই মূর্ত্তি চিত্রনের উল্লেখ দেখিতে পাই না।

চিত্রলিপি পৃথিবীর অতি প্রাচীন লিপি। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় ভারতীয় আর্য্যেরাও এই লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রামায়ণে চিত্র-লিপির আভাস আছে; লিপি বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

## সাহিত্য সংবাদ।

গত ১লা ও ২রা আষাঢ় কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিম-সম্মিলন এবং ৮ই ও ৯ই আষাঢ় নৈহাটীতে বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। পঞ্চদশ সাহিত্য সম্মিলন রাধানগর রামমোহন-ভবনে হইবে।

আশুতোষ লাইব্রেরীর প্রকাশিত রামায়ণ হইতে সংগৃহীত।

Asutosh Press, Dacca.
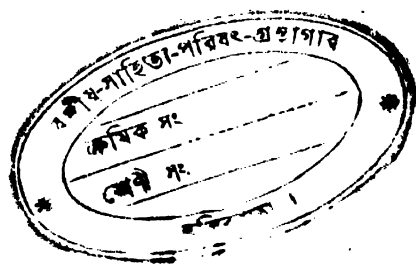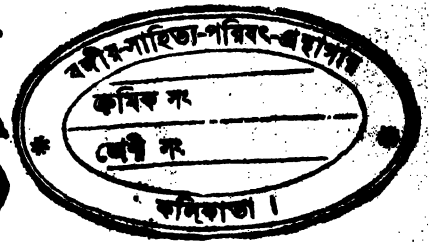
একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, ভাদ্র ১৩৩০ | অষ্টম সংখ্যা।

## রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের অভিব্যক্তি।

( শেষ প্রবন্ধ )

'মানসসুন্দরী' রবীন্দ্রনাথের একটী প্রধান কীর্ত্তি। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলন করি বলিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, এই কবিতাতে আমরা শেলীর আগ্রহ, কীটসের আভাস-জগত ওয়ার্ডসওয়ার্থের আনন্দ, ও ইটালিয়ান কবি ডি এনানজিয়ো (DE Annanzio)র বর্ণনা বৈচিত্র্য একত্রীকৃত দেখি। এই সমস্ত ছাড়া রবীন্দ্রনাথের স্বরূপত্বও এখানে প্রকাশিত।

আমাদের প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। এখন হইতে ধারাবাহিকরূপে আমরা কবিকে দেখাইতে যাইব না। তাঁহার কাব্যজীবনের বিচিত্র প্রথমভাগকে আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি; পরের সমস্তই শান্ত ও স্বচ্ছল। ইহার-পর দেশ-প্রীতিতে ও কর্ম্মের আহ্বানে তিনি ভারতবর্ষের অতীতকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলেন। 'সংকল্প' ও 'স্বদেশে' 'কথা' ও 'কাহিনীতে' তাঁহার সে দেশপ্রীতি জানা যায়। এই খানেই তাঁহার কাব্যজীবনের দ্বিতীয়াংশের পরিচয় পাই। তিনি দেখাইয়াছেন, আমাদের অতীত খুব উজ্জল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের অতীতের দিকে চাহিয়া থাকিলেই চলিবে না। এই উজ্জল অতীতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে হইলে আমাদিগকে এখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন এই কাব্যখণ্ডে রবীন্দ্রনাথের আর যে বিশেষত্ব আছে তাহা আমরা সর্ব্বপ্রথমেই দেখাইয়া আসিয়াছি। মনুষ্যত্বের আদর্শকে উচ্চে ধরিয়া সে আদর্শেই তিনি দেশ-প্রীতিকে অনুপাণিত করিতেছেন। আমরা এক্ষণে কবিবরের 'মানস-সুন্দরী' ও 'জীবনদেবতার' কথা বলিয়া 'খেয়া' 'নৈবেদ্য' এবং গীতাঞ্জলার" মূলভাবটী জানাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। 'মানস-সুন্দরীতেই কবির কাব্যজীবনের তৃতীয়াংশের সূচনা। এই অংশে কবি বিশ্বপ্রকৃতিকে আদর্শ মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত করিয়া তাঁহার সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

উচ্চভাবের প্রেম সুন্দরকে পূজা করে—এই পূজাতেই সৌন্দর্য্যের সার্থকতা। কবি 'মানসসুন্দরী'তে উপাসকের বেশেই বসিয়া আছেন। আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার এই বেশ নূতন নয়। সমালোচক বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (প্রবাসী) ঠিক বলিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের প্রণয়গীতি আবাল্য পূজার রাগিণীতে বাঁধা।

প্রেমাস্পদ আকাঙ্ক্ষা পুরাইবার বস্তু নহে। আপন অসীমতায় সে স্বীয় মূর্ত্তি-বিশেষকে মিলাইয়া দেয়; প্রণয়ী তখন তাহার পূজার আরতিতে মগ্ন হয়। প্রথমে প্রেমাস্পদ মূর্ত্তিবিশেষে প্রকাশিত হইয়া কবির উচ্ছ্বসিত প্রাণের অধীশ্বর হইয়াছিলেন; এখন বিশ্বসৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজকে লুকাইয়া রাখিয়াও কবির আনন্দময় প্রাণের অধিশ্বর রহিয়াছেন। কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন,—

> 'সুন্দর হৃদি রঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার
> তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার'।

নীল অম্বর ইহাকেই বুকে করিয়া রহিয়াছে। সঙ্গীতের অজস্র প্রবাহ ইহাকেই ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া উঠিয়াছে। কবির সমস্ত মর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার সকল আশা, সকল স্মৃতি ইহারই দিকে ছুটিয়া লুটিয়া বহির

গিয়াছে। কত বিচিত্রভাবে কবির এই জীবনদেবতা আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন; কত ললিতছন্দ ইহার ছন্দভঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে—'কত মঞ্জুল রাগিণী' কবির অন্তর্জগতেও ইনি ব্যাপিয়া রহিয়াছেন

'অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী'।

তাহার উষালোক সম স্থির হাসিতে কবির হৃদয় উদ্ভাসিত। কবির ভাষা, কবির ভাব লইয়া কত কি খেলাই তিনি খেলিয়া থাকেন। কবি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কবির মনে হয় জন্মে জন্মে বুঝি ইহাকেই তিনি পূজা করিয়াছেন—যৌবনে প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে বুঝি ইহারই জয়গান গাহিয়াছেন, বুঝি অন্তরে বাহিরে কেবল ইহাকেই অনুভব করিয়াছেন। হয়ত ভবিষ্য-জীবনে ইহারই সহিত আবার দেখা হইবে—তখন,

"নিদ্রিত অতীত কাঁপি উঠিবে চমকি
লভিয়া চেতনা। জানি মনে হবে মম
চির জীবনের মোর ধ্রুব তারা সম
চির পরিচয় ভরা ঐ কাল চোখ!"

কবি তাই ইহার পায়েই সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন—ইহাকেই তিনি সেই শাশ্বত এক বলিয়া জানিয়াছেন। 'নৈবেদ্যে' তিনি গাহিয়াছেন—

'তোমারি রাগিনী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো,
তোমারি আসন হৃদয় পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো'।

খেয়ায় ইহারই উদ্দেশে এই বিশ্বাত্মার সহিত আপনার যোগ ঘনীভূত করিতে কর্ম্মের পথ হইতে কবি বিদায় লইতেছেন—

"বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি ত আর নাই।
× × ×
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই
তোমরা মোরে ডাক দিও না ভাই'।

গীতাঞ্জলিতে কবির এ সাধনা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে
নয়ক আমার আপন মনে
সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়
সেথায় আপন আমারো।

গীতাঞ্জলিতে ও প্রথমে ব্যগ্রকণ্ঠে কবিকে গাহিতে শুনিয়াছিলাম—

'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে
এস গন্ধে বরণে এস গানে।
× ×
এস নির্ম্মল উজ্জ্বল বসন্ত
এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত
এস এস হে বিচিত্র বিধানে'।

তাহার উপাস্য, তাহার ঐ ব্যগ্র আহ্বান উপেক্ষা করেন নাই। পরেই কবিকে বলিতে দেখি,

'আমার নয়ন—ভুলানো এলে
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলি তলার পাশে পাশে
ঝরাফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙা-চরণ ফেলে,
নয়ন-ভুলান এলে'।

কবির হৃদয়-দুয়ার ভাঙ্গিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। আজ আকাশ হইতে প্রভাত আলো তাঁহার পানে হাত বাড়াইতেছে। শস্য ক্ষেতের সোণার গানে ও কবি যোগ দিয়াছেন। আপনাকে এইরূপে কবি জগতে প্রসারিত করিয়া ফেলিয়াছেন। চারিদিকে গান বাজিয়া উঠিয়াছে—

'সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে
সুরে হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী'।

চারিদিকে প্রাণ নাচিতেছে ছুটিতেছে—তাহার 'গগন-ভরা পরশখানি লাগে সকল গায়'। কবি গাহিতেছেন,

'ডুব দিয়ে এই প্রাণ সাগরে
নিতেছি প্রাণ রুক্ষভরে
আমায় ঘিরে আকাশ ফিরে
বাতাস বহে যায়'।

ইহাই গীতাঞ্জলির গীতাভাস। কবি এই বিশ্বযোগে নূতন প্রাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মুখের পুরাতন ভাষা নবীন হইয়া গুঞ্জরিয়া উঠিয়াছে। বলিতেছেন—

"পুরাতন পথ শেষ হয়ে গেল যেথা
সেথায় আমারে আনলে নূতন দেশে।'

ইহা যেন 'নিষ্ক্রমণের'ই পুরাতন রাগিণী। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের" মধ্যে আবার তিনি নূতন আবেগে গাহিয়া ছুটিয়াছেন। নিষ্ক্রমণের উদ্যম আবার তাঁহার মাঝে যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। কবি-জীবনে প্রভাতের অরুণরাগের আভাস সন্ধ্যার রক্তিম আভায় যেন পাইতেছি। তাই মনে হয়, কবি-জীবনের এই বিবর্তন অতি স্বাভাবিক।

রাত্রির সৌন্দর্য্যেই কবিজীবন এখন উদ্ভাসিত। তাহার বর্ণনা অবকাশ পাইলে আর একদিন করিব। আজ কথান্তরে কবি-প্রভাব সম্বন্ধে একটু বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

দেশকালপাত্রভেদে কবি-প্রভাব এক এক ভাবে অনুভূত হয়। উপস্থিতকালে আমাদের এই বাঙ্গালী কবির কোন্ প্রভাব বা কিরূপ প্রভাব বাংলা দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী যুবককে উদ্বোধিত করে ও করিবে, তাহার আলোচনা এ প্রবন্ধে করিলে অসঙ্গত হইবে না।

আমরা দেখিয়াছি, কবি রবীন্দ্রনাথে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট হইয়াছে উহা তাঁহার প্রাণের আবেগ। তদীয় কাব্যজীবনের প্রথম অবস্থা হইতে এই পরিণত অবস্থা পর্য্যন্ত উহা সমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই জীবনকে আমরা উপেক্ষা করিব না—সংসারের—নানা বাধা বিঘ্ন ব্যর্থতার মাঝেও জীবনানুভূতিকে কখনও ভুলিব না—সকল দীনতা হীনতার উপর জীবনের, শুধু জীবন পাইবার, শুধু জীবনপথে চলিবার আনন্দকেই বুঝিয়া লইব—সমস্ত পরিবর্তন আবর্তনের মধ্যে, জরামৃত্যুর বন্ধনে জীবনকে জীবন বলিয়াই মানিব—বিশ্বাস রাখিব, উহা, অজর, অমর, অচঞ্চল—অসীম মহত্ব, অপরিসীম সৌন্দর্য্য উহাতে নিহিত—উহাই আমাদের সত্য; ভূমৈব; আমাদের এ বিশ্বাসের আবেগ আমাদের পরস্পরকে নিকটতর করিয়া তুলিবে—আমাদের সহিত আমাদের পারিপার্শ্বিকের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করিবে—প্রাণের উচ্ছ্বাসে বাতাসে আকাশে পৃথিবীতে আমরা ছুটিয়া ফিরিব—আলোর গীতে আঁধারের গমকে আমরা গাহিয়া উঠিব আমাদের জীবনগান,—বিস্ময়মুগ্ধ সমগ্রবিশ্ব আমাদের গান শুনিয়া আত্মহারা হইবে;—কবি ইহাই গাহিতেছেন।

আমাদের দৈন্যজীর্ণ সঙ্কীর্ণ অবস্থার গণ্ডীকে ঘৃণাভরে অবহেলা করিয়া কখনো তিনি বলিয়া উঠিয়াছেন

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন!
ছুটেছে ঘোড়া উড়েছে বালি
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন
বরষা হাতে ভরসা প্রাণে, সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।

কখনো বা মত্ত উল্লাসে তিনি গাহিয়াছেন

নিমেষতরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে,
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন উচ্ছ্বাসে।
শূন্যব্যোম অপারমনে
মত্তসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্দ্ধনীলাকাশে।

অনেকে বলিয়া থাকেন রবিবাবুর আজকালিকার কবিতাসমূহে একটা উদাসীভাব—একটা "যাই যাই" ভাব—জীবনের একটা পরিসমাপ্ত হোক, এমন কোনও ভাব বেশী ফুটিয়া থাকে; এবং এতে যেন তাঁহার জীবনাবেগ

কমিয়া আসিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। আমি বলিব, এই লোক হইতে লোকান্তরে যাইবার ইচ্ছায়, জীবনের পরিসমাপ্তির কথায়, কবির জীবনাবেগ একটা নূতনত্ববোধের অন্বেষণেই উদ্দাম গতিতে ছুটিতেছে। ইহা তাঁহার জীবনেরই একটা নূতন বৃহৎ অনুভূতি।

আর আমি দেখিতেছি, এই যে ব্যগ্র জীবনানুভূতি, উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগ, যাহা কবির যাত্রাপথে 'নিষ্ক্রমণ' হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বন্যার প্লাবনে বহিয়া চলিয়াছে—ইহার প্রভাবই বাঙ্গালী জাতীয় ইতিহাসের বর্ত্তমান নবযুগে বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের উপর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ও করিবে। জীবন বোধের যে চাঞ্চল্য আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের অংশে অংশে সাড়া দিতেছে, তাহার সহিত কবির কাব্য জীবনের এই প্রধান সুর মিলাইয়া দেখিলেই উল্লিখিত মতের যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। বর্ত্তমান যুগ বাংলার নব জাগরণের যুগ। রবীন্দ্রনাথ এই নবজাগরণেরই প্রধান কবি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র ভাদুড়ী এম, এ,

---

# "বউ কথা কও"

দজ্জাল শাশুড়ী ওই ফিরিছে ডাকিয়া!
কেন সাধো এবে "বউ কথা কও" বলি'?
ছিল না কি পূর্ব্বে মনে? মরমে মরিয়া
নিয়ত কেঁদেছে বধূ! তাই গেছে চলি'!
মিছাই চেঁচাও, পাখী; বৃথা ও কাকলি!
আর না আসিবে ফিরি'! জ্বালা না সহিবে
আর! সাধো না যতই কেন, না কহিবে
কথা পুনঃ! চলে' গেছে সহিয়া সকলি,
ননদ শাশুড়ী-জ্বালা নিশিদিনমান!—
ওগো বধূ, কোথা একা কাঁদো অনিবার!
গলা ছেড়ে গাহো, দেশ শুনুক সে গান!
ননদ-শাশুড়ী করে বড় অত্যাচার!
তোমার মত ঘরে ঘরে বঙ্গকুলবালা
সহিতেছে প্রতিদিন কত শত জ্বালা!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

# স্নেহের দান।

( ১১ )

মণির মা প্রথম যখন শুনিলেন, মণি স্বামীজীর সহিত 'কারণ' নাম করিয়া মদ ও সিদ্ধির নাম করিয়া গাঁজা খায় এবং আশ্রমের শিষ্যা স্ত্রীলোকদিগের সহিত নিঃসঙ্কোচে চলা ফিরা করে, তখন তিনি তাহা ছেলের চোখ মুখ ফুটিবার লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন; এবং ছেলের যে স্বর্গীয় কর্ত্তাদের হাব্‌ভাব অল্পে অল্পে আয়ত্ব হইতেছে, তাহা ভাবিয়া গর্ব্ব অনুভব করিলেন। তিনি ভাবিলেন মন্দ কি? জমিদারী চাল চলন বজায় রাখিতে হইলে লোক দেখানো সব পদই আয়ত্ব থাকা চাই। হয়ত এইরূপে মাখনের ক্ষুদ্র দৃষ্টির প্রভাবটা কাটিয়া যাইবে। এইরূপ আত্মতুষ্টির ভাবের ভিতরও একটু চিন্তার ভাব যে তাঁহার মনে না আসিত, তাহা নহে। কিন্তু মণি কি তেমন মানুষ! সে কি মাতাল হইয়া স্বর্গীয় কর্ত্তার ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিবে? তেমন মানুষ যে মণি কোন দিনই নয়!

স্বর্গীয় কর্ত্তার অবস্থা মনে হইলেই মণির মার মন সিহরিয়া উঠিত। ছেলের স্বভাবের প্রতি মায়ের মন কিছুতেই এতখানি অগ্রসর হইতে পারিত না।

মণির মা'র মনে এইরূপ দ্বন্দের ভাব সময় সময় হইত এবং তাহা তাঁহার ভাবের অনুকূলেই মীমাংসা হইত।

অবশেষে এক দিন এই দ্বন্দ ভাব কাটিয়া গেল, মা ছেলের অবস্থা দেখিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন।

জমিদার বাড়ীর প্রায় অন্দর বাড়ীর ভিতরই স্বামীজীর শ্রীপাট স্থাপিত হইয়াছে। মণিমোহন সারাদিন মদে বিভোর থাকিয়া তাহার গুরুভ্রাতা ও ভগ্নী দিগের সহিত আহার বিহার, শয়ন উপবেশন ও কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে। স্বামীজী এই পন্থাই মণির ধর্ম্মজীবন লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মণির জমিদারী শাসন করেন স্বয়ং স্বামীজী। মণি স্বামীজীকে তাহার স্থলবর্ত্তী করিয়া দিয়া নিজে গুরুর আদেশে ভোগের পথে সিদ্ধির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

নেসার দোষ-ই এই যে সে সঙ্কোচের সহিত অত্মপ্রকাশ করে এবং তাহাতে কোন বাধা না ঘটিলে সে তাহার সঙ্কোচের পরিসর অবলীলা ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে অসঙ্কোচে রাজত্ব করে।

মণিও প্রথম সঙ্কোচের সহিতই কারণ গ্রহণ করিত; কিন্তু যখন গুরুর শ্রীমুখ হইতে শুনিল যে সঙ্কোচের ভিতরই পাপ লুক্কাইত, তখন সে আর সে ভাবটী ত্যাগ করিতে অণুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করিল না। তারপর হইতে যাহা গুরু নিষেধ না করিতেন তাহা সে কদাপি পাপ বলিয়া মনে করিত না। এইরূপে তাহার ভোগ স্পৃহা অবলীলা ক্রমে নিঃসঙ্কুচে বৃদ্ধি পাইয়া চরমে উঠিল। মণির মা তখন ছেলের অবস্থা ভাবিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

আজ দুই বৎসর যাবৎ এ অঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। প্রজার খাজানা আদায় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গত পূর্ব্ব বৎসরের, অতিবৃষ্টি ও প্লাবনে কৃষকের ক্ষেত্রের শস্য ক্ষেত্রেই নষ্ট হইয়াছে; গতবৎসর আনাবৃষ্টিতে বারআনা জমিই পতিত পড়িয়াছে, ফলে অগ্রহায়ণে ফসল হয় নাই। চৈত্রমাসে দেশে প্রকৃত পক্ষেই আহাকার উঠিল—সাড়ে তিন টাকা মনের স্থলে দেখিতে দেখিতে চাউলের মূল্য আট টাকায় দাঁড়াইল, প্রজার গৃহে ভাত নাই, খাজানা দিবে কোথা হইতে?

সরকারী রাজস্বের সংস্থান জন্য স্বামীজী কড়া শাসন চালাইলেন বটে কিন্তু ফল শুভ হইল না।

দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ছোট হিস্যার কর্ত্রী ম্যানেজারকে প্রজার বর্ত্তমান কিস্তি রেহাই দিতে আদেশ করিলেন। ছোট হিস্যা হইতে খাজানা রেহাই পাইয়া প্রজারা বাহানা ধরিয়া বসিল, সুতরাং বড় হিস্যার কিস্তির খাজানা ও আশ্রমের রাজসিক ব্যয় সম্পাদন চিন্তায় স্বামীজী বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

মণিমোহনের উপদেশে পূর্ব্বে ম্যানেজারই বড় হিস্যার অনেক বাহুল্য খরচ কমাইয়া ফেলিয়াছিলেন; অনেক আত্মীয় স্বগন, দাস-দাসী বিদায় করিয়াছিলেন। এই পরিবর্ত্তন লইয়াই ম্যানেজার ও কর্ত্রীতে কথাবার্ত্তা হয় এবং তাহার ফলে ম্যানেজার পদত্যাগ করিয়া ছোট হিস্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন

এই বার বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া আরও কতগুলি ছোটবড় অতিরিক্ত অনাবশ্যক খরচ তুলিয়া দিয়া কীর্ত্তন ও আশ্রম রক্ষার ব্যয় কোন কোন বাবতে বৃদ্ধি করার জন্য এবং রীতিমত সময়ে সরকারী রাজস্ব প্রদান জন্য স্বামীজীতে ও মণিমোহনে পরামর্শ হইল।

স্বামীজী বলিলেন "বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই পরমধর্ম্ম। পর্ণ কুটীরে বাস, একাহার, স্বপাক ভোজন, কুশাসন শয্যা, একবাস—তোমার মার জন্য আমি তাহারই ব্যবস্থা করিব। ইহাতে একাধারে চিত্তের উন্নতি ও ধর্ম্মপথে সিদ্ধি-উভয়ই যুগপৎ লাভ হয়।"

মণি বলিল—"প্রভুর ইচ্ছা।"

স্বামীজী—"দ্বিতীয় বিচার্য্য, সরকারী রাজস্ব। এবার দুর্ভিক্ষ প্রবলতর হইয়াছে। ছোট হিস্যার কর্ত্রী প্রজার চৈত্র কিস্তির খাজানা আউস ফসল উঠাইয়া পরিশোধ করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রশ্রয় পাইয়া, প্রজারা আমাদের খাজানাও রেহাই প্রার্থনা করিতেছে। এখন প্রার্থনা করিতেছে, সুযোগ বুঝিলে, ছোট হিস্যার প্রশ্রয়ে ও সমর্থনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে। যাক্, সে কথা পরে, ভাবিব। এখন সরকারী রাজস্ব তো ২।১ দিন মধ্যেই চাই; উপায় কি?"

মণি—বলিল "মতি চাঁদের কুঠিতে হেণ্ডনোটই দিতে হইবে; তাহা দিব। আষাঢ়ে পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।"

স্বামী "তোমার মার তহবিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ জমা আছে। বিধবার পক্ষে অর্থ সর্ব্বদাই অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়; বিশেষ জমিদার ঘরের বিধবা—চক্ষু মুদিলেই দেখিবে, ভাণ্ডার শূন্য। টাকাটার সদগতি করিতে হইবে। আপাতত বাহিরে ঋণ না করিয়া মার নিকট হইতেই টাকাটা বাহির কর। কেমন? বাহিরে বদনাম করার চেয়ে ঘরে ঋণ করা ভাল—তোমার কি মত?"

মণি—"তাহাই করিব।"

স্বামীজী—"তৃতীয় বিষয় গুরুতর। সংসারে আসিয়া এখন আমরা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পন্থা হইতে চ্যুত না হই - এ বিষয়ে লক্ষ্য থাকা উচিত

মণি—"উচিত।"

স্বামী—"এখন প্রতিদিন কীর্ত্তনে দুইশত লোক ভোজন করিতেছে। আপাততঃ এই সংখ্যাই নির্দ্দিষ্ট থাক। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে একার্য্যের ন্যায় মহৎ কার্য্য আর কিছুই নাই। অন্ন দান মহাদান, বৎস স্বর্গ যদি আছে—স্বীকার কর, তবে অন্ন দাতার জন্যই যে সে স্বর্গ—ইহাতে আর বিচার বিতর্কের বিষয় কিছু নাই।"

মণি—"নাই।"

স্বামীজী "রামকৃষ্ণ দরিদ্র নিঃসহায় লোক। তাহার মেয়েটীকে এখন পাত্রস্থ করিতে হইবে। সে আমাদের আশ্রমে স্ত্রী-কন্যা লইয়া আছে বলিয়া সমাজে আটক পড়িয়াছে; সুতরাং তাহার মেয়ের জন্য আমরাই এক প্রকার দায়ী। মেয়েটীও তোমার বেশ অনুগতা; তাহার গতি তোমার করা উচিত—ধর্ম্মতঃও সেজন্য তুমি দায়ী। রামকৃষ্ণের বড় ভাই আসিয়াছেন। আর যদি কিছু সাহায্য কর, তিনিও তাহার গতির-পন্থা দেখিতে পারেন। হাজার খানেক টাকা হইলেই হয়। ভগবান এই সকল কার্য্যেই তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্রেও বলে "দরিদ্রাণ্ ভর কৌন্তের..."

মণি মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

স্বামীজী মণিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"তা যাক; সদর খাজানার গোলমালটা মিটিয়া যাক; তারপর বৈশাখ মাসে কি জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহা দেওয়া যাইতে পারিবে।

মণি বলিল—"হুঁ"।

তাহার মুখ হইতে স্পষ্ট কথা বাহির হইল না।

( ১২ )

জমিদার বাড়ীর গৃহে গৃহে শিষ্য-শিষ্যাদিগের স্থান দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতেও স্থান সংকুলান হইতেছিল না।

আজ দুই তিন বৎসর মাত্র দীনানন্দ এ অঞ্চলে আসিয়াছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার মোহিনী শক্তি প্রভাবে বহু ভদ্র অভদ্র স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে। তাহাদের এক এক পরিবার এক এক ঘর অধিকার করিয়া বসায় মণির মা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন। ইহার পর নিজ সংসারের কর্ত্তৃত্ব প্রভাবও কিছু কিছু করিয়া বাধা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া তিনি একেবারে রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন।

স্বামীজীর আদেশ—তাঁহাকে আজ দালান ছাড়িয়া এক খানা ঘরে থাকিতে হইবে—শুনিয়া তিনি দুঃখে ও ক্ষোভে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উপায় নাই। আত্মীয় স্বজন যাহারা এত দিন তাঁহার তাঁবে থাকিয়া তাঁহাকে কর্ত্রী বলিয়া, রাণী মা বলিয়া সম্মান করিত—আজ তাহারা সকলি তাড়িত হইয়াছে, পুরাতন দাস দাসী গুলির পর্য্যন্ত রাজবাড়ীর চতুঃসীমায় আসিবার অধিকার নাই। কর্ত্রী আজ কাহার কাছে যাইয়া তাঁহার প্রাণের বেদনা জ্ঞাপন করিবেন! বড় হিস্যার অন্তঃপুর হইতে ছোট হিস্যার অন্তঃপুরে যাইবার যে দরজা ছিল, স্বামীজীর আগমনের পর ছোট তরফ হইতে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং সেখানে যাইয়া হৃদয়ের এই জ্বালা জুড়াইবারও আর পথ নাই।

মণির মা কাঁদিয়া কাটিয়া যাইয়া গোপী ভাণ্ডারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেয়ালের পাশেই এই বিশ্বস্ত ভাণ্ডারীর গৃহ। বৃদ্ধ গোপী চিরদিন রাজ অন্নে প্রতিপালিত। শেষ বয়সে মণি তাহার কুলে কলঙ্ক দিতে বসিয়াছে। গোপী সেই কথাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, আর অদৃষ্টের ধিক্কার দিয়া স্ত্রীপুত্র কন্যা বধু বর্ত্তমান সত্ত্বেও নিজে আখা ধরাইয়া ভাত সিদ্ধ করিতেছিল।

গোপী রুরোদ্যমানা কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে তাহার নিজ উঠানে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল তারপর আসিয়া কর্ত্রীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। সেও কর্ত্রীর দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বিশেষ করিয়াই শুনিয়াছিল। কিন্তু আজ যে তাঁহাকে তাঁহার নিজ বাস গৃহ হইতে উঠিয়া যাইয়া দাসীদিগের জন্য রক্ষিত টিনের ঘরে বাস করিতে হইবে বলিয়া আদেশ করা হইয়াছে—তাহা সে জানিত না। গোপী নিজের দুঃখেই কাঁদিয়া ছিল। এখন সসব্যস্তে বলিল—"মা ঠাকুরান্ এমনভাবে আসিলেন কেন, একটা খবর দিলেতো পায়ের দরজা দিয়াও যাইয়া শ্রীচরণে সেবা দিয়া আসিতাম।"

কর্ত্রী চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "বাবার বাপ, আমার

কি আর সংবাদ পাঠাইবার লোক আছে? আমি যে আজ আপন ঘরে কাঙ্গালিনী। তুমি কবিরাজ মহাশয়কে একবার না ডাকিয়া দিলে হইবে না। আমার যে আর পরামর্শেরও স্থান নাই।"

গোপী দুই হাত জোড় করিয়া বলিল—"যান মা, আমি কবিরাজ ঠাকুরকে লইয়া আসিতেছি—আমার ভাতটা........."

কর্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন -'তুমি রাধিতেছ রামুর বাপ, রমার মা, বউ—তারা সব কোথায়?

গোপীর অন্তরে তুফান ছুটিল, চক্ষে পুনরায় জলধারা বহিল। সে বলিল—"কি আর বলিব মা—মণি আমার কুলে কলঙ্ক দিল; মা, সকলেই স্বামীজীর শিষ্য হইয়াছে—বার চৌদ্দ বছরের মেয়ে, আঠার বছরের বউ—আমার সে দিকে যাইবার হুকুম নাই। আজ চার দিন তারা বাড়ী ছাড়া। মণি—মা—মণি ....

"বলিতে বলিতে বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

কর্ত্রী বলিলেন—"কোথায়, আমি তো মামুর মাকে রামুর বৌকে বা কেমিকে আমাদের বাড়ীতে দেখি নাই।

গোপী—"আপনি কি আর বাহিরে যাইতে পারেন মা? বাহের খণ্ডে, মধ্য খণ্ডে, পুজার খণ্ডে, কাছারী খণ্ডে, বাগান বাড়ীতে, পুকুর পাড়ে, অতিথি খণ্ডে—ঘরে ঘরে কীর্ত্তন—ঘরে ঘরে মাগি মর্দ্দে লাফাইতেছে—দশা পড়িতেছে। কি বিতিগিচ্ছা কাণ্ড—মা জাত আর রইল না? বুড়ী মাগিটা পর্য্যন্ত ঘরের বাহির হইয়া গেল। স্বামীজী বলিতেই অজ্ঞান—পাড়াকে পাড়া উজাড়। কত বদমাহেশ যে জুটিয়াছে মা, সে কি আর বলিব? মণি সর্ব্বনাশ করিল মা, দেশের কুল মজাইল। খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়া নিজেরও সর্ব্বনাশ করিল—পরের···

কর্ত্রী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "কাছারী খণ্ডে, পুকুর পাড়ে নাচ হয়, তবে কাছারী বসে কোথায়?"

গোপীও বিস্ময়ের সহিত বলিল—"মা আপনি কি কিছুই জানেন না? কাছারী কবে এখান হইতে সরান হইয়াছে। কাছারী হয় সেই জীবানন্দ আশ্রমে, এখানে বাহিরের জন মানব আসিবার উপায় নাই। ছোট হিস্যার ম্যানেজারও দুই হিস্যার পথঘাট-সংশ্রব সব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের কোন লোকও এবাড়ীতে আইসে না। মণি অধঃপাতে গেল মা। নিজেতো গেলই, দেশের মুখে কলঙ্ক দিয়া গেল। মা. মদ, গাঁজা, সন্দেশ, লুচি, মাংস-জীবাশ্রম হইতে অনবরত আসিতেছে—এসংসার কি আর থাকিতে পারে মা? বড় কুঠি হইতে রোজ হুণ্ডিতে টাকা কর্জ্জ হইতেছে।"

বৃদ্ধ গোপীর দুঃখের কথা শুনিয়া প্রথমে কর্ত্রীর মনটা কিছু পাতলা হইয়াছিল। গোপীর দীর্ঘ নিশ্বাসের অভিসম্পাত ভয়ে ও প্রত্যক্ষ বিপদ গুলির কথা শুনিয়া কর্ত্রী পুনরায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু উপায় কি?

কর্ত্রী গোপীকে ভরসা দিয়া বলিলেন—রামার বাপ মণিকে তুমি অভিসম্পাত করিও না; আশীর্ব্বাদ কর, ভগবানের ইচ্ছায় তাহার সুমতী হউক; তুমি কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া আইস। মণি আমার এমন ছেলে নয়। আমি একবার তাহাকে পাইলেই হইত।"

কর্ত্রী গোপীকে শীঘ্র যাইতে অনুরোধ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলেন এবং আসিয়া নিজ দালানের কান অংশে কাহাকেও অধিকার দিবেন না সঙ্কল্প করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধকবিরাজ মহাশয় গ্রামের মধ্যে বয়সে ও বুদ্ধিতে প্রবীন লোক। তিনি রাজবাড়ীর গৃহ চিকিৎসক। সুতরাং তাঁহার ভিতর বাড়ীতে যাইবার দ্বার মুক্তছিল। গোপী ভাণ্ডারী তাঁহাকে লইয়া ভিড় ঠেলিয়া ভয়ে ভয়ে যাইয়া ভিতর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। পথে এদিক সেদিক চাহিয়াও বারে বারে দেখিল বাড়ীর মেয়ে গুলিকেনি সে কোথাও দেখিতে পায়—তাহা সে পাইল না।

কবিরাজ মহাশয় আসিয়াছেন জানিয়া কর্ত্রী দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন। তিনি বারান্দার চেয়ারে উপবেশন করিলে ভিতর হইতে গোপীকে মধ্যে উপলক্ষ্য রাখিয়া কবিরাজ মহাশয় শুনিতে পারেন এমন ভাবে কর্ত্রী তাঁহার নিজের দুর্দ্দশার কথা এবং স্বামীজীর অন্তঃকার দালান পরিত্যাগের আদেশ—তাহাকে সব বলিলেন এবং শেষ কাঁদিয়া কাটিয়া তাঁহার নিকট সদোপদেশ চাহিলেন।

আজ কর্ত্রীর নিকট "দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য" তাই যাহার সহিত কোন দিন কখনও কোন কথা

মুখ ফুটিয়া বলার প্রয়োজন হয় নাই, তাঁহার নিকটও তিনি আজ মুখরা হইয়া অনর্গল বকিয়া গেলেন এবং কাঁদিয়া আত্ম দৈন্য প্রকাশ করিতে অনুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। আজ বিপদ তাঁহার এমনি সঙ্গিন হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া ফেলিয়াছে।

কবিরাজ মহাশয় নস্যের ডিবা হইতে এক টিপ নস্য লইয়া তাহা নাসিকায় টানিলেন; তারপর গোপীর হাত হইতে হুকাটা লইয়া ধীরে ধীরে টান দিতে দিতে বলিলেন—"অসাধ্য ব্যাপার! মণিই তাহা প্রাঞ্জল করিয়া তুলিয়াছে। উপযুক্ত পুত্র অবাধ্য হইলে—হাত ছাড়া হইলে—সে যে কি দুর্ঘট ব্যাপার, তাহা আমার আর বুঝিবার বাকী নাই। যাক্ আপনি কস্মিন্ কালেও ভাণ্ডার গৃহ ছাড়িয়া এক পদ নড়িবেন না। তহবিলটা যেন কোন মতেই হস্তচ্যুত না হয়। এ আপদ দূর করিতে না পারিলে, রক্ষা নাই। গ্রামের রক্ষা নাই—দেশের রক্ষা নাই। ধর্ম্মের নামে অন্যায় ও অধর্ম্ম হইতেছে। মণি এখন উন্মত্ত মোহগ্রস্ত। তাকে আটক করিয়া যদি—"এইস্থানে কবিরাজ মহাশয় হটাৎ আমরা চারিদিক সভয়ে লক্ষ্য করিয়া খুব ধীরে ধীরে বলিলেন—"ওটাকে লাঠি মারিয়া তাড়াইতে পারেন, আপদ দূরে যায়। তবে সেরূপ কার্য্য আপনার পক্ষে এখন একরূপ অসাধ্য; ছোট তরফের সহায়তা লইলে সহজ হইতে পারে।"

কবিরাজ মহাশয় থামিয়া হুকা টানিতে লাগিলেন। তারপর হুকায় জোড়ে টান দিয়া বলিলেন—"আর একটা সহজ পন্থা—বিষস্য বিষং-ঔষধম"—ওই মাখন্ ছোকরাটাকে আনান। ওটাকে আনিলে বোধ হয় একদম সব পরিষ্কার হইতে পারে।"

গোপী বলিল—"এখন যা দেখিতেছি, সেটাই ছিল ভাল......"

কবিরাজ মহাশয় হুকাটীর শেষ দম নিকাশ করিয়া অনিচ্ছার সহিত তাহা গোপীর হাতে দিয়া উঠিলেন।

গোপী এই সুযোগ পরিত্যাগ করিল না। কবিরাজ মহাশয়কে একটু অগ্রসর করিয়া দিয়া স্ত্রী-পুত্রকন্যা-বধুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

---

# চাষা।

যে চাষারে তোম্‌রা বাবু করছ এত ঘৃণা,
ভেবে দেখ সেই চাষারা ঘৃণার পাত্র কি না!
এরা কিন্তু ধারছে না কো সুখ বিলাসের ধার
দুঃখের জীবন ঘোর দুঃখে করছে তারা পার।
চার অঙ্গুলী কাপড় হলেই নগ্নতা হয় দূর
দরিদ্রতায় গৃহটী তার নিত্য ভরপুর।
আসবাব পত্র আর কিছু নাই এই টুকু সম্বল
সানকীতে খায় ভাত চারটী, বদনাতে খায় জল।
গ্রীষ্মকালে এই যে মশার কামড় ভয়ঙ্কর
উদ্‌লা গায়ে প'ড়ে থাকে ঘরের মেঝের 'পর।
জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টি তুফান মাথার উপর ব'য়
মাঠে গি'য় খেত চষিয়ে খেতেতে ধান রুয়।
জোঁক পোকের আর ভয় কি তাদের বজ্রের ভয় নাই?
এই চাষারাই খে'তে দিলে আমরা খে'তে পাই।
ইষ্টুপিট্, ডেম্, শূয়র গাধা বলছ নিশিদিন
ভাবছো কি গো এজীবনে শোধবে তাদের ঋণ?
তারা যদি না দেয় অন্ন মাটির পোকা হ'য়ে—
বাঁচবি না ভাই, কিমাখনের শুধু শরণ ল'য়ে।
ভূমি করে রত্ন প্রসব এই চাষারই হাতে
ধান্য গোধুম ইক্ষু কলাই পয়সা নাই কোন্‌টাতে
যাদের কেবল শোষণ ক্রিয়া আসন পে'তে ব'সে
কোন্ প্রাণে বা চাষার পিঠে চাবুক তারা কসে?
অন্নদাতা ত্রাতা ব'লে না ধরে তার হাত
কেমন ক'রে করছ ঘৃণা চাষারে দিনরাত?
তাই বলি ভাই দেশোন্নতির যদি কর আশা
সবার আগে চাই গো তবে চাষায় ভালবাসা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।
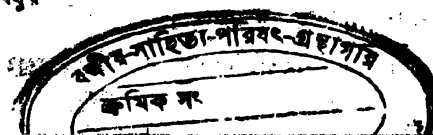
# জ্যোতিষে অয়ন সিদ্ধান্ত।

অস্মদ্দেশীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের গণিতাংশ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল গ্রন্থে গণিত জ্যোতিষের আলোচনা করা হইয়াছে তাহাদের সাধারণ নাম সিদ্ধান্ত। যেমন সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত রহস্য, সিদ্ধান্ত শিরোমণি ইত্যাদি। কিন্তু সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ যাহা Theory, তাহার কিছুই ঐ সকল গ্রন্থে নাই। সুতরাং ইঁহাদের নামের কোন স্বার্থকতা দেখা যায় না। ঐ সকল গ্রন্থ শুধু কতকগুলি সূত্র বা শ্লোকে (formula) পরিপূর্ণ।

সম্ভবতঃ উক্ত গ্রন্থ সমূহের অংশ বিশেষে সিদ্ধান্তের আলোচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে মেধাবী পণ্ডিতের অভাব হওয়াতে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। অথবা ইহাও সম্ভব যে এই সিদ্ধান্তের জ্ঞান গুরু মার্গগামী ছিল। কেন না জ্যোতিষ অতি দুরূহ শাস্ত্র। কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া সকলে ঐ জ্ঞান সহজে আয়ত্ব করিতে পারেনা। তজ্জনাই বোধ করি যে, কোন গ্রন্থেই এ সকল বিষয় বিস্তারিত রূপে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। গুরু শিষ্যকে অধ্যাপনার কালে এ সকল বিষয় বিস্তারিত শিক্ষা দিতেন তখনকার দিনে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। সুতরাং হাতে গ্রন্থ লিখিয়া বিস্তৃত সিদ্ধান্ত বা Theory শিক্ষা করাও সুবিধা হইত না। তাই ২।৪ জন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি এগুলিকে সাধারণের কার্য্যোপযোগী করিয়া সূত্র বা formulaর আকারে অতি ছোট ছোট শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফলে এই হইয়াছে যে ইঁহারা গ্রহগণের গতি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের সার সঙ্কলন করিয়া ঐ দুরূহ শাস্ত্র, সকলের কণ্ঠস্থ রাখিবার উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আর একটী গুরুতর অসুবিধাও হইয়াছে—আমরা মূল সিদ্ধান্তটী হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

এই সকল সিদ্ধান্তের প্রায় সকল সূত্রেই নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দেশ আছে মাত্র। যেমন অমুক সংখ্যাকে দুই দ্বারা পূরণ করিয়া ৫ দিয়া ভাগ করিলে অথবা ইত্যাদি ইত্যাদি প্রক্রিয়া সম্পাদন করিলে অমুক বিষয়টী বাহির হইবে। কিন্তু কেন যে দুই দিয়া গুণ করিতে হইবে, ২এর পরিবর্ত্তে ৩ দ্বারা গুণ করিলে ক্ষতি কি হইবে, ইত্যাদি প্রশ্নের কোন ও মীমাংসা নাই। বৈদেশিক জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান পাঠ করিলে সময় ২ দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাতে ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার (Indian method) উল্লেখ আছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কত উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা সকলই ভুলিয়া গিয়াছি। কেন দুই দিয়া গুণ করিতে হয় এবং কেনই বা ৫ দিয়া ভাগ করিতে হয়, ইত্যাদির তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে। তাহা হইলে ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানও অনতিকাল মধ্যেই পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে।

মহামহোপাধ্যায় রাঘবানন্দ বিরচিত সিদ্ধান্ত রহস্য হইতে উদাহরণ স্বরূপ একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে। আচার্য্য রাঘবানন্দ অয়নাংশ আনয়ণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন

শাকমেকাব্ধিবেদোনং দ্বিঃ কৃত্বা দশভির্হরেৎ।
লব্ধেনচ পুনর্হীনং ষষ্ট্যাপ্তোহয়নাংশকঃ॥

অর্থাৎ "ইষ্ট শকাব্দ হইতে ৪২১ বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের অঙ্ক কে ১০ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগ ফল লব্ধ হইবে তাহা অপর স্থানস্থিত অঙ্ক হইতে বিয়োগ করিয়া ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগ ফল হইবে তাহাই অয়নাংশ হইবে।"

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে ৪২১ বিয়োগ না করিয়া ৪২১½ কিম্বা ৪২২ বিয়োগ করিলে, এবং ১০ দ্বারা ভাগ না করিয়া ৯ বা ১১ বা অন্য কোন সংখ্যাদ্বারা ভাগ করিলে কি দোষ হইবে? গ্রন্থকার বা ভাষ্যকার এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন নাই। অর্থাৎ যে সিদ্ধান্তটীর উপর এই সূত্রটী (formula) স্থাপিত, তাহার কোন আলোচনাই হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সিদ্ধান্ত রহস্যে সিদ্ধান্ত নাই; কেবল রহস্যটুকু আছে। অথবা সিদ্ধান্তটী প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। রহস্য ভেদ করিতে পরিলেই সিদ্ধান্ত ভাসিয়া উঠিবে। ঐ প্রচ্ছন্ন সিদ্ধান্ত উন্মোচন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার মতে ১৩২৬ সনের বা ১৮৪১ শকাব্দের প্রথমে অর্থাৎ আরম্ভকালে অয়নাংশাদি ছিল ২১।১৮।০। উক্ত পঞ্জিকা সিদ্ধান্ত রহস্যানুসারে গণিত।

সিদ্ধান্ত রহস্যের সূত্রানুসারে গণনা করিলে নিম্নলিখিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

| | |
|---|---|
| শাকং | ১৮৪১ |
| একাঙ্কিবেদোনং | ৪২১ ( অঙ্কস্য বামাগতিঃ ) |
| শাকমেকাঙ্কিবেদোনং ১৪২০ ; দ্বিঃ কৃত্বা | ১৪২০ |
| দশভির্হরেৎ | ১৪২০ ÷ ০ |
| | = ১৪২ |
| লব্ধেনচ পুনর্হীনং | ১৪২ |
| ৬০ ) | ১২৭৮ |
| ষষ্ট্যাপ্তং | ২১ ( ১৮ = ২১।১৮।০ ( অয়নাংশ ) |

এই সূত্রানুসারে লব্ধ ফল ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার প্রদত্ত ফলের সহিত ঐক্য হইতেছে। কিন্তু শুধু ঐ প্রক্রিয়াতে কোন প্রকৃত জ্যোতির্ব্বিদ বা গণিতজ্ঞ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। মূলে প্রবেশ করিতে হইবে।

প্রত্যেক পঞ্জিকারই ভূমিকায় বা "জ্যোতিষ বচনার্থে" লগ্ননিরূপণ সম্বন্ধে নিজেদের ভূয়সী কৃতিত্বের কথা উল্লেখ থাকে। কিন্তু ৫।৭।১০ বৎসরের পঞ্জিকা একত্র মিলাইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ১০।১২ বৎসরের মধ্যে হয়ত একবারও লগ্ন মানের পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

যাহা হউক ; আমরা অয়নাংশ গণনার প্রকৃত নিয়ম ব্যাখ্যা সহ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

প্রায় সকল পঞ্জিকায়ই জ্যোতিষ বচনার্থে "অয়নাংশ প্রকরণং" নাম দিয়া আরও কয়েক পংক্তি লিখিত থাকে। তথায় লিখিত আছে যে "সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে বার্ষিক অয়ন গতি ৫৪ বিকলা। "মেষের আদি বিন্দু হইতে সম্পাতের দূরত্বকে অয়নাংশ বলে"।

সুতরাং ৫৪ বিকলা = $\frac{৫৪}{৬০}$ কলা = $\frac{৫৪}{৬০ \times ৬০}$ অংশ = $\frac{৯}{১০ \times ৬০}$ অংশ। ৪২১ শকের অন্তে অয়নাংশ শূন্য হইয়াছিল। তখন মেষ রাশির আদি বিন্দুতে বা মীন রাশির অন্ত্য বিন্দুতে অয়ন ছিল। অর্থাৎ তখন ৩০শে চৈত্র ও ৩০শে আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হইত। অয়নবিন্দু ৪২২ শকাব্দে ৫৪ বিকলা, ৪২৩ শকে ৫৪ × ২ বিকলা, ৪২৪ শকে ৫৪ × ৩ বিকলা ইত্যাদি নিয়মে পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছিল। ( ১৮৪১ — ৪২১ ) = ১৪২০ বৎসরে অয়ন বিন্দু কতদূর পশ্চাৎগামী হইয়াছিল তাহা অনুপাত দ্বারা বাহির করিতে হয়। এক বৎসরে ৫৪ বিকলা বা $\frac{৯}{১০ \times ৬০}$ অংশ হইলে শাকমেকাঙ্কিবেদোন ( ১৮৪১—৪২১ ) বৎসরে কত হইবে ?

$$১ : (১৮৪১ - ৪২১) :: \frac{৯}{১০ \times ৬০} : ক ::$$

$$\therefore ক = \frac{১৪২০ \times ৯}{১০ \times ৬০}$$

$$= \frac{১৪২০ \times ৯}{১০} \times \frac{১}{৬০} = ১৪২০ \times \frac{৯}{১০} \times \frac{১}{৬০} \quad (১)$$

$$= ১৪২০ \times \frac{(১০ - ১)}{১০} \times \frac{১}{৬০}$$

$$= ১৪২০ \times (১ - \frac{১}{১০}) \times \frac{১}{৬০} \quad (২)$$

$$= (১৪২০ - \frac{১৪২০}{১০}) \times \frac{১}{৬০} \quad (৩)$$

$$= (১৪২০ - ১৪২) \frac{১}{৬০}$$

$$= ১২৭৮ \times \frac{১}{৬০} = ২১।১৮।০$$

উল্লিখিত (১) চিহ্নিত স্থানে ১৪২০কে ১০ দ্বারা ভাগ করিয়া তৎপর ৯ দ্বারা গুণ করা অপেক্ষা (২) ও (৩) চিহ্নিত স্থানে ১৪২০ হইতে ১৪২০ এর এক দশমাংশ বিয়োগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই সহজ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই মহামহোপাধ্যায় রাঘবানন্দ অয়নাংশ আনয়নের শ্লোক রচনা করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রক্রিয়া হইতে সহজেই অয়নাংশের মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। মূল সিদ্ধান্তের বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়া পরে সূত্র বা formulaর অবতারণা করিলে ভাল হইত। কিন্তু গ্রন্থকার, ভাষ্যকার, বা পঞ্জিকাকার কেহই তাহা করেন নাই। এই জন্যই গণিত জ্যোতিষ সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা যদি একটী একটী করিয়া এই সূত্রগুলির প্রকৃত অর্থ বাহির করিতে পারি, তবে জ্যোতিষ শাস্ত্র পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে পারে। কিন্তু এরূপ কাজ বড়ই কঠিন। শিক্ষিত মহোদয়গণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে সুফল লাভের আশা করা যায়। ভারতীয় জ্যোতিষে এইরূপ বহুমূল্য প্রচ্ছন্ন সত্য অনেক নিহিত আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# রামায়ণী যুগের

## ধাতু ও ধাতব শিল্প।

মৌলিক ধাতু গুলির ব্যবহার ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। ধাতু গালাইয়া প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহারের উল্লেখ বেদে আছে। বেদে ধাতু গালান, মুদ্রা প্রস্তুত করণ, লৌহ কলস নির্ম্মাণ প্রভৃতির কথা আছে। * শুক্ল যজুর্ব্বেদেও কতকগুলি ধাতুর কথা আছে। যথা হিরণং চমে। অয়শ্চমে। শ্যামং চমে। লৌহং চমে। সীসং চমে। ত্রপু চমে। যজ্ঞেন কল্পন্তাম। ১৮।১৩

রামায়ণে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সীসক, পারদ, ত্রপু প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সমাজ যে বহু প্রাচীন কাল হইতে এই সকল ধাতুর বিষয় জানিত, তাহার প্রধান কারণ ভারতবর্ষে এই সকল ধাতুর অধিকাংশেরই আকর বিদ্যমান ছিল।

দাক্ষিণাত্যের চিত্রকুট, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি অরণ্য প্রদেশের বর্ণনায় জানিতে পারা যায়—

শ্বেতাভিঃ কৃষ্ণ তাম্রাভিঃ শিলাভিরূপ শোভিতম্। ৭
নানা ধাতু সমাকীর্নং নদী দর্দ্দর সংযুত্তম। কি—২৭।
অন্যত্র—"বিরাজন্তেঽচলেন্দ্রস্য দেশাধাতু বিভূষিতাঃ॥
৬।২।৯৪

এই সকল অঞ্চল ধাতুর আকর সমূহে পূর্ণ ছিল।

অযোধ্যার উত্তর প্রদেশেও ধাতুর আকর ছিল বলিয়া জানা যায়। ঐতিহাসিক যুগের বৈদেশিক ইতিহাস লেখক দিগের গ্রন্থে এবং মেগাস্থানিস প্রভৃতি প্রাচীন ভ্রমণকারীগণের ভ্রমণ কাহিনীতেও এই সকল ভারতীয় সম্পদের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। ২

রামায়ণী যুগে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার অত্যন্ত অধিক ছিল। সামান্য লোকের গৃহেও তথন কনক ও রজত নির্ম্মিত তৈজস পত্র ছিল। বিশিষ্ট প্রাসাদাদি নির্ম্মানে বর্ত্তমান সময় যেমন মর্ম্মর-প্রস্তরাদির বাহুল্য ব্যবহার দেখা যায় সে কালের রাজ গৃহাদিতেও সেইরূপ জাঁক জমকের সহিত স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহৃত হইত।

অযোধ্যায় রাম ভবনের বহিরাঙ্গনে বেদিকা সমূহে যে স্বর্ণ মূর্ত্তি সমূহ অবস্থিত ছিল, তাহা আমরা তক্ষণ শিল্পের আলোচনায় দেখাইয়াছি!

স্বর্ণের বাহুল্য-ব্যবহারে রাক্ষসপুরী লঙ্কা ছিল—কনক লঙ্কা—স্বর্ণসৌধ কিরিটিণী লঙ্কা। লঙ্কার চতুর্দ্দিকের প্রাচীর, গৃহ, গৃহের ছাদ, কুট্টিম (মেজ), এমন কি সোপানগুলি পর্য্যন্ত স্বর্ণময় ছিল। রাবণ সীতাকে লইয়া সর্ব্ব প্রথমে লঙ্কার যে গৃহে যাইয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহাতে ধাতব শিল্পের এবং মণি মাণিক্য ও স্ফটিক সমাবেশের বিশেষ বৈচিত্রতা লক্ষিত হইবে।

মহর্ষির বর্ণনা এই স্থানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম। 'রাবণ শোক-দীনা বিবশা সীতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া হর্ম্মমালা সমন্বিত অন্তঃপুরের দুন্দুভি শব্দে মুখরিত কনক নির্ম্মিত সোপান পথে আরোহণ করিল। সেই কনক সোপান হস্তীদন্ত সুবর্ণ, রজত ও স্ফটিকে নির্ম্মিত মনোহর স্তম্ভমালার উপর স্থাপিত। সেইস্তম্ভ গুলির গাত্রও আবার বজ্রমণি ও বৈদুর্য্যমণি খচিত। সেই গৃহের গজদন্ত ও রজতে নির্ম্মিত গবাক্ষ গুলি স্বর্ণজালে বিমণ্ডিত ছিল।"

লঙ্কার বর্ণনায় প্রায় সর্ব্বত্রই স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পের এইরূপ উচ্চ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

তখন সাধারণের ব্যবহার্য্য অনেক জিনিষ এবং যুদ্ধাস্ত্র গুলি লৌহ নির্ম্মিত ছিল।

শকটের উল্লেখ রামায়ণে আছে। যথা—

শকটী শতমাত্রস্তু (বালকাণ্ড ৩১ সর্গ।)

শকট রথ প্রভৃতি যানগুলি লৌহ কীলকের সাহায্যে প্রস্তুত হইত।

ধাতু নির্ম্মিত যে সকল দ্রব্যের নাম রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কতক গুলি নিম্নে প্রদান করা গেল।

* ঋকবেদ ৫ম মণ্ডল—১৯, ২৭, ৩০, ৩৩, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৭ সূক্ত ও ৬ মণ্ডলের ২, ২৭, ৪৬, ৪৭, ৪৮ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

(২) ঐতিহাসিক প্লিনি লিখিয়াছেন—সিন্ধুদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি ছিল। ইহা খ্রীঃ ১ম শতাব্দীর কথা।

মেগাস্থানিস তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতে স্বর্ণ রৌপ', তাম্র, লৌহ প্রভৃতির আকরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর কথা।

আধুনিক মোগল-ইতিহাস আইন-ই আকবরিতেও ভারতবর্ষের ধাতুখনি সমূহের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য এই সকল বর্ণনা আধুনিক। এই আধুনিক উল্লেখ দ্বারা সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাচীন প্রমাণ সমর্থন নিরাপদ কি না নিরপেক্ষ পাঠক বিচার করিতে পারিবেন।

ধাতু নির্ম্মিত পশুমূর্ত্তি ( অ ১৫ ), কনক নির্ম্মিত মূর্ত্তি (অ ১৪, কাঞ্চন নির্ম্মিত মণি খচিত সিংহাসন (অ ২) স্বর্ণ ও রৌপ্য বেদিকা ( অ ১০), সুবর্ণের ভদ্রাসন ( অ ২৬ ), স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ স্ফটিক ধবল চামর ( ল ১১), (অ ২৬), স্বর্ণময় রথ (বা ৫৩), হস্তীও অশ্বের লৌহ বর্ম্ম (ল ৭৮), স্বর্ণরজ্জু (ল ১২০), কাঞ্চন কবচ ( আ ৬৪ ), স্বর্ণমুষ্টি খর্গ (আ ৪৩), স্বর্ণ কিরিট ( সু ১০ ), স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা ( অ ৩০ ), স্বর্ণ কমণ্ডলু ( সু ১ ), স্বর্ণ কলসি ( সু ১১ ), স্বর্ণ পত্র ( সু ১ ), স্বর্ণ প্রদীপ ( সু ১১ ), স্বর্ণখট্টা ( অ ৯১ , স্বর্ণ ময় হস্ত প্রক্ষালন পাত্র ( অ ৯১ ), রজত নির্ম্মিত ভোজন পাত্র ( বা ৫৩ ) কাংস্যময় দোহন পাত্র ( বা ৭২ ), স্বর্ণাসন ( সু ১ ), ভৃঙ্গার (অ ১৪ ), রৌপ্য পঞ্জর ( ল ৬৫ ) ইত্যাদি।

স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যাদির উল্লেখ ব্যতীত রামায়ণে অন্য হীন ধাতু-দ্রব্যের উল্লেখ বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে রামায়ণ রাজ পরিবারেরই ইতিহাস। অযোধ্যা, লঙ্কা ও কিষ্কিন্ধ্যার বিভব বর্ণনায়ই রামায়ণ পূর্ণ; দারিদ্র-জীবনের কথা ইহাতে নাই। যুদ্ধাস্ত্র গুলি বোধ হয় সকলি লৌহ নির্ম্মিত ছিল; সে গুলির বিষয় অস্ত্র-বিজ্ঞান অধ্যায় বর্ণিত হইল।

রামায়ণী যুগে এক ধাতুর সহিত অন্য ধাতুর মিশ্রন দ্বারা যৌগিক ধাতু প্রস্তুত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল কি না তাহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না। আমরা উপরে যে সকল ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে কাংস্য দোহনার উল্লেখ আছে। কাংস্য একটী যৌগিক ধাতু। বালকাণ্ডের ৭২ সর্গে আছে—

" সুবর্ণ শৃঙ্গাঃ সম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ।
গবাং শত সহস্রাণি চত্বারি পুরুষ র্ষভ ॥২৩"

অর্থ—পুত্রাদির বিবাহ অন্তে গৃহে যাইয়া রাজা দশরথ চারিজন ব্রাহ্মণকে বৎস্য ও কাংস্য দোহন ভাণ্ডসহ গাভী দান করিয়াছিলেন। সুতরাং এই যৌগিকধাতুটীর কথা আমরা রামায়ণে পাই।

কোন বৈদিক সাহিত্যে কাংস্যের উল্লেখ নাই। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক সুশ্রুতের নামে যে আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন গ্রন্থ প্রচলিত আছে, সেই সুপ্রাচীন "সুশ্রুতে" কাংস্যের উল্লেখ আছে। ( ১ )

প্রাচীন ভারতে তামা ও টিন ( ত্রপু ) যে পরিচিত ছিল, তাহার উল্লেখ আমরা করিয়াছি। স্মৃতি শাস্ত্রে এই দুটী ধাতুর পরস্পর যোগে যে কাংস্য উৎপন্ন হয় তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

ত্রপুস্তাম্রয়োঃ সংযোগে ধাত্বন্তরস্য কাংস্যস্যোৎপত্তি।"

স্মৃতির ব্যবস্থা যুগে যুগে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া তাহার কথা কোন নির্দ্দিষ্ট কালের ঐতিহাসিক কথা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; সে জন্য আমরাও এস্থলে এই উক্তিকে খুব বিশ্বস্ত প্রাচীন প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

পিত্তল আর একটী যৌগিক ধাতু। তাহা দস্তা ও তামার মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। আরণ্য কাণ্ডের ২৯ সর্গে রূপক ভাবে পিত্তলের উল্লেখ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

নিশাচর খর ক্রুদ্ধ হইয়া রামকে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, তাহার এক অংশে আছে :—

"সর্ব্বথা তু লঘুত্বং তে কথনেন বিদর্শিতম্।
সুবর্ণ প্রতিরূপেন তপ্তেনেব কুশাগ্নিনা ॥ ২০ "

অর্থ—তুষাগ্নির উত্তাপে স্বর্ণ প্রতিরূপ পিত্তলের যেমন মালিন্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ আত্মশ্লাঘায় কেবল তোর লঘুতাই দৃষ্ট হইতেছে।"

সুবর্ণপ্রতিরূপ অর্থে তান্ত্রিক যুগে আধুনিক পিত্তলকে বুঝাইত। সেজন্য পিত্তলও রামায়ণী যুগে আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

রামায়ণে পারদের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু তাহার কোন ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায় না। পারার সংযোগে আধুনিক কালে সিন্দুর প্রস্তুত হয়; রামায়ণে সিন্দুরের উল্লেখ নাই। তখন মহিলারা সিন্দুর ব্যবহার করিত না; আধুনিক যাত্রাগানের শ্রীকৃষ্ণের মত গণ্ড পার্শ্বে রক্তবর্ণ মনঃশিলার তিলক ব্যবহার করিত। সীতা হনুমানকে বলিতেছেন :—

মনঃশিলায়াস্তিলকো গণ্ডপার্শ্বে নিবেশিতঃ।
ত্বয়া প্রনষ্টে তিলকে তং কিল স্মর্তুমর্হসি ॥৫। সু ৪০

অর্থ—রাম যে মনঃশিলা দিয়া আমার গণ্ডপার্শ্বে তিলক করিয়া দিয়াছিলেন এই কথাটী রামকে স্মরণ করাইয়া দিও। *মনঃশিলাও একটী রক্তবর্ণ গিরিজ-ধাতু বিশেষ।

( ১ ) সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬শঃ ৩৩৩ শ্লোক।

পারদ হইতে সিন্দুরের উৎপত্তি সুশ্রুতের যুগে হইয়াছিল। কাঁচের উল্লেখও সুশ্রুতে আছে (২) কিন্তু রামায়ণে নাই

রামায়ণে দর্পণের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা ধাতু নির্ম্মিত কি স্ফটিক নির্ম্মিত—তাহার আভাস কোন স্থানেই নাই। (৩)

কাচ ও স্ফটিক এক নহে। স্ফটিক আকরিক মহামূল্য প্রস্তর; কাচ, বালি, ও ক্ষারে প্রস্তুত যৌগিক পদার্থ। কাচকে দর্পণে পরিণত করিতে পারদের প্রয়োজন। পারদের উল্লেখ রামায়ণে থাকিলেও পারদের যৌগিক বা রাসায়নিক ক্রিয়া সুশ্রুতের পূর্ব্বে পরিচিত হয় নাই (১)

কোন ধাতুকে রূপান্তরিক করিয়া কাংস্য ও পিত্তলে পরিণত করা ব্যতীত উর্দ্ধ ধাতুতে অর্থাৎ স্বর্ণে বা রৌপ্যে পরিণত করিবার কোন চিন্তা বা কল্পনা বৈদিক সাহিত্যে নাই।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রাচীন মিসরীয়েরাই নাকি নীচ ধাতুকে উচ্চধাতুতে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের এই বিদ্যার নাম ছিল 'কিমিয়া' বিদ্যা। (২)

---

(২) সুশ্রুত—সূত্র স্থান ৪৬অঃ ৫০৪ শ্লোক।

(৩) বঙ্গীয় সমাজে বিবাহাদি ক্রিয়ায় এখনও বর কন্যারা নরসুন্দরের প্রদত্ত ধাতু নির্ম্মিত দর্পণ ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্ব্ববাঙ্গালার কুমারী কন্যারা মাঘ মাসে মাঘমণ্ডল পুজিতে যাইয়া চিত্রিত দর্পণ পূজা করে ও মন্ত্র যপে—

আমি পুজিতেছি শুঁড়ির আয়না।

আমার জন্য যেন হয় অভ্রের আয়না ॥

প্রাচীন দর্পণের কথা চিন্তা করিতে পাঠক এই দুটি কথাও একটু ভাবিবেন।

(১) ডাঃ পি, সি, রায় তাঁহার 'হিন্দু রসায়ণের, ইতিহাসে' লিখিয়াছেন—পারদ সুশ্রুতের সময় ভারতীয় সমাজে পরিচিত হইয়াছে। সুশ্রুত ১ম শতাব্দীর আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ।

সুশ্রুত কাশীরাজ দিবোদাসের সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রচিত "সুশ্রুত" গ্রন্থে প্রকাশ। কাশীরাজ দিবোদাস ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। তবে সুশ্রুতের যে প্রতিসংস্কার হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সুশ্রুত যে সেই প্রতিসংস্কারেরই ফল তাহা বলা যাইতে পারে।

(২) মিসরীয়েরা কিমিয়া বিদ্যার সাধনে বহু শক্তি ব্যয় করিয়াছিল। শোনা যায় কিমিয়া প্রভাবে নীচ ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারিত। এই বিদ্যা ক্রমে "এলকিমি" নামে পরিচিত হয়। এখন 'এলকিমিই' কেমিষ্ট্রি নামে পরিচিত।

মিসরীয় সভ্যতা খুব প্রাচীন। ভোগ-বিরাগী ভারতীয় সমাজ, ভোগালিপ্সু বিলাসী মিসরীয়দিগের ন্যায় "পরশ পাথরের" অনুসন্ধানে যে স্বীয় সাধনার অপব্যবহার করিয়াছিলেন না—এ কথা বোধহয় ঠিক।

রামায়ণে নীচ ধাতুকে উচ্চ ধাতুতে পরিণত করিবার কোন উল্লেখ নাই।

কিন্তু বালকাণ্ডের ৩৭ সর্গে ধাতু উৎপত্তির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এক পদার্থের সংস্পর্শে অন্য পদার্থ অর্থাৎ কাঞ্চন, রজত, লৌহ, ত্রপু ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল—বলা হইয়াছে।

রামায়ণে অনেক প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে। আমরা "প্রক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ" প্রসঙ্গে এই সর্গটীকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। বিবরণটী এইরূপ:—

"গঙ্গা (নদী) অগ্নির বাক্য অনুসারে তৎক্ষণাৎ নাড়ী প্রবাহ হইতে তেজ পরিত্যাগ করিলেন। তন্নিঃসৃত তেজ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল। উহার প্রভাবে সমীপস্থ পার্থিব পদার্থ সুবর্ণ ও দূরস্থিত পার্থিব পদার্থ রজত রূপে প্রাদুর্ভূত হইল। উহার তীক্ষ্ণতায় তাম্র ও লৌহ জন্মিল এবং গর্ভমল সীসকরূপে পরিণত হইল। এইরূপেই নানাপ্রকার ধাতুর উৎপত্তি হইল।"

(হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের অনুবাদ)।

এই রচনা তান্ত্রিক যুগের প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের একস্থানে আছে "সুমেরু পর্ব্বতে যাহা থাকিত, তাহা সমস্তই স্বর্ণে পরিণত হইত।" কি ৪২ সর্গ।

এই কল্পনাও তান্ত্রিক যুগের "পরশ পাথর' সাধনার পরে কল্পিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

রামায়ণে গৌরিক, জাম্বনদ, সুধা (চুন) প্রভৃতি আরো কতগুলি আকরিক পদার্থের নাম আছে।

---

# জাপানী শিক্ষা।

আজকাল সভ্যজগতে জাপান খুব সুপরিচিত। কিন্তু জাপানের সভ্যতা বড় বেশী দিনের নহে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চীন দেশের লোক জাপানে সভ্যতার বীজ বপন করে। ইহার ফলে জাপানে শিক্ষাদীক্ষার

সূত্রপাত হয়। প্রাচীন জাপানীরা সিণ্টো ( Shinto ) ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতার পূজাই ছিল এই ধর্ম্মের সারমর্ম্ম। তখন ধর্ম্ম যাজক পুরোহিতগণের হাতে শিক্ষার ভার ছিল। তাঁহারা এই ধর্ম্মমূলক শিক্ষাই আদিম জাপানীদের ঘরে ঘরে প্রচার করিতেন। স্থানে স্থানে দুই একটা বিদ্যালয়ও ছিল। পুরোহিতগণ এই বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। প্রাচীন ভারতের অধ্যাপকদের ন্যায় তাঁহারাও ছাত্রগণের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু বেতনের পরিবর্ত্তে তাঁহারা চাউল গ্রহণ করিতেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কনফিউশিয়ানিজম্ ( Confucianism ) জাপানের শিক্ষিত সমাজের রীতিনীতি ও শিক্ষা পদ্ধতির অনেকটা সংস্কার সাধন করে। তারপর ৫৫২ খৃষ্টাব্দে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। তখনও ধর্ম্ম যাজকেরাই জাপানের শিক্ষক ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার কালে জাপানের শিক্ষাদীক্ষার একটু পরিবর্ত্তন হয়। "গুণ কর্ম্ম বিভাগ" অনুসারে জাপানী সমাজে শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হইতে থাকে। ক্রমশঃ জাপানী সমাজ—(১) রাজকর্ম্মচারী ও যোদ্ধা, (২) কৃষক, (৩) শিল্পী, (৪) বণিক, (৫) এইনু (Ainu)—এই পাঁচভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া রাজকীয় ও সামরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। তাহারা ডেইমিওস ( Daimios ) দিগের অধীনে উপযুক্ত বেতনে কাজ করিত। কারণ তখন ডেইমিওস্ দিগের হাতেই রাজশক্তি ছিল। এই রাজকর্ম্মচারী ও যোদ্ধা শ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। তাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ লেখাপড়া ও শারীরিক ব্যায়াম—মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে—চীন ও জাপানের ইতিহাস, আফিসের চিঠি পত্রাদি লিখিবার রীতি ও শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন। অবশিষ্ট চারি শ্রেণীর লোকদিগের জন্য কেবল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে পিণ্টো (Pinto) নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ নাবিক জাপানে প্রথম প্রদর্পণ করেন। তখন হইতেই জাপানের সহিত ইউরোপের পরিচয় হইতে থাকে; খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকগণ জাপানে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনা জাপানকে মুগ্ধ করিয়াছিল। চৈনিক সভ্যতা ও সাধনার জড়তা যেন নবীন জাপানের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরীপন্থী হইয়া উঠিল। কাজেই কর্ম্মকুশল জাপান কর্ম্ম প্রধান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাধনাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। ইহার ভিতর দিয়াই জাপান আপন মুক্তি পথের সন্ধান পাইল।

শিক্ষা মানব সভ্যতা ও সাধনার ভিত্তিভূমি। যখন মানুষের সভ্যতার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হয় তখন শিক্ষা দীক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই কারণেই জাপানের শিক্ষা-সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন হইল। সময়োপযোগী শিক্ষা-সংস্কারেরফলেই আজ জাপান সভ্যজগতে ধন্য ও বরেণ্য। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জাপানে ইউরোপীয় আদর্শে জাতীয় শিক্ষার সূত্রপাত হয়। তারপর বাধ্যতামূলক সাময়িক শিক্ষার ফলে জাপানী শিক্ষার বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান জাপান প্রাথমিক শিক্ষায় আমেরিকার ও উচ্চশিক্ষায় জার্ম্মেণীর আদর্শ অনুসরণ করিতেছে। ইহা কেবল অনুকরণ নহে; ইহার ভিতর জাপানের নিজস্ব চিন্তা যথেষ্ট আছে। জাপানের শিক্ষা সংস্কারকগণ সাধারণ বিদ্যালয় গুলির সহিত টেকনিকেল স্কুল সমূহের বেশ্ একটা সুন্দর সমন্বয় ও সংযোগের সূত্র বাঁধিয়া দিয়াছেন। প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চবিদ্যালয় গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে। একের সহিত অপরের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। নিম্নলিখিত চিত্র হইতে ইহাদের সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইবে।

সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় (৬—১০ বৎসর)

| | |
|---|---|
| o উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় ( ৪ বৎসর ) | o(১) প্রাথমিক ট্যাকনিকেল স্কুল ( কৃষি বাণিজ্য বিষয়ক সহজ প্রাথমিক পাঠ্য ) |
| o মধ্য বিদ্যালয় ( ৫ বৎসর ) | o(২) ট্যাকনিকেল স্কুল ( কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক কঠিন প্রাথমিক পাঠ্য |
| o হাইস্কুল ( ৩ বৎসর ) | o(৩) ট্যাকনিকেল স্কুল ( কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক মধ্য পাঠ্য ) |
| o বিশ্ববিদ্যালয় ( ৩—৪ বৎসর ) | o(৪) উচ্চ ট্যাকনিকেল স্কুল ( কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক উচ্চ পাঠ্য ) |
| o বিশ্ববিদ্যালয় হল ( ১-৫বৎসর ) | |

জাপানে ৬ বৎসর বয়সে বালক বালিকা সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এখানে ছাত্রগণ সাধারণ লেখাপড়া, গণিত নৈতিক উপদেশ, শারীরিক ব্যায়াম, চিত্রাঙ্কন, ও হস্তশিল্প, শিক্ষা করে। এখানকার পড়া শেষ হইলে শিক্ষার্থিগণ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা প্রাথমিক টেক্‌নিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারে। উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য ব্যতীত জাপানের ইতিহাস, ভূগোল ও ইরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে ছাত্রগণকে ৪ বৎসর পড়িতে হয়। কিন্তু কেহ ইচ্ছা করিলে, দুই বৎসর পড়িয়াই মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে অথবা উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা ২নং টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে। শেষোক্ত উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মধ্য শ্রেণীর ৩নং টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ করিতে কোন আপত্তি নাই। এখানকার আরও একটা সুবিধা এই যে ছাত্রীগণ বালিকা বিদ্যালয়ে ও ছাত্রগণ নর্ম্যাল স্কুলে যাইয়া পড়িতে পারে। তারপর বালক বালিকাগণ উচ্চ নর্ম্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারে।

উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে অন্ততঃ ১২ বৎসর বয়সে মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। এখানে ৫ বৎসর থাকা দরকার। উচ্চাঙ্গের নৈতিক উপদেশ; জাপানী ও চীনা সাহিত্য, বিদেশী ভাষা (ইংরেজী), ইতিহাস, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, শারীরিক ব্যায়াম, আইন, অর্থনীতি, সঙ্গীত, প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সকল বিষয়ই মাতৃভাষার সাহায্যে শিখান হয়। ইংরেজী ব্যতীত অন্যকোন বিষয় বিদেশী ভাষায় পড়ান হয় না। মধ্যশিক্ষা লাভ করিয়া ছাত্রগণ ১৭ বৎসর বয়সে উচ্চশিক্ষা লাভার্থ হাইস্কুলে, উচ্চ নর্ম্যাল স্কুলে ও মেডিকেল স্কুলে অথবা উচ্চ টেকনিক্যাল স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে। হাইস্কুলের পাঠ্য তিন ভাগে বিভক্ত ঃ—

* (১) আইন কলেজে প্রবেশ করিবার উপযোগী পাঠ্য

(২) কৃষি বিজ্ঞান ও

ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে " " " "

(৩) মেডিকেল কলেজে " " " "

হাইস্কুলে তিন বৎসর পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ করিতে হয়; তখন বয়স অন্ততঃ ১৮ বৎসর হওয়া চাই।

সেখানে ৩।৪ বৎসর শিক্ষা লাভ করিয়া বি, এ পাশ করিলে বিশ্ববিদ্যালয় হলে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে।

টেকনিক্যাল স্কুল গুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে। প্রাথমিক টেকনিক্যাল স্কুল হইতে ক্রমে উচ্চতর টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ করা যায়। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট লইয়া যদি কেহ প্রাথমিক টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ করিয়া সেখানকার পাঠ্য যথাযথরূপে অধ্যয়ন করে তবে সে মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর টেকনিকেল স্কুলে পড়িতে পারে; তজ্জন্য উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে তাহার পড়িবার প্রয়োজন হয় না। ভারতে কিন্তু এ সুবিধাও সুযোগের নিতান্ত অভাব। এখানে কোন মেট্রিকুলেট ইন্‌জিনিয়ারিং অথবা মেডিকেল স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাস করিলেও আই, এ, পাস না করা পর্য্যন্ত ইন্‌জিনিয়ারিং কিংবা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারে না।

জাপানে যাহারা খুব মেধাবী ছাত্র তাহারাই সাধারণতঃ হাইস্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। একবার যাহারা হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়, তাহারা বোধহয় আর টেক্‌নিকেল স্কুলে পড়েনা। জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছাত্রগণের মৌলিক গবেষণার সাহায্য করা অথবা রাজকার্য্যের উপযোগী মানুষ তৈয়ী করা। জাপানে টোকিও (Tokyo) ও কাইটো (Kyoto) এই দুইটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় ছয়টী ও কাইটো বিশ্ববিদ্যালয় চারিটি কলেজ লইয়া গঠিত। জাপানে দুইটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। পুরুষদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানে নারীগণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। মেয়েদের জন্য মনাকায় একটা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রতিভাশালী ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয় হলে প্রবেশ করে। প্রত্যেক কলেজ হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র হলে পড়িবার

* জাপানের আইন কলেজে কেবল আইন শিক্ষা দেওয়া হয় না; সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রভৃতি পড়ান হয়। জাপানের আইন কলেজ আমাদের আর্ট কলেজের অনুরূপ।

জন্য মনোনীত হইয়া থাকে। ৫ বৎসর মৌলিক গবেষণা করিয়া ছাত্রগণকে এক একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এই প্রবন্ধ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষ জনক বিবেচিত হইলে ছাত্রগণ "হাকুসি" (Hakushi) অথবা "গাকুসি" (Gakushi) অর্থাৎ পি এইচ্ ডি, কিংবা এম্ এ, উপাধি পাইয়া থাকেন। জাপানের শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বোপরিকর্ত্তা —একজন কেবিনেট মন্ত্রী। একজন সম্পাদক কয়েকজন আইন পরামর্শ দাতা ও পরিদর্শন কর্ম্মচারী মন্ত্রী মহাশয়কে শিল্পবিভাগের কার্য্য পরিচালনে সাহায্য করিয়া থাকেন।

জাপানে যাহারা শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট হইতে শিক্ষকতা করিবার সনন্দ না পায়, তাহারা শিক্ষক হইতে পারেন না। ভারতের ন্যায় জাপানে বি, টি, অথবা এম, টি পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত নাই। উচ্চ নর্ম্মাল স্কুলের বি এ, উপাধী ধারী শিক্ষকগণ ললিতকলা ও সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক গণ এবং যাহারা সনদ পাওয়ার উপযোগী শিক্ষাবিভাগের পরীক্ষা পাস করিতে পারেন—তাঁহারা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করিবার সনদ পাইয়া থাকেন। জাপানের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই একটা নর্ম্ম্যাল স্কুল আছে। কয়েক বৎসর হইল সমগ্র জাপানে ৫৭ টা নর্ম্ম্যাল স্কুল ছিল। আমাদের বাঙ্গালায় কেবল মাত্র ৫ টি নর্ম্মাল স্কুল। তার উপর আবার ব্যয় সংক্ষোচ কমিটির তীব্র কটাক্ষ নিপতিত হইয়াছে। ভারতের নর্ম্মালস্কুলের ন্যায় জাপানের নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণকেও বেতন দিতে হয়না। তাঁহাদের খোরাক পোষাকের ব্যয় নর্ম্মাল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ বহন করিয়া থাকেন। নর্ম্মাল স্কুলে পুরুষদের ৪ বৎসর ও মেয়েদের তিন বৎসর পড়িতে হয়।

উচ্চ নর্ম্মাল স্কুলের ব্যয় ভার জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন। সেখানে মেয়ে পুরুষ সকলকেই ৪ বৎসর পড়িতে হয়।

ভারতের ন্যায় জাপানেও শিক্ষকতার আদর নাই। অন্য কাজের সুবিধা না হইলেই মানুষ গুরুগিরি খুঁজিয়া লয়। সেখানে শিক্ষকগণ এক স্কুলে বেশী দিন কাজ করেন না! যদি কেহ ১৫ বৎসর শিক্ষকতা করেন এবং তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হয়, তবে তিনি পেন্সন্ ভোগ করিতে পারেন। জাপানে শিক্ষকগণের পারিবারিক পেন্সনের প্রথা প্রচলিত আছে। দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর কোন শিক্ষকের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গ পেন্সন্ ভোগ করিতে পারে। জাপানে হাইস্কুলের শিক্ষকের মাসিক বেতন ১ হইতে ৭ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কলেজের অধ্যাপকের মাসিক বেতন ৫ হইতে ২০ পাউণ্ডের বেশী হয় না।

জাপানের শিক্ষা অবৈতনিক নহে কিন্তু বাধ্যতা মূলক। মার্কিন যুক্তরাজ্যে কানাডায় ও ফ্রান্সে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক ও অবৈতনিক। জার্ম্মেনিতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক কিন্তু অবৈতনিক নহে জাপান এবিষয়ে জার্ম্মেনির নীতি অনুসরণ করিতেছে। জাপানে গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর গড়ে একজনের শিক্ষার জন্য ৮৶ আনা ব্যয় করেন কিন্তু ভারতগবর্ণমেণ্ট মাত্র ।০ আনা ব্যয় করিয়াই শিক্ষাবিভাগের ব্যয় সংক্ষোচ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

জাপানে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড অথবা গবর্ণমেণ্ট হইতে বিদ্যালয়ে সাহায্য দেওয়ার রীতি নাই। দুই একটা সরকারী বিদ্যালয় ব্যতীত প্রায় সকল স্কুলই সর্ব্ব সাধারণের ব্যয়ে পরিচালিত হয়। সেখানে ছাত্রগণকে বৃত্তি অথবা পুরস্কার দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে একান্ত প্রয়োজন হইলে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণকে অর্থ সাহায্য করা হয়। কিন্তু ঐ সকল সাহায্য প্রাপ্ত ছাত্র কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে ঐ টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়।

ভারতের ন্যায় জাপানী বিশ্ববিদ্যায়ে বিরাট লিখিত পরীক্ষা প্রণালী নাই। ছাত্রগণের প্রমোশন পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিলেও সেখানে হাতে কলমে লিখিয়া পরীক্ষা দিতে হয় না। সকল পরীক্ষাই মৌখিক; ছাপান প্রশ্নপত্র নাই পরীক্ষার ফিসও নাই। জাপানী ছাত্রগণ পরীক্ষায় নম্বর কম পাইলে অথবা ফেইল হইলে আত্মহাত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। শিক্ষক ছাত্রগণকে কড়া শাসন করিলে তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া বসে। জাপানে শাসন শৃঙ্খলা রক্ষা করা বড়ই দুষ্কর।

রাজবিধি অনুসারে জাপানের ছোট বড় সকলকেই ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হয়; ভারতে কিন্তু এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই

জাপানের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স আছে। আমাদের দেশে চাকুরিতে ঢুকিবার সময় বয়সের কড়া কড়ি আছে কিন্তু বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার কালে বয়সের কোন বিশেষ নিয়ম নাই।

জাপানী শিক্ষার আর একটা সুবিধা এই যে সেখানে সকল বিষয়ই মাতৃ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতে বিজাতীয় ভাষায় সকল বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়া থাকে; তজ্জন্য ছাত্রগণ সহজে ও অল্প সময়ে কোন বিষয় আয়ত্ত করিতে পারে না। কেবল বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে করিতেই ভারতীয় ছাত্রজীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় কাটিয়া যায়। পরে স্বাস্থ্য ও বলবীর্য্যের অভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে তাহারা তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেনা। আবার মানুষ নিজ মায়েরসঙ্গে যে ভাষায় প্রাণখুলিয়া কথাবলে, সে ভাষায় সকল বিষয় লিখিলে মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী রূপ দেখিবার জন্য প্রাণে যেমন একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তেমন আর কিছুতেই হয়না। ইহার ফলেই বরাভয়া-মার আহ্বানেজ াপান সাড়া দিয়া উঠে, আর ভারত সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

---

## কালের ভেরী।

ভাদরের ভরা নদী, রূপসী যুবতী,
ঠমকে চমকে চলে অথির অঞ্চল,
তারুণ্য-লাবণ্যে খেলে সুবর্ণ কিরণ,
রঙ্গে ভঙ্গে সিন্ধুসঙ্গে স্খলিত অঞ্চল।

যৌবনে সকলি পূর্ণ, পূর্ণ মনস্কাম,
সম্ভোগ-বাসনা তৃপ্ত, দৃপ্ত ভূমণ্ডল।
নাদে শঙ্খ মহাকাল, গোপনে অদূরে
ধীরে ধীরে জরা অঙ্গ কর‌য়ে বিকল।

কোথা যে সুষমা রাশি নদী-বক্ষে আজ
শোভে না সুন্দর সেই মরালের মালা,
উদ্দামতা অবসান কালের তাড়নে
শিশিরে মলিন হায় তপনের জ্বালা।

আকাশে জ্যোছনা রাশি হাসেনা সতত,
কালের ভ্রূকুটি ভয়ে সকলি আনত।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

## ফিজির আদিম অধিবাসী।

আজ আমরা এমন একটী জাতির কথাই বলিব, যাহাদের কার্য্য কলাপ আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ অভিনব, অথচ এই অধিবাসীদিগকে লইয়া বর্ত্তমানে আমাদের দেশেও একটু আলোচনা চলিতেছে এবং অনেক ভারতবাসী তাহাদের সাহচর্য্যে বাস করিতেছেন।

এই জাতির বাসস্থান প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহাকে ফিজি দ্বীপ বলিয়াই অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই দ্বীপের অধিবাসীগণ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সুসভ্য শ্বেতকায় লোকদিগের সংশ্রবে আসিয়া আপনাদের বিশেষত্ব হারাইয়া ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপের আদিম অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২০০০০০ ইহার পর বৈদেশিক প্রবাসী সহ ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে গণনায় নামিয়া ছিল—.৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এক লক্ষের কিছু বেশীতে অর্থাৎ ১২২০০০। বর্ত্তমানে এই ফিজি দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে—প্রবাসী ও উপনিবেশী সহ মোট ১ লক্ষ ৬৭ হাজার মাত্র। ইহার মধ্যে ৯১ হাজার ১৮০ জন মাত্র স্থানীয় আদিম অধিবাসী ঐ দ্বীপে আমাদের প্রবাসী ভারত সন্তানের সংখ্যাও ৬১ হাজার ৫০ এবং শাসক শ্বেতকায় লোকের সংখ্যা মোট ৪ হাজার ২৮৪ জন।

ফিজির শাসন পরিষদে ছয় জন সদস্য—সকলেই শ্বেতাঙ্গ। ব্যবস্থাপক সভায় ২১ জন সদস্যের মধ্যে ২০ জন শ্বেতাঙ্গ, এক জন মাত্র ভারতসন্তান। এই ভারতীয় সদস্যটীও নির্ব্বাচিত নহেন, কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে মনোনীত সদস্য। ঐ দ্বীপে সম্প্রতি যে নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে এই রূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে ব্যবস্থাপক সভায় ২১ জন সদস্যের মধ্যে অতঃপর ২ জন ভারতবাসী সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে, কিন্তু আদিম নিবাসী এক জনেরও নির্ব্বাচন ব্যবস্থা হয় নাই।

এই নীলাম্বু পরিবেষ্টিত ফিজি দ্বীপ বাসিগণ খাদ্যের জন্য কখনও অন্যের মুখাপেক্ষী হয় নাই। বিশাল সমুদ্রের গর্ভজাত দ্রব্যে তাহাদের উদর পূর্ণ করিয়াও বহু দ্রব্য জগতের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পাড়িতেছে। ফিজির শ্যামল প্রান্তর কুঞ্জ ও কাননে যে সকল ফল শস্য উৎপন্ন

যুদ্ধ-বেশে নৃত্য।

হয়, তাহাই তাহার সন্তানের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত। ইহারা অতিথি সৎকার ও প্রীতিভোজ প্রদানে বড়ই উৎসুক। এই প্রীতি ভোজের সময় তাহাদের ব্যবহার অত্যন্ত নম্র ও শিষ্ট।

চুলের পারিপাট্যে এ জাতির বিশেষত্ব আছে। এই জাতির প্রধান ব্যক্তিগণ সুধু চুলের যত্ন করিবার জন্যই একজন লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন ও দিনের অধিকাংশ সময় চুলের তত্ত্বাবধানে ব্যয় করেন। উপরের এবং অপর পৃষ্ঠার চিত্র হইতে পাঠক তাহাদের চুলের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

তাহাদের চুলগুলি অত্যন্ত দৃঢ় অথচ তারের ন্যায় নমনীয়; তাহা কপালের ৬ ইঞ্চি দূরে অনায়াসে রক্ষিত হইতে পারে। রাজগণ এই চুল গুলি উষ্ণীষ দ্বারা আবৃত করিয়া রাখেন। এই উষ্ণীষ গুলি "মাসি" নামক এক প্রকার বৃক্ষ বল্কলে নির্ম্মিত।

ইহাদের চেহারা বেশ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। যুদ্ধ-বেশে নৃত্য পরায়ণ এই লোকগুলির হস্তে কাষ্ঠ নির্ম্মিত যে এক প্রকার লাঠি, ইহাই তাহাদের প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র। ইহাদের পরিধানে বৃক্ষ চর্ম্ম।

এই বৃক্ষ চর্ম্মই আদিম অধিবাসীদিগের বস্ত্র। এই কাপড় তাহারা কটীদেশে জড়াইয়া রাখে। স্ত্রীলোকগণও নানা রূপ সুরঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার করে। এই পোষাক "লিকু" নামে পরিচিত এবং ইহা কোমরের চারিদিকে তিন ইঞ্চি ঝালর সংযুক্ত। ছোট বালিকারা সরু কাপড় ব্যবহার করে এবং বিবাহের সময় এই বস্ত্রের পরিসর বৃদ্ধি করিয়া হাটুর নীচ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া শরীরও আবৃত করিয়া থাকে। সন্তান হইলে পর তাহারা আরও নীচ পর্য্যন্ত শরীর আবৃত করিয়া থাকে।

ফিজির স্ত্রীলোকগণ স্ব স্ব স্বামীর অধীন থাকে; এবং তাহারা গৃহকর্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকে।

ফিজির বিবাহ পদ্ধতি অভিনব। যদি কোন যুবক কোন সুন্দরীকে স্ত্রীরূপে পাইতে ইচ্ছা করে, তবে প্রথমতঃ যুবতীর পিতার অনুমতি লইতে হয়। অনুমতি পাইলে যুবতীর নিকট কোন উপহার পাঠাইতে হয়। তারপর কিছু দিন গেলে, যুবককে নিজে রান্না করিয়া সেই খাদ্য বস্তু যুবতীর নিকট পাঠাইতে হয়। এই রূপ উপায়ে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার পথে অগ্রসর হয়।

এই সময় চারিদিন যুবতী আপন বেশভূষায় নিয়োজিত থাকে। তারপর তাহাকে কোন বিবাহিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে সমুদ্রে পাঠাইয়া তাহা দ্বারা মৎস্য ধরাইয়া আনিতে হয়। ধৃত মৎস্য পাক হইলে যুবকের জন্য লোক পাঠান হয় এবং সে আসিলে যুবক যুবতী একত্র আহার করে। ইহার পর

ফিজি-গৃহ।

আরো কয়েকদিন যায়। ইতিমধ্যে যুবক তাহার নূতন বাসর ঘর প্রস্তুত করিতে থাকে। নূতন ঘর প্রস্তুত হইলে সেই ঘরে একটা ভোজের আয়োজন হয়। তখন যুবক যুবতীর সম্মিলন হয়।

বড়লোকের ব্যবস্থা আবার অন্যরূপ। তাহাদের কন্যাদের শৈশবেই বিবাহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। প্রতিশ্রুত ব্যক্তিদের যদি পরে বিবাহ না হয়, তবে তাহা অত্যন্ত অপমানের বিষয় হয়। তখন এই ব্যাপার লইয়া উভয়পক্ষে বিষম যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যদি প্রতিশ্রুত ব্যক্তির বিবাহের পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়, তবে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই জ্যেষ্ঠের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। কন্যাপক্ষেও এইরূপ।

আদিম কালে নাক মুখ শরীর চিত্রিত করিবার প্রথা সকল জাতীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ফিজিয়ানদের মধ্যেও ছিল। তাহাদের পছন্দ সই রং সাদা, লাল ও কাল। সৌখিন যুবকেরা পুষ্পেরমালা গাঁথিয়া পরিধান করিয়া থাকে।

ফিজি স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কারের ভার বহন করিতে ইচ্ছুক নহে। পুরুষেরা গলায় তিমির দাঁতের, কুকুরের দাঁতের, বাদুরের দাঁতের ও কচ্ছপের হারের মালা পরিধান করিয়া থাকে।

ইহাদের নমস্কার পদ্ধতি অনেক প্রকার। অবস্থা ভেদে প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে। প্রাতে সম শ্রেণীর দুইজন লোকের দেখা হইলে উভয়ে উভয়কে "জাগো" বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে। সন্ধ্যাকালের সম্ভাষণ "ঘুমাও"।

বাড়ীর কর্ত্তা আগন্তুক কে সম্ভাষণ ও গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়া ৩।৪ বার হাততালি দিতে দিতে বলেন "তোমার বাড়ী হইতে শান্তিসহ আইস"। কোন উপহার প্রদান কালের বিনীত উক্তি—"আমার কিছুই দিবার নাই কেবল, আপনার ছেলে মেয়ের প্রতি ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ এই উপহার।" প্রত্যেক প্রকারের উপহার দিবার সময়ই এইরূপ কোন কথা ব্যক্ত করিতে হয়।

ফিজিদ্বীপ বাসিগণ পূর্ব্বে নরমাংস খাদক ছিল। বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে হত করিয়া তাহার মাংস আহার করিত। এই উদ্দেশ্যে তাহাদের আহার্য্য ভাণ্ডারে অনেক ক্রীতদাস রক্ষিত হইত।

ইহারা মানুষের মাংস সুধু তৃপ্তির জন্যই ভক্ষণ করিত না। তাহাদের ধারণা যাহার মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহার সমস্ত গুণাবলীই খাদকের আয়ত্ত হয় সুতরাং ইহাতে তাহাকে দ্বিগুণ শক্তিশালী করে; চতুরতা ও ধূর্ত্ততা শিক্ষা দেয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সাহসী শত্রুর মাংসই ভক্ষণ করিতে প্রয়াস পায় বেশী।

সৌখিন-ফিজিয়ান।

পূর্ব্বে মানুষ হত্যা প্রায় প্রত্যেক ঘটনাতেই ঘটিত। কোন প্রধান ব্যক্তি বৃহৎ নৌকা প্রস্তুত করিলে তাহার জয়ের আশায় অনেক মানুষকে হত্যা করা হইত। বড় নৌকাগুলি সমুদ্রে ভাসাইবার সময় মানুষের উপর দিয়া টানিয়া নেওয়া হইত; নৌকার চাপে সেই সকল লোক মারা পড়িলে সেই সকল মৃত দেহ ভক্ষিত হইত।

ইহাদের দলপতি দিগের ক্ষমতা অপরিসীম ছিল। তাহাদের হাতে মানুষের চিহ্নিত ফর্দ্দ থাকিত। তাহাদের ইচ্ছা মত সেই ফর্দ্দের লোককে প্রাণ দান করিতে হইত।

অন্যান্য আদিম অধিবাসীর ন্যায় ফিজি দ্বীপ বাসিগণও মরণকে ভয় করেনা। সেখানে বৃদ্ধ হইলে পিতা পুত্রকে আদেশ করিত "আমাকে সংহার কর"। পুত্র ও তাহার কর্ত্তব্যবোধে পিতা মাতাকে জীবিতাবস্থায় সমাধিস্থ করিত। এই প্রকার ব্যবস্থা খুব সন্মান জনক বলিয়া সকলেরই ধারণা ছিল। প্রাচীন যুগে স্বামীর সঙ্গে সহ-মৃতা হইয়া পরলোকেও স্বামীসঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা এই জাতির মধ্যেও ছিল।

বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় মিসনারীদের কল্যানে ইহারা ক্রমে এই সকল প্রাচীন বর্ব্বরতা মূলক আচার ব্যবহারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। এখন ইহারা ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষায়ও শিক্ষিত এবং দীক্ষিত হইতেছে। বিলাসিতা শিক্ষা ও সভ্যতার সহচর, তাহাও দেশের কাণায় কাণায় প্রবেশ লাভ করিতেছে। কিন্তু তাহাতে ফল কি হইয়াছে? ফলে তাহারা "আগেও যে তিমিরে এখনও সে তিমিরে।"

---

## রথ-যাত্রা।

লাখে লাখে লোক এসেছে, শোন্‌রে ঐ প্রলয় কোলাহল।
সবাই ভাবে আকুল প্রাণে, লুটবে আজ তীর্থের পুণ্য ফল,
তুলে তাদের কাঠের রথে কাঠের রাম, ভদ্রা, নারায়ণ,
নিবে টেনে; তাঁদের হেরে সফল হবে পোড়া দুনয়ন।

অন্ধ মোহে রাখ্‌লে আঁখি
জগতের নর;
দেখ্‌লে না নিজ দেহ রথে
দেব চক্রধর।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নিয়োগী।

## পরিণাম।

তখন দশটা বাজিয়াছে। ছোট চৌপায়াটায় বসিয়া গায়ে তেল মাখিতেছিলাম; এমন সময় গান শুনিলাম—

সুধু সে রেখে গেছে আখর কটি গো।
রক্তে রাঙ্গাইয়া প্রাণের ব্যথা গো॥
আরতো আসিল না, আরতো আসিল না...

রাগিণী অশ্রুভরা। এই সুর আমার মন টানিয়া নিল; আমি আমার পুত্র পট্‌লাকে বলিলাম—"দেখ্ দেখি, কে গায়?"

পট্‌লা—বলিল—"ও পাগল বাবা, রোজ গায়।"

আমি বলিলাম—"ডাক্ দেখি।"

পট্‌লা ছুটিয়া গেল। আমি তেল মাখিতে লাগিলাম। তেল মাখা শেষ হইল, তবু পট্‌লা ফিরিল না। সেই অশ্রু সুরও শোনা যাইতেছে না। মাথায় তেল ঘসিতে ঘসিতে বারান্দায় গিয়া গলিটার যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখিলাম—বহু দূরে, গলির প্রায় শেষ সীমায়, বালকগণে বেষ্টিত এমনি ধারার একটা কিছু দেখা গেল। বিলম্ব হইবে বুঝিয়া আমি স্নানে চলিয়া গেলাম।

স্নান শেষ করিয়া কলতলায় কাপড় কাছিতেছিলাম, এমন সময় পুনরায় গান শুনিলাম—

আমি যে তাহার লাগি ঘুরে ঘুরে ফিরি গো।
সেও কি আমার লাগি একটুও...॥

গানের সুর আমার বারান্দা হইতে আসিতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি কাপড়খানা মেয়ের হাতে দিয়া চলিয়া আসিলাম।

অগণিত বালক বৃন্দে বেষ্টিত পাগলকে সেই ব্যূহ হইতে উদ্ধার করিয়া আমার আফিস কোঠায় সযত্নে বসাইলাম। পাগল টেবিল সম্মুখে লইয়া নিঃসঙ্কোচে চেয়ারেই উপবেশন করিল।

পাগলের চেহারা সুন্দর, বর্ণ গৌর, কিন্তু অযত্নে মলিন; দাড়ি গোফ চুল, তৈল হীন রুক্ষ। বয়স অনুমান ২৪।২৫; গায়ে একখানা আলোয়ান, পরিধানে বস্ত্র, উভয়ই মলিন; কিন্তু এখনও জীর্ণ হয় নাই।

পাগলের সুর আমাকে একান্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, তাই তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিতে আমি ইতঃস্তত করিলাম না।

পাগল গাইতে ছিল, থামিয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ক্ষুধা পাইয়াছে কি?"

পাগল বলিল—"হুঁ।"

পাগলের গান শুনিয়া আমার মেয়ে কিরণ আসিয়া ভিতর দিকের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—"কিরণ, এর জন্য একটা থালায় করিয়া দাল আর ভাত কিছু আনিয়া দাও দেখি।"

আমার কথা শুনিয়া পাগল কিরণের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। কিরণ চলিয়া গেলে পাগল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"শূন্যে চলিয়া গেছে প্রাণ, বাঁধিয়া রেখেছি জয়কাল।" তারপরই গুণ গুণ করিয়া গাহিল—

"আর সে আসিল না, আর সে আসিবে না,
আর সে তো কহিবে না মরমের কথা গো।"

গৃহিণী আমার হুকুম শুনিয়া ও এইরূপ কাণ্ড দেখিয়া ঠুঁট ফুলাইতে ছিলেন। "খাবার বেলায় এ আবার কি শ্রাদ্ধ জুটাইয়া বসিলে?" বিরক্তির স্বর জানালার মুখে শুনা গেল। আমি বলিলাম—"এ লোকটা হয়ত দুই তিন দিনই খায় নাই, সেদিকে একটু দৃষ্টি থাকা উচিত। যাও আগে তার জন্য দাও, তারপর আমি খাইব।"

কিরণ বোধ হয় তার মার বিরক্তি ভাব দেখিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিল। পাগল অপলক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিরণ পাগলের মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জায় দাঁতে কাপড় কামড়াইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

কিরণকে যাইতে দেখিয়া পাগল তাহাকে ডাকিল "ওগো তুমি যাইও না, দাঁড়াও তোমায় দেখি, তোমার হাতে আজ আমি খাব চারটী।"

পাগলের যেন প্রাণের ভিতর হইতে এই কটি কথা অতি আপনার জনের নিকট আব্দারের ভাবে গলিয়া পড়িল। আমি কিরণকে বলিলাম—"যা শীঘ্র নিয়ে আয়।"

আমার কথার উপরেই স্ত্রীর নির্ম্মমবাণী ধ্বনিত হইল, "কি জাত না কি জাত; তাকে ঘরের ভিতর দাও—যত অনাচার, যত কুকাণ্ড।"

আমি বলিলাম—"অতিথি নারায়ণ! কোন চিন্তা নাই তোমার; এই আফিস ঘরে দাও; পাগল নিজেই তাহা ধুইয়া ফেলিবে—আর, ওতে জাত যাইবে না।"

গৃহিণী বেজায় শুচিবাই গ্রস্ত। এদিকে আমাকে পাগলের সুরে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি নিজেই ভিতরে গিয়া তদ্বির করিয়া ভাত, তরকারী দাল এক পাত্রেই সব পরিবেশন করাইয়া দিলাম। কিরণ তাহা লইয়া আসিল।

আমি পাগলকে স্নান করিয়া খাইতে অনুরোধ করিলাম। সে কোন উত্তর না দিয়া গুণ গুণ করিয়া গাইল—

"চলে গেলে প্রাণের পাখী আরতো ফিরে আসে না।"

পাগল চেয়ার হইতে নামিয়া ভোজনে বসিয়া কিরণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—'তুমি সম্মুখে দাঁড়াও, আমি তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া খাইব।"

গৃহিণী দেখিতে আসিয়াছিলেন—কোথায় পাত পাতা হয় এবং তাহাতে গৃহের শুচি ও শুদ্ধি রক্ষার ব্যাঘাত হয় কি না। পাগলের এই কথা শুনিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন—"ওমা, এটা বলে কি গো? এ কোথাকার আপদ আসিয়া কোথায় ঠেকিল! আমার এত বড় মেয়েকে বলে কি না—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"চুপ কর, একটা কথা বলিলেই দোষ হয় না। কিরণ এখানে দাঁড়াইলেই যদি ওর মনটা সুস্থ বোধ করে, আপত্তি কি? ভয়েরইবা কি কারণ! আমিও তো এখানেই আছি।"

লজ্জা শূন্য, ভয় শূন্য ভাবে স্থির দৃষ্টিতে কিরণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পাগল আহার করিতে লাগিল। আমি ও কিরণ তাহা দেখিতে লাগিলাম। আমার ইঙ্গিতে কিরণ আরো ভাত, দাল আনিয়া দিল। কিন্তু কিরণকে গৃহিণী আর ঘরে যাইতে দিলেন না!

ডাল ভাতের পরিমাণ দেখিয়া বুভুক্ষু পাগল যেন স্ফূর্ত্তি অনুভব করিল। সে কিরণের দিক হইতে মাথা নোয়াইয়া গুণ গুণ করিয়া গাইল—

"এই যে তোমারে দেখি, সে-ই কি তুমি গো।"

পাগল থালা নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। আমি বলিলাম—"এ থালা খানা লও; চল, কল তলায় যাই।"

পাগল কিরণকে দেখাইয়া যেন, গর্ব্বিত ভাবে বলিল—"এ-ই থালা ধুইবে।"

এ ব্যাপারে গিন্নির জয় হইবে বুঝিয়া আমি কিরণকে বলিলাম—"মা, দেখ পাগল কেমন পরিষ্কার খাইয়াছে, একটী ভাত মাটীতে পড়ে নাই। তুমি থালা খানা ধুইয়া স্নান করিয়া ফেল। ওতে আর কি আসে যায়?"

কিরণ তাহাই করিল। পাগল তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল দেখিয়া যেন মনে মনে প্রীতি অনুভব করিল।

আমি বলিলাম—"এখন তুমি বসো, আমি যাইয়া খাই; তার পর একত্র কলেজে যাইব। তুমি ততক্ষণ গান গাও।"

পটলা স্কুলে চলিয়া গিয়াছিল; সুতরাং খুব ভাল করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আমি আহারে গেলাম।

গৃহিণীর মেজাজ তখন সপ্তমে চড়া তিনি কিরণকে সারা বাড়ীতে গোবর ছড়া দিতে আদেশ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।

গৃহিণীর কথায় কোন রূপ প্রতিবাদের আঁচ্ না দেখাইয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতে লাগিলাম। কেবল মাঝে মাঝে দু একটা উপদেশ কথা মিজাজ বুঝিয়া সংক্ষেপে বলিয়া গেলাম।

আমি বলিলাম—"ছেলেটার চেহারায়ই দেখা যায়, ভদ্রলোকের ছেলে—মাথার বিকার হইয়াছে বোধহয়। ঘরে বিমাতা অথবা ঘরে একেবারেই কেউ নাই। অথবা যা তার কথার ভাবে, গানের ভাবে বুঝা যায়—প্রেমে নিরাশা; কিন্তু বেশ গায়! সুরটা আমার কানে হটাৎ যেন মধু ঢালিয়া দিয়াছে। কলেজ আজ একটায়, তাই লোকটার সুরটা একটু হারমোনিয়ামের সহিত মিলাইয়া নিব বলিয়া ডাকিয়াছি। তার পর, মানুষের অবস্থা দেখিয়া ঘৃণা করিতে নাই"। ভগবান ঐরূপ কাঠামের ভিতরই নিয়ত বাস করেন। তাই লোকে বলে ভিক্ষুক ভগবান, দরিদ্র নারায়ণ।

গৃহিণীও বলিলেন, আমিও বলিলাম। কথার মাঝে মাঝে আমি এই কথা গুলি বলিয়া গেলাম।

আহার করিয়া আসিয়া দেখি, সেদিনকার দৈনিক বাঙ্গালা কাগজ খানা পাগল খুব মনোযোগের সহিত দেখিতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "লেখা পড়া জান কি?"

পাগল প্রশ্ন করিল—"কিরণ কোথায়?

আমি—"খাইতে বসিয়াছে।"

পাগল—"বিবাহ হইয়াছে?"

আমি—"হইয়াছে।"

পাগল—"কত টাকা দিলে?"

আমি—"আমি গরীব মাষ্টার, টাকা কোথায় পাইব?"

পাগল—"ফল ভোগ করিতে হইবে।"

বলিয়াই পাগল গাইয়া উঠিল—

"ইহার লাগিয়া গেল গো চলিয়া,
পোষা পাখী খাচা হতে।"

রাগিণী থামাইয়া পাগল উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "আমি আর আসিবনা, আমি আর আসিবনা; জীবনের ফল করিব সফল, এমনি করিয়া ঘুরিয়া। তোমাদের মনে যা ছিল বাসনা, যা ছিল কামনা, সকল তোমরা সফল—আর না"—বলিয়া দৈনিক খানা ঘরের কোণায় ছুড়িয়া ফেলিল।

দেখিলাম পাগলের কথা ও গান সকলি এক মিলের। অথচ কোন চরণের সহিত কোন চরণের মিল নাই। গদ্য কথা গুলিই যেন সুর করিয়া গাহিয়া যায়। তাহাতে মিল না থাকিলেও আছে—হৃদয়ের জমাট দুঃখের অভিব্যক্তি—দুঃখ প্রকাশের উদগ্র চেষ্টা!

আমি হারমোনিয়মে সুর ধরিতে চেষ্টা করিলাম। পাগল তাহার দিকে লক্ষ্য করিল না। আমি বলিলাম—"গাও"। পাগল নিরুত্তর।

জিজ্ঞাসা করিলাম "বাড়ী কোথায় তোমার?
"ভগবানের উদার উন্মুক্ত রাজ্যে।"
"পিতামাত বর্ত্তমান আছেন কি?"
"আপনার আছেন?"
"আছেন।"
"তবে আমারও আছেন।"
"বিবাহ করিয়াছ?"

পাগল গান ধরিল—

"আমি তোমার লাগিয়া দেশে দেশে যাব
ফিরিব কানন বন।"

আমি হারমোনিয়াম টিপিলাম। গান বন্ধ হইল। পাগল চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি চাই?"

পাগল বলিল "কোথায় গেল সে ?"

আমি বুঝিলাম, পাগল কিরণকে অনুসন্ধান করিতেছে। এ খেয়াল ভাল নহে। আপাততঃ আর গানও সুবিধা হইবে না ; পাগল এক সঙ্গে ধৈর্য্য ধরিয়া দুটী পদ গাইতে পারে না।

একখানা গাড়ী ডাকিয়া কলেজে চলিলাম। পাগলকে সঙ্গে লইলাম পথে নামাইয়া দিব ; যদি গান গায় শোনা যাইবে।

গাড়ী যখন চলিল তখন পাগল উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া গান ধরিল। সেই মিল হীন কথা—সেই কথার ভিতর বিরহের নিদারুণ ব্যথা। ব্যথায় গায়কের চক্ষে জল নাই, শ্রোতার চক্ষে জল ভরিয়া উঠিল।

কলেজের গেটে আসিয়া গাড়ী বিদায় করিলাম। পাগলকেও সিকিটী দিয়া তাহার মিষ্টি গানের জন্য পুরস্কৃত করিলাম।

( ২ )

কলেজ হইতে বাসায় আসিয়া শুনিলাম, পাগল ফিরিয়া আসিয়া বাসায় ঢুকিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। এবং এই রূপে মেয়েদিগকে আতঙ্কিত করিয়া বিষম উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিল। গৃহিণীতো একেই সপ্তমে চড়াছিলেন। পাগলের এই ব্যবহারে ও কিরণকে ডাকিয়া জানালা গলাইয়া কমলা লেবু প্রদানে তিনি খুব অপমান বোধ করিয়াছেন। তাঁহার কথার খরধারের সম্মুখে চুপ করিয়া রহিলাম।

বুঝিলাম পাগল আমার দেওয়া সেই সিকিটী দ্বারাই কিরণের জন্য এই কমলা লেবু আনিয়াছিল।

পোষাক ছাড়িয়া সেই দৈনিক কাগজখানা কোণ হইতে কুড়াইয়া লইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, একস্থানে পাগল লিখিয়াছে—"আমি আর আসিব না, আমি আর আসিব না। জীবনের ফল করিব সফল এমনি করিয়া ঘুরিয়া ! আমি তাহার লাগিয়া যাব দেশে দেশে—ঘুরিব কানন বন। সফল হইবে আমার কামনা যেদিন তাহাতে মিশিব। সুখ নাই, দুঃখ নাই, পিতা কে, মাতা কে ? অবাধ্য পুত্র। পাগল আমি।"

এই লেখাগুলি একটা বিজ্ঞাপনের পার্শ্বে লেখা ছিল। বিজ্ঞাপনটার প্রতি দৃষ্টি গেল, তাহাতে লেখা—

"বাবা কমল গৃহে আইস। তোমার অদর্শনে তোমার জননী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় অন্ধ হইয়াছেন। আমারও মৃত্যুকাল উপস্থিত।

"আমার ২৫ বৎসরের পুত্র কমলাকান্ত ঘোষ পত্নী বিয়োগে হটাৎ উন্মাদ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, চেহারা বেঁটে গৌরবর্ণ, গোপদাড়ি আছে। বামহাতে অঙ্গুলী ছয়টী নাকের বামপার্শ্বে কাটা চিহ্ন। বি এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। কেহ দেখিলে আটক রাখিয়া আমাকে সংবাদ দিলে পরম উপকৃত হইব।"

তবে কি এই পাগলই কমলাকান্ত ঘোষ। বর্ণনা তো ঠিকই মিলে। বামহাতে অঙ্গুলী যে ছয়টী ও নাকের পার্শ্বে কাটা দাগ, তাহাতো লক্ষ্য করি নাই।

গৃহিণীকে ডাকিয়া সংবাদটা দিয়া বলিলাম "দেখ যাহা মনে করিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই হইয়াছে লোকটা স্ত্রীর অভাবে উন্মাদ হইয়াছে বোধ হয় তাহার স্ত্রীর চেহারার সহিত কিরণের চেহারার সাদৃশ্য পাইয়াছিল তাই."

গৃহিণী বলিলেন—"কোথাকার পাগল কে ঠাঁই দেয় ? এ বাড়ীতে পাগল যেন আর না আসে ! আমি নিষেধ করিয়াছি।"

পাগলকে আর দেখিতে পাই নাই। গৃহিণীর সহানুভূতিহীন অথচ অপমানজনক বাক্যের তাড়নায় বোধ হয় পাগল এ পথ ত্যাগ করিয়াছে। আর একদিন দেখিতে পাইলে পুলিসে ধরাইয়া তাহার পিতাকে সংবাদ দিব—মনে করিয়াছিলাম। আর সাক্ষাৎ না হওয়ায় তাহা হইল না।

( ৩ )

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রায় দুই তিন মাস পরে ঢাকার এক খানা সংবাদ পত্রে নিম্ন লিখিত সংবাদ পাঠ করিলাম।

" কিছুদিন পূর্ব্বে একটা মৃত দেহ বাবুরবাজার খালে ভাসমান দেখিয়া স্থানীয় পুলিস তাহা উঠায় ; তখন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা একটা পাগলের দেহ। এই পাগলকে সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। পাগলের গায়ে কয়েকটী আঘাতের চিহ্ন ছিল ; সে জন্য, পাগল আত্মহত্যা করিয়াছে, কি কেহ তাহাকে হত্যা করিয়াছে, তাহার তদন্ত হয়।

সম্প্রতি পুলিশ-তদন্তে যে বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহা অতি শোচনীয়, অতি মর্ম্মান্তিক। আমরা নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া এই ধ্বংশোন্মুখ সমাজের চক্ষু ফুটিবে কি?

পাগলের নাম কমলাকান্ত ঘোষ। সে বি, এ, পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এক ব্যবসায়ীর ফার্ম্মে কাজ করিত। ছেলেকে বিবাহ করাইয়া পিতা মাতা যথেষ্ট প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন। ছেলে পিতা মাতার সে আশা নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। পাত্রী দেখিয়া কমলাকান্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। তখন, অবস্থা বুঝিয়া পাত্রীর দরিদ্র পিতা, পাত্র পক্ষের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সম্মত হন না। কমলাকান্তের আগ্রহে বিবাহ হইয়া যায়। ফলে নববধূ শ্বশুর ও শাশুড়ীর চক্ষের শূল হইয়া পড়েন। প্রবাসী কমলাকান্ত এ ব্যাপার কিছুই জানিত না।

কমলার স্ত্রীর নাম ছিল কিরণ। কিরণ যখন শুনিল, তাহার শাশুড়ী তাহার স্বামীর জন্য অন্য এক অবস্থাপন্ন ঘরে প্রচুর অর্থ লইয়া দ্বিতীয় পাত্রী মনোনীত করিয়াছেন; এবং স্বয়ং কমলাকান্তও সেই বিবাহে সম্মতি দিয়াছে এবং কেবল ঘরে দ্বিতীয় পত্নী আছে, এই অজুহাতে এই বিবাহ হইতে পারিতেছে না; তখন কিরণ স্বামীর ও শ্বশুর শাশুড়ীর অবস্থা বুঝিয়া স্বামীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও সুখের পথ হইতে দূরে সরিয়া গেল। সে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইল (?)।

মৃত্যুর পূর্ব্ব সময়ে কিরণ স্বামীকে যে চিঠি লিখিয়াছিল, এ সকল কথা তাহাতেই প্রকাশ। পাগল এ চিঠিখানা কবচরূপে আপনার শরীরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

এই চিঠি পাইয়া কমলাকান্ত উন্মাদ হইয়া বাহির হয়। তখন পিতা পুত্রের জন্য সংবাদ পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কমলাকান্তের পরিণাম—নিষ্ঠুর সমাজ চক্ষু মেলিয়া দেখুন শিক্ষিতা নারী-সমাজও দেখুন! নারীর প্রতি নারীর কি নির্য্যাতন! সেই নির্য্যাতনের কি ভীষণ পরিণাম।"

* * *

গৃহিণী ও কিরণকে ডাকিয়া সেই করুণ কাহিনী পড়িয়া শুনাইলাম। পড়িতে পড়িতে চক্ষুর পাতা ভিজিয়া উঠিল, গৃহিণীর কঠিন প্রাণ সহানুভূতিতে দ্রব হইয়া পড়িল; কিরণের চক্ষু হইতে ধারা বহিয়া ছুটিল।

আমার কেবলি তখন মনে পড়িতেছিল সেই গানটী—

"সুধু সে রেখে গেছে আখর ক'টী গো।
রক্তে রাঙ্গাইয়া প্রাণের ব্যথা গো॥"

---

## সাহিত্য সংবাদ।

পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা হইতে "প্রাচী" নামে একখানা সচিত্র মাসিক পত্র গত আষাঢ় হইতে বাহির হইতেছে। আমরা নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

---

বিগত ২৯শে শ্রাবণ রবিবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় সৌরভ কার্য্যালয়ে সৌরভ সম্মিলনের এক অধিবেশন হইয়াছিল। বৃদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সহরের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য "সুসং পাহাড়" ও "শিব-তাণ্ডব" এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র কবিভূষণ-তত্বনিধি ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় যথাক্রমে "দুনিয়া রমনী" ও "কৃষ্ণানুসন্ধান" শীর্ষক কবিতাদ্বয় পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এস সি, বি, টি, "কালচক্র" নামক জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলে সাহিত্য বিষয়ক নানা কথা আলোচনার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

---

সাহিত্য-সুহৃদ নীরব কর্ম্মী কামিনী কুমার সেন এম, এ বি এল মহাশয় গত ২০ শ্রাবণ রবিবার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। "আরতি" পরিচালনে কামিনী বাবু আমাদের সাহায্যকারী ছিলেন, তখন তিনি এখানে তৎকালীন সিটী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ভগবান তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার শান্তি বিধান করুন।

---

স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরী।

Asutosh Press, Dacca.
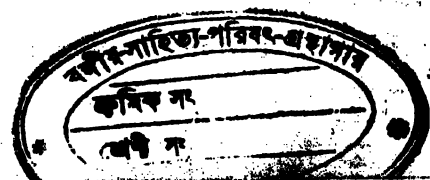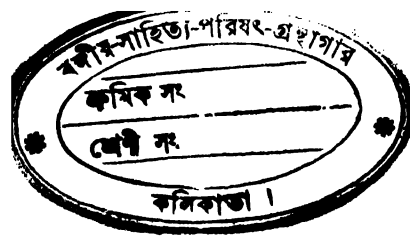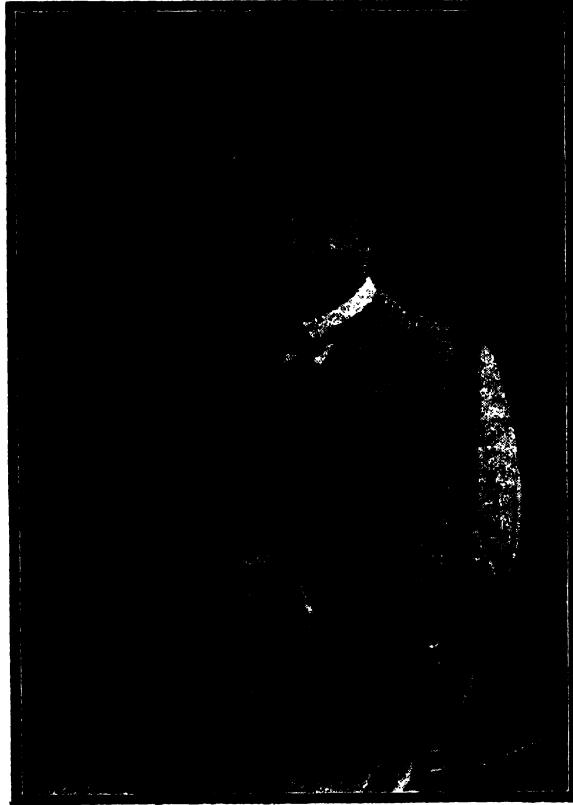
একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩৩০। | নবম সংখ্যা।

# ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিণাম।

কোনও জাতি কেবল মাত্র স্বীয় সম্পদে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। জাতির বিবিধ প্রকার অভাব মোচন করিতে হইলে বৈদেশিক পণ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতে হয়। বৈদেশিক পণ্য ক্রয় করিতে হইলে নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানী করিতে হয়। অবশ্য কোনও দেশ তাহার উৎপাদনী শক্তির সীমা অতিক্রম করিলে ঋণগ্রস্ত হইবে। প্রায় সমস্ত দেশই, যে সমস্ত পণ্য উৎপন্ন করে, তাহা দ্বারা তাহার অভাব নিবৃত্তি করিয়া অতিরিক্ত পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে। এই বৈদেশিক রপ্তানীর বিনিময়েই বিদেশ হইতে অন্যান্য অভাব নিবৃত্তির উপযোগী পণ্য সামগ্রী স্ব স্ব দেশে আমদানী হয়।

বাস্তব জগতে আমরা দেখিতে পাই যে কোনও দেশের অভাব নিবৃত্তির উপযোগী পণ্যগুলি সমস্তই কেবল নিজে উৎপাদন করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি বিরুদ্ধগামী হইয়া তাহার চেষ্টাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে; সুতরাং সেই ক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া—যে সমস্ত পণ্যের উৎপাদন করিলে তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক হয়—সেই সমস্ত পণ্যের উৎপাদনই সে করিবে এবং সেই সমস্ত পণ্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত পণ্য দ্বারা অন্যান্য অভাব নিবৃত্তির উপযোগী দ্রব্য সম্ভার বিদেশ হইতে আমদানী করিবে। অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তি বিরুদ্ধগামী না হইলেও পণ্য বিশেষের উৎপাদনে দেশ বিশেষের ক্ষান্ত হয়—যদি উক্ত দেশ তদপেক্ষা লাভজনক অন্য কোন পণ্যোৎপাদনে তাহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করিতে সুবিধা পায়। মোট কথা যে ক্ষেত্রে লাভ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ক্ষেত্রেই উৎপাদনী শক্তির চালনা হয়। ইহাই উৎপাদনের মূল রহস্য। ইহা মনুষ্য স্বভাবের সনাতন নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত—যাহাকে আমরা ইংরেজীতে বলি—"Maximum of gain and minimum of labour." ধরুন, বাঙ্গালা দেশের চাষী যদি পাট উৎপাদন করিয়াই বেশী লাভ পায়, সেই ক্ষেত্রে সে কখনও তৎস্থলে তুলা কিংবা রেশম উৎপাদন করিতে যাইবে না। আবার দক্ষিণাত্য তুলা ছাড়িয়া পাট কিংবা রেশম, তথা আসাম রেশম ছাড়িয়া তুলা কিংবা পাট উৎপাদন করিতে কখনও প্রয়াসী হইবে না। বাস্তবিক, এই ভাবেই বিভিন্ন পণ্য স্ব স্ব উৎপত্তি স্থান বাছিয়া লয়: এই ভাবেই ইংলণ্ডে লৌহজাত দ্রব্য, কয়লা, কাপড় ইত্যাদি, ফ্রান্সে রেশম, মদ, ইত্যাদির, জাপানে রেশম, দেশলাই, প্রভৃতি, তথা ভারতে ধান, গম, পাট, তুলা, রেশম, পশম, কাপড়, চট প্রভৃতির উৎপাদন সম্ভাবনীয় হইয়াছে। ইহাকেই ইংরেজীতে "Geographical division of labour" বলে। এইরূপেই আমরা বেশ বুঝিতেছি যে পণ্যোৎপাদনের মূলতত্ত্বই হইতেছে—"Maximum of gain and minimum of labour. অর্থাৎ কোনও দেশ বিশেষের অর্থ ( Capital ) ও শ্রম ( labour ) সেই পরিমাণেই পণ্য সকল উৎপাদনে ব্যয়িত হইবে যে পরিমাণে শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লভ্য দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

উপর্য্যুক্ত আলোচনা হইতে আমরা আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের মূলতত্ত্ব কোথায়? তাহা বেশ বুঝিতে

গুলি জিনিষ আমরা এই পরিমাণে উৎপাদন করি, যা আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিয়া রপ্তানী করিতে ; কারণ তাহাতেই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা লাভ এবং যাহার বিনিময়ে আমরা কতগুলি সামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানী করি ; যাহার উৎপাদন করা আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত, কিংবা যাহার উৎপাদনে প্রকৃতিদেবী আমাদের অনুকূল নহেন, কিংবা যাহার উৎপাদনোৎকর্ষ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এই আলোচনা অনেকটা সাধারণ ভাবে উৎপাদন সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা জন্মাইয়া দেয় মাত্র। কিন্তু মানুষের চেষ্টা ও অনেক অপরিজ্ঞাত কারণে অনেক সময় এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়।

যাহা হউক, ভারতবর্ষের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেখিতে হইবে কোন্ জিনিস উৎপাদন করিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোগ্য বস্তু আমরা তদ্ বিনিময়ে পাইতে পারি? কতগুলি জিনিস আছে যাহা যত বেশীই উৎপাদন করা যায়, ততই ক্রমশ অনুপাতে খরচ কম পড়ে ; কাজেই ঐ গুলিতে বেশী লাভ দাঁড়ায়। সাধারণতঃ শিল্প কার্য্যাদি এই নিয়মে পরিচালিত হয়। এই সমস্ত শিল্পগুলিকে ক্রম বর্দ্ধনশীল লাভ মূলক বা Industries under increasing returns বলিয়া অভিহিত করা হয়। অধিকন্তু এই গুলিতে অল্পশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে অধিকতর লাভ হওয়ার সম্ভব। জগতের সমস্ত শিল্প কার্য্য ( manufacturing industies ) এই নিয়মের অধীন। পরন্তু এই সমস্ত শিল্প কার্য্যে অনেক বিস্তৃতভাবে এক বিশাল কারখানায় করায় সম্ভব হয় বলিয়া গড় পড়তায় খরচ কম হয় এবং তদ্দরুণ প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অনেকখানি সুবিধা পাওয়া যায়।

আবার এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যে গুলির যতই বেশী উৎপাদন করা যায়, ততই অনুপাতে খরচ বেশী হয়। সাধারণতঃ ভূমিজ বস্তুর উৎপাদন এই প্রকার। এবম্বিধ উৎপাদন প্রণালীকে ক্রমহ্রাসমান লাভমূলক ( Production under diminishing returns ) নামে অভিহিত করা হয়। কৃষিজ ধান, পাট, সরিষা, গম, ইত্যাদি প্রায় সমস্ত কাচা মালের উৎপাদনই এই প্রকারের। ইহার উৎপাদন যতই বেশী হইবে, ততই অনুপাতে লাভ কম হইবে। ইহার প্রধান কারণ—ভূমি অসীম নয়। ভূমির উৎপাদনী শক্তির সীমা আছে ; পক্ষান্তরে জন সাধারণের চাহিদার তুলনায় অন্যান্য শিল্পাদির উৎপাদনের সীমা নির্দ্দেশ করা একপ্রকার অসম্ভব। চাহিদাই উহার শেষ সীমা। কিন্তু ভূমিজ পদার্থ উৎপাদনের সীমা নির্দ্দেশের পক্ষে চাহিদা অপেক্ষা ভূমির সসীমতা টুকুকেই আমরা বেশী কার্য্যকারী বলিয়া মনে করি। ভূমিরএই সসীমতা নিবন্ধন প্রত্যেক উৎপাদক তাহার আয়ত্ত ভূমিতে যদ্দূর চাষ সম্ভব হয়, ততটুকু চাষ করিতে ক্ষান্ত হয় না, কাজেই ভূমির উৎপাদনী শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার জন্য ভূমির ক্রম অবনতির ধারা কিছুতেই রোধ করা যাইতে পারে না। অবশ্য নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক সার ও উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া এই ক্রমহ্রাসমানতার গতি পিছাইয়া দেওয়া যায় ; কিন্তু ইহা একেবারে কিছুতেই ফিরান যাইবে না। পরিণামে উহার উৎপাদনী শক্তির হ্রাস অনিবার্য্য। অতএব যতই এই সমস্ত ভূমিজ পদার্থের চাহিদা বাড়িবে, ততই উৎপাদনের এই ক্রমহ্রাসমানতা জনিত ভূমির উপর যে ক্ষতিজনক চাপ পড়ে তাহাও বাড়িতে থাকিবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদকগণেরও গড়্‌প‌ড়্‌তা লাভ কম হইতে হইতে শূন্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা হইবে। সেই জন্য কোনও দেশের সমৃদ্ধি বাড়াইতে হইলে, এই সমস্ত ভূমিজ দ্রব্যের উৎপাদনে যে ক্রমহ্রাসমানতার উদ্ভব হয়, তাহার যথা সম্ভব গতিরোধ করা প্রয়োজন ; এবং শিল্পাদির উন্নতি বিধান কর্ত্তব্য। আমাদের চাহিদা যদি আমাদের উৎপাদনকে নিয়মিত করে, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল। আমাদের চাহিদা স্বতঃই নানাপ্রকার মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু যদি আমাদের চাহিদাই পক্ষান্তরে উৎপাদনী শক্তিদ্বারা নিয়মিত হয়, তাহা হইলে তাহা আমাদের সমৃদ্ধির কারণ হইবে না। বাস্তবিক দরিদ্রের চাহিদা তাহার সীমাবদ্ধ আয় দ্বারা অর্থাৎ সীমাবদ্ধ উৎপাদনী শক্তিদ্বারা অনেকটা নিয়মিত ; তদ্দরুণ দরিদ্র ব্যক্তির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হয়। যে দেশ কেবল মাত্র ভূমিজ পদার্থের আয়ের উপরই নির্ভর করে, তাহার অবস্থা

অনেকটা এইরূপ শোচনীয়। সেই দেশ আপাততঃ সমৃদ্ধ থাকিলেও তাহার ক্রম-বর্দ্ধমান জন সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা সভ্যতার উপযোগী ক্রম-বর্দ্ধমান অভাব সমূহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দরিদ্র হইতে থাকিবে। বর্ত্তমানে আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থাই এই শেষোক্ত অবস্থার তুল্য।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা বিবৃত করিয়া আমাদের দুর্দ্দশার বিষয় প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব এবং পাঠকগণও আশা করি ভারতের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার বিষয় ভাবিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে চেষ্টা পাইবেন।

ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের বাণিজ্যের অর্থনৈতিক গতি সম্বন্ধে বেশ ধারণা জন্মে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত জিনিষ সকল বিদেশ হইতে ১৯২০-২১ সনে এদেশে আমদানী হইয়াছে।

কার্পাস বস্ত্র ও সূতা —১০২ কোটি টাকা।
নানা প্রকার যন্ত্র —২৪ কোটি টাকা।
রেলপথ নির্ম্মাণের
আসবাবাদি —১৬½ কোটি টাকা।
মটরকার————৮ কোটি টাকা।
বিবিধ ধাতব দ্রব্য——৯ কোটি টাকা।
কাগজ ও পেষ্টবের্ড—৬৩ লক্ষ টাকা।
রেশম————৪ কোটি টাকা।

মোট ১৬৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।

এতদতিরিক্ত, লৌহ, ইস্পাত, চিনি এবং খনিজ তৈল আমদানী—১৭৪ কোটিরও অধিক। এইভাবে আমদানী বাণিজ্যের ৩৩৫৲ কোটি টাকার ও অধিক হিসাব আমরা পাইলাম। কার্পাস নির্ম্মিত দ্রব্যের প্রায় বার আনিরও অধিক ইংলণ্ড হইতে এ দেশে আমদানী হয়। লৌহ, ইস্পাত প্রায় শতকরা সত্তরের ও বেশী ইংলণ্ড হইতে আমদানী হয়। নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির মধ্যে শতকরা প্রায় আশি ভাগ ইংলণ্ড হইতে পাই। চিনি প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ জাভা দ্বীপ হইতে আসে। মটরকারের বারআনি আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ হইতে আসে। বিবিধধাতব দ্রব্যের মধ্যে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ ইংলণ্ড হইতে, ২৫ ভাগ আমেরিকা হইতে এবং অবশিষ্ট জাপান হইতে এদেশে আমদানী হয়। খনিজ তৈল ৬২ ভাগের ও অধিক আমেরিকা হইতে এবং অবশিষ্ট বোর্ণিয়ো, পারস্য ইত্যাদি দেশ হইতে আমদানী হয়। রেশম নির্ম্মিত দ্রব্যের অর্দ্ধেকের ও বেশী জাপান হইতে আসে।

এতদ্ব্যতীত আরও ছোটখাট নানাপ্রকার আমদানী দ্রব্য আছে যাহার উল্লেখ উপরে নাই। যথা :—দেশলাই, ঔষধ, কৃমিরসার, সুগন্ধি দ্রব্য, পশম দ্রব্য, পাকা চামড়া ও তন্নির্ম্মিত পাদুকাদি, রবার, কাচ ইত্যাদি।

উল্লিখিত আমদানী দ্রব্যাদির সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে তাহা সমস্তই শিল্পজাত পণ্য (manufactured goods)। আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের পণ্য কিন্তু অধিকাংশই ভূমিজ। শিল্পদ্রব্য রপ্তানী দ্রব্যের তালিকায় একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।

আমাদের রপ্তানী দ্রব্যের তালিকা (মূল্যাধিক্যানুসারে) অনেকটা এই প্রকারের।

সামান্য পরিমাণ কাচা পাট ও পাট নির্ম্মিত চট্, গাণিব্যাগ ইত্যাদি; কাচা তুলা ও মোটা সূতা ও কাপড়। খাদ্য শস্য যথা—চাউল, গম ইত্যাদি এবং ময়দা, তৈলবীজ যথা :—রেড়ী, সর্ষপ তিসি, তিল ইত্যাদি। চা, কাচা ও পাইট্ করা চর্ম্ম, এবং লাক্ষা। এতদতিরিক্ত অন্যান্য ছোট খাট জিনিস আরও অনেক আছে।

১৯২০-২১ সনে রপ্তানী দ্রব্যের মোট মূল্য হইয়াছিল ২৩৮, কোটি টাকা। উক্ত সনে নানাকারণে রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য আমদানী দ্রব্য অপেক্ষা কম হইয়াছিল। সে সব কারণ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। তবে, সাধারণতঃ ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য টাকার অঙ্কে আমদানী অপেক্ষা বেশীই থাকে। তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা পরবর্ত্তী বর্ষ সমূহের হিসাব দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে। এখন, দেখিতে হইবে, যদিও টাকার অঙ্কে রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য আমদানী অপেক্ষা বেশী থাকে, তথাপি কি আমরা বাস্তবিকই আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে ধনী হইতেছি? আপাত দৃষ্টিতে উহাতে আমাদের ধনবত্তা বাড়িয়াই চলিয়াছে এমন

বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এবম্বিধ প্রগতির পরিণাম কখনই শুভজনক নয়।

আমাদের পণ্য সামগ্রী প্রায় সমস্তই ভূমিজ। ভূমির সসীমতা দরুণ আমাদের সমস্ত পণ্যেরই উৎপাদন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং আমাদের নিত্য বিবর্দ্ধমান অভাব সমূহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির উপর অধিক হইতে অধিকতর চাপ পড়িতেছে। তাহাতে আমাদের ভূমির উৎপাদনী শক্তির ক্রমহ্রাসমানতা ক্রমশঃই অধিকতর ফুটিয়া উঠিতেছে। কারণ ভূমিজ পণ্যের বিনিময় ব্যতিরেকে আমাদের অভাব নিবৃত্তির আর কোনও উপায় একপ্রকার নাই বলিলেও চলে। অবশ্য এ দুর্দ্দশা আমাদের আধুনিক। কলকারখানার প্রতিযোগিতায় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারে আমাদের শ্রম শিল্প এখন সমস্তই লুপ্ত প্রায়। একদিন আমাদের শিল্প সম্ভারের রপ্তানী দ্বারা আমাদের সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের সেই শিল্পিকুল আর নাই। ভারতের সেই শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক পণ্যে ভারতের বাজার ভরিয়া গিয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতের সমৃদ্ধ এবং রাষ্ট্র শক্তির আশ্রয় বিচ্যুত ভারতীয়চারু শিল্পকে ধ্বংশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উহা ক্রমশঃ ভারতের জীবনী শক্তির সম্বল কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিনিময় মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভারতের স্থিতিশীল উর্ব্বরতা শক্তিটুকুকেও ক্রমশঃ বিনাশের পথে লইয়া যাইতেছে। এবং এই ভাবেই বৈদেশিক পণ্যের প্রভাবে ভারত ক্রমশঃ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতে চলিয়াছে এবং ক্রমে নিঃস্ব হইবে।

এই ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্রের প্রতিকার কতক আমাদের নিজেদের কার্য্যশক্তির উপর, আর কতক রাষ্ট্রীয় শক্তির অনুকূলতার উপর নির্ভর করিতেছে। রাষ্ট্রীয় শক্তির অনুকূলতা কতদূর হইবে জানি না; তবে আমাদের স্বাবলম্বন দ্বারা যেটুকু হওয়া সম্ভব হয় সেটুকু হইলেও অনেক উপকার হয়।

দেশে দেশীয় শিল্পের প্রসার এখন একান্ত প্রয়োজন। কৃষিকার্য্যের উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা আপাততঃ আমাদের কমাইতে হইবে। নূতন নূতন শিল্পের উদ্ভাবন দ্বারা আমাদের বহির্বাণিজ্যের পণ্য সাজাইতে হইবে। কল কারখানা দ্বারা পাশ্চাত্য প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে। শিল্পাদির যথেষ্ট সমৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তির আনুকূল্যের অপেক্ষা না করিয়া নিজেদের মধ্যে এখন স্বদেশিকতার প্রসার আবশ্যক যাহাতে বৈদেশিক পণ্য আসিয়া আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে আমাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধির সহায়তা না করে। কিন্তু এই সঙ্গে কেহ যেন মনে না করেন যে শিল্প প্রসারেরকালে কৃষির কোনও উন্নতির প্রয়োজন নাই।

যতই কেন শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি হউক না, ভারত চিরকালই কৃষি-প্রধান দেশ থাকিবে। কৃষি কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি দ্বারা আমাদের ভূমির উর্ব্বরতার ক্রমহ্রাসমানতার বেগটুকু প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য। এবং ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি এবং পরিণামে তাহারাই আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারকারী হইবে।

শিল্পপ্রসারজনিত প্রতিযোগিতার প্রথমাবস্থাতে অনুন্নত দরিদ্র কৃষককুলকে কখনও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করা যাইতে পারিবে না। আবার কৃষকদিগকেও কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবসর সময়ে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারে এমন নানাবিধ হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে সামাজিক সমৃদ্ধি ও অনেকটা সমপরিমাণে বিস্তার লাভ করিতে পারিবে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের শোচনীয় পরিণামজনিত যে দুর্দ্দশা, তাহার গতিরোধ করা সম্বন্ধে প্রত্যেক ভারত বাসীর ব্যক্তিগত একটা কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করি। যখন আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের বৈদেশিক দ্রব্য ব্যবহারের লালসা আমাদেরই কৃষিজাত নিত্য প্রাণ ধারণোপযোগী দ্রব্যের রপ্তানীদ্বারা পরিতৃপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে আমাদের বিলাসতমসাচ্ছন্ন পরিতৃপ্ত লালসাটুকুই এই রপ্তানীজনিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ, তখন আমাদের বিদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহারের প্রতিপক্ষতা করা ছাড়া আর আত্মরক্ষা করার কোনও উপায় নাই বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ।

# স্নেহের দান।

( ১৩ )

মা ছেলেকে প্রতিদিন ডাকিয়া আনিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মণির সময় সংকীর্ণ হেতু, মাতার নিকট আসিতে সে মোটেই সময় পায় না। যখন পায়, তখন হয়ত স্মরণ থাকে না; অথবা মায়ের আহ্বান তখন পঁহুছে না।

কবিরাজ মহাশয় চলিয়া গেলে, কর্ত্রী মণিমোহনকে ডাকাইয়াছিলেন। বার্ত্তাবাহক বহুকষ্টে তাহার নিকট মাতার আহ্বান পঁহুছাইয়াছিল। কিন্তু কার্য্য বাহুল্যেই হউক, আর অনিচ্ছায়ই হউক, মাতা পুত্রের সাক্ষাৎ পাইলেন না। পুত্রের অবস্থা ভাবিয়া মাতা চক্ষু জলে বক্ষ ভাসাইলেন। ইহার অধিক আর পুত্রের প্রতি মাতার এই অবস্থায় করণীয় কি?

দাস দাসীগণের ন্যায় পুরাতন আমলাগুলিকেও একে একে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং কাহাকে ডাকিয়া তিনি কোন্ আদেশ প্রদান করিবেন, অথবা ব্যবস্থা করিবেন? আজ তিনি পুত্রের সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়াও শক্তিহীন—পথের ভিকারিণীর চেয়েও উপায়হীন।

তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা ভাবিলেন। তারপর সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে—আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিলে—লোহার সিন্দুকের চাবিগুলি সযত্নে কোমরে বান্ধিয়া লইয়া দালানের সমস্ত জানালা ভিতর হইতে ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া পেছনের দরজা দিয়া বাহির হইলেন। এবং সেই দরজায় মজবুত তালা আটাইয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে পাছের পুকুর পাড়ের দরজায় বাহির হইয়া মন্ত্রনার জন্য ছোট হিস্তার কর্ত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আজ যে তাঁহার মনে কত বেদনা, কত যন্ত্রণা কে তাহার পরিমাণ করিতে পারিবে?

বসন্তের নির্ম্মল জ্যোৎস্নার আলোকে ছোট হিস্তার পশ্চিমের দালানের বারান্দায় বসিয়া নীচে পা ঝুলাইতে ঝুলাইতে কনক যখন পাঁচি, রামী, উমা প্রভৃতি দাসীদিগের নিকট মুখে মুখে রামায়ণের গল্প বলিতেছিল—এই সময় বড় হিস্তার কর্ত্রী ধীর পদে আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কনক মধ্য স্থলে গল্প বন্ধ করিয়া বলিল—"কেগো?"

কর্ত্রীর দুঃখভারাক্রান্ত বেপথুমান কণ্ঠ কনকের প্রশ্নে আরো কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মুখ হইতে অস্পষ্ট ধ্বনি আসিল; কোন স্পষ্ট কথা আসিল না।

কনক শরীর উঠাইয়া বারান্দা হইতে নামিয়া যাইয়া কুতুহলের বশে সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া মাকে ডাকিতে লাগিল—

"ওমা—মা; জ্যেঠিমা আসিয়াছেন।"

কনক মাটিতে পড়িয়া জ্যেঠি মাকে প্রণাম করিল। দাসীরা সমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছোট কর্ত্রীকে সংবাদ দিতে চলিল।

এই আদর অভ্যর্থনায় বড় কর্ত্রীর হৃদয় মথিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল; তিনি কনককে বুকে টানিয়া লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

ছোট কর্ত্রী সাগ্রহে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বড় কর্ত্রীকে হাতে ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন।

এক বৎসর পরে উভয়ের সাক্ষাৎ। ম্যানেজারের পদচ্যুতির পর উভয়ের অসাক্ষাৎ মনোমালিন্যে পরিণত হইয়াছিল। মনোমালিন্যের আরো কারণ ছিল। সাধারণ পরিবারের পক্ষে এগুলি তত গুরুতর না হইলেও জমিদার পরিবারের পক্ষে ক্ষুদ্র বিষয়ও সাঙ্গোপাঙ্গের চেষ্টায় বৃহৎ ঘটনায় দাঁড়াইয়া যায়।

বড়কর্ত্রী ম্যানেজারকে পদচ্যুত করায় এবং সেই পদচ্যুত ম্যানেজারকে ছোট হিস্তার কর্ত্রী আশ্রয় দেওয়ায় বড় কর্ত্রীর প্রভুত্ব প্রিয় অভিমানী হৃদয়ে এ ঘটনা প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসীর আগমনের পর দুই হিস্তার মধ্যের যাতায়াতের রাস্তাও ছোট হিস্তা হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপেও দুই বাড়ীর কথা বার্ত্তার সম্বন্ধ বন্ধ হইয়া যায়। এই সকল ঘটনায়ই মনোমালিন্য তিলে তিলে তাল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই অবস্থায় আজ বড় কর্ত্রীকে নিজ বাড়ীতে উপস্থিত পাইয়া তাঁহার কত বিক্ষত হৃদয়ের দারুণ আঘাত ও বেদনাকে ছোট কর্ত্রী তাহার স্বভাব-কোমল সদয় ব্যবহারে ও মধুর আপ্যায়নে জুড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন।

বড় হিস্তার যে অভাবনীয় কাণ্ড কারখানা চলিতেছিল, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। মণির মার অবস্থাও

ছোট কর্ত্রীর অজ্ঞাত ছিল না; তাঁহাকে যে আজ তাঁহার বাস গৃহ ছাড়িয়া দিবার আদেশ করা হইয়াছে, তাঁহাও আজ তিনি শুনিয়াছিলেন। রাজরাণী ভিখারিণী হইলে যে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হয়, ছোট কর্ত্রীর তাহা বুঝিবার এবং অনুভব করিবার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছিল। সুতরাং বড় কর্ত্রী যে আজ কত দুর ব্যথা বুকে লইয়া আসিয়াছেন, তাহা সহজেই তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। এবং সেইরূপ সাশ্রু নয়নে, বেদনাপ্লুত অন্তরে, সরল সহৃদয়তায় দিদিকে বরণ করিয়া লইয়া তাঁহার হৃদয়ের দারুণ ক্ষত আরামের জন্য তিনি যথেষ্ট সান্ত্বনা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে পুঞ্জীকৃত আবেগের নিশ্বাস ফেলিয়া বড় কর্ত্রী বলিলেন—"দুরদৃষ্টের বাকী আর কিছুই নাই বোন্! সবই হইয়াছে। এখন আমার উপায় কি? এ বিষয়ে পরামর্শ কি?"

ছোট কর্ত্রী সহানুভূতির সুরে বলিলেন—"আমরা কি বলিব দিদি! সকলি ভগবানের হাত। মণি যে এমন সাধু মানুষ হইয়া, বুদ্ধিমান হইয়া শেষটায় এমন একটা কুকাণ্ড করিয়া তুলিবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল। সকলি অদৃষ্ট। এই উপদ্রবে আমরাও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি। বাড়ন্ত মেয়ে ঘরে, তাই ভিতরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়াছি। ম্যানেজার বলিয়াছিলেন ফৌজদারীতে দরখাস্ত দিয়া বাড়ীর উপরের এই দিন-রাত চীৎকার-কাণ্ড-কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে পারা যায়। আমি নিষেধ করিয়াছি। ইহাতে হয়ত তুমি রাগ করিতে; মণির সঙ্গেও চিরদিনের জন্য একটা আক্রোশ বাধিয়া উঠিত। নানা দিক ভাবিয়া আমি এই উপদ্রব সহ্য করিতেই স্বীকার করিয়া নিয়াছি। এখন যদি তোমার উপরও অত্যাচার হয়, তবে প্রতিকার অবশ্যই করিতে হইবে। এখন তুমি যাহা বল, আমরা তাহাতেই সম্মত হইতে পারি। তোমার অসম্মানে আমার অসম্মান, আমার অসম্মানে তোমার অসম্মান।"

বড় কর্ত্রী ছোট কর্ত্রীর কথায় হৃদয়ের বেদনা অনেকটা লাঘব বোধ করিলেন। তিনি সাগ্রহে নিজ হৃদয়ের দারুণ দৈন্য একেবারেই উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলেন—"কি বলিব বোন্, আমার যে নিজের তহবিলের গোমস্তাটা ছিল, নিজের টাকা কড়ির হিসাব রাখিত, মামলা মোকদ্দমা করিত, টাকা পয়সা উশুল তহসীল আমার নিজের হাতে আনিয়া জমা দিত, সেই লোকটাকেও বিদায় দিয়াছে। আজ এই এক বৎসর যাবত একটা টাকাও আমার হাতে আইসে না—সব তাহাদের লুচি-সন্দেশ, মদ-গাঁজায় উড়িতেছে। আমার নিজের জন্ত আমি একটুও চিন্তা করি না। যাহা হাতে আছে, তাহাতেই আমার যথেষ্ট। কিন্তু আমার মণির কি হবে গো?" বলিতে বলিতে বড় কর্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ছোট কর্ত্রী বলিলেন—"কাঁদিয়া লাভ নাই দিদি, এখন সাহসের দরকার। সাহসে ভর করিয়া উপায় বাহির করিয়া নিতে হইবে। আমার কাছে উপদেশ চাহিলে, আমি লাঠি মারিয়া বাহির করিতে উপদেশ দিব। এ অবস্থায় এরূপ না হইলে তাড়াইতে পারিবে না।"

বড় কর্ত্রীর এ পরামর্শে মন উঠিল না। তিনি বলিলেন "মাখনকে আনাইতে পার তুমি? সে আসিলে সে-ই সকল গোল মিটাইতে পারিত। তাহার কথা মণির নিকট বেদবাক্য।"

মাখনের প্রতি যে বড় কর্ত্রীর বিজাতীয় ঘৃণার ভাব বর্ত্তমান, তাহা বিশেষ করিয়া ছোট কর্ত্রী জানিতেন। এই সময় সে সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিয়া বড় কর্ত্রীর মনে আঘাত দেওয়া তিনি মোটেই পছন্দ করিলেন না। তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন— "মাখনের সংসর্গে থাকিলে কি মণি এরূপ হইতে পারিত দিদি? সে কি সোণার ছেলে! তার এখন এখানে চলিয়া আসা অসম্ভব। তাহার অপেক্ষা করিতে হইলে আরও ৫।৬ মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। তাহার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এই পরীক্ষার ছয়মাস পরেই শেষ পরীক্ষা দিবে। সেটা এম, এ পরীক্ষা। বি, এ পরীক্ষার দুটা কাগজ নাকি হইয়া গিয়াছে, খুব ভাল লিখিয়াছে।..."

বড় কর্ত্রীর নিকট এইরূপ অযাচিত প্রসংশা খুব ভাল লাগিতেছিল না। এ দিকে তাঁহার গরজও বেশী। তাহাকে চাই-ই। তিনি কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"না বোন তাহাকে আনিতেই হইবে। দুই-চার-ছয় দিনের জন্ত সে একেবার আসিয়া মণিকে দেখিয়া যাউক। মণির অবস্থা শুনিলে মণির জন্ত তাহার মন কাঁদিবে। তুমি তাহাকে সকল কথা খুলিয়া লিখিয়া দাও।"

ছোট কর্ত্রী—"আচ্ছা—পরীক্ষা শেষ হইলে একবার আসিতে লিখিব। সে স্বামীজীর কীর্ত্তি নীর্ত্তি সবই শুনিয়াছে, মণির গুণাগুণও সব জানিয়াছে। তুমিও একটা চিঠি লিখ। তোমার চিঠির আমার চিঠি অপেক্ষা একটু বেশী জোড় হইবে।"

বড় কর্ত্রী—"বোন, মণিকে একেবারে ভেড়া বানাইয়াছে ;শুনিতেছি, লোকটা কামরূপের সন্নাসী ; সঙ্গেও অনেকগুলি ডাইনি পত্নী আছে—সব কামরূপের। আমার মণির কি হবে গো ?"

বড় কর্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন।

ছোট—"কাঁদিলে কি হইবে দিদি, সব কপালের লেখা। তুমি মাখনকে চিঠি লিখ। পারিলে সে নিশ্চয় আসিবে।"

বড়—"আমাকে কে চিঠি লিখিয়া দিবে বোন্ ; আমি এখন কাঙ্গালের অপেক্ষাও কাঙ্গাল। আমার যে—আমার বলিতে কেউ নাই। নিজ বাড়ীতে আমার স্থান নাই ; পুত্র অবাধ্য, আমি যে শত্রু পুরীতে বাস করিতেছি। রাত যায় তো দিন যায় না, দিন যায় তো রাত যেন যায় না। এমন একটা লোক নাই, যাহাকে বলি—তুমি আমার এই কাজটা কর।"......

ছোট—"সে বন্দোবস্ত আমি করিয়া দিব দিদি ; আমার গোমস্তা তোমার চিঠি লিখিয়া দিবে। আর তোমার কাজের জন্য তুমি পচি, রামী, উমা যাহাকে ইচ্ছা, লইয়া যাও।"

কথায় কথায় রাত্রি হইয়া গেল দেখিয়া বড় কর্ত্রী বলিলেন—"তবে আজ যাই বোন্। বাড়ীতে মন টিকেনা, কাল আবার আসিব।"

"খালিমুখে যাইতে নাই দিদি! সেখানে তোমার কখন কি হবে ; কে কি দিবে ; যখন আসিয়াছ, আর একটু... .." বলিয়া ছোট কর্ত্রী উঠিয়া গেলেন।

ঠাকুর ঘরের বিকালী-প্রসাদ আসিয়াছিল। ছোট কর্ত্রী তাহাই বড় কর্ত্রীকে পরিবেশন করিলেন। বড় কর্ত্রী নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাহা হইতে মাত্র দুই টুকরা সন্দেশ লইলেন।

সন্দেশ খাইতে খাইতে বড় কর্ত্রী বলিলেন—"আমাদের তরফে এখন লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ উঠিয়া গিয়াছে। স্বামীজীর আহারের সময় ভোগের বাজনা বাজে। তাঁহার সম্মুখে দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় ধূপ দীপে আরতি হয়। স্বামী সিল্কের ধুতি পরিয়া চেয়ারে বালাপোষের আসনে বসিয়া থাকেন। চারিদিকে নৃত্য হয়। দ্বিপ্রহরেও রাত্রিতে শয়ন করিলে মেয়েরা পা টিপিয়া দেয়। স্বামীজী শুইয়া শুইয়া গুড়গুড়িতে খাম্বিরা তামাক মিশ্রিত গাঁজা ও চরস টানেন। বোন্, স্বর্গীয় কর্ত্তা যে এত করিতেন, তাহাতেও এগুলি দেখি নাই। মণি অবাক্ কাণ্ড সব দেখাইল।"

ছোট—"স্বামীজী খান্ কি দিদি ?"

বড়—"খান যে না কি, তাহাই বুঝিলাম না। রোজ একটা পাঁঠা তাহার নিজেরই বরাদ্দ। দোকানের সন্দেশ তিনি নাকি খান না ; সে জন্য ঢাকার বাঙ্গালা বাজারের আমির্ত্তিওয়ালা ও কলিকাতার ভীম নাগের বাড়ীর সন্দেশ ওয়ালা আনাইয়া জীবাশ্রমে বসান হইয়াছে। রোজ নাকি এক মণ সন্দেশ হয়। তাহাতে স্বামীজীর প্রাতে ও বৈকালে ভোগ হয়। রাত্রিতে লুচি মাংস, দ্বিপ্রহরে ঘৃত পক্ক আতপান্ন, পায়েস ইত্যাদি—রামার বাপ আরো কত বলিল। ভোগের পর ছোট সাধুরা প্রসাদ খান। শীতের সময় তিন শত টাকার একখানা কাবুলী আলোয়ান ও আড়াই শত টাকার এক জোড়া লেপ আসিয়াছে। সে লেপের কি খোল—কি ঝালর—দেখ্লে তুমি অবাক্ হইবে। স্বর্গীয় কর্ত্তা বেজায় বাজে খরচ করিয়াও বোন আড়াই শত টাকার লেপ দেখান নাই—মণি তাহা দেখাইল।..."

বড় কর্ত্রী উঠিলেন। ছোট কর্ত্রী উমাকে বলিলেন—"যা উমা, তুই-ই দিদির সঙ্গে থাক্ গিয়া। এখানে থাকিলে দিদি, তোমার ভাণ্ডার নিরাপদে থাকিবে না ; নতুবা তোমাকে এই নরকে আর কখনই যাইতে দিতাম না।

ছোট কর্ত্রীর সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহারে গলিয়া গিয়া বড় কর্ত্রী আর একবার চক্ষু জল ফেলিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। উমা লেণ্টার্ণ ধরিয়া আগে আগে চলিল।

খিরকী দরজা বন্ধ। উমা বলিল—"ও মা, উপায় ?"

কর্ত্রী বলিলেন—"জোরে ধাকা দে।"

উমা জোরে ধাকাইতে আরম্ভ করিল। একজন দরজা খুলিয়া বলিল—"স্বামীজীর হুকুম নাই—এ বাড়ী হইতে কেহ রাত্রিতে যায়, কি এখানে আসে।"

উমা কথা না শুনিয়া কপাট ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। পশ্চাতে কর্ত্রীকে দেখিয়া লোকটা আর কথা বলিতে সাহস করিল না। তাঁহারা প্রবেশ করিবা মাত্র দরজা পুনরায় বন্ধ করিয়া ফেলিল।

উমা সিঁড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিল। কর্ত্রী দরজা খুলিতে আরম্ভ করিলেন। "ওমা একি। এ তালা আবার কে লাগাইল?" কর্ত্রী অবাক!

দরজায় ডবল তালা পড়িয়াছে। এখন উপায়? কর্ত্রী বলিলেন—"উমা দরজা যে খোলা যাইবে না—আমার তালার উপর আর এক তালা লাগাইয়াছে, এখন উপায়?"

উমা বলিল "চলুন মা, ফিরিয়া যাই; এ শত্রুর পুরীতে আপনার এরূপে বাস করা আর কিছুতেই উচিত না।"

কর্ত্রী বলিলেন—"না উমা, আমার সর্ব্বস্ব এখানে রাখিয়া আমি একা নিরাপদে থাকিলে কি হইবে?"

তিনি নূতন তালাতে চাবি পরীক্ষা করিয়া করিয়া ক্রমে বিফল হইলেন। পরে নিরাশ হইয়া অন্য ঘরের অনুসন্ধানে চলিলেন।

সকল ঘরেই লোকের ভীর; সকল ঘরেই কুরুক্ষেত্র। যে ঘরে স্বামীজী তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, শেষ সে ঘরেও যাইয়া দেখিলেন, স্থানাভাব। বড় কর্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে উমাকে বলিলেন—"উমা আজ স্বামীর ভিটাতেও আমার স্থান রাখিল না মণি—এমনই কুপুত্র আমি পেটে স্থান দিয়াছিলাম।"

দীর্ঘ নিশ্বাসের উষ্ণ শ্বাসে তাহার চক্ষের সমস্ত জল যেন তরল হইয়া গণ্ডদ্বয় ভাসাইয়া চলিল।

তখন হটাৎ তাঁহার যেন মনে হইল, মায়ের চক্ষুর জল ছেলের অকল্যাণ আনিতেছে। অমনি তিনি তাহা বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতে লাগিলেন।

উমা বলিল—"কাঁদিলে কি হইবে মা, যা অদিষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তাহা ফলিবেই। এখন চলুন, ছোট তরফেই যাই। এখানে যতক্ষণ থাকিবেন, দুঃখই মনে হইবে।"

উমা চলিল। কর্ত্রী অনিচ্ছায় তাহার পাছে পাছে চলিলেন। উমা সদরের দরজার কপাট খুলিবে, এই সময়, আর একটা লোক আসিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল—"স্বামীজীর হুকুম নাই, রাত্রিতে কাহারও বাহির হইয়া যাইবার।"

কথা কানে না তুলিয়া উমা দরজার হুড়কা খুলিয়া ফেলিল। লোকটা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কপাট বন্ধ করিতে চাহিল। উমা জমীদার বাড়ীর দাসী। সে এমন বেয়াদপি সহ্য করিতে কখনই শিখে নাই। রাগে তার টনক নড়িয়া গেল। সে লেণ্ঠানটা মাটিতে রাখিয়া দুইহাতে লোকটার মাথার লম্বা চুল টানিয়া ধরিয়া তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিল। লোকটা মেয়ে মানুষের সাহস দেখিয়া একবারে থতমত খাইয়া থ বনিয়া গেল; ভয়ে ও অপমানে কোন কথা বলিতে পারিল না। উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া শরীর ঝাড়িয়া নীরবে অপমান হজম করিয়া ফেলিল।

এই অবসরে উমা কর্ত্রীকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। বড় কর্ত্রী নিজের বিষয়টা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়াও দেখিবার অবসর পাইলেন না। দেখিবার অন্য উপায়ই বা কি?

ছোট কর্ত্রী সান্ত্বনা বাক্যে বড় কর্ত্রীকে প্রবোধ দিয়া গ্রহণ করিলেন। ছোট কর্ত্রী শেষ বলিলেন—

"দিদি আমার এ বড় দালান আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম; উমাকেও ছাড়িয়া দিলাম; এ বাড়ীতে তুমি স্বেচ্ছায় যাহা খুসী তাহা করিয়া থাক; তোমার নিজের ধনের অভাব নাই, আমরাও যে তোমার খরচ যোগাইতে গেলে দেউলিয়া হইব তেমন নয়। তারপর দেখ, ভগবান মণিকে সুমতি দিন, মাখনও পরীক্ষা শেষ করিয়া আসুক। চিরদিন কি আর তোমার এরূপে যাইবে? আজ হইতে এ বাড়ীই তোমার আপনার, আর সেখানে যাইয়া অপমানী হইয়া দরকার কি?"

বড় কর্ত্রী বলিলেন—"মান অপমানের জ্ঞান আর নাই বোন, আমার সকল গর্ব্বই খর্ব্ব হইয়াছে; তবে নগদ তহবিলটা অলঙ্কাপত্র, সাবেক আমলের মোহর, নবাবী আমলের টাকা, আমার স্ত্রী-ধন—সর্ব্বস্বই রহিল দালানে—মনটা সেখানেই রহিল।"

ছোট—"কাহার জন্য এসকল দিদি? চক্ষু বুজিলে কি এ গুলি তোমার সঙ্গে যাইবে? যাহার জন্য তুমি কাঁদ, সে যদি তোমার দরদ না-ই বুঝিল—তবে ভাবিয়া ফল? থাকুক ডবল তালাতেই সব; তোমার চাবিটাতো সঙ্গে আছে?"

বড় কর্ত্রী চাবিটা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন "আছে।"

# শিব তাণ্ডব।

( ১ )

একি উচ্ছল আলো উজ্জ্বল কালো-কজ্জল সঙ্গে!
দেখি দিনরাত চলে সন্তাপ, নাশে উৎপাত রঙ্গে!
লহু-কর্দ্দম ছোটে দুর্দ্দম, শিঙা বম্‌বম্ গর্জ্জে!
বহু সংসার হোলো সংহার, বীণা-ঝঙ্কার বর্জ্জে!
সহ দলবল জাগে দুর্ব্বল, সদা টলমল বিশ্ব!
কত সোম্‌সুৎ—কোথা প্রেত-ভূত? এযে অদ্ভুত দৃশ্য!

( ২ )

বাজে গর্জ্জন করি' বর্জ্জন করো অর্জ্জন শক্তি!
কাজে উচ্ছ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস আনো উল্লাস ভক্তি।
সহা বায় কই? তাতা থৈথৈ নাচো নিভাই বন্দী!
মহাদেব্ সাথ, করো দৃক্‌পাত, রাখো দিনরাত সন্ধি!
নিজে দুর্ব্বার, জাগো এইবার! বসো দেব্‌তার অঙ্কে!
কিযে শঙ্কার! করো হুঙ্কার! ফোটো নিন্দার পঙ্কে!

( ৩ )

ওগো নির্ভয়, তুমি দুর্জ্জয়! তব সব সয় বক্ষে!
ভোগো দুখ সুখ, ছাড়ো কৌতুক, রাখো তেজ টুক্ চক্ষে!
রহ আটপ'র সারা দিনভর অতি ঘৃণ্‌কর কর্ম্মে!
বহু চিন্তার বোঝা এন্‌তার! মাতো বাঁচবার ধর্ম্মে!
তাঁবে দিনরাত সহ উৎপাত, অভিসম্পাত্-উক্তি!
যাবে যাক্ প্রাণ, রাখো সম্মান; এযে নির্ব্বাণ মুক্তি!

( ৪ )

ধূধূ প্রান্তর, ধূধূ অন্তর! জপো মন্তর চিত্তে!
শুধু মঙ্গল করো সম্বল; বলো কোন্ ফল বিত্তে?
করো হাঁসফাঁস, ফ্যালো নিশ্বাস! কোথা বিশ্বাস লক্ষ্য?
গড়ো আসমান্ জোড়া উত্থান! কোথা প্রাণ্‌বান্ সখ্য?
মিছে বোল্‌চাল্ শুনি আজকাল! করো জঞ্জাল বৃদ্ধি!
পিছে রইলেই! তারা ছুটছেই! তোরা জাগলেই সিদ্ধি!

( ৫ )

জাগো ধার্ম্মিক! জাগো ঋত্বিক! এযে সাত্ত্বিক যুদ্ধ!
জাগো ঘর্ ঘর্ প্রীতি-নির্ঝর নাথো শঙ্কর বুদ্ধ!
বলে ভূর্লোক খোলে নির্ম্মোক কাঁপে স্বর্লোক-বংশ!
চলো মন্থন, গীতি-বন্দন, সুধা-বণ্টন্-অংশ!
ধরো মর্ম্মর-দেহ বিস্তর! জাগো সুর্-নর্-ত্যাজ্য!
করো বিষপান! গাহো সামগান! লভো সম্মান স্বাধ্য!

( ৬ )

ওরে নির্লাজ, তোরা কই আজ! সদা যমরাজ-ভক্ষ্য!
জোরে কুন্দন জানো ক্রন্দন! শুধু নিন্দন্-দক্ষ!
নারী-অঞ্চল ছাড়ো চঞ্চল! করো শৃঙ্খল ছিন্ন!
ভারী দিক্‌দার জাতি-উদ্ধার! মোছো ধিক্কার-চিহ্ন!
হেসে খিলখিল চলো একদিল্ ভেঙে লাল নীল হর্ম্ম্য!
শেষে শূরবীর নব সৃষ্টির করো তদ্বির কর্ম্ম!

( ৭ )

গত গৌরব আনো বৈভব! সাথে ভৈরব রুদ্র!
যত হাঁক্-ডাক করো নির্ব্বাক্ মিলে লাখ লাখ ক্ষুদ্র!
লাগে ভাই বোন! আনো যৌবন! হবে নন্দন তৈরী!
জাগো এক্ ভাই, ভীতি নাই নাই, নাশো একলাই বৈরী!
এযে প্রেতভূম্! নিশা নিঝ্‌ঝুম্! বাজে গুম্ গুম্ ডঙ্কা!
সেজে আয় সব জাতি-সম্ভব! নাশি' বিপ্লব-শঙ্কা!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

---

# শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেম ধর্ম্ম ও তাহার ব্যভিচার।

আধুনিক বৈষ্ণব সমাজের নিম্নস্তরে যে সমস্ত বৈরাগী ও বৈষ্ণবী দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রতি সর্ব্বসাধারণের তেমন শ্রদ্ধা নাই। অনেক ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্য হইতে দূষিত চরিত্রের অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষ ভেক লইয়া বৈষ্ণবী বা বৈরাগী হয়। ফলে আখ্‌ড়াধারী বৈরাগী সম্প্রদায় একটা ব্যভিচারী সমাজে পরিণত হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। অন্যদিকে আধুনিক বৈষ্ণব সমাজে, তথা-কথিত ভদ্র, ব্রাহ্মণ, এবং গুরু শ্রেণীতে একপ্রকার নূতন সাধন পদ্ধতির কথা শ্রুত হয়, তাহার নাম "কিশোরী ভজন"। তন্ত্রে স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার কথা আছে। ইহারা বোধহয় তাহারই অনুসরণ করিয়া এই সাধন প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদের এই কিশোরী ভজন গুপ্তভাবে বিশ্বস্ত শিষ্য মণ্ডলী লইয়া গভীর রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই সাধারণে ইহার বিবরণ ঠিকভাবে জানিতে পারে না।

দৈবক্রমে উক্ত ভজনের প্রণালী লিখিত একখানা হাতের লিখা বই আমার হস্তগত হয়। উক্ত পুস্তকে এই প্রকার কিশোরী ভজনকে বৈষ্ণব শাস্ত্র দ্বারা সমর্থন করার চেষ্টা হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের মান্য শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে রাস লীলার শেষে একটী শ্লোক আছে তাহা এই—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যচ্ছ্রুত্বা তৎ-পরোভবেৎ"—

তাৎপর্য্য:— ভগবান্ ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া এমন সমস্ত লীলা করেন, যাহার কথা শুনিয়া মানুষ তৎপর অর্থাৎ ভগবৎ পুরায়ণ হয়

পূর্ব্বোক্ত "কিশোরী ভজন" সম্প্রদায়ীরা এই শ্লোকের "তৎপর" শব্দের অর্থ বিকৃত করিয়া "তৎপর অর্থাৎ তাহার লীলাপরায়ণ হইবে" এইরূপ অর্থ করিয়া তাহাদের মত সমর্থন করেন। তাহাদের মতে শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করিয়া নিজেরাও সেইরূপ কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিবে হস্তলিখিত পুস্তক খানাতেও এই ভাবেই তাহাদের গুপ্তসাধন—কিশোরী ভজনের সমর্থন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহারা কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি লীলার অনুষ্ঠান না করিয়া স্ত্রীগণ পরিবৃত হইয়া "বস্ত্রহরণ" "রাসলীলা" প্রভৃতির অনুকরণ করে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের অনেক পরে এই সমস্ত ভেক্‌ধারী বৈরাগী বৈষ্ণব ও উল্লিখিত কিশোরী ভজন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অনেকের একটা ভ্রম ধারণা আছে যে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব মুখ্যতঃ না হইলেও গৌণভাবে বৈষ্ণবসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য দায়ী। বর্ত্তমানে ভেক্‌ধারী বৈরাগীরা যে সমস্ত "মচ্ছব" করে তাহাতে অনেক বার গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি গীত হয়। "মচ্ছব" দেওয়া ইহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং গৌরাঙ্গকে এই হীনাচারের জন্য দায়ী করা নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু গৌরাঙ্গ দেব যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি কামিনী কাঞ্চন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল থাকিতেন। তাঁহার হৃদয় অতি কোমল ছিল। দন্তে তৃণ লইয়া মানুষের পায়ে ধরিয়া লোককে কৃষ্ণনাম লওয়াইতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। অথচ শিষ্যদের মধ্যে অনাচার দেখিলে তিনি বজ্রকঠোর রূপ ধারণ করিতেন। ভবভূতির সেই "কুসুম হইতে কোমল অথচ বজ্র লইতে কঠোর" কথাটা গৌরাঙ্গ দেব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খাটে।

ছোট হরিদাসের বর্জ্জন বিষয়ক বিবরণটী আলোচনা করিলে বৈষ্ণবদের কামিনী-সঙ্গ-সম্বন্ধে ও গৌরাঙ্গ দেবের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে।

একদিন ছোট হরিদাস মাধবী দেবীর নিকট হইতে গৌরাঙ্গ দেবের ভোজনের জন্য উত্তম তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল। গৌরাঙ্গ ভোজনে বসিয়া উত্তম অন্ন দেখিয়া খুব খুসী হইলেন কিন্তু তাঁহার মনে সন্দেহ উদিত হইল; তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন ছোট হরিদাস মাধবী দেবীর নিকট হইতে উত্তম তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে, এবং সেই তণ্ডুলে এই অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে। গৌরাঙ্গদেব নিঃশব্দে ভোজন শেষ করিলেন কিন্তু পরে আদেশ দিলেন— "ছোট হরিদাস যেন আমার গৃহ দ্বারের নিকট আসে না, আমি তাহার মুখ দর্শন করিবনা।"

এই আদেশ শুনিয়া সমস্ত শিষ্যগণ আতঙ্কিত হইলেন; ছোট হরিদাস লজ্জায় ঘৃণায় কি করিলেন?

"তিন দিন হৈল হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি আসি পুছিলা মহাপ্রভুর পাশ॥
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাস॥"

চৈঃ চঃ।

তিন দিন ধরিয়া হরিদাস দুঃখে উপবাস করিতেছে কিন্তু চৈতন্যদেবের মন ইহাতে নরম হইলনা। স্বরূপ প্রভৃতি প্রধান ভক্তগণের প্রশ্নে গৌরাঙ্গ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। হরিদাসকে স্ত্রীলোক দর্শন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, সে সেই আদেশ অমান্য করিয়া স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ভিক্ষা আনিয়াছে, এজন্য গৌরাঙ্গ দেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন অথচ বেচারী হরিদাসেরও বিশেষ দোষ নাই। মাধবী দেবী বৃদ্ধা এবং গৌরাঙ্গ দেবের ভক্তগণের মধ্যে যে চারিজন শ্রেষ্ঠ তাহাদের মধ্যে মাধবী দেবীও একজন। সুতরাং এই প্রকার ভক্তপ্রধান পরম ভাগবত বৃদ্ধা মাধবী

দেবীর নিকট হইতে ভিক্ষা লইতে ছোট হরিদাসের মনে বিন্দুমাত্র ও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু গৌরাঙ্গ দেব যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাই নিয়ম ভঙ্গকারী হরিদাসের জন্য অন্যান্য প্রধান ভক্তগণ খোসামোদ্ করায় গৌরাঙ্গ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন :—

" প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞির আদেশ দেখি সবে মৌন হৈলা॥"

চৈঃ চঃ।

হরিদাসের ব্যবহারে গৌরাঙ্গ দেব এত বিরক্ত হইয়াছেন যে উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া স্বরূপ প্রভৃতির কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন এদিকে হরিদাসের উপবাস চলিতে লাগিল। অন্যান্য ভক্তগণ গৌরাঙ্গকে প্রসন্ন করিবার জন্য হরিদাসের পক্ষ হইয়া নানা প্রকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন :—

" প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
নিজ কার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।
পুন যদি কহ আমা না দেখিবে হেথা॥"

চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গের এই উক্তি শুনিয়া শিষ্যেরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল বেশী বিরক্ত করিলে গৌরাঙ্গ অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। গৌরাঙ্গগত—প্রাণ ভক্তগণের ইহা বজ্রপাত তুল্য শাস্তি। ইহা অপেক্ষা তাহাদের মৃত্যুও শত গুণে ভাল।

শিষ্যেরা নানা প্রবোধ দিয়া, ভবিষ্যতে প্রভু দয়া করিবেন—এইরূপ আশ্বাস দিয়া হরিদাসকে ভোজন করাইল। কিন্তু গৌরাঙ্গ অটল। এক বৎসর চলিয়া গেল হরিদাসের প্রতি গৌরাঙ্গের কৃপা হইলনা। হরিদাসহতাশ হইয়া প্রয়াগ ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। যথা :—

"রাত্রি অবশেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেতে গেলা কারে কিছু না বলিয়া॥
প্রভুপদ-প্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি পরাণ ছাড়িল॥"

চৈঃ চঃ।

এই সংবাদ শুনিয়া গৌরাঙ্গ কি কহিলেন ?

শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥"

চৈঃ চঃ।

সাধারণের নিকট গৌরাঙ্গের এই কঠোরতা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয় কিন্তু যাহারা অলৌকিক চরিত্র লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে সাধারণ চরিত্রের লোকের মাপকাঠি দিয়া বিচার করা চলেনা। সীতা বিসর্জ্জন সম্বন্ধেও অনেকে রামকে দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু ভবভূতি লিখিয়াছেন :—

" বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদূনি কুসুমাদপি,
লোকোত্তোরাণাং চেতাংসি কোহিনু বিজ্ঞাতুমর্হতি।"

লোকোত্তর চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির কার্য্য কলাপ কেহ বুঝিতে পারে না। ইংরাজীতে একটী কথা আছে পরিণাম দেখিয়া প্রণালীর সমর্থন করা যায় এক্ষেত্রে ছোট হরিদাসের বর্জ্জনের ফলে ও হরিদাসের জীবন বিসর্জ্জনের কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গের সন্তুষ্টির ভাবে শিষ্যদের মধ্যে কিরূপ অবস্থা হইল ?

মহা প্রভু কৃপাসিন্ধু কেপারে বুঝিতে।
প্রিয় ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম বুঝাইতে॥
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহো ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে॥"

চৈঃ চঃ।

সমস্ত শিষ্যগণ ছোট হরিদাসের ব্যাপারে এত ভীত হইল যে তাহারা জাগরিত অবস্থায় প্রকৃতি সংসর্গ দূরে থাক স্বপ্নেও স্ত্রী সম্ভাষণ ত্যাগ করিল !!

এই ছিল গৌরাঙ্গ দেবের বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদর্শ।

কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজে বৈরাগীদের বৈষ্ণবী গ্রহণ করিবার প্রথা নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র দেব বৈষ্ণব সমাজে সর্ব্ব প্রথমে প্রবর্ত্তন করেন।

ব্রহ্মচর্য্যশীল উগ্রতেজা বৈষ্ণবদের নিকট গৃহস্থগণ অপরাধ করিয়া প্রায় অভিশাপগ্রস্ত হইত। কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে বীরভদ্র দেব সেই সমস্ত উগ্রতেজা দাম্ভিক বৈষ্ণবদের তেজ বিনষ্ট করার জন্য তাঁহাদিগকে প্রকৃতি গ্রহণে বাধ্য করেন। সেই সময় হইতেই এই কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। চণ্ডীদাসের সহজ সাধনার প্রচারও এই কুপ্রথার অন্যতম প্রধান কারণ।

কাহারও মতে কোনও কবিরাজ গোসাই ইহার প্রবর্ত্তন করেন। এ বিষয়ে কেহ আলোচনা করিলে অর্থাৎ বৈষ্ণবী গ্রহণের প্রথা কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহ নির্ণয় করিলে লেখক অনুগৃহীত হইবেন।

আধুনিক বৈরাগীরা প্রকৃতি সংসর্গ রূপ হীনাচার করিয়াও কি প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম উচ্চারণ করিয়া "মচ্ছপ" করে তাহা বুঝা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আদর্শ হইতে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ কতদূর অধঃপতিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ-জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

---

# পল্লি চিত্র।

(১)

রামশরণ চক্রবর্ত্তীর আজ স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। বিকালে বাল্যবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র গিয়া বলিলেন "রামশরণ দাদা, শীঘ্র শীঘ্র সে কর্ম্মটা শেষ করিয়া ফেলুন"।

রামশরণ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"কি ভাই, কাম্য বৃষোৎসর্গ না কি?"

"আরে না, একটা বিবাহ আর কি।" ঈশ্বরচন্দ্রের বিরাট হাস্তে ঘরখানা যেন কাঁপিয়া উঠিল। উপস্থিত একজন বলিল 'উনি যে এত হটাৎ মারা যাইবেন আমার এ ধারণা মোটেই ছিল না'

কেহ বলিল "বলিষ্ঠ লোক একবার পড়িলে উঠেনা, ও আমার জানা কথা। সেইদিন পাঁচকড়ির বৌটী জাননা— দুইদিনের জ্বরে মারা গেল।"

কেহ বলিল "আপনার কোষ্ঠিখানা দেখুন দেখি কয় বিবাহ লেখা আছে।"

কেহ বলিল—যাহা হউক কোন মতে বৃষোৎসর্গটা সারিয়া একটা সকাল সকাল"—

রামশরণ শেষোক্ত ব্যক্তিকে বাধা দিয়া বলিলেন "অমর, তুইও কি পাগল হইলে"? অমরনাথ বলিল "কি মামা, পাগলের কথা আমি কি বলিলাম? বিবাহ না করিলে আপনার কি করিয়া সংসার চলিবে'? রামশরণ বলিলেন "কেন? রামরতনকে বিবাহ করাইলেইত চারিটা অন্নের সংস্থান হইতে পারে?" অমরনাথ বলিল তা পারে বটে, তবু সংসারে থাকিতে হইলে আপনারও নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। একটু অধিক বয়স্কা দেখিয়া"—রামশরণ 'রাখ রাখ' বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন "অমরনাথ, বিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিয়াছ চুল কয়গাছিও পাকাইয়াছ, কিন্তু তোমার মুখে এই বালকোচিত কথা শুনিয়া আজ অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তুমি জান না আমার বয়স কি হইয়াছে"? অমরনাথও ছাড়িবার পাত্র নহে, সে তৎক্ষণাৎ বিশ পঁচিশটী নজির দেখাইয়া রামশরণকে আক্রমন করিল। উপস্থিত সকলেই সেই সুরে সুরে ধরিল। ভাব গতিক দেখিয়া রামশরণ মৌনাবলম্বনই শ্রেয় বোধ করিলেন। পরের দিন পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হইল রামশরণ চক্রবর্ত্তী আর বিবাহ করিবেন না, বাকি জীবন কুক্রিয়াসক্ত হইয়া থাকিবেন।

(২)

রামশরণ চক্রবর্ত্তীর প্রধান যজমান ব্রজ বিদ্যারত্ন বৈঠক খানা ঘরে বসিয়া আছেন। এই সময় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সেখানে উপবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিস্ময়ের ভাব মুখে চোখে উদ্রেক করিয়া—"শুনছ বিদ্যারত্ন, হুঃ, কিসে কি!" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের বক্র তর্জ্জনীটার উপর ওষ্ঠের অধোভাগ স্থাপন পূর্ব্বক মস্তক ঘূর্ণন সহকারে ঠোঁট দুইটার বিচিত্র ভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বিদ্যারত্ন জিজ্ঞাসা করিলেন "সিদ্ধান্তবাগীশ দাদা, হইয়াছে কি?" সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত্রিম কোপসহ মুখ ভঙ্গী করিয়া কহিলেন "আরে যাও গাঁ খানা তোলপাড় হইতেছে, তুমি এখনও সংবাদ পাও নাই"?

"বাস্তবিকই না"।

"আরে তুমি বল কি"?

"ধর্ম্মতই না"।

"তোমার পুরোহিত রামশরণ শর্ম্মা বিবাহ করিবে-না, ধনুর্ভঙ্গ পণ"।

"সত্য না কি? আস্পর্দ্ধাতো কম নয়?"

"ঐ যে দেখেছ সুদীর্ঘ সন্ধ্যা, পূজা ও কিছু নয়।"

"লোকটা এমনই নাকি? আমার তো—"

কথা শেষ না হইতেই সিদ্ধান্তবাগীশ বলিলেন "সে নাকি বলছে—কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়ের পক্ষেই একবার বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ। যারা পত্নী বিয়োগের পর বিবাহ করেন, তারা পতিত হন। ঐ পুত্রের দ্বারা পিতৃ লোকের পিণ্ড সিদ্ধ হয় না"। দন্তহীন মুখে হুকাটিকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন ও অল্প অল্প ধূম্র উদ্গীরণ করিয়া সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাহার বক্তব্যটা শেষ করিলেন। শুনিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় তেলে বেগুণে জলিয়া উঠিলেন। এবং চক্ষু দুটী রক্তিম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দাদা, আথার মুখ দিয়া ছাই উড়ে! ও শাস্ত্র পড়িলই বা কি, জানিলই বা কি; আচ্ছা দেখা যাবে"। বিদ্যারত্ন ও সিদ্ধান্তবাগীশই হইয়াছেন পাড়ার আপীল আদালত।

( ৩ )

রামশরণ চরিত্রবান পুরুষ। তাঁহার ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠাটীও অসাধারণ। আহ্নিকতত্ত্বের লিখিত শৌচ আচমন, স্নান, তর্পণ প্রভৃতি আচার নিয়ম তিনি সম্যক মানিয়া চলেন। ওদিকে অত্যন্তই পরোপকারী। কলেরা ও বসন্ত রোগীর সেবা শুশ্রূষায় পাড়া প্রতিবাসীর রামশরণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। পরের জরা মরায়, পরের বিপদে আপদে রামশরণ কোমর বাঁধিয়া হাজির। স্বভাবটী মেয়ে মানুষের মতন কোমল। প্রায় প্রতি কথাতেই কান্না পায়। যাহাদের আত্মীয় বিয়োগ হয়, তাহারা তত কাঁদেনা, রামশরণ যত কাঁদিয়া থাকেন! একবার একটা সংলগ্ন বাড়ীতে গৃহ দাহ হইতেছিল, রামশরণ গললগ্নী কৃতবাসে হাত জোর করিয়া "মা ব্রহ্মা, রক্ষা কর, মা ব্রহ্মা, রক্ষা কর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। নিকটেই ছিল রামহরি. সে সম্পর্কেও হইত নাতি, হাসিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দাদা, ব্রহ্মা কি স্ত্রীলিঙ্গ"? রামশরণ কান্নার মাত্রা পঞ্চমে চড়াইয়া বলিলেন "হাঁ ভাই, হাঁ ভাই, আজ আর রক্ষার উপায় নাই, মা যদি না রক্ষা করেন।"

এহেন সরল সাধু লোকের উপর পাড়ার মুরব্বী প্রধানেরা চটিয়া লাল হইয়াছেন। তাঁহার অপরাধ পুনর্ব্বিবাহে অসম্মতি। এই অসম্মতির ব্যাপারটাই অদ্ভুত মতভবিষ্যতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে! সকলেই ইহা নিয়া স্থানে স্থানে সমালোচনায় ব্যস্ত। রামশরণের ন্যায় সৎপাত্র একজন পরকীয়া লইয়া জীবনাতিবাহিত করিবে, পাড়ার দুশ্চরিত্র লোক ছাড়া কাহারও ভাল বোধ হইতেছে না, অথচ পবিত্র ভাবেই সে থাকিতে সমর্থ হইবে, এ ধারণাও তাহাদের হইয়া উঠিতেছে না।

আজ রামশরণ চক্রবর্ত্তীর পত্নীর শ্রাদ্ধ। বিদ্যারত্ন, সিদ্ধান্ত-বাগীশ দুইজনই ক্রিয়ক রূপে উপস্থিত। শ্রাদ্ধ ও ব্রহ্ম-ভোজ্যের পর বিদ্যারত্ন ও সিদ্ধান্তবাগীশের বৈঠকে রামশরণ চক্রবর্ত্তীর ডাক পড়িল। রামশরণ চক্রবর্ত্তী যাইতে মাত্রেই বিদ্যারত্ন মহাশয় দুই চক্ষু রাঙ্গাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—'রামশরণ, তুমি নাকি বিবাহ করিতে চাওনা?"

"আজ্ঞা না।"

"তোমার পক্ষে ইহা সাজে কি?"

"আমার পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে"।

"আরে রাখ তোমার পঞ্চাশ, সিদ্ধান্ত বাগীশ দাদা তো বাইট বছর বয়সে চতুর্থ দার পরিগ্রহ করিলেন।"

"তিনি শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন।"

বিদ্যারত্ন মহা খাপ্পা হইয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন:— দেখ রামশরণ, বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে তোমার মত লোকের কথা কহা ধৃষ্টতা। তোমার শাস্ত্র জ্ঞান কতটুকু হে?"

"আজ্ঞে, আপনিই বলুন না, পুরুষের বারম্বার বিবাহ কোন্ শাস্ত্রে আছে"?

"কেন? পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্ ইহা শাস্ত্র নহে কি"?

"এ বচনে পুনর্ব্বিবাহের কি কথা আছে"?

"কেন? পুত্র পদটী সম্বোধনান্ত করিয়া লইলেইত কোন গোল থাকে না"?

"গোল থাকে বই কি? ঋষি যে পুত্রের সহিত আপন বিবাহের পরামর্শ আটিতে বসিয়া ছিলেন, ইহা কিসে মনে

করা যায়? বরং বিবাহে অনিচ্ছুক পুত্রকে বিবাহে প্রবৃত্তি দেওয়াই স্বাভাবিক। ফলে এ বচনটী দায় সংগ্রহের আবশ্যকতা রূপেই প্রযোজ্য"।

"শুন বাপু, তুমি অনধিকারীর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করা নিরর্থক। কেবল একটী কথা তোমাকে পূর্ব্বাহ্নেই জানাইয়া রাখি, যে দিন শুনিব, তুমি অপকর্ম্মান্বিত হইয়াছ, সেই দিন হইতে তোমা দ্বারা আমি কখনই ক্রিয়া কর্ম্ম করাইব না, এ কথা যেন স্মরণ থাকে।"

"আজ্ঞা স্মরণ থাকিবে।"

কুতূহলী জনমণ্ডলী বুঝিল, এইখানেই রামশরণের একটী মৃত্যুবাণ সৃষ্টি হইল।

( ৪ )

রামশরণ চক্রবর্ত্তীর অভিনব প্রতিজ্ঞা শুনিয়া গ্রামের উপর দিয়া যেন বিস্ময়ের এক বন্যা বহিয়া যাইতেছে। যে শুনে, সেইবলে "আহা, বুড়ো বয়সে কি অধঃপতন!"

তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। হাওড়ার তাঁতিরা কাপড়ে পাড় বসাইয়াছে—:

"বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চির জীবী হয়ে
সদরে হয়েছে নোটশ বিধবার হবে বিয়ে।"

দেশের নারী মহলে তখন হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড উপস্থিত। যাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালনে অসমর্থ, তাহারা প্রাচীন পদ্ধতির ঐ রদ বদলের দিক দিয়া সুন্দর একটী আসন্ন সুখের ছবি মনে মনে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছে। এ সমস্ত সঙ্গীতে ও তখন বিধবাদের মর্ম্ম বিলাপ উত্থিত হইয়াছে—

"ভারত শ্মশান মাঝে আমিরে বিধবা বালা,
দুঃখের মূরতি গড়ি বিধি মোরে পাঠাইলা।"

অন্য দিকে সমাজ সংস্কারক রাসবিহারীও তখন কুলীন কুমারী দিগের দুর্দ্দশা মোচনে বদ্ধ পরিকর। পুরুষান্তর না ঘটিয়া বিধবাদেরও যে দশা, চির জীবন কুমারী থাকিয়া কুলীন কন্যা দিগেরও সেই দশা; অর্থাৎ এক বিপত্তিই উপস্থিত হইয়াছে। রাস বিহারীর সঙ্গীত তো আছেই, মাঝে মাঝে স্ত্রী কবিদিগেরও এই সকল সঙ্গীত পথে-ঘাটে শ্রুত হওয়া যাইতেছে—

"আমি কেনরে কুলীনের মেয়ে হৈলামরে,
কুলীন ঘরে জন্ম ন'য়ে আমার বিয়ের কাল গেলরে।"

যখন বিধবা ও কুলীন কন্যা দিগের দুঃখ রাত্রি প্রভাতের কল্পনা লইয়া মানুষ ব্যতিব্যস্ত তখন রামশরণ চক্রবর্ত্তীকে উল্টা বুঝিলে রাম দেখিয়া তাহাদের গাত্র দাহ উপস্থিত হইবে—ইহা অন্যায় কি? তবে প্রতিবাসী সাধ্বী রমণীদের কাছে রামশরণ খুব বাহবা পাইতে লাগিলেন। একদিন পাড়ার সর্ব্ব প্রধান কালীশ্বরী ঠাকুরাণী ঘাটের অন্যান্য রমণীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'রামশরণ কে জানিও, সেই আমাদের বশিষ্ঠ মুনি।"

( ৫ )

আরও চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে ফৌজদারী শাসনের প্রকৃতি অত্যন্ত তীব্র ছিল। যাহার এলাকায় খুন হইত, সেই মালিককেও অনেক সময় খুনের দায়ে পড়িতে হইত। এত বড় যে ছিলেন × × × চৌধুরী, তাহার একটী খুব বড় মৌজা ঐ কারণে পরের হস্ত গত হইয়াছিল, তিনি খুন চাপিবার ভয়ে ঐ মৌজাটী তাহার নয়—বলিয়াছিলেন, আর কপর্দ্দক শূন্য ব্যক্তি ঐ মৌজা তাহার বলিয়া বড় মানুষ হইয়া গেল। গইবুল্লা দরখাস্ত দিয়াও তখন এক জন আর একজন কে বিপন্ন করিতে পারিত। এখনও সে প্রক্রিয়া আছে, তবে শাসকদের প্রকৃতি অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে।

ভয়ঙ্কর দস্যু রাম নাথ হদীকে কে ব কাহারা কাটিয়া ফেলিল। গ্রাম শুদ্ধ থর থর কম্প আরম্ভ হইল। ভয়ে এক এক জনের আত্মা পুরুষ শুকাইয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল—এখন এ ডাকাতির উপায় কি?

রমানাথ হদীর লাশ চৌকিদার থানায় লইয়া গেল, পুলিস থানা হইতে সদরে চালান দিল, মাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়া লিখিলেন "রামানাথ হদী কাটা পড়িয়াছে সত্য, পুলিশের কর্ত্তব্য, হত্যা কারীকে সত্বর ধৃত করা।"

খুব জোরে পুলিশ তদন্ত চলিতে লাগিল।

প্রায় এক মাস পরে হটাৎ একদিন পুলিশ আসিয়া ব্রজ বিদ্যারত্নকে গ্রেফতার করিল। তাহার এলাকায় রাম নাথ হদীর লাশ পাওয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, পূর্ব্ব হইতেই লাল পাগড়ীর ভয় করিতেন, সুতরাং ওয়ারেণ্ট পাইয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনেক শুশ্রূষায় মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল সত্য, কিন্তু দেখা গেল

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তিনি যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন "কলিকাতা হইতে কবে আসিলেন"? তাহার মুখে ঐ এক কথা ভিন্ন কথা নাই। পুলিশ মামুলী লইয়া বিদায় হইলেন। রামশরণ আসিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতঃপর বিদ্যারত্নের মাথায় মহাবিষ্ণু ও মধ্যমনারায়ণ তৈল মালিশ জুড়িয়া দিলেন। পরের দিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পত্নীকে বলিলেন "কাকী মা, আমি বিদ্যারত্ন কাকার আরোগ্য কামনায় লক্ষ শিবপূজা মানসিক করিয়াছি, আমাকে অনেক গুলি শিব গড়াইয়া দিন্।"

একদিকে বিদ্যারত্নের শুশ্রূষা, অন্যদিকে স্বস্ত্যয়ন—রামশরণ শ্বাস ফেলিবারও সময় পান না।

এদিকে পুলিশ সাহেব স্বয়ং আসিতেছেন বলিয়া গ্রামে গুজব উঠিল। গ্রাম বাসীর পক্ষে পুলিশ ব্যাঘ্রবৎ হইলে পুলিশ সাহেব সিংহবৎ হইবেন ইহা আশ্চর্য্য কি? সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র হইল পুলিশ সাহেব আসিবার কারণ এক গইবুল্লা কবিতা। কবিতাটী এই—:

শ্যাম দত্তে কয়, মুনশী মহাশয়,
বন্দকোণা হৈছে খুন আমার মনে লয়।

যথা কালে সদল্ বলে পুলিশ সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের সকলেই শশব্যস্ত। তবু সাহেব দেখিবার কুতূহল অনেকেই সম্বরণ করিতে পারিল না, দূরে দূরে দাঁড়াইয়া কুতূহল নিবৃত্তি করিতে লাগিল।

পুলিশ সাহেব একে একে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি বাংলা বেশী জানিতেন না। এই বার রাম শরণ চক্রবর্ত্তীর পালা। তিনি সাহেবের নিকটস্থ হইয়া পৈতা সহ দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। সাহেব সঙ্গীদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিলেন—সে কালে ব্রাহ্মণেরা এই রূপই বরদ হস্ত হইয়া ক্ষত্রিয় রাজাদের নিকট দাঁড়াইতেন, রাজারা নমস্কারান্তে সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিতেন। সাহেব দন্ত পঙক্তি বিকাশ করিয়া রাম শরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"টুমার নাম"?

"কালী শরণ, বিষ্ণুঃ রাম শরণ শর্ম্মা।"

"বাপের নাম"?

"কালী কিঙ্কর, বিষ্ণুঃ কালী শরণ চক্রবর্ত্তী।"

"টুমি রাম নাঠ হডীকে চিনে"?

"আজ্ঞা বিষ্ণুঃ, আজ্ঞা বিষ্ণুঃ।"

সাহেব সঙ্গী দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাম শরণের বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ বলার অর্থ বুঝিলেন এবং উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—:

"টুম মিঠ্যা বাডী, টফাৎ যাও।"

রাম নাথ হদী খুন হওয়ার একমাস পরে শ্যাম দত্ত নামক যে গ্রাম্য কবি কবিতা কুণ্ডয়ন নিবৃত্তি করিয়া ছিলেন, এখন পুলিশের লগুড়ের ভয়ে তিনি গা ঢাকা দিয়াছেন।

( ৬ )

রাম শরণ—বিদ্যারত্নকে লইয়া রাত দিন ব্যতিব্যস্ত, বাড়ী আসিবার ও সাবকাশ পান না। বিদ্যারত্নের বাহ্য চৈতন্য হইয়াছিল, কিন্তু বাতব্যাধির প্রকোপে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া গেল। তৈল ঔষধ ও পথ্যের দিকে আছেন রাম শরণ, মল মূত্র পরিস্কারের দিকে আছে বিজয়া।

বিজয়া এক ভাণ্ডারীর মেয়ে। বিয়ে কামলার কাছে বিবাহ হইয়াছিল। তখন বহু বিবাহ কারী কুলীনদের মত বঙ্গদেশে বিয়ে কামলা নামক এক প্রকার লোকের আমদানী হইয়াছিল। তাহারা ভাণ্ডারী শ্রেণীর লোকের কন্যা ভগ্নী, ভাগিনেয়ীর পাণি গ্রহণ করিয়া ফিরিত। কিন্তু কোথাও স্থায়ী দাম্পত্য সুখ উপভোগ করিত না। বিবাহ কালে একবার টাকা পাইত, আর একবার টাকা পাইত স্ত্রী অন্তঃসত্তা হইলে। কেন না ঐ সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের জন্য তাহার ডাক পড়িত।

কিন্তু বিজয়াকে বিয়ে কামলায় বিবাহ করিলেও অবস্থাটা অন্য রকম দাঁড়াইয়া ছিল। বিজয়ার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াই নাকি বিবাহ কারী তথাতেই থাকিয়া গেল। তাহাদের দাম্পত্য প্রেম যখন ঘনাইয়া উঠিল তখন তাহারা পরামর্শ করিল এই ব্রাহ্মণ শাসিত স্থানে আর থাকিতে নাই। ব্রাহ্মণেরা এখানে শূদ্র জাতিকে একে বারে দাস্য জীবিতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহে শূদ্র কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ দেওয়া হইতেছে। পিতৃ মাতৃ স্নেহও পরিপন্থী হইবার যোগাড় নাই। এই

অবিচারের রাজ্যে কি থাকিতে আছে? আহারা এমন দেশে গিয়া বাস্তব্য করিবে, যেখানে তাহাদের পুত্র কন্যার উপর কাহারও কর্তৃত্ব থাকিবেনা। ইহাদের এই পরামর্শের কথা যে দিন বিদ্যারত্নের কানে গেল সেই দিনই তিনি বিজয়ার স্বামীকে উর্দ্ধ্যং বহস্তি' দিয়া বিদায় করিলেন। বিজয়ার দাম্পত্য সুখ এই খানেই শেষ হইল। কিন্তু সে কলুষিত পথে পা বাড়াইল না, সাধ্বীব্রত ধারণ করিয়া ত্রিশ বৎসর পাছে ফেলিল।

( ৭ )

এক বৎসর যাবৎ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সেবায় বিজয়াও রাম শরণ নিয়োজিত, পাড়ায় কানা ঘুষা পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল, আজ সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়েরও কানে গেল বিজয়ার গর্ভ হইয়াছে। প্রসব হইবার দিনও অতি নিকট। শতটা বিরাটের দক্ষিণায়, শত থান পাতি লেখায় যে আনন্দ দিতে না পারিত, আজ সিদ্ধান্তবাগীশ সেই আনন্দে অধীর। কিন্তু বিদ্যারত্ন কাতর থাকায় তিনি এই ব্যাপারটাকে বাক্য বিন্যাসের ছটায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিলেন না, এই যা দুঃখ।

বিজয়ার প্রসব বেদনা উপস্থিত। সে যখন এক এক বার বেদনায় অস্থির হইয়া উঠে, তখন সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সঙ্কেত মত ধাত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করে "কাহা দ্বারা গর্ভ হইয়াছে বল, না হইলে প্রসব হইবে না, মারা যাইবে।" বিজয়া বারম্বারই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে—"আমি পর পুরুষকে কোন দিন মনে ও স্থান দেই নাই।" কিছুক্ষণ পরে বিজয়া মাংস পিণ্ডের মত একটা পদার্থ প্রসব করিল। বিদ্যারত্নের চিকিৎসায় ভগবান কবিরত্ন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ ঘটনা শ্রুত হইয়া বলিলেন, "পুরুষ সংসর্গ ব্যতিরেকেও স্ত্রী দিগের গর্ভ হইতে পারে, সুশ্রুত সংহিতায় আছে—:

ঋতু স্নাতাতু যা নারী স্বপ্নে মৈথুনমাবহেৎ
আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতিহি।
মাসি মাসি বিবর্দ্ধেত গর্ভিণ্যা গর্ভ লক্ষণম্
কললং জায়তে তস্যা বর্জ্জিতং পৈতৃকৈর্গুনৈঃ।

গ্রামের লোকে কিন্তু রামশরণ কেই এই কাণ্ডের নায়ক মনে করিল। রাম শরণ আর যজমান বাড়ীতে ক্রিয়া কর্ম্ম করাইতে পারেন না, তাহার সহিত পঙক্তি ভোজন পর্য্যন্ত রহিত হইল।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অন্তিম কাল উপস্থিত। তিনি প্রসন্ন মনেই মৃত্যু শয্যায় শুইয়া ইষ্ট মন্ত্র স্মরণ করিতেছেন। গ্রামের প্রায় সকলেই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও উপস্থিত। যখন অন্তিম মুহূর্ত্ত নিকট হইল, তখন রামশরণ তাহাকে তুলসী তলায় নিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "বিদ্যারত্ন কাকা আপনিতো আপনার দেশে যাত্রা করিলেন, আমার কি করিয়া গেলেন"? বিদ্যারত্ন জড়িত কণ্ঠে কহিলেন "সিদ্ধান্ত বাগীশ দাদা, আমার পুত্র নাই, মুখানল যেন রামশরণ করে। আর আপনারা রামশরণের প্রতি কোন কটাক্ষ রাখিবেন না, এ অতি চরিত্র বান পুরুষ।"

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

## "জ্যোতিষে অয়ন সিদ্ধান্ত"।

( প্রতিবাদ )

বিগত ভাদ্র মাসের "সৌরভে" শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয় জ্যোতিষে অয়নগতি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া অতীব বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। তিনি যে এক ভ্রমাত্মক ধারণা হইতে ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বেশ স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

তিনি লিখিয়াছেন "যে সকল গ্রন্থে গণিত জ্যোতিষের আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার নাম সিদ্ধান্ত। যেমন সূর্য্য সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত রহস্য সিদ্ধান্ত, শিরোমণি ইত্যাদি। কিন্তু সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ যাহা Theory—তাহার কিছুই ঐ সকল গ্রন্থে নাই।"

উল্লিখিত অদ্ভুত স্বকপোলকল্পিত কথা তিনি কোথায় পাইলেন? সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও সিদ্ধান্ত রহস্যকে এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজকে অতীব উপহাসাস্পদ করিয়াছেন। আর সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ যে কেবল Theory, আর কিছু নহে—তাহাই বা তিনি কোথায় পাইলেন? আমি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে—

(১) যে সকল গ্রন্থে গণিত জ্যোতিষের আলোচনা করা হইয়াছে তাহার সবগুলিই সিদ্ধান্ত নহে। এ বিষয়ের

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—"গণিত হোরা ও সংহিতা এই তিন শাখায় আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র বিভক্ত। যে শাস্ত্রে গ্রহগণের গতি আলোচিত হয়, তাহার নাম গণিত। × × × গণিতজ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থের সামান্য নাম তন্ত্র হইলেও তাহা সিদ্ধান্ত ও করণ ভেদে দ্বিবিধ। সিদ্ধান্তে যাবতীয় গণনার উপপত্তি ( যুক্তি ) থাকে, কিন্তু করণে উপপত্তি থাকেনা; গণকসুখার্থ কেবল গণনার সংক্ষিপ্ত নিয়মাদি থাকে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত আশ্রয় না করিয়া করণ হয়না। সিদ্ধান্তের আবার দুইভাগ আছে; একভাগে গণনাক্রম এবং অন্যভাগে গণনার উপপত্তি থাকে। প্রথম ভাগের নাম "গ্রহ গণিত" এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম ' গোলগণিত।"

সিদ্ধান্ত শিরোমণিকে রায় মহাশয়ের উল্লিখিত গ্রন্থে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কারণ সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে উক্ত গ্রহ গণিত ও গোলগণিত উভয়ই আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে "কেন" প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। তিনি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া গোলগণিত পড়িবেন। উক্ত রায় মহাশয়ের গ্রন্থে সিদ্ধান্ত ও করণের অধ্যায়ে বহু "সিদ্ধান্ত" গ্রন্থের এবং বহু "করণ" গ্রন্থের নাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেখিতে পাইবেন।

রায় মহাশয়ের গ্রন্থে সিদ্ধান্ত রহস্যকে "করণ" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। "করণ" কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে সুতরাং সিদ্ধান্ত রহস্যকে সিদ্ধান্ত শিরোমণির এক পর্য্যায়ভুক্ত করা কিরূপ অসমীচীন কার্য্য তাহা পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন।

পাণিনি ব্যাকরণে শব্দসাধন প্রণালী আছে। গজঃ গজৌ গজাঃ—কি প্রকারে সাধিত হয় তাহার প্রণালী আছে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণ কৌমুদীতে মাত্র শব্দরূপ আছে, শব্দ সাধন প্রণালী নাই। এখন পাণিনিও ব্যাকরণ কৌমুদীকে একপর্য্যায় ভুক্ত করিলে কেমন হয়? সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও সিদ্ধান্ত রহস্য ঠিক ঐ প্রকার।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন সিদ্ধান্ত রহস্যে অয়নাংশ আনয়ণে অঙ্কের প্রক্রিয়ায় "কেনর" উত্তর দেওয়া নাই।" করণ "গ্রন্থে উপপত্তি থাকেনা" সুতরাং সিদ্ধান্ত রহস্যে "কেন" প্রশ্নের উত্তর নাই কিন্তু তিনি ভাষ্যকার শব্দে কি বুঝাইতে চাহেন? সিদ্ধান্ত রহস্যের কাহার রচিত ভাষ্য তিনি পাঠ করিয়াছেন, জানাইলে কৃতার্থ হইব। আমরাতো এ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত রহস্যের কোন ভাষ্যের নাম জানিনা। যদি সিদ্ধান্ত শিরোমণির ভাষ্যে তিনি উপপত্তি না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি তিনি নৃসিংহের "বাসনাবার্ত্তিক" এবং মুণীশ্বরের "মরিচি" নামক ভাষ্য ও টীকা পাঠ করুন, বহু উপপত্তি ও সব "কেন"র উত্তর পাইবেন।

অমরকোষে সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থে লিখিত হইয়াছে "কৃত নিশ্চয়তা"। পূর্ব্ব পক্ষ নিরসন পূর্ব্বক যথার্থ পক্ষের স্থাপনকেও সিদ্ধান্ত বলা হয়। প্রথমোক্ত অর্থে শুধু Conclusion এবং দ্বিতীয়ার্থে Conclusion by reasoning বলা যাইতে পারে। Theory অর্থে সিদ্ধান্ত শব্দের প্রয়োগ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। Final conclusion or Decision অর্থে সিদ্ধান্ত শব্দের বহু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। করণ গ্রন্থে শুধু মীমাংসিত ফল ও তাহা আনয়নের প্রক্রিয়া লিখিত থাকে; সুতরাং করণ গ্রন্থ—সিদ্ধান্ত রহস্যকে চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে ঠাট্টা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অসমীচীন। তিনি লিখিয়াছেন—"সুতরাং দেখা যাইতেছে সিদ্ধান্তরহস্যে সিদ্ধান্ত নাই, কেবল রহস্যটুকু আছে।" এরূপ উক্তি শুধু অজ্ঞের পক্ষেই শোভা পায়।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন "মূল সিদ্ধান্তের বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়া পরে সূত্র বা Fonmulaর অবতারণা করিলে ভাল হইত কিন্তু গ্রন্থকার বা পঞ্জিকাকার কেহই তাহা করেন নাই।" আসল সিদ্ধান্ত গ্রন্থে উপপত্তি ও Fonmula দুই ই আছে, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে; কিন্তু পঞ্জিকাকার কেন উপপত্তি দেখাইতে যাইবেন তাহাতো আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিলাম না। পঞ্জিকা কি সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অঙ্ক করিয়া অয়নাংশ আনয়নের প্রক্রিয়ায় যে "কেন"র উত্তর দিয়া একটা কিছু করিয়াছেন বলিয়া শিক্ষিত মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা কিরূপ উপহাস্যাস্পদ তাহা না বলিলেও চলে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃ সিদ্ধান্ত।

# নিউগিনির কথা।

নিউগিনি প্রশান্ত মহাসাগরের একটী দ্বীপ—এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। এই দ্বীপের অধিকাংশ পূর্ব্বে জর্ম্মন-অধিকৃত ছিল। বিগত—মহাযুদ্ধে এই দ্বীপ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসিয়াছে। ইহা এখন অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণরের অধীনে শাসিত হইয়া থাকে।

এই দ্বীপের অধিবাসীরা উচ্চতায় ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের বর্ণ কাল, কিন্তু নিগ্রোদের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ নহে। ইহারা প্রায়ই নগ্ন অবস্থায় থাকে। কখন

যুবতী প্রৌঢ়া বালিকা

কখন গাছের ছাল পরিধান করিয়া থাকে। সম্প্রতি তাহারা সুসভ্য জাতির শাসনাধীনে আসিলে তাহাদিগকে বস্ত্র দ্বারা গাত্র আবৃত করিবার জন্য বাধ্য করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে দেখা গেল যে, তাহাদের অনাবৃত দেহ বস্ত্রে আবৃত করিবার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য দিন দিন ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। তখন এক কমিটী নিযুক্ত করিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করা গেল। অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইল যে তাহাদের দেশের আবহাওয়ায় উলঙ্গ থাকাই স্বাস্থ্য রক্ষায় উপায়। সুতরাং নিউগিনের কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ঐ দ্বীপবাসী গণকে অতঃপর নগ্ন থাকিতেই দেওয়া হইবে।

এই দ্বীপবাসীদের অন্যান্য আচার ব্যবহার ও অদ্ভুত। ইহারাও ফীজী দ্বীপবাসীদের ন্যায় চুলের পারিপাট্য বিধানে খুব যত্ন করিয়া থাকে। ইহাদের চুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। ইহারা গলায় শাখা, দাঁত বা হাড়ের মালা পরিধান করিয়া থাকে। নাকে প্রচুর অলঙ্কার ব্যবহার করে এবং নিজেদের শরীর নানা বর্ণে চিত্রিত করিতে ভালবাসে।

ডোবা গৃহ।

ইহারা উচুতে বা বৃক্ষ শাখায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। বৃক্ষের উপরে নির্ম্মিত গৃহকে ডোবা বলা হয়। ইহাতে অবিবাহিতা স্ত্রীলোকেরাই অবস্থান করে। এই প্রকার ঘর সর্প ভয় এবং শত্রু ভয় হইতে নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

নিউগিনির পূর্ব্বাঞ্চলে কৃষিকার্য্য বেশ ভাল হয়। ঐ অঞ্চলে মিষ্ট আলু, সুমিষ্ট আঁখ প্রভৃতি শস্যই লোকে করিয়া থাকে। মৎস্য ও সাগুই ইহাদের প্রধান খাদ্য। সৌভাগ্যের বিষয়—এই দ্বীপে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই। ইউরোপীয় স্ত্রীলোকগণ যেমন কুকুর বিড়াল প্রতিপালন করে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সেইরূপ শূকরের ছানা পোষণ করিয়া থাকে। এমন কি তাহাদিগকে স্তনের দুগ্ধ পর্য্যন্ত পান করাইয়া থাকে।

ইহারা আত্মায় বিশ্বাস করে। ইহাদের কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে, তাহার আত্মার আশ্রয় জন্য তাহারা একটী

নিউগিনি যুবক।

কাঠের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। তাহাদের বিশ্বাস এই মৃত ব্যক্তির আত্মা অনাশ্রিত ভাবে চতুর্দ্দিকে না ঘুরিয়া এই মূর্ত্তির মধ্যে আশ্রয় লইলেই আর ব্যারাম পীড়ার সৃষ্টি হইবে না।

এই সমাজে স্ত্রীলোকগণের উপদেশেই সংসার পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহারাই পুরুষদিগকে অন্যের সঙ্গে লড়িবার জন্য উত্তেজিত করে; এমন কি খুন ও হত্যা করিতেও পরামর্শ দেয়।

পুরুষ পরিণত বয়সে পৌছিলেই এখানে জীবন সঙ্গিনী পাওয়া যায় না। অনেক অনুসন্ধান করিয়া জীবন সঙ্গিনী মিলাইতে হয়। এই সঙ্গিনী সংগ্রহ করিবার সময় কন্যার পিতা বা অভিভাবককে বহু উপঢৌকন প্রদান করিতে হয়। শূকর, খাদ্য দ্রব্য, অলঙ্কার, এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় সৌখিন দ্রব্য যাহা তাহাদের দেশে পাওয়া যায়—এইরূপ বহু জিনিষই উপহার স্বরূপ দিতে হয়। প্রচলিত প্রথানুসারে বিবাহের সময় স্ত্রীলোক গণ হয় চুল না হয় অলঙ্কার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। বিবাহিত জীবনের চিহ্ন স্বরূপ তাহারা মুখে উল্কী পরিধান করিয়া থাকে। মুখমণ্ডলে উল্কী বিবাহিতা মেয়েদের চিহ্ন। অবিবাহিতা যুবতীরা সর্ব্বশরীর চিত্রিত করিয়া থাকে। বিবাহ না হইলে মুখ চিত্রিত করিবার নিয়ম নাই।

বিবাহের দিন একটা বড় ভোজ হয়। ঐ ভোজ সুসম্পন্নের নিমিত্ত সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণই দায়ী। তাহারাই নানা খাদ্য দ্রব্য উপহার লইয়া আসিয়া থাকেন।

বর ও কন্যা সে দিন বেশ সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়। কোমল পুষ্প পল্লবে ও শাখায়, বর কন্যাকে সজ্জিত করা হয়। বিবাহে কোন পুরোহিত প্রয়োজন হয় না।

স্ত্রীলোকগণকে এক জীবনে ইচ্ছামত বহু স্বামী পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়; সুতরাং ইহাদের পরিবারিক জীবন খুব সুখের বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

## আরতি।

আরতি করিছে তপন ইন্দু,<br>
নীল অম্বর ফেনিল সিন্ধু,<br>
বিশ্ব দেবের মন্দিরে;<br>
বিশ্ব মায়ের ভরে অঞ্চল,<br>
শ্যামল নীলিম কুসুম কোমল,<br>
কত সুমধুর গন্ধী রে!

ভুবনে গগণে ধ্বনিছে বাঁশরী,
বিহগ গাহিছে আপনা পাসরি,
হর্ষ ব্যাকুল পরাণে,
মরমে পশিয়া ললিত সুতান,
উথলি উঠিছে জীবনের গান,
ডাকিগো করুণা নিদানে !
স্বপনের দেশে সাগর ধীরে,
কি খেলা খেলিছে লহরী নীরে,
বিপুল কর্ম্মী সাগর উর্ম্মী,
ভক্তিতে গলি প্রণমে তীরে,
সাদা ফেন ফুলে হরষে।
আমার মোহন মানস কুঞ্জে,
ওই বুঝি ওই মধুপ গুঞ্জে,
বিশ্ব মায়ের মূরতি রাজে,
প্রেমের পূজা হৃদয় মাঝে,
আঁখি জলে নিশি দিবসে।
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়।

# নারীর অধিকার।

এ সংসারে এখন আর কেহই নীরবে বসিয়া নাই। সকলেই আপন আপন ন্যায্য দাবী ও অধিকার লাভ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এতকাল পুরুষের অনুগ্রহ ভাজন নারী-সমাজও নবযুগের শুভ আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। তাই সে দিন কাশীধামে বিরাট মহিলা কংগ্রেস দেখিলাম। জননী, ভগিণী, কন্যাগণের অধিকার লাভের আবেগ-আন্দোলন অনুভব করিলাম। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

একদিন বোধ হয় মাতৃত্বের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই নারী আপন স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া পুরুষের আনুগত্য ও আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। পুরুষেরাও সুযোগ পাইয়া নাগ-পাশে নারী সমাজকে বাঁধিয়া নিজেদের অধিকার টুকু ষোল আনা বজায় রাখিয়াছেন। এবং ইহার ফলে নারীগণ অনেক ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই কথাটী একেবারে অস্বীকার করিলে চলিবেনা।

এখন আদিমসমাজে নারীর কর্ত্তব্য ও অধিকারের সীমা কতটুকু ছিল, তাহা একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব—বর্ত্তমান নারী সমাজ তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে কতটুকু বঞ্চিত হইয়াছেন।

প্রাচীন সমাজে অনেক কাজের ভার মেয়েদের হাতে ছিল। গৃহস্থালীর সাজ সরঞ্জাম, যাহা কিছু দরকার হইত, তাহা মেয়েরা নিজ হাতে তৈরী করিতেন। ঘর বাড়ী তৈরী করা, কাঠ কাটা, জলতোলা, জমিতে বীজবুনা, জমীর আগাছা উঠান, শস্য কাটা ইত্যাদি নারীদের কর্ত্তব্য ছিল। কুমারের কাজটাও মেয়েদের একচেটীয়া ছিল। পুরুষেরা কেবল গো মহিষ চরাইত, শিকার করিত, প্রয়োজন হইলে কোমর বাধিয়া যুদ্ধে লাগিয়া যাইত মাঝে মাঝে নারীগণও যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইয়া পুরুষের সাহায্য করিত। এখনকার ন্যায় মেয়েদের তখন বড় একটা অবসর ছিল না। মেয়েরা তখন উঠিয়া পড়িয়া আপন কাজে লাগিয়া যাইত, বরং তখন পুরুষেরা কোমল শয্যায় শুইয়া চক্ষু বুজিয়া ধূম পান করিত।

কৃষিকার্য্যে মেয়েদের সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম করিতে হইত। এখনও সুসভ্য ইউরোপীয় সমাজে কৃষিকার্য্যের বেশীর ভাগ মেয়েদের হাতে। ইটালীতে দশ বার বৎসরের লক্ষ লক্ষ বালিকারা আজও কৃষিকার্য্য করিতেছে। পশ্চিম বঙ্গে ও বিহারে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে ধান্য রোপন করিয়া কৃষিকার্য্যে এখনও পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমের হাওয়া যাহাদের গায় বেশী লাগিয়াছে, তাহারা চাষের কাজ ছাড়িয়া কার্পেট বুনিতেছে, নাটক নভেল পড়িয়া সময় কাটাইতেছে।

রোগীর চিকিৎসা করাও প্রাচীন কালের মেয়েদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। এখনও কুর্দ্দিস্থানের মেয়েরা পুরুষানুক্রমে ডাক্তারি করিতেছে। সেখানে পুরুষ চিকিৎসক নাই। রোগীর সেবা শুশ্রূষা, ঔষধ সেবন ও পথ্যদান ইত্যাদি নারীরই প্রধান কর্ত্তব্য; কারণ এসব কাজ মেয়েরা যত সহজে ও সুচারুরূপে করিতে পারে পুরুষেরা বোধ হয় ততটা পারেনা। তথাপি আর্ত্তসেবা ও রোগী শুশ্রূষায় পুরুষেরই এখন প্রধান্য। রামকৃষ্ণ মিসনের সেবক সন্ন্যাসীগণ ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। পরদুঃখ কাতর নাইটীঙ্গিলের ন্যায় রমণী নিতান্ত বিরল বলিয়াই কেবল তাঁহারাই দ্বারা আর্ত্ত

সেবায় নারীর স্থান নির্ণয় করা যায়না। ইউরোপের ভগিনী সম্প্রদায়ে ( Sisterhood ) নারীর সংখ্যা খুব বেশী কিনা ঠিক বলিতে পারিনা। ভারতে অল্প সংখ্যক বেতন ভোগী ধাত্রী ব্যতীত চিকিৎসা বিদ্যায় ও রোগী সেবায় পারদর্শিণী নারীর সংখ্যা নেহাত কম। নারী তাঁহাদের এই শ্লাঘ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন কেন ?

তারপর রাজনীতি। রাজনীতিতে নারীর অধিকার নেহাত কম ছিলনা—যদিও ম্যাচিভেলি, বিসমার্ক বা চানক্যের ন্যায় কোন নারী ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারে নাই। আজ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ার বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহের পর সন্ধি স্থাপনের জন্য নারীগণকে দূত রূপে পাঠান হইয়া থাকে। তাহারা বেশ দক্ষতার সহিতই কুট রাজনীতির মীমাংসা করিতেছেন। বিদুষী আইরিশ মহিলা আনিবেশান্ত ও মিসেস্ সরোজিনী নাইডু নারী সমাজের অতীত রাজনীতি কুশলতার সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময় রাজনীতিতে নারী সমাজের তেমন প্রতিষ্ঠা নাই। তাই নারীগণ ভোট দানের অধিকার পাওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

যাহা হউক, এখন আর সে কালও নাই ; আদিম নারী সমাজের সে অবস্থাও নাই। সভ্যতা যতই দিন দিন জাঁকাল ও চক্ চকে হইতেছে, ততই নারী সমাজও নূতন ছাঁচে গড়িয়া উঠিতেছেন। মেয়েরা যতদূর সম্ভব সংসারের কাজ পুরুষের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। পারিবারিক জীবন কার্য্য সাধারণতঃ মেয়েদেরই করণীয়। কিন্তু পূর্ব্ব আফ্রিকায় পুরুষ বেচারীরা মেয়েদের গাউন, সেমিজ, ব্লাউস্, বডি, ইত্যাদি সমস্তই নিজহাতে সেলাই করিয়া দিতেছে। সেখানে যদি কোন স্ত্রী তাহার পেটিকোটে স্বামীর জীবন কার্য্যের সামান্য কোন ত্রুটি দেখিতে পায়, তবে সে ইচ্ছা করিলে স্বামীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে ; ইহাতে সমাজ বিধি বা রাজবিধি কোন বাধা দিতে পারে না। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারী সমাজের কর্ত্তব্যের এত টুকু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

প্রাচীন সমাজে নারীগণ যাহা কর্ত্তব্য মনে করিয়া কঠোর পরিশ্রমে সুসম্পন্ন করিতেন, এখন তাহাই সুসভ্য সমাজে সুকুমার কলা কৌশলে পরিণত হইয়াছে এবং তাহা নারীর হাত হইতে পুরুষের হস্তে আসিতেছে। মেয়েরা পূর্ব্বে যে, যে রূপে পারিত সে সেই রূপেই মাটির জিনিষ তৈরী করিত, তাহাতে বিশেষ কিছু কারুকার্য্য থাকিত না। এখন কারু কার্য্য বিশিষ্ট না হইলে মাটির ঘটও বিকায় না ; সুতরাং তাহা পুরুষের হস্তে আসিয়াছে। এইরূপে সভ্য সমাজের বাহ্যিক চাকচিক্য ও সৌন্দর্য্য পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য মেয়েদের অনেক শিল্পকার্য্য পুরুষদিগের হাতে আসিতেছে।

জীবন্ত মানুষের চামড়ার উপর সূচের সাহার্য্যে রং দিয়া সুচিক্কণ কারুকার্য্য করাও (উল্কী) নারীদিগের একটা কর্ত্তব্য ছিল। আসামে নাগাদের ও জাপানে এইনু জাতির মধ্যে বৃদ্ধা নারীগণ এই শিল্প কার্য্য (Tattooing) করিয়া থাকে। কানাডায় অদ্যাপিও ইহা নারীদিগের একটী কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। সেখানে ইহা ধর্ম্মের আচ্ বলিয়া লোকের বিশ্বাস। যাহা হোক, এই নারী শিল্প এখনও নারীদের হাতেই বেশীর ভাগ রহিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে অনেক বাগ্দী রমণীর অঙ্গে এই শিল্পের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি বাগ্দী মেয়েরা এবিদ্যায় খুব পারদর্শী।

ঢাকার জামদানীর বোটা ও ফুল তোলার কাজ পূর্ব্বে মেয়েরা করিত, এখন মেয়েরা তাহা করে না, পুরুষ ছেলেরাই তাহা করিয়া থাকে।

চিত্রশিল্পে নারীদের অধিকার নাই বলিলেও চলে। খুব নামজাদা নারী চিত্রকরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। ভাস্কর বিদ্যায় ও নারীর অধিকার খুব কম। সঙ্গীত বিদ্যা নারীদের প্রিয় বটে কিন্তু ইহাতে নারী সমাজের আসন খুব উপরে নহে। এ পর্য্যন্ত কোন রমণী বিশেষ কোন বাদ্য যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন কিনা জানিনা। কেবল মেয়েরাই ব্যবহার করিতে পারেন, এমন কোন বাদ্যযন্ত্র আছে কিনা তাহাও ঠিক বলিতে পারিনা। পুরুষের সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বোধহয় মেয়েরা এখনও ব্যবহার করিতে শিখে নাই। এ পর্য্যন্ত যত বিখ্যাত গায়ক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহই বোধহয় নারী নহেন।

মানব হৃদয়ের চঞ্চল ভাবপ্রবণ আবেগ আন্দোলনের পরিণতি সঙ্গীতে। নারী হৃদয় স্বভাবতঃই ভাবের আবেগ আন্দোলনে ভরপুর। যিনি নিজের ভাবে বিভোর, তিনি

কখনই অপরের ভাব সংযত করিয়া তান-স্বর-মানের সহিত তাহা প্রকাশ করিতে পারেননা। তাই নারী ভাবের পরিণত সঙ্গীতকে শান্ত সংযত সমাহিত চিত্তে আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার অনুরূপ অনুভূতি কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া ততটা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারেনা। নারী অন্যের সুর ও ভাবভঙ্গী অনুকরণ করিতে পারে কিন্তু কোন মৌলিক সুর আবিষ্কার বা উচ্চাঙ্গের মৌলিক সংগীত রচনা করিয়া তাহাতে অভিনব সুর সংযোজনা করিতে নারী বোধহয় তেমন পারেনা। ঠাকুরবাড়ীর নারীদের মধ্যে দুই এক জনের মৌলিক সঙ্গীত রচনা করিবার ক্ষমতা অনেকটা আছে। শ্রদ্ধেয়া সরলা দেবী গভীর ভাবোদ্দীপ কয়েকটি মৌলিক সঙ্গীত রচনা করিয়া নিজেই তাহতে সুর সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

সঙ্গীত প্রিয় পুরুষ আমরণ গতিবাদ্য ভালবাসেন। কিন্তু বয়স একটু বেশী হইলেই নারীর সঙ্গীত স্পৃহা একেবারে লোক পাইতে চায়। কাজেই নারী প্রকৃতি সঙ্গীতের খুব অনুরূপ বলিয়া মনে হয়না। এইজন্য নারী সংগীতবাদ্যে আজও খুব একটা গৌরবের আসন অধিকার করিতে পারেনাই, যদিও আধুনিক নারী সমাজ গীতবাদ্যের প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।

ধর্ম্মের দিক দিয়াও নারীর অধিকার খুব বেশী নাই। ধর্ম্মের প্রতি পুরুষের চেয়ে নারীহৃদয় সহজেই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ধর্ম্ম জগতে আজও নারী এমন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই যাহার জন্য নারী বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, প্রভৃতির ন্যায় একটা অমরত্বের দাবী করিতে পারে। মিরাবাই ধর্ম্ম প্রাণ রমণী ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম জগতে তাঁহার স্থান কোথায়, ইহা বিচার্য্যবটে! দর্শন শাস্ত্রে নারীর অধিকার কত টুকু ও বিশ্ব বিখ্যাত নারী দর্শনিক কয়জন, তাহা চিন্তনীয়! মণ্ডন মিশ্রের পত্নী সরস্বতী শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বিচারে মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি বাস্তবিক দর্শনিক কিনা বিচার্য্য। গীতার অনুবাদক এনিবেসান্ত ও মাতাজী তপস্বিনীর বক্তৃতার সময় সময় দার্শনিক ভাব খুব ফুটিয়া উঠিয়াছিল বটে কিন্তু এরূপ লোক নারী সমাজে খুব বিরল।

সাহিত্যে নারীর অধিকার খুব সাবধাণতার সহিত বিচার করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, কবিত্বের বীজ প্রথম নারী হৃদয়েই উপ্ত হইয়াছিল। কবিতায় নারীর অধিকার নেহাত কম নহে। নারী কবিদের মধ্যে ইংলণ্ডের মিসেস্ ব্রাউনিং, মিসেস্ হিমেনস্, বঙ্গের শ্রীমতী কামীনী রায়, শ্রীমতী মানকুমারী বসু, শ্রীমতী তরু দত্ত প্রভৃতি ও প্রবাসিনী বঙ্গ মহিলা শ্রীমতী সরোজিণী নাইডুর নাম উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারা সকলেই মৌলিক কবিতা লিখিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সাহিত্যে, নবযুগ প্রবর্ত্তক কোন মহিলা কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

কবিতার চেয়ে উপন্যাসে আমরা নারীদিগের কৃতিত্বের বেশী পরিচয় পাই। উপন্যাসে নারীর স্থান পুরুষের চেয়ে নেহাত নীচে নহে।

জেইন অষ্টিন, চারলটি, ইমিলি ব্রন্টি. জর্জ্জ ইলিয়ট, মেরি কেরোলি, স্বর্ণকুমারী, অনুরূপা, নিরুপমা, সীতা-শান্তা প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণ উপন্যাস জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। কি চরিত্র অঙ্কনে, কি ঘটনাবৈচিত্র্যে, কি মনোভাব বিশ্লেষণে, কিভাব গাম্ভীর্য্যে; কি ভাষার মাধুর্য্যে ইঁহারা উঁচুদরের লেখিকা। সাহিত্য জগতে ইঁহাদের স্থান নিতান্ত নগণ্য নহে।

সাহিত্যের ন্যায় নারীর রঙ্গাভিনয়ের কথাও অবশ্যই উল্লেখ যোগ্য। কারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে নারীর আসন চিরকালই পুরুষের অনেক উপরে। পুরুষ এবিষয় নারীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। পুরুষের চেয়ে নারীর ভাব তরঙ্গ অধিকতর চঞ্চল। তাই ইঙ্গিত মাত্রই অপরের ভাবভঙ্গী অনুকরণ করিবার ক্ষমতা নারীর বেশী। আবার নারীর অঙ্গ স্বভাবতঃ কোমল ও নমনীয়। কাজেই পরের হাব ভাব অনুকরণ করিয়া যথাযথ-রূপে প্রকাশ করা তাহার পক্ষে যত সহজ, পুরুষের পক্ষে তত নহে। শারীরিক গনের জন্যই বোধ হয় নারী নৃত্যা-দিতে পুরুষের চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে নারী সমাজের কোন বিষয়ে কতটুকু ন্যায্য অধিকার পূর্ব্বে ছিল বা এখন আছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। এই

ন্যায্য অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিলে স্বাধীনতা লোলুপ নারী সমাজের পরিণাম কি হইবে মিঃ লায়ড্ জর্জ্জের প্রতি নারীগণের দুর্ব্যবহারেই কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

ইহা এখন আমাদের জননী-ভগিনী-কন্যাগণের পক্ষে বিশেষ ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। *

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

---

# স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরী।

মস্যুয়ার অন্যতম জমিদার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রশিল্পী ও শিশু সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত "সন্দেশ" সম্পাদক সুকুমার রায় চৌধুরী সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া দুর্জ্জয় কালা জ্বরে বিগত ২৪শে ভাদ্র অনন্তের কোলে আশ্রয় লইয়াছেন।

বাল্যকাল হইতে সুকুমারের প্রতিভা পিতার পদানুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। সুকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানের সহিত বি, এস, সি পরীক্ষা পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি লাভ করেন এবং ফোটোগ্রাফী ও ব্লক প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য মানচেষ্টার গমন করেন। তথায় কৃতিত্বের সহিত সফলতা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া ব্যবসায় নিযুক্ত হন। ফটোগ্রাফী ও ব্লক নির্ম্মান সম্বন্ধে তাহার বহু গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার কালে তিনি রয়েল ফটোগ্রাফীক সোসাইটীর সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন ফটোগ্রাফীও ব্লক প্রস্তুত সম্বন্ধে এদেশে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

সুকুমার শিশুদের জন্যে বিমল হাস্যোদ্দীপক ও শিক্ষা-প্রদ কবিতা প্রণয়ণে এবং তদোপযোগী চিত্র অঙ্কনে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। সুকুমার বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ তেজস্বী ও সদালাপী ছিলেন। ৩৭ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার এইরূপ অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গলা দেশ একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী শিল্পী হারাইল। ময়মনসিংহের যে ক্ষতি হইল তাহার পূরণ হইবার নহে। ময়মনসিংহ তাঁহার প্রতিভা গৌরবে গৌরব অনুভব করিত। সাহিত্য শিল্পকলায় সুকুমার যে সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। তাহার যশোদীপ চিরদিন তাহার নাম স্মরণ করাইয়া দিবে। তাহার শোকার্ত্ত মাতা, পত্নী, শিশু, পুত্র ও ভ্রাতাগণের সহিত আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রার্থনা করি, যিনি সকল শোকের হরণ কর্ত্তা, তিনি তাঁহাদের প্রাণে শান্তি বিধান করুন। সুকুমারের স্বর্গীয় আত্মা তাঁহারই শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান লাভ করুক।

* এই প্রবন্ধ সংকলনে আমরা হেভেলক ইলিয়সের (*Havelock Ellis*) *Man & Woman* গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছি।

---

# অঞ্জলি।

## অপূর্ব্ব গণিতজ্ঞ।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'London Lancet' নামক পত্রিকায় এক আশ্চর্য্য জন্মান্ধ গণিতজ্ঞের আখ্যান বাহির হইয়াছে জন্মান্ধ সত্বেও এই লোকটী তাহার আশ্চর্য্য গণনা শক্তিদ্বারা সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। তিনি ৪ সেকেণ্ডে ৪ সংখ্যা বিশিষ্ট যে কোনও অঙ্কের বর্গমূল ও ৬ সেকেণ্ডে ৬ সংখ্যা বিশিষ্ট যে কোনও অঙ্কের ঘনমূল বাহির করিতে পারেন। পরীক্ষা স্বরূপ তাহাকে ৪৬৫৪৮৪৩৭৫ এর ঘনমূল বাহির করিতে বলা হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ১৩ সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন। ইহা হইতেও আরও একটী কঠিন বিষয় দ্বারা তাহার এই শক্তির পরীক্ষা করা হয়। ১ম বাক্সে ১টী, ২য় বাক্সে ২টী, ৩য় বাক্সে ৪টী, ৪র্থ বাক্সে ৮টী এইরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে বীজের সংখ্যা দ্বিগুণিত করিয়া ৬৪টী বাক্সে কতকগুলি শস্যের বীজ রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ১৪শ, ১৮শ, ২৪শ, ও ৪৮শ বাক্সে ক্রমান্বয়ে কয়টি করিয়া বীজ আছে?" ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি উত্তর দিয়া ফেলিলেন,"১৪শ টীতে ৮১৯২টী, ১৮শটীতে ১৩১০৭২টী ২৪শটীতে ৮৩৮৮৬০৮টী ও ৪৮শটীতে ১৪০৭৩৭৪৮৮৩৫৫৩২৮টী বীজ থাকিবে।" তারপর সব কয়টীতে মোটে কয়টী বীজ আছে জিজ্ঞাসা করায় উহারও প্রকৃত উত্তর তিনি ৪৫ সেকেণ্ডের মধ্যে দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া কোন বৎসর 'ইষ্টার ডে' কোন তারিখে পড়িবে, তাহাও তিনি বলিয়া দিতে পারেন। দৃষ্টিহীন একব্যক্তির পক্ষে এরূপ মানসিক গণনার আশ্চর্য্য শক্তির বস্তুতঃই প্রশংসা করিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে কাউরাইদের গণিতজ্ঞ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বৈষ্ণবের নাম এবং ময়মনসিংহের সোমেশচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

টাঙ্গাইল নিবাসী শুকুর মামুদের নাম এস্থলে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ব্যক্তি ছিল একটী পথের ভিখারী, লেখা পড়া জানিতনা, ছিন্নবস্ত্রে দিন মান ভিক্ষা করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিত; ছেলেরা পাগল বলিয়া তাহাকে তাড়া করিত। কিন্তু সে গণিতের এইরূপ প্রক্রিয়া জানিত যে, যে কোন পূরণ, ত্রৈরাশিক, বহুরাশিক অঙ্কের তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারিত।

স্থানীয় জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অঙ্ক শিক্ষক বাবু শশিকুমার বসু মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া একদিন ক্লাশ একটী পূরণ অঙ্ক করিতে দিয়া ২য় শ্রেণীর ছেলেদিগকেও তাহা শ্লেটে করিতে দিলেন।

অঙ্কটী ছিল ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত ক্রমিক রাশিকে ৯ হইতে ১ পর্য্যন্ত ক্রমিক রাশিদ্বারা পূরণ করা। শুকুরমামুদ দুই মিনিটের মধ্যে অঙ্কটীর ফল মুখে মুখে করিয়া দিল।

শুকুর মামুদ পরাধীন ভারতের লোক না হইয়া স্বাধীন দেশের লোক হইলে তাহাকে বোধ হয় পেটের দায়ে পাগল হইয়া ফিরিতে হইতনা। আমরা শুনিয়াছি, শুকুর মামুদের গুণে আকৃষ্ট হইয়া মহারাজা সূর্য্যকান্ত তাহাকে একটী ছাতা দিয়াছিলেন এবং সাহায্য করিয়াছিলেন।

* * * *

### মৎস্য হইতে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় প্যারিশ হইতে যে সব দ্রব্য অন্যস্থানে রপ্তানী হইতে পারে নাই, তন্মধ্যে কৃত্রিম মুক্তা অন্যতম। এই অভাব পূরণের জন্য আমেরিকার অনেকেই অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে এক বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় এক জাতীয় মৎস্য হইতে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুতের উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুক্তা প্রস্তুত করিবার জন্য প্যারিশ বাসিগণ রাশিয়ার মৎস্যজীবিদের নিকট হইতে একপ্রকার উপকরণ প্রাপ্ত হইত। যুদ্ধের সময় এই মৎস্যের আমদানী বন্ধ হওয়ায় আমেরিকায় আর মুক্তা প্রেরিত হয় নাই। সুতরাং আমেরিকার ব্যবসায়িগণ নিজ দেশের মৎস্য জীবীদের নিকটেই এইরূপ মৎস্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ফলে আমেরিকার মৎস্য ব্যবসায়িরা শীঘ্রই এমন এক জাতীয় মৎস্য প্রাপ্ত হইল যাহাতে মুক্তার ন্যায় কোমল দীপ্তিমান একপ্রকার পদার্থ ছিল। প্রয়োজন মানুষকে সকল রকম অভাব নিবৃত্তির উপায় আবিষ্কার করিতে বাধ্য করে, এখন আর আমেরিকা বাসিদের মুক্তার জন্য ফ্রান্সের দিকে পথ চাহিয়া থাকিতে হয়না। এই কৃত্রিম মুক্তার এক প্রকার আশ্চর্য্যগুণ এই যে, ইহা সকল দ্রব্যেই লাগিয়া থাকে।

শ্রীশিশিরকুমার সোম।

---

## গ্রন্থ সমালোচনা।

**কাশ্মীর ও জাম্মু** (ভ্রমণ কাহিনী) শ্রীনরেন্দ্র কান্ত লাহিড়ী চৌধুরী। মূল্য ২॥০ টাকা। ডবল ক্রাউন ষোল পেজি ১৪৪ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থকার বিখ্যাত ভ্রমণকারী ৺ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র। পিতার উপযুক্ত পুত্র বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইলেও দেশ ভ্রমণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সকল প্রকার পথশ্রমকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহা মিটাইবার সুযোগ খুজিতেছিলেন। সেই সুযোগের ফলই এই কাশ্মীর ভ্রমণ। এই ভ্রমণ কাহিনীতে তিনি বহু তথ্যই পাঠককে উপহার দিয়াছেন। গ্রন্থে অনেক গুলি ছবি আছে। কাশ্মীর ও জাম্মুর একখানা মাত্র চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সরল; ছাপা এবং বাঁধাইও সুন্দর।

**মায়া দেবী**—শ্রীঅক্রুরচন্দ্র সেন প্রণীত, মূল্য আট আনা। মায়াদেবী ক্ষুদ্র গল্প পুস্তক। গল্পে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের পূর্ব্ববাঙ্গলার একটী একান্ন ভুক্ত পরিবারের চিত্র বেশ সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ছাপা কাগজ উত্তম।

## সংবাদ।

টাঙ্গাইল হইতে "টাঙ্গাইল হিতৈষী" নামে একখানা নূতন সাপ্তাহিক পত্র বাহির হইতেছে। আমরা এই নূতন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

গত ২৩শে ভাদ্র রবিবার শেষ রাত্রিতে ভীষণ ভূমিকম্পে এ জেলার অনেক ক্ষতি হইয়াছে বটে কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় তত ক্ষতি হয় নাই।

সৌরভের নিয়মিত লেখক শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথ মহাশয়ের ভবনে গত ২৩ ভাদ্র রবিবার তাঁহাদের জাতীয় সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সবজজ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(, আশুতোষ লাইব্রেরীর প্রকাশিত রামায়ণ হইতে ·)

Asutosh Press, Dacca.

# সৌরভ
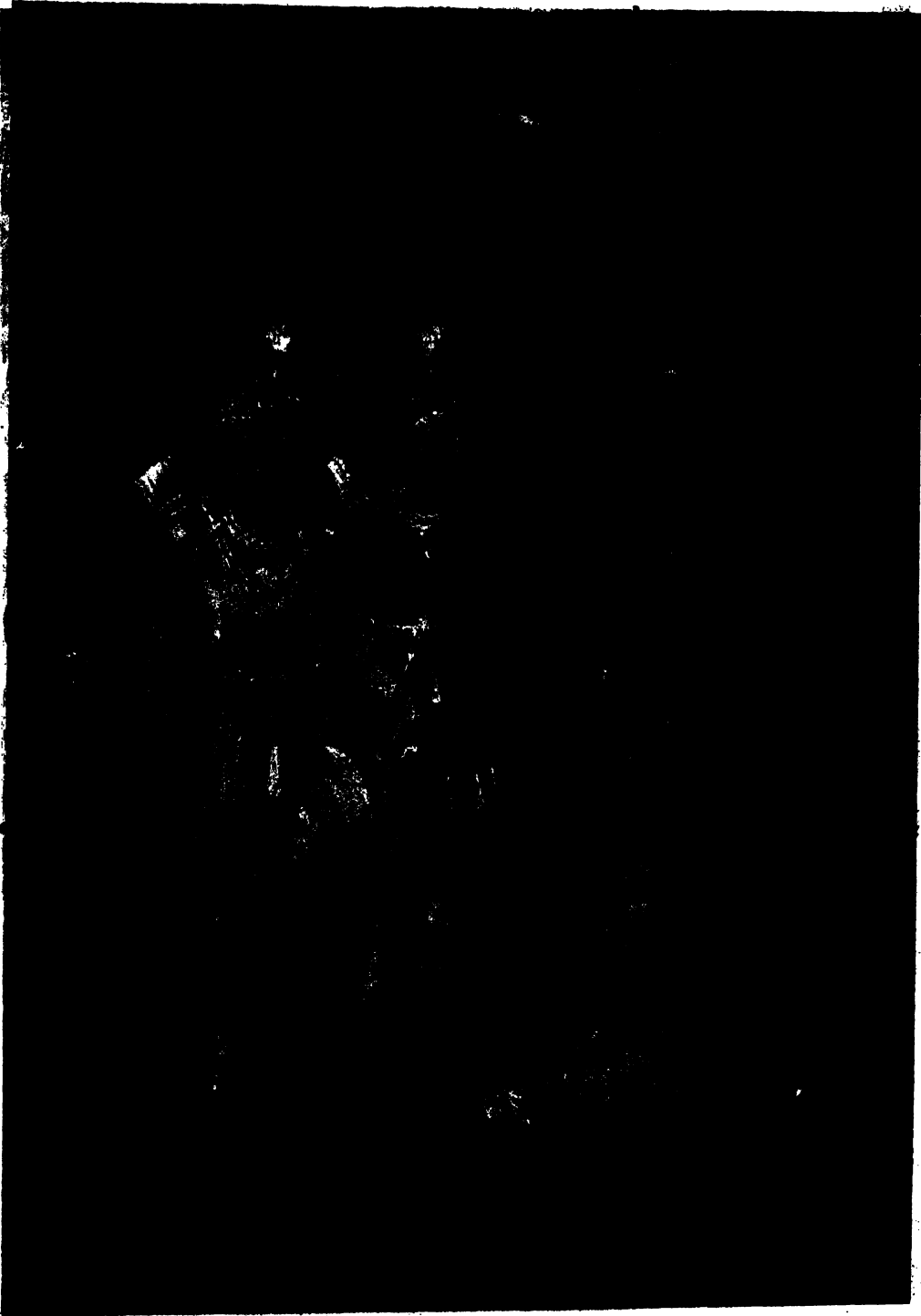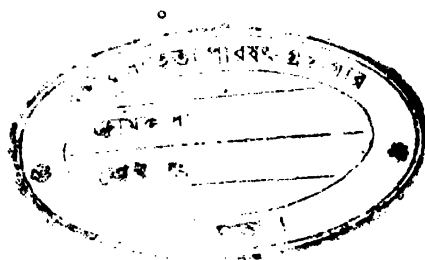
একাদশ বর্ষ। } ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩৬০। } দশম সংখ্যা।

## উপন্যাস ও আর্ট।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম উপন্যাস বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। 'আলালের ঘরের দুলাল' তৎকালীন বঙ্গ ভাষার অভিনব সৃষ্টি সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা উপন্যাসের উচ্চ গ্রামে উঠিতে পারে নাই। উপন্যাসের কলা কৌশল, উচ্চাঙ্গের চরিত্র বিশ্লেষণ এবং আখ্যায়িকার বৈচিত্র্য 'আলালে' নাই। ইহা সত্ত্বেও আলালের ঘরের দুলাল অতুলনীয়। বাঙ্গালা সাহিত্যাকাশে ইহা প্রভাত-তারা। প্রভাত-তারার ন্যায়ই উহা নব সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়াছিল। অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র আলালকে বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সামগ্রী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল কি না তাহা জানা নাই।

প্রকৃত পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক এবং তাঁহার দুর্গেশনন্দিনীই প্রথম উপন্যাস। দুর্গেশনন্দিনী যখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় তখন সমাজে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই। তখন মুষ্টিমেয় লোকমাত্র ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্রই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী সাহিত্যচর্চ্চার ফল সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। দুর্গেশনন্দিনীর অধিকাংশ উপাদানই ইংরেজী সাহিত্য হইতে সংগৃহীত। এই কথা সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগেরও অবিদিত ছিল না। সুপণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন—"ইংরেজীর নানাবিধ নবেল পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্কিম বাবু আপন পাত্রগণের অলঙ্কার সংগ্রহ করেন, এই [illegible] বলিয়া কেহ কেহ দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যাহা দীনবন্ধু মিত্রের নবীন তপস্বিনী সমালোচনায় ব্যক্ত করিয়াছি যে, সেরূপ করা আমাদের গুণ, দোষ নহে। কিন্তু এ স্থলে ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ পাঠকদিগকে নিতান্ত অন্ধকারে না রাখিয়া একটু বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে এই দুর্গেশনন্দিনীস্থ কোন কোন পাত্রের অনেক অংশ প্রসিদ্ধ সার ওয়াল্টর স্কটের 'আইবান্‌হো' নামক ইংরেজী নবেল হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু বিজ্ঞাপনের মধ্যে যদি এই কথাটী স্বীকার করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত।"

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পরেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়,—এইরূপ একটা নূতন সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রবর্ত্তন করিলেন তথাপি সেকালের গোঁড়া পণ্ডিতগণ দুর্গেশনন্দিনীর তীব্র প্রতিবাদ করেন নাই! বরং পণ্ডিতদিগের মুখপাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয় দুর্গেশনন্দিনীর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন,—"কয়েকটা পাত্রের চরিত্র যেরূপ সমালোচিত হইল, বোধ হয় তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, এই আখ্যায়িকাখানি একটী মনোহর পদার্থ হইয়াছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছি। ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ হইলে উত্তরোত্তর সমধিক পরিবর্দ্ধিত কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। উপন্যাস গ্রন্থের ইহা একটী প্রধান গুণ।"

সেকালের কথা ছাড়িয়া এখন একালের কথা বলি। ১৩০৮ সনের নবপর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস মুদ্রিত হয়। চোখের বালি রবীন্দ্রনাথের পাকা হাতের লেখা। কিন্তু চোখের বালি প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ পত্রিকায় উহার তীব্র সমালোচনা বাহির হইল। ইতঃপূর্ব্বে কোন পুস্তকের এরূপ কঠোর সমালোচনা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বঙ্কিম বাবুর কাচা হাতের লেখা প্রথম উপন্যাস খানি সেকালের গোঁড়া পণ্ডিত সমাজে যে আদর পাইয়াছিল 'চোখের বালি' আধুনিক উদার পাশ্চত্য শিক্ষা প্রাপ্ত সাহিত্যিকদিগের নিকট সেইরূপ আদর পাইল না কেন? রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'রাজর্ষি', বৌঠাকুরাণীর হাট' প্রভৃতি উপন্যাস যে প্রশংসা পাইয়াছিল 'চোখের বালি' তাহা হইতে বঞ্চিত হইবার কারণ কি?

যাহারা 'চোখের বালির' কঠোর প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের বক্তব্য সংক্ষেপতঃ এই যে—'চোখের বালির আদর্শ লোক শিক্ষার অনুকূল নহে। ইহা দ্বারা সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে। বিধবা বিনোদিনীর চরিত্র এইরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহাতে পাপের প্রতি লোকের ঘৃণা না হইয়া আসক্তি জন্মিবে।' 'চোখের বালি' যখন রচিত হয় তখন রবীন্দ্র নাথ নোবেল (Nobel) পুরস্কার পাইয়া জগদ্বিখ্যাত না হইলেও তিনি সাহিত্যের নানা বিষয়ে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাহার শিষ্যের অভাব ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'চোখের বালির সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "উপন্যাস পাঠে যদি সমাজে পাপ-স্রোত বৃদ্ধি পায়, তাহাতে উপন্যাস লেখকের কি? আর্ট বা কলা সৃষ্টি করিতে পারিলেই উপন্যাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কলা-সৌন্দর্য্য-জাত আনন্দ প্রদান ছাড়া উপন্যাস লেখকের অন্য উদ্দেশ্য নাই।"

কলা-সৃষ্টিযোগে কেবল আনন্দ প্রদান করাই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ইহা সম্পূর্ণ নূতন কথা। ইয়ুরোপের কোন কোন লেখকের আদর্শ "Art for Art's sake" ইহা সত্য বটে কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে এই আদর্শ কখনও বিকাশ পায় নাই। লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যেই সাহিত্যের সৃষ্টি, সাহিত্যই জাতীয় জীবন সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে। এই সনাতন সত্য এ দেশের সাহিত্যের অস্থি মজ্জাগত। যুগযুগান্তর হইতে এই সত্য, সাহিত্যে ও কলায়, নিত্য অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। দুর্গেশনন্দিনীতে লোক শিক্ষার উপাদান অধিক নাই সত্য কিন্তু উহার কোথাও ভোগলালসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সংযমের সীমা অতিক্রম করে নাই। উহার কোথাও অপবিত্র প্রেমের উৎকট অভিব্যক্তি নাই। তাই সংস্কৃত সাহিত্য রসজ্ঞ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও রমণীরত্ন আয়েষার চরিত্র আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আয়েষা যথার্থই দেবকন্যারূপিণী।" বিমলার কথা লিখিয়াছেন,—"বিমলার চরিত্র গ্রন্থকার আদ্যোপান্তই এইরূপ মনোহরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে উহাকেই সময়ে সময়ে গ্রন্থের নায়িকা বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয়।" বীরেন্দ্র সিংহের কঠোর সংযমের কথা উল্লেখ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—"আয়েষা পরম সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, অসাধারণ গুণশালিনী, যুবতী রাজকন্যা। তিনি বিপদ সময়ে রাজ পুত্রের যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে হয় ত তাঁহার আরোগ্য লাভই দুর্ঘট হইত কিন্তু সেই আয়েষাও মুক্তকণ্ঠে অনুরাগ প্রকাশ করিলেও রাজপুত্রের মনে তাঁহার প্রতি এক নিমেষের জন্যও অন্য ভাব জন্মে নাই, ইহা নায়কের পক্ষে সাধারণ গুণ নহে।"

আমরা সেকালের কথা উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে সেই গোঁড়ামীর দিনেও সম্পূর্ণ নূতন ধরনের উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী জাতীয় আদর্শে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকটও প্রশংসিত হইয়াছিল। আবার জাতীয় আদর্শ হইতে পার্থক্য হেতু নব্য ইংরেজী শিক্ষিত সমাজেও "চোখের বালি" সাদরে গৃহীত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কোন কলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম ও নীতিকে উপেক্ষা করেন নাই।

চোখের বালির পর রবীন্দ্রনাথের ঐ ছাচে ঢালা নৌকাডুবি বঙ্গদর্শনে বাহির হইল। তখনও কলা সৃষ্টিই উপন্যাসের একমাত্র উদ্দেশ্য, Art for art's sake এই নীতি দুই চারজন ইংরেজী শিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতানুরাগী লেখকের মধ্যেই সীমা বদ্ধ ছিল। ১৩২১ সনে

রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। সেই অবধি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংবাদ অধিক পরিমাণে বাঙ্গলা সাহিত্যে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহারা বাঙ্গলা সাহিত্যে কলা-কৌশলের কথা বলিতেন তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিলি জোলার (Emile Zola) প্রতিভা ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দৃষ্টান্ত দিতেন। এই সময়ে 'ইবসেন,' 'পিয়ের লোটি,' 'আনাটোল ফ্রান্স,' 'মেটারলিঙ্ক' 'বর্ণাডশ' প্রভৃতি সাহিত্যিকদিগের নাটক ও উপন্যাস ইংরেজী সাহিত্যানুরাগিগণ সাদরে পাঠ করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ইবসেনই বাঙ্গলা সাহিত্যে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিল। ইবসেনের আদর্শ সকলে গ্রহণ করিবে না সত্য কিন্তু ইবসেনের প্রতিভা ও নাট্যকলা সৃষ্টি অসামান্য। কলা-কৌশলে তিনি Sophocles, Shakespeare, Goethe ও Mollierএর পরেই স্থান পাইবার যোগ্য। কোন কোন মাসিক পত্রিকায় 'আর্টের' নূতন আদর্শে গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হইতে লাগিল। 'নারায়ণ' ও 'সবুজ পত্র' গল্প এবং প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া আর্টবাদীদিগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তখন 'আর্টের' নামে উচ্ছৃঙ্খল ভোগলালসার চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণই কোন কোন গল্প ও উপন্যাস লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম ও নীতির সহিত উপন্যাসের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহাই এই নব গঠিত দলের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালও নারায়ণে প্রবন্ধ লিখিয়া এই মতই সমর্থন করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' পুরস্কার পাইবার প্রায় এক বৎসর পরে সবুজ পত্রে প্রথমে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আর্ট সঙ্গত কয়টী গল্প এবং পরে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসের তীব্র প্রতিবাদ দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। 'চোখের বালি' প্রকাশিত হইবার পর সাহিত্যে যে নৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হইলে উহা প্রবলতর হইল। বাঙ্গলা সাহিত্যের পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইবসেনের কলা সৃষ্টির আদর্শের প্রভাবই বিশেষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন দলের সৃষ্টি করিয়াছে। এমন কি ঘরে বাইরের' সহিত ইবসেনের A dolls house এর অসামান্য ভাব সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল নহে, স্বামী স্ত্রীকে পুতুলের মত নিজ ইচ্ছামত পরিচালন করেন ইহাই ইবসেনের প্রতিপাদ্য বিষয়। পত্নী "নোরা হেলমার" (Nora Helmer) তাহার স্বামীকে বলিতেছেন "When I was at home with papa he told me his opinion about every thing and so I had the same opinion ; he called me his doll-child and he played with me just as I played with my dolls and when I come to live with you I was simply transferred from papas hands to yours."

'নোরা হেলমারের' মুখে যাহা শোভাপায়, তাহা একজন অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গ মহিলার মুখে শোভা পায় না। তাই রবিবাবু স্ত্রীর অধীনতার দার্শনিক তথ্যটী স্বামী নিখিলেশের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—"আমার স্ত্রী অতএব ও আমারই ! স্ত্রী ! ওটা কি একটা বুক্তি ? ওটা কি একটা সত্য ? ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগা গোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায় ?" সমগ্র গ্রন্থেই এই ভাবটী ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইবসেনের এই ভাবটী 'ঘরে বাইরেতে' ব্যক্ত করিতে গিয়া সতীধর্ম্মকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। বাস্তবিক 'ইবসেনের' 'নোরার' আদর্শ বঙ্গালয়ত দূরের কথা জগতের কোন সমাজেই স্থান পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করিয়া তথাকার সমাজের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। বোধ হয় তিনি স্বীকার করিবেন, দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি এখনও যাহা কিছু ভারতবর্ষেই আছে। পাশ্চাত্য দেশে ভোগ লালসা পরিতৃপ্তির জন্য নর নারীগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তথায় সতীত্বের গৌরব পরিহাসের বিষয় হইয়াছে বর্ত্তমানে এক আমেরিকায় প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা হইতেছে। ইহার মূলে কেবল উদ্দাম ইন্দ্রিয় সুখের দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা। পাশ্চাত্য দেশে বিবাহ বন্ধনে কেহ আর বড় আবদ্ধ হইতে চায় না ; অবাধ প্রেমই স্পৃহণীয়। সুতরাং তথায় নারীর ব্যক্তিত্ব স্বৈর উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। এখনও আমাদের দেশে বিবাহ একটী

পবিত্র যজ্ঞ ইহার আহুতি আত্মত্যাগ। সতী, সীতা ও সাবিত্রী এখনও ভারত রমণীর জীবনের আদর্শ। থাক এখন সে কথা। ইবসেনের বিবাহের আদর্শের প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের পর এই শ্রেণীর আর্টের উপাসক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

Art for art's sake এই নীতি পাশ্চত্য দেশ হইতে বঙ্গ সাহিত্যে আমদানী হইয়াছে। ফরাসী সাহিত্যে উহার জন্ম এবং ফরাসী সাহিত্যেই উহার অনেক দিন হইল সমাধি হইয়া গিয়াছে। বহু বৎসর পর সেই ঢেউ আসিয়া বাঙ্গলা দেশে পৌছিয়াছে। আমরা তাঁহাতে আত্ম হারা হইয়া গিয়াছি। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দার্শনিক কোমৎ (Comte) সমাজের হিত সাধনই কলার উদ্দেশ্য ( Art for utility's sake ) এই মত প্রচার করেন। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক টেইন (Taine) এই মতাবলম্বী ছিলেন তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিক দিগের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া এই নীতি সমর্থন করেন। ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ Art for art's sake এই মত কোন কোন লেখক প্রচার এবং তাহা অনুসরণ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'Gautier' 'Flaubert' প্রমুখ কতিপয় লেখক শেষোক্ত শ্রেণী ভুক্ত। ফরাসী সাহিত্যের প্রদীপ্ত রবি হিউগো ( Victor Hugo ১৮০২-১৮৮৫ ), প্রতিভার অবতার বেল্‌জেক্ (Balzac ১৭৯৯-১৮৫০) অথবা অসাধারণ মনীষী জোলা ( Emele Zola ১৮৪০-১৯০২) ইঁহারা কেহই নিরবচ্ছিন্ন কলা সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া পাঠকের চিত্ত বিনোদন করিতে প্রয়াসপান নাই। কলা সৃষ্টির সহিত লোক শিক্ষা দেওয়াই ছিল তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। জগৎ বরেণ্য দান্তে ও সেক্সপিয়ার, মিল্টন, গেটে ও টলষ্টয় ইঁহারা লোক শিক্ষার জন্যই উদ্দেশ্যমূলক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। স্কট ও লিটনের ঐতিহাসিক রোম্যান্স গুলিও উদ্দেশ্যমূলক। রিচার্ডসন উচ্চশ্রেণীর, ফিল্ডিং ও অষ্টিন্ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং স্মলেট্, জর্জ ইলিয়ট, ( George Elliot ) নিম্ন শ্রেণীর লোকের জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া পুণ্যের জয় ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে Art for art's sake এই নীতি অবলম্বন করিয়া কোন প্রতিভাবান্ লেখক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে ইংরাজী কথা-সাহিত্যে মেরিডিথ্ ( Meriedith ), ডিকেন্স ( Dickens ), কালিন্স (Callins) ও হার্ডি ( Hardi )—এই সকলই সমাজের কল্যাণকর উদ্দেশ্য মূলক উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গলার আর্টবাদীগণ,—তাহাদের আদর্শ জোলা ও ইবসেন কেবল মাত্র কলা কৌশল প্রদর্শনের জন্য উপন্যাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া নজির দেখান ; ইহা তাহাদের একটা মস্ত ভুল। বাস্তবিক জোলা ও ইবসেন উদ্দেশ্য হীন কলার উপাসক নহেন। তাঁহারা উভয়েই সমাজের কল্যাণের জন্য উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সকল বিষয়ে তাহাদের আদর্শ আমরা গ্রহণ করিতে পারি না বটে কিন্তু তাঁহাদের সংস্কারের প্রয়াস প্রশংসনীয় স্বীকার করিব। ফ্রান্সের লোক মদ খাইয়া উচ্ছন্ন যাইতেছে দেখিয়া জোলার হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। তিনি "L'Assomoir" উপন্যাসে মদ্যপায়ীদের এমন এক ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, যে উহা পাঠ করিলে ঘৃণায়, লজ্জায়, ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্তের এমন জীবন্ত চিত্র আর কোন গ্রন্থে আছে কি না আমি জানি না। Assomoir মদের মহাকাব্য (Epic of drink) বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ফরাসী মহিলারা কৃত্রিম উপায়ে সন্তান হইতে না দিয়া নিজেদের এবং সমাজের কি ভীষণ অনিষ্ট করিতেছেন তাহা জোলা তাঁহার Fecondite উপন্যাসে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন ফরাসী সৈনিক দিগের অধঃপতনের কথা তিনি La debacle গ্রন্থে কি পুঙ্খানুপুঙ্খানু রূপে বিবৃত করিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থান হইবে না। La debacle এর ভূমিকায় Zola স্পষ্ট বলিয়াছেন "My novels have always been written with a higher aim than merely to amuse."

যেমন জোলা তেমনি ইবসেন ও সমাজের দোষ গুলি প্রদর্শন করিয়া তাহার নাটকে নগ্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সমাজ দেহের তথা কথিত ব্যাধি গুলি দেখাইয়া দেওয়াই তাঁহার ছিল উদ্দেশ্য। ইবসেনের A dolls house, Ghost, The wild duck, The

enemy of the people প্রভৃতি নাটক লোক শিক্ষার জন্য লিখিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে জোলা ও ইবসেন প্রমুখ মনীষীগণ Realistic বা বাস্তবতামূলক উপন্যাস এবং নাটক রচনা করিয়াছেন। সমাজের সংস্কার করিয়া মানবের কল্যাণ সাধন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তবে তাঁহারা টলষ্টয়, হিউগো প্রভৃতির ন্যায় সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারের উপায় বলেন নাই।

আর্ট বা কলা, কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটী উপায় বা কৌশল মাত্র (Means to an end)। কিন্তু ইহা যথার্থ যে আর্ট বা কলা কৌশল ব্যতীত কোন উৎকৃষ্ট উপন্যাস হইতে পারে না। আর্ট ই কাব্য ও উপন্যাসের এক মাত্র আশ্রয়। আর্ট অবলম্বন করিয়াই কবি আপনার হৃদয়ের রস বা উচ্ছ্বাস অন্যের হৃদয়ে ঢালিয়া দেন। তাই টলষ্টয় বলিয়াছেন "Art is a means of union among men joining them in the same feeling." আর্টের কৌশলেই কবি আপনার ভাবে অন্যকে মাতোয়ারা করিয়া তোলেন। সত্য বা স্বাভাবিকতা এবং সৌন্দর্য্য আর্টের প্রাণ। যাহা স্বাভাবিক নয় এবং সুন্দর নয়, তাহা চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। যাহা আমরা সর্ব্বদা চারিদিকে দেখি, তাহাই পুনরায় যথাযথ গ্রন্থে বা চিত্রে দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ হয় না বরং বিরক্তি জন্মে। তাই কবি এবং চিত্রকর সমাজের অথবা স্বভাবের photograph মাত্র অঙ্কিত না করিয়া প্রয়োজনানুসারে সুন্দর পদার্থ গুলি বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া লন। এই বাছাই কার্য্যেই কবি এবং চিত্রকরের কলা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি ধর্ম্ম প্রচারকের ন্যায় উপদেশ দেন না, গুরু মহাশয়ের ন্যায় নীতি শিক্ষাও দেন না। নৈয়ায়িকের ন্যায় তর্ক করিয়াও কাহাকে কোন কথা বুঝাইতে প্রয়াস পান না। করিলে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইত। কবি তাঁহার প্রয়োজন অনুসারে আদর্শ নরনারীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করেন। The business of art lies in this—to make that understood and felt which in the form of an argument, might be incomprehensible and inaccessible" (What is art—Tolstoi)।

তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যের ও সেই উদ্দেশ্য।"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

# রামায়ণ-যুগের যন্ত্র-বিজ্ঞান।

ভারত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। তখন বিজ্ঞান বলিতে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উচ্চ জ্ঞান চিন্তাকেই বুঝাইত। "সাইন্স" বলিতে আধুনিক কালে যে জড় বিজ্ঞান শাস্ত্রকে নির্দ্দেশ করে, আর্য্য-ভারতে তাহা বোধ হয় তেমন উন্নত পর্য্যায়ে ছিল না। তবে জড় বিজ্ঞানের চিন্তায় যে প্রাচীন ভারতীয়েরা একেবারেই বিমুখ ছিলেন, তাহা বলা যায় না।

রামায়ণের নানাস্থানে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রশালার উল্লেখ আছে। যন্ত্রবিজ্ঞানে আর্য্যভারতের সভ্যতার কেন্দ্রভূমি অযোধ্যা অপেক্ষা অনার্য্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল লঙ্কাই অধিক উন্নত ছিল। মানবী জ্ঞান অপেক্ষা দানবী জ্ঞানে বৈচিত্রের পরিচয় অধিক প্রদত্ত হইয়াছে।

অযোধ্যা ও লঙ্কা—উভয় স্থানের বর্ণনায়ই দুর্গাদির ও যন্ত্রাদির উল্লেখ আছে। উভয় স্থানের দুর্গশীর্ষেই লৌহ নির্ম্মিত শত শত শতঘ্নী নামক যন্ত্র রক্ষিত হইত। কিন্তু ঐ যন্ত্র যে কি পদার্থ, তাহা এখন অনুমানে অবগত হইবার চেষ্টা ব্যতীত, মহর্ষির বর্ণনায় তাহার কোন কার্য্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। শতঘ্নী যে মারাত্মক যন্ত্র এবং তাহার আত্ম প্রকাশে যে শত সংখ্যক প্রাণের অনিষ্ট বা নাশ হইতে পারিত, তাহা এখন নামের অর্থ দ্বারা ব্যতীত বুঝিবার অন্য উপায় নাই। এরূপে অর্থ গ্রহণেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। (১)

রামায়ণের টীকাকার রামানুজ শতঘ্নীকে নালীক আগ্নেয়াস্ত্র বলিয়া লিখিয়াছেন, রামায়ণে আগ্নেয়াস্ত্র ও নালীক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং শতঘ্নীকে আধুনিক কামান তুল্য আগ্নেয় অস্ত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

(১) শতঘ্নীর উল্লেখ কালিদাস করিয়াছেন। কিন্তু জিনিসটার স্বরূপ-পরিচয় তিনিও প্রদান করেন নাই। কালিদাসের টীকাকার মল্লিনাথ টীকায় লিখিয়াছেন—শতঘ্নীতু চতুস্তালা লৌহ কণ্টক সঞ্চিত যষ্টি।" অর্থাৎ লৌহ কণ্টক কীলিত যষ্টি।

যে কালের যে বস্তু, সে কালের লোকে তাহার পরিচয় না লিখিয়া রাখিলে; বস্তু পরিচয়ে এরূপ মতভেদ অবশ্যম্ভাবী; সে জন্যই এখন বেদের অর্থ করিতে অনুমানের প্রশ্রয় দিতে হয় এবং শেষ ভোটের আশ্রয় লইয়া মীমাংসার পথে অগ্রসর হইতে হয়।

কুশধ্বজের স ংকাশ্যা রাজধানীতেও প্রাকারোপরি যন্ত্র ফলক সমূহের উল্লেখ আছে। ( রা ৭১ )

অযোধ্যার দুর্গ বিন্যাস প্রণালী অপেক্ষা লঙ্কার দুর্গ বিন্যাস ও যন্ত্র সংস্থাপন প্রণালী উন্নত পর্য্যায়ের ছিল। নিম্নে লঙ্কার দুর্গ ও দুর্গ রক্ষার্থে যন্ত্র সংস্থাপন ব্যবস্থার পরিচয় উদ্ধৃত করা গেল।...... "লঙ্কার প্রাচীরের চারিটী বিশাল ও উচ্চ দ্বারের সুদৃঢ় কপাট সতত লৌহ পরিঘ দ্বারা আবদ্ধ আছে। সেই দ্বার সকলের ভিতর হইতে বাণ ও শিলাদি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত দৃঢ় বৃহৎ ইষুপল যন্ত্র সমূহ স্থাপিত আছে। ঐ যন্ত্র সাহায্যে সমাগত ( আক্রমনকারী ) শত্রু সৈন্য বহির্দেশ হইতেই নিবারিত হয়। রাক্ষস বীরগণ তথায় শত শত লৌহ সারময়ী শলা ও শত শত শতঘ্নী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ... সেই মণিবিক্রম বৈদূর্য্য-মুক্তাখচিত স্বর্ণ প্রাচীরের চারিদিকে ভীষণ নক্র কুম্ভীর সমাকুল অগাধ জলপূর্ণ পরিখা। পরিখার উপর চারি দ্বারে চারিটি সুপ্রসস্ত সেতু পথ। সেতু গুলির নিকটে বহু প্রকার যন্ত্র এবং বৃহদাকার যন্ত্রগৃহ। শত্রুসৈন্য উপস্থিত হইলে সেই সেতু পথ সকল প্রাকারোপরিস্থাপিত যন্ত্রদ্বারা সুরক্ষিত থাকে। শত্রুসৈন্য সেতুতে উঠিলে যন্ত্রগুণে সকলকেই সেই নক্র কুম্ভীর পূর্ণ পরিখায় ডুবিয়া যাইতে হয়। ( লঙ্কা ৩ )

এই যন্ত্র খুব উন্নত পর্য্যায়ের না হইতে পারে; কিন্তু ইহাও একপ্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণারই ফল। আর্কিমিডাস রোমান সৈন্য নাশের জন্য যে পদ্ধতি আবিস্কার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান উন্নত যুগের বৈজ্ঞানিক গবেষণার তুলনায় তাহা যেমন অকিঞ্চিৎকর, ইহাও তেমনি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই সকল ক্ষুদ্র চেষ্টা ও চিন্তাই বর্ত্তমান বিরাট উন্নতির জন্ম দান করিয়াছে।

লঙ্কার রাবণের শয্যা গৃহে যন্ত্র চালিত পাখা ছিল। হনুমান নিশাযোগে সেই কক্ষে যাইয়া কৃত্রিম বালহস্তে বীজ্যমান পাখা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া দেখিয়াছিলেন।

"বাল ব্যজন হস্তাভির্বীজ্যমানং সমন্ততঃ।" ।৫।৫।১০

হনুমান আর দেখিয়াছিলেন—স্থানে স্থানে "জলন্তঃ কাঞ্চনা দীপাঃ।" অবশ্য সে আলো তৈল-প্রদীপের কি অন্য প্রকারের—তাহা এখন বলা যাইতে পারে না। সভ্যতার প্রভাব দেখিয়া প্রাচীনে শ্রদ্ধাবান পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারেন মাত্র।

লঙ্কায় দানব শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা রচিত শূন্য গামী "পুষ্পক" নামক একটী যান বা বিমান ছিল। ইহা বর্ত্তমান যুগেরও একটী আলোচ্য পদার্থ। বহু পাশ্চাত্য মণীষা সম্পন্ন লেখক ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং এ সম্বন্ধীয় আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিয়া কেবল রামায়ণে বর্ণিত ইহার সামান্য পরিচয় মাত্র প্রদান করা গেল। পুষ্পক ছিল হংস-চালিত মহাবেগ শালী বিমান। ( ১ ) উহা আরোহীর ইচ্ছানুসারে,ইচ্ছানুরূপ স্থানে অপ্রতিহত গমনে বিচরণ করিত।

কোন্ শক্তির তাড়নায় পুষ্পক শূন্যমার্গে গমন করিত, তাহা কবি লিপিবদ্ধ না করিয়া গেলেও যন্ত্র শক্তির প্রভাব ইহাতে যে ছিল, তাহা অনুমান করিবার পথে বোধ হয় কোন প্রতিকূল কারণ নাই। কলের পাখার অস্তিত্ব বিশ্বাস করিলে, ইহাকে বিশ্বাস করিবার পথ সহজ হইবে।

রাম, সীতা উদ্ধার করিয়া এই পুষ্পক রথে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। রাম শূন্য-পথ-গামী-পুষ্পক হইতে সীতাকে লঙ্কার অবস্থা, সাগরের অবস্থা, ও অপরাপর পরিচিত স্থানগুলি দেখাইতেছেন।

কৈলাশ শিখরাকারে ত্রিকুট শিখরে স্থিতম্।
লঙ্কামীক্ষস্ব বৈদেহি নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা॥

× × ×

এব সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে।
তবহেতো বিশালাক্ষি নলসেতু সুদুষ্করঃ।
পশ্য সাগরমক্ষোভ্যং বৈদেহি বরুণালয়॥ ১৭।৬।১২৫

মহাকবি কালিদাসও এই পুষ্পকেরই অবতারণা করিয়া মহাকবি বাল্মীকির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :—

বৈদেহি পশ্যমলয় বিভক্তাংমৎসেতুনাং ফেনিলম্বুরাশী...

আকাশের উর্দ্ধদেশে উঠিয়া সেই স্থান হইতে নিম্নস্থিত জনপ্রাণী, ঘর বাড়ীর আকৃতি কি রূপ দেখা যায়, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৬২ সর্গে তাহার বর্ণনা আছে। এগুলি পরীক্ষিত সত্য বলিয়াই মনে হয়।

সাগরে সেতুবন্ধনে কোন উচ্চ বৈজ্ঞানিক রীতি আচরিত হইয়াছিল কি না, মহর্ষির রচনায় তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু

( ১ ) লঙ্কাকাণ্ড ১২৩শ সর্গ ১ শ্লোক।

সাগর বন্ধনে যে যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রামায়ণে আছে। যথা

হস্তি মাত্রান্ মহ কায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ।
পর্ব্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ। ৬।৮।২২

হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড এবং পর্ব্বত সকল উৎপাটিত হইয়া যন্ত্র সাহায্যে (সমুদ্রে) নীত হইতে লাগিল।

এই যন্ত্রের স্বরূপ আমরা রামায়ণ হইতে অবগত হইতে পরিতেছি না, তাহার কারণ, রামায়ণের কবি বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তথাপি তিনি তাঁহার সময়ের অভিজ্ঞতা অনুসারে যতদূর সম্ভব শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। সেতু যে কেবল জলে পাথর ভাসাইয়া হয় নাই, পরন্তু তাহাতে মাপ-পরিমাপেরও প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা তিনি দেখাইতে ক্রটী করেন নাই। তাহার সংক্ষেপ বর্ণনাটী এইরূপ :—প্রস্তর খণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে সমুদ্রের জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশের দিকে উত্থিত হইতে লাগিল এবং পুনরায় অধঃপতিত হইতে লাগিল। বহু সংখ্যক বানর সূত্র ধরিয়া সেই সেতুর সম-বিষমাদি পরীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে বানর শিল্পী নল ঘোরকর্ম্মা কর্ম্মীদিগের সাহায্যে সেতুবন্ধন করিতে লাগিল। (লঙ্কা ২২ সর্গ।)

একস্থানে পাংশু যন্ত্রের সাহায্যে সেতু ও কূপ খননের উল্লেখ আছে। (৯.২।৮০)

বাস্তবিক পক্ষেই রামায়ণের ঋষির যদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় এরূপ একটা বিরাট ব্যাপারের উপলক্ষে প্রাচীন ভারতের যন্ত্র-বিজ্ঞান বিষয়ের অনেক কিছুর আভাস পাইতে পারিতাম। প্রধানতঃ এই কারণেই রামায়ণ হইতে আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও অন্যান্য শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত অধিক তত্ত্ব অবগত হইতে পারি, যুদ্ধ বিজ্ঞান ও যন্ত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা আমরা প্রাপ্ত হইতে পারিতেছি না।

রামায়ণে অর্ণব যানের উল্লেখ আছে। অর্ণব যানের উল্লেখ ঋক্ বেদেও আছে। কিন্তু তাহা যন্ত্রে চলিত হইত, কি বায়ু বেগে চলিত হইত, অথবা নাবিক গণের চেষ্টায় চালিত হইত, সে সম্বন্ধে কোন আভাসই রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। ইহাকে রামায়ণে রাক্ষসী মায়া বলিয়া কথিত হইয়াছে। জানামি তস্য রৌদ্রস্য মায়াং সত্য পরাক্রম॥ (১৭।৬।৮৫)
এই মায়ার ভিতর জড় বিজ্ঞানের কোন প্রভাব আছে কি না—পাঠক বিচার করিবেন। ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ লব্ধ অধ্যাত্ম বল ছিল, তহা বিভিষণের মুখেও নিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্ম বল যে ভারতের সনাতন বল, তাহা বলাই বাহুল্য।

---

# এডিশনের সাক্ষ্য।

## তড়িৎ সাহায্যে আসামীর প্রাণদণ্ড।

আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম রজ্জুর পরিবর্ত্তে তড়িৎ সাহায্যে যখন আসামীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয়, তখন আমেরিকায় এই দণ্ড প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আপত্তি উঠিয়াছিল।

কেমলার নামক একটী অপরাধীর দণ্ডের বিরুদ্ধে তাহার পক্ষের ব্যবহার জীবিগণ আমেরিকার প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিলেন, "তড়িৎ সাহায্যে প্রাণদণ্ডের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল; উহাতে কেবল অসহ্য শারীরিক যন্ত্রনাই উৎপন্ন হইবে,—"

কেহ কেহ বলিলেন যে, "মানব দেহে প্রস্তাবিত তড়িৎ প্রভাব অনিশ্চিত; ইহাতে প্রাণনাশ নাও হইতে পারে; বরং ইহাতে যে অসহ্য যন্ত্রনা উৎপাদিত হইবে, ইহা নিশ্চিত।" অপর কেহ কেহ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করিলেন। এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় মানবের প্রাণ নাশ করার পক্ষে তাড়িতশক্তি কতদূর কার্য্যকরী উহা স্থির করার জন্য এক মীমাংসা কমিটী গঠিত হইয়াছিল। এবং তড়িৎ বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ গণের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। এই সাক্ষীগণের মধ্যে জগদ্বিখ্যাত টমাস এডিশনের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। নিম্নে আমরা এ বিষয়ে তাঁহার অভিমতের সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিলাম :—

কমিটীর প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করিলেন, "আপনার ব্যবসায় কি ?"

এডিশন উত্তর করিলেন, "আবিষ্কার।"

"তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনি গবেষণা করিতেছেন ?"

"হাঁ।"

"এ কার্য্যে আপনি কয় বৎসর যাবৎ নিযুক্ত আছেন ?"

"২৬ বৎসর যাবৎ।"

তাড়িত বিজ্ঞানের কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন কি ?

"তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি।"

"উহা কিরূপ ?"

"উহা দ্বারা অবিচ্ছিন্ন এবং পর্য্যায় ক্রমানুগত দুই প্রকার প্রবাহই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ "নলের ভিতর দিয়া জলের মত অনবরত যে প্রবাহ বহিয়া যায়, তাহাকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ এবং ঐ ভাবেই কতক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিপরীত দিকে যে প্রবাহ বহে, তাহাকে আমরা পর্য্যায় ক্রমানুগত প্রবাহ বলিতেছি।"

তৎপর প্রেসিডেণ্টের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন যে—মানব তড়িৎ প্রবাহে কতটুকু প্রতিক্রিয়া সাধন করিতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য যখন তাঁহার রাসায়নিক কারখানায় পরিমাপ করা হয়, তখন তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ২৫০ জন লোকের পরিমাপ করা হইয়াছিল; তাহাদের গড় প্রতিঘাত ১০০০ ohms.

তদনন্তর ঐ পরীক্ষা প্রয়োগ করিবার উপায়টী বর্ণন করিবার জন্য মিঃ পোষ্ট ( অনৈক সদস্য ) তাহাকে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, " আমরা ১০ইঃ উচ্চ ও ৭ইঃ ব্যাস পরিমিত দুইটী ব্যাটারী নিয়া উহার ভিতর এক একটী তাম্রপাত্র রাখি। তৎপর ঐ ব্যাটারী দুইটীতে জল ও শতকরা ৫ অংশ 'কষ্টিক পটাশ' রাখিয়া এক একজন করিয়া তাহাদের হাত উহার ভিতর এইরূপ ভাবে নিমজ্জিত করিতে বলা হয় যেন প্রত্যেক অঙ্গুলির অগ্রভাগ পাত্রের তলদেশ স্পর্শ করিয়া থাকে। ৩০ সেকেণ্ড এরূপ ভাবে রাখিলে পর পরীক্ষা নেওয়া হয়। ইহাতে দেখা গেল কেহই ৮ Volts এর অধিক যাইতে পারে নাই।"

বৈদ্যুতিক তার সংযোগে সময় সময় যে ভয়ানক ঘটনা হয় উহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়।

ইহার উত্তরে তিনি বলেন, "মাংস ও তারের সহিত শক্তি প্রতিঘাতের বিভিন্নতা ও খারাপ সংস্পর্শেই এইরূপ হইয়া থাকে।"

"আপনার বিবেচনায় কি একটী কৃত্রিম তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া এইরূপ ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে যে প্রত্যেক অবস্থাতেই উহা মানবের মৃত্যু ঘটাইবে ?"

"হাঁ। অপরাধীর হস্তদ্বয় জল ও কষ্টিক পটাশ মিশ্রিত এক পাত্রে রাখিয়া পর্য্যায় ক্রমানুগত প্রবাহের ১০০০ Volts সংযোগ করিলে, কোনও যন্ত্রনা ভোগ না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।"

অপরাধীর এটর্ণী মিঃ ককরান্ বলিলেন, "এই ব্যক্তির শক্তি প্রতিঘাতের পরিমাণ করার জন্য আপনি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কি আপনি মানবের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ? এবং তাহা হইলে এই প্রতিঘাত বিষয়ে মানব কিরূপে বিভিন্ন হইতে পারে, তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছেন ?"

মিঃ এডিশন্ বলিলেন, "দুইদিন পূর্ব্বে আমি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম।"

"তাহা হইলে আপনি মানবভেদে প্রতিঘাতের পরিমাণ ভেদ কিছু দেখিয়াছেন কি ? "

"হাঁ। তবে একই প্রবাহে যে প্রতিমানুষের প্রাণনাশ হইবে না, উহাতে এমন কিছু বুঝা যায় নাই।"

"৫।৬ মিনিট যাবৎ যদি কেবল প্রবাহ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে এই ব্যক্তির কি অবস্থা হইবে ? সে কি উহার প্রভাবে অঙ্গারে পরিণত হইবে না ? "

"না। সে বিশুষ্ক হইয়া যাইবে। ৫।৬ মিনিটের মধ্যেই তাহার শরীরের জলীয় অংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে।"

"১০০০ Volts যে পরিমাণ প্রবাহ উৎপন্ন করিতে পারে উহার $\frac{1}{১৬}$ অংশ দ্বারাই একটী লোকের প্রাণনাশ করা যাইতে পারে।"

"ইহা কি আপনার বিশ্বাস ? না ইহা আপনার পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন ? "

"ইহা আমার বিশ্বাসই বটে ; কারণ এই ভাবে আমি কাহারও প্রাণ নাশ করি নাই।" (Scientific American)

শ্রীশিশিরকুমার সোম।

# যবদ্বীপের মহাভারতীয় কথা।

অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় হিন্দুদিগের এক শাখা সাগর অতিক্রম করিয়া যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা পুণ্যভূমি ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার ন্যায় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা কিরূপ মহাভারত নিয়াছিলেন, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে যবদ্বীপে যে মহাভারত পাওয়া যায়, তাহার সহিত ব্যাসদেবের মহাভারতের অনেক পার্থক্য আছে। কাশীদাস যদি দিল্লীবাসী পঞ্চপাণ্ডবের চরিত্রে এতটা বাঙ্গালীত্বের আরোপ করিতে পারেন, তবে যবদ্বীপের কবিভাষার কবি তথাকার মহাভারতীয় চরিত্র অঙ্কনে যবদ্বীপের তুলি ব্যবহার করিতে পারিবেন না কেন? কবিগণ এইরূপ নিরঙ্কুশ বলিয়াই আসল ও নকল মহাভারতের পার্থক্য বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়াছে।

যবদ্বীপের মহাভারতের নাম ব্রত যুদ্ধ বা ব্রাত যুদ্ধ। বোধ হয়, ভ্রাতৃ যুদ্ধের অথবা ভারত যুদ্ধের নাম হইতেই তথাকার কবিরা ইহার ব্রত যুদ্ধ বা ব্রাত যুদ্ধ নামকরণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মহাভারত নামটি যবদ্বীপ বাসীর নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমাদের মহাভারতের ন্যায় ব্রাতযুদ্ধেও অষ্টাদশ পর্ব্ব আছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ নায়ক নায়িকা ও স্থান বিশেষের নাম ব্রাতযুদ্ধে ভিন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাসদেবের মহাভারতে সব্যসাচী, ধনঞ্জয় প্রভৃতি অর্জ্জুনের দ্বাদশটি নাম আছে; কিন্তু ব্রাতযুদ্ধে জনক, বর্দ্দিনিংসি ও অর্জ্জুন এই তিনটি নামই বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। মূল মহাভারতের সহিত ব্রাতযুদ্ধের কোথায় কতটুকু সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য ব্রাতযুদ্ধে উল্লিখিত নাম গুলির পাশে ব্রেকেটের ভিতর আমাদের মহাভারতীয় নামগুলি দেওয়াগেল। এই সামঞ্জস্য বিধানের ও সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার পাঠকগণের উপর অর্পণ করিয়া আমরা মূল বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

পুরাকালে গজাহ্বয় (হস্তিনাপুর) নগরে দশবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সৌন্তান (শান্তনু) রাজা হইলেন। দেবব্রত নামে সৌন্তানের এক পুত্র জন্মিল। পুত্র প্রসব করিয়াই দেবব্রত-জননী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। স্নেহবৎসল পিতা শিশু পুত্রের স্তন্য পানের জন্য প্রসূতীর অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

এদিকে পলাসরের (পরাশরের) পত্নী অম্বুসারী অবিআসকে (ব্যাসকে) প্রসব করেন। ব্যাস-জননী অম্বুসারী পুত্রকে কোলে করিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় শান্তনু-প্রেরিত লোক প্রসূতীর অনুসন্ধানে সেখানে উপস্থিত হইল। তখন ত্রিতুষ্টির বংশধর হৃতরাজ্য এবং সৌন্তান সেখান কার রাজা। ব্যাসকে মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট দেখিয়া মাতৃহীন শিশু দেবব্রত কাঁদিয়া উঠিল ও স্তন্য পানের জন্য ব্যাকুল হইল। কিন্তু অম্বুসারী স্তন্যদানে স্বীকৃত হইলেন না। অপত্য স্নেহের অনুরোধে রাজা সৌন্তান স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়া অম্বুসারীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, তথাপি অম্বুসারী স্তন্যদানে সম্মত হইলেন না। সৌন্তানের আগ্রহ দেখিয়া স্বদেশ প্রেমিকা অম্বুসারী পতিবংশের হৃতরাজ্যের প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ সৌন্তান, আপনি আমাদের রাজ্য আমাদিগকে ফিরাইয়া দিন, আমরা ইহা ভোগ দখল করি। যদি আপনি ইহাতে রাজী হন, তবে আমি এখনই দেবব্রতকে আপন পুত্রের ন্যায় স্তন্যদান করিব।" সৌন্তান অনন্যোপায় হইয়া অম্বুসারীর কথায় সায় দিলেন। অম্বুসারীর বুদ্ধি বলে তাহার পতি হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। ব্যাস বয়ো প্রাপ্ত হইলে, পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া কুণ্ডিল নায়ক স্থানে র‍্যাজ্য স্থাপন করেন। তারপর ব্যাস এক বয়োধিকা রমণীর পাণি গ্রহণ করিলেন। তাহার গর্ভে তিনটি পুত্র জন্মে। প্রথম পুত্র—ধৃতরাষ্ট্র—জন্মান্ধ; দ্বিতীয় পুত্র—পাণ্ডুদেব নাথ—পরম সুন্দর পুরুষ; তৃতীয় পুত্র—রাম বিদুর—খঞ্জ। বারবৎসর রাজ্য ভোগের পর দ্বিতীয় পুত্র পাণ্ডুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ব্যাসদেব বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। পাণ্ডুদেব চৌদ্দ বৎসর বয়সে রাজা হইলেন। তিনি মদুরার (মথুরার) রাজা বসুকেতুর কন্যা কুন্তী দেবীকে বিবাহ করেন। কুন্তীর তিন পুত্র——কুন্তদেব, সেন ও জনক। পাণ্ডু দেবের দ্বিতীয়া মহিষী—মাদ্রী। তাহার পিত্রালয় ছিল মদ্রদেশে। মাদ্রী যখন গর্ভবতী তখন পাণ্ডুর মৃত্যু হইল। নকুল সহদেব নামক দুইটি যমজ পুত্র প্রসব

করিয়াই মাদ্রীপতির অনুসরণ করিলেন। পাণ্ডব পুত্রগণ তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক; সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের অভিভাবক হইলেন। তাহারা বড় হইয়া পিতার রাজ্য দাবী করিল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র আপন পুত্র সুযোধনকেই রাজ্য দিলেন। পাণ্ডবগণ পিতার রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অমরারতীতে ( ইন্দ্রপ্রস্থে ) নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন।

মদ্রদেশের এক রাজকন্যা সুযোধনের মহিষী। তাহার একপুত্র। সুযোধনের প্রতাপ দিন দিন বেশ বাড়িতে লাগিল। সুতরাং কর্ণ, দেবব্রত, জয়পথ, (জয়দ্রথ) জয়কর সেন ও শল্যরাজ প্রমুখ তখনকার শক্তিশালী রাজন্য বর্গ সুযোধনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

এদিকে কুন্তদেব ( যুধিষ্ঠির ) অমরারতীতে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে সুযোধনের নিকট অর্দ্ধ রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে দ্বারাবতীর রাজা কৃষ্ণ স্বয়ং দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সুযোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দিতে চাহিলেন না। কাজেই ব্রতযুদ্ধ ( ভ্রাতৃযুদ্ধ ) বা ধর্ম্মযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। যুদ্ধে কত লোক মরিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুযোধন নিজেও নিহত হইলেন। পাণ্ডবেরা জয়লাভ করিল।

কুন্তদেব হস্তিনার সম্রাট হইলেন। তৎপর অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ ও তৎপুত্র জয়ধর্ম্ম রাজা হন। ইহাই যবদ্বীপের মহাভারতের স্থূলমর্ম্ম।

ব্রাতযুদ্ধের বর্ণিত পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুন চরিত্র বড়ই বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যময়। ভারতের পার্থ—স্থির-ধীর, গাণ্ডীব ধারী মহাবীর; তিনি শান্ত, সৌম্য, প্রিয়—দর্শন। তাঁহার চরিত্রে যাদু মন্ত্র বা মায়া-মোহের কোন প্রভাব নাই। কিন্তু যবদ্বীপের অর্জ্জুন কবিকল্পনার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাঁহার মায়া মোহ আছে; অলৌকিক মোহিনী শক্তি আছে; তাঁহার কথায় ও কাজে যেন যাদু মন্ত্রের এক অপূর্ব্ব প্রভাব। এই অর্জ্জুন চরিত্রের কথা আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

অর্জ্জুন সারাটিদিন লোকলোচনের অগোচরে থাকেন; সন্ধ্যার অন্ধকারে কি এক অপূর্ব্ব সাজ সাজিয়া লোক সমাজে অবতীর্ণ হন। তাঁহার মোহিনী শক্তির প্রভাবে মানুষ সুখদুঃখের অতীত স্থানে পৌঁছিতে পারে; মানুষের প্রাণে অনন্ত সুখের ফোয়ারা ফুটিয়া উঠে। তাঁহার হৃদয়ে শোক দুঃখের স্থান নাই; সদাই যেন ভূমানন্দ বিরাজমান এই টুকু হইল অর্জ্জুন চরিত্রের অলৌকিকত্ব।

লৌকিক শৌর্য্য বীর্য্য হিসাবেও অর্জ্জুন চরিত্রের বিশেষত্ব আছে। ধনুর্ব্বিদ্যায় কেহই তাহার সমকক্ষ নহে। বরং বীরত্ব গৌরবে তিনি ব্রাতযুদ্ধের ভীমের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাহার বীরপনায় দেবগণ মুগ্ধ। বাতরগুরু পশুপতি ( পাশুপতাস্ত্র ) ও বাতরব্রহ্ম ব্রহ্মাস্ত্র অর্জ্জুনকে পুরস্কার দিলেন। আমাদের মহাভারতেও মহাদেবের নিকট হইতে অর্জ্জুনের পাশুপতাস্ত্র লাভের বিবরণ আছে। তবে কি যবদ্বীপের বাতরগুরু ও আমাদের মহাদেব এক? খুব সম্ভব ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে।

ব্রাতযুদ্ধ ও ভারতীয় মহাভারত—এই উভয়গ্রন্থে ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে অর্জ্জুনের তপস্যার বিবরণ পাওয়া যায়। আমাদের অর্জ্জুন মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের অর্জ্জুন ও বোধহয় সমর বিজয়িনী শক্তিলাভের জন্য শক্তিপতি শিবের আরাধনায় ব্রতী ছিলেন। যদি আমাদের এই অনুমান সত্যহয় তবে বাতরগুরু ও মহাদেব এক হইতে পারেন।

দ্বপরযুগে ইরাং বায়ুর নিবাত কবচনামে এক দুরন্ত পুত্রছিল। একদিন ইরাং বায়ু নিবাত কবচকে স্বর্গ হইতে তুরঙ্গ জাতিনামক পুষ্প আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। নিবাত কবচ স্বর্গে যাইয়া অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী বিদাদরী ( বিদ্যাধরী ) সুপ্রভাকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। দুরন্ত দৈত্য সুপ্রভাকে আপন করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সুপ্রভা কিছুতেই সম্মত হইলনা। কাজেই নিবাত কবচ তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে উদ্যত হইল। বিপন্ন সুপ্রভা পিতার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিল। পিতা বর গর্ব্বিত দানবের পৈশাচিক অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ঋষি নারদকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনি দয়া করিয়া ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে তপস্যা নিরত বাদ্দিনিংসির ( অর্জ্জুনের ) সাহায্য প্রার্থনা করুণ; কারণ আমার বড় আদরের কন্যা সুপ্রভা আজ বিপন্ন।" নারদ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, অর্জ্জুন জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ; তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি

অসাধারণ। বিশেষতঃ অর্জ্জুন ব্রাতযুদ্ধে (কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে) জয়লাভের নিমিত্ত তপস্যায় নিরত ছিলেন। অর্জ্জুনের তপোভঙ্গ তখন নারদের পক্ষে সহজ সাধ্য ছিলনা। কাজেই নারদ সুপ্রভার পিতার আদেসানুসারে সুপ্রভা, বিলোত্তমা (তিলোত্তমা) মন্তনা, সুমরতক আঙ্গীপুণী, সুপ্রভাসিণী ও দর্শনমালা, নামক সাতজন বিদ্যাধরকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। বিদ্যাধরিগণ নানা ছলে অর্জ্জুনের তপোভঙ্গ করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু কোন ফলোদয় হইলনা। অর্জ্জুন পূর্ব্ববৎ অটল অচল। পরিশেষে বাতর স্বর্গ হইতে ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে যাইয়া নিবাত কবচ বধের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে অনুরোধকরেন। নিবাত কবচ এই সংবাদ অবগত হইয়া অর্জ্জুনকে নিহত করিবার জন্য সেনাপতি মুক্ষকে ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে পাঠাইলেন। এদিকে নিবাত কবচের ইষ্ট দেবতা বাতরগুরু ব্যাধবেশ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু অল্পকাল পরেই অন্তর্হিত হইলেন। বাতরগুরুর বরে নিবাত কবচের দেহে বানবিদ্ধ হইতনা। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে জানিবার জন্য অর্জ্জুন সুপ্রভাকে তাহার নিকট পাঠাইলেন। সুপ্রভা কৌশলে জনিতে পারিল নিবাচ কবচের মাত্র কণ্ঠনালীতেই বানবিদ্ধ হইতে পারে, অন্যকোন স্থানে তার বানবিদ্ধ হয়না। নিবাত কবচের মৃত্যু সন্ধান অবগত হইয়া অর্জ্জুন ঘটোৎকচের সহায়তায় তাহাকে আক্রমন করিলেন। অল্পকাল পরেই অর্জ্জুন মৃত্যুর ভানকরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়াগেলেন। নিবাত কবচ আনন্দে মুখব্যাদন করিয়া হাসিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন সুযোগ বুঝিয়া নিবাত কবচের কণ্ঠনালীতে বান নিক্ষেপ করিলেন। নিবাত কবচ নিহত হইল।

আমাদের মহাভারতে তাহার বধবৃত্তান্ত অন্যরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যাধরূপী বাতরগুরু ও কিরাতরূপী মহাদেবের মধ্যে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়।

বীরত্ব গৌরবে অর্জ্জুন সর্ব্বত্রই গৌরবান্বিত। ব্রাতযুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের শিষ্যদিগের মধ্যে অর্জ্জুনের স্থান অনেক উপরে। ভারতের চেয়েও সেখানকার গুরুশিষ্য সম্বন্ধটা যেন একটু বেশী জাকাল। দ্রোণাচার্য্য কৌরবদিগের পক্ষে; তথাপি প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুন তাঁহার স্নেহ ও অনুগ্রহে বঞ্চিত নহে। তিনি অর্জ্জুনকে সেনকালী নামক আগ্নেয়াস্ত্র উপহার দিলেন। দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে অকালে প্রাণ ত্যাগ করিলে অশ্রুজলে গুরুভক্ত অর্জ্জুনের বক্ষ সিক্ত হইল। ব্রাতযুদ্ধে অর্জ্জুনের এই বিলাপ কাহিনী পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় তন্ত্রী করুণ তানে বাজিয়া উঠিবে।

অর্জ্জুন কেবল গুরুভক্ত আদর্শ বীর নহেন; তিনি স্নেহ বৎসল বন্ধু, করুণাশীল মানব, ক্ষমাশীল তপস্বী; স্বভাব সৌন্দর্য্যের প্রিয় উপাসক। এইজন্য আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে প্রকৃতি দেবীর রম্য লীলা নিকেতনে ধ্যানমগ্ন দেখিতে পাই।

অর্জ্জুনের সময়, কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ ও তপস্যায় কাটিয়া যাইত, এমন নহে। তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার ছিল। তিনি সন্তান বৎসল পিতা, প্রীতিশীল পতি। অভিমন্যু তাহার আদরের নন্দদুলাল; পত্নী সুভদ্রা প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। কিন্তু দ্রৌপদী নামে তাঁহার কোন পত্নী ছিল না। ব্রাতযুদ্ধে একমাত্র যুধিষ্ঠিরই দ্রৌপদীর স্বামী। আমাদের মহাভারতে কিন্তু দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী।

যখন মহাভারতের আদি রচনা যবদ্বীপে নীত হইয়াছিল, তখন বোধ হয়, ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা ও সামাজিক রীতি নীতি অক্ষুন্ন ছিল। তখনও হয়ত, অনার্য্য সমাজের বহুভর্ত্তৃকতা আর্য্য সমাজে প্রবেশ করে নাই।

ভারতের খাঁটি আর্য্য সভ্যতা ও ক্ষাত্র শৌর্য্য বীর্য্য খুব সম্ভব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইলে পরীক্ষিৎকে হত্যা করিয়া অনার্য্য নাগবংশ আর্য্যভূমি অধিকার করেন। জন্মেজয় নাগদিগকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ ইহার প্রমাণ। এই অনার্য্য জাতির অধিকার কালেই বোধ হয় ভারতের অনার্য্য সমাজে বহুভর্ত্তৃকতা ছিল এবং মহাভারতের কবি তাহাই তাহার রচনায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রাতযুদ্ধে আমরা দেখিতে পাই পঞ্চকুমার একজনের নাম এবং তিনি যুধিষ্ঠিরের পুত্র। আমাদের দ্রৌপদীর ন্যায় তাহার পঞ্চ কুমার বা পাঁচ পুত্র নাই।

আমরা দ্রুপদ পুত্র শিখণ্ডীকে নপুংসক বলিয়াই জানি, কিন্তু ব্রাতযুদ্ধে শিখণ্ডী দ্রুপদের কন্যা ও অর্জ্জুনের স্ত্রী। শিখণ্ডীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ বড়ই কৌতুকাবহ।

সুভদ্রা বিবাহের সময় ষোড়শী যুবতী। তাহার বুকভরা

যৌবন ও অপরূপ রূপ সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া উঠিতেছিল। অর্জ্জুন তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইলেন। ভগবান কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকেই সুভদ্রার যোগ্য বর বিবেচনা করিলেন। কিন্তু উগ্র স্বভাব বলরাম তাহাতে সায় দিলেন না। কাজেই সুভদ্রার স্বয়ম্বরের বন্দোবস্ত হইল। স্বয়ম্বরে তিনি অর্জ্জুকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। আমাদের মহাভারতে সুভদ্রার স্বয়ম্বরের উল্লেখ নাই।

সুভদ্রার স্বয়ম্বর সভায় চেম্বল রাজকুমারী দ্রৌপদীর কনিষ্ঠা ভগিনী শিখণ্ডী উপস্থিত ছিলেন। তখন অর্জ্জুনের রূপ শিখণ্ডীকে পাগল করিয়াছিল। শিখণ্ডী অভিভবাকের নিকট বলিলেন, "অর্জ্জুন বৈ অন্যকেহ আমার স্বামী হইতে পারিবেনা; কারণ আমি মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি।"

শিখণ্ডী অবলা নারী নহেন; তিনি মাইকেলের প্রমীলার ন্যায় বীর রমণী, তাহার মনোবল ও চরিত্র বল যথেষ্ট আছে। তিনি সরলভাবে অভিভবাবকের নিকট প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

তারপর এক দিন শিখণ্ডী সাহসে বুক বাধিয়া অর্জ্জুন ভবনে যাত্রা করিলেন। সুভদ্রা তখন সূতিকা গৃহে। কয়েক দিন হইল অভিমন্যুর জন্ম হইয়াছে। বুদ্ধিমতী শিখণ্ডী ইহাকে শুভ সুযোগ মনে করিয়া ধনুর্ব্বিদ্যাশিক্ষার্থীচ্ছলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শিক্ষা বেশ চলিল। প্রণয়ী যুগলের প্রেমের মাত্রা ঘনীভূত হইতে লাগিল। সুভদ্রা সূতিকা গৃহে থাকিয়াই শিখণ্ডীর প্রণয় কাহিনী শুনিলেন। কিন্তু তাহার মনে নারী স্বভাব সুলভ সপত্নী হিংসার উদয় হইল না। তিনি তখন শিশু পুত্র অভিমন্যুর কচিমুখে সুধা মাখা হাসি দেখিয়াই আনন্দে বিভোর থাকিতেন। পতি প্রেমের অভাব বড় একটা অনুভব করিতেন না।

ক্রমে এই সংবাদ দ্রৌপদীর কর্ণগোচর হইল। তিনি অর্জ্জুন ভবনে যাইয়া ভগিনীকে অনেক উপদেশ দিলেন; কিন্তু ফলোদয় হইল না। দুই ভগিনীর মধ্যে অনেক বাকবিতণ্ডা হইল। শেষে ঝগড়া বাঁধিবার উপক্রম হইলে শিখণ্ডী পিত্রালয়ে পলায়ন করিল।

এদিকে অর্জ্জুন শিখণ্ডীর বিরহে ম্রিয়মান। তাহার পুরাতন ভৃত্য সেমর শিখণ্ডীর অনুসন্ধানে চলিল। অন্ধকার রজনীতে সুভদ্রার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সেমর সুভদ্রাকেই শিখণ্ডী মনে করিয়া বলিল, "অর্জ্জুন আপনাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন। তিনি আপনার সুখের জন্য প্রিয়তমা পত্নী সুভদ্রাকেও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন।" এই নিদারুণ সংবাদে সুভদ্রা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন কিন্তু সেমরকে মনের ভাব জানিতে দেওয়া হইল না। সুভদ্রা সেমরকে বলিয়াদিলেন, "সেমর, অর্জ্জুনকে বলিও, অভাগিনী শিখণ্ডী দিবানিশি তাকে ভালবাসে; শিখণ্ডীর অন্তরে, বাহিরে, জীবনে, মরণে শয়নে, স্বপনে, অর্জ্জুন বৈ তার আপনার বলিতে এ জগতে আর কেউ নাই। ইত্যাদি।" এই উচ্ছ্বাস ময় প্রেমোক্তি শিখণ্ডীর মনে করিয়াই সেমর সংবাদ লইয়া তাড়াতাড়ি প্রভুর নিকট দৌড়াইল। প্রেমে আত্মহারা অর্জ্জুন এগুলিকে শিখণ্ডীর প্রানের কথা মনে করিয়া উন্মাদের ন্যায় সেখানে ছুটিয়া গেলেন। তখন সুভদ্রার দাসী লরাসতী দ্বার খুলবা মাত্রই অন্ধকারে অর্জ্জুন আবেগ ভরে লরাসতীকেই শিখণ্ডী মনে করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু পরে অর্জ্জুন তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। তথাপি শিখণ্ডীকে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি আকুল প্রাণে শিখণ্ডীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাহার প্রাণপ্রিয়া শিখণ্ডী বিপন্না বৃতগণ তাহাকে বধ করিতে উদ্যত। বীরবর অর্জ্জুন তাহাকে বৃতগণের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু শিখণ্ডী তাহার সঙ্গে মাতৃকরায় ফিরিয়া যাইতে রাজী হইলেন না। শিখণ্ডী পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন।

শোকে দুঃখে অপমানে অর্জ্জুন যেন মরমে মরিয়া গেলেন। যুধিষ্ঠিরও এজন্য তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। এই লাঞ্ছনা গঞ্জনা সত্ত্বেও সহৃদয় অর্জ্জুন যখন শুনিলেন, শিখণ্ডীর পিতা চেম্বল রাজ বিপন্ন তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। শিখণ্ডীর পাণি প্রার্থিগণ বিফল মনোরথ হইয়া চেম্বল রাজ্য আক্রমন করিলে অর্জ্জুন তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শিখণ্ডীর পিতাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। চেম্বল রাজ তাহার বীরত্বের পুরস্কার ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ শিখণ্ডীকে অর্জ্জুনের নিকট বিবাহ দিতে চাহিলেন। এবার কিন্তু

শিখণ্ডী বলিলেন, "যদি অর্জ্জুন এমন কোন রমণী আনিতে পারেন, যিনি আমার চেয়ে ধনুর্ব্বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ, তবে আমি অর্জ্জুনকে বিবাহ করিব।" সুভদ্রা এই সংবাদ শুনিয়া ধনুর্ব্বিদ্যায় সুনিপুন নরাসতীকে পাঠাইলেন। শিখণ্ডী নরাসতীর নিকট ধনুর্ব্বিদ্যায় হার মানিলেন। শিখণ্ডীর সহিত অর্জ্জুনের শুভ বিবাহ হইয়া গেল।

এখানে আমরা সুভদ্রার উদারতায় মুগ্ধ হই বটে কিন্তু অর্জ্জুনের প্রেমপ্রবণ চিত্ত চাঞ্চল্যে দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারি না। ইহা অর্জ্জুন চরিত্রে অনেকটা অস্বাভাবিক বলিয়াই আমাদের মনে হয়। যবদ্বীপের ব্রতযুদ্ধে এইরূপ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অনেক কথা আছে। হইতে ভারতীয় মহাভারতের আদিম স্তরের অনেক সত্য ইতিহাস যে প্রচ্ছন্ন আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

---

# স্নেহের দান।

( ১৪ )

কর্ত্রীর হাব ভাব ও চলন-ফিরণ লক্ষ্য করিবার জন্য একজন গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছিল। স্বামীজী তাহার নিকট হইতে সকল তত্ত্বই পাইতেছিলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, কর্ত্রী পরামর্শ পাকাইতেছেন এবং স্বামীজীর আদেশ সহজে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক নহেন। অথচ তাঁহার গৃহখানা স্বামীজীর হস্তগত না হইলে চলিবে না—গৃহখানা চাই-ই—অন্তত পক্ষে তাঁহার স্ত্রীধন-সমষ্টি পূর্ণ লৌহমঞ্জুষা দুর নিতান্তই মণিবাবুর হস্তগত হওয়া প্রয়োজন। মাতাপুত্রে যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, তাহা স্বামীজীর ইচ্ছা; কেমনা মাতার স্নেহ মমতা—মায়া; তাহা ধর্ম্ম পথের কণ্টক। স্বামীজী এই দুর্ব্বার মায়াকে হৃদয়ের কোণ হইতে সবলে উন্মুলিত করিতে উপদেশ প্রায়ই দিতেন। তাঁহার এই উপদেশ সুফলই প্রসব করিয়াছিল। মণির সাধন পথ এই জন্যই অধিকতর মুক্ত ও সহজ হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্বামীজী যখন শুনিলেন, কর্ত্রী দালানের কপাট তালা চাবিতে আটকাইয়া ছোট হিস্যার দিকে চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি মণিকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎস, স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী; তোমার মা বোধহয় তোমার ভোগের ধন স্থানান্তরিত করিবার মতলব আটিয়াছেন। যাই হউক, মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া উচিৎ নয়; অথচ নিজের ধন বুদ্ধির দোষে পরহস্তগত হইতেও দেওয়া উচিত নহে। মা তোমার ছোট হিস্যায় সব সরাইয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছুক। তাহার যে পরিণাম কি, তাহা তিনি এখনও বুঝিতেছেন না। যাহাহউক তুমি, তোমার পন্থা দেখ। তুমি তাঁহার তালার উপর আর একটা তালা লাগাইয়া সেই চাবি নিজের হাতে রাখ। যেন তিনি ইচ্ছা করিলেই তোমাকে না জানিতে দিয়া গোপনে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে না পারেন। জমিদারের ঘরে মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ...."

স্বামীজী থামিয়া গেলেন।

মণি নত মস্তকে বলিল—"তাহাই হউক।"

তাহাই হইল। তারপর, পশ্চাতের পুকুর পাড়ের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া স্বামীজী আদেশ করিলেন—"রাত্রিতে যেন কেহ এই দরজার বাহির হইতে না পারে, অথবা কেহ বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশও না করিতে পারে।"

সে দিন রাত্রিকার ভোজনে মণির অংশে কারণের পরিণাম একটু বেশী মাত্রায় করা হইল। স্বামীজী কারণ গ্রহণ করিলেন না। সেবাদাসীর প্রয়োজনও আজ তাঁহার আবশ্যক বোধ হইল না। স্বামীজীর অসুখ হইয়াছে বলিয়া কীর্ত্তন-আরতিও আজ সংক্ষেপে হইয়া অল্প রাত্রিতেই সব নীরব হইয়া গেল।

নিশীথ রাত্রে চারিদিক নিস্তব্ধ হইলে স্বামীজী তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর রামকৃষ্ণকে লইয়া যাইয়া কর্ত্রীর ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তারপর লৌহ সিন্দুক গুলির মধ্যে যে দুটিতে খাজাঞ্চি তাঁহার পরামর্শ মতই কোন সুযোগে চুণের দাগ দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল, একটা অদ্ভূত সঁড়াশী সাহায্যে অবলীলা ক্রমে সে দুটার তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এবং তাহা হইতে ক্ষিপ্রহস্তে নোটের গাদি ও টাকার তোড়া বাহির করিতে লাগিলেন। কোন্ গাদীতে কত নোট, কোন্ ছালায় টাকা ও মোহর তাহা দেখিবার অবসর ছিল না।

দুইজনে তাহা পুনঃ পুনঃ বহন করিয়া দরজায় আনয়ন করিলেন, তারপর সেইরূপ পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্র উৎসাহে চালিত

হইয়া স্বামীজীর মণি কোঠায় আনিয়া সব মজুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই বিপুল শ্রম, অসাধারণ অধ্যবসায়, ও অদম্য উৎসাহ দেখিবার জন্য সেই শুব্ধ রজনীতে একটী বিস্ময় দৃষ্টিও জাগ্রত ছিল না!

অসাধ্য সাধন করিয়া উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। মণিকোঠার লৌহ সিন্ধুকে নোটের গাদি ও টাকার তোড়া গুলি সযত্নে স্থাপিত করিয়া তাহার তালাবন্ধ করিয়া স্বামীজী সশিষ্য পুনরায় পশ্চিমের দালানে গেলেন এবং অতি সন্তর্পণে লোহার সিন্ধুকের পূর্ব্ব পারিপাট্য সম্পাদন করিয়া কোন প্রকারে তাহাতে তালাটী আটিয়া রাখিয়া দালানের কপাট বন্ধ করিলেন এবং বাহিরের দিকের ভগ্ন তালার স্থানে অনুরূপ তালা লাগাইয়া স্বস্থানে আসিয়া আরামের শ্বাস ফেলিলেন।

( ১৫ )

প্রাতে স্বামীজি মণিকে বলিলেন "বৎস, তোমার মা ছোট তরফের আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার স্বাধীনতায় তোমার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে; তাঁহাকে ভাণ্ডার সরাইত দেওয়াও উচিত নহে। চল আমরা প্রতি দরজায় 'লা মোহর' করিয়া রাখি। অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টি রাখিয়া চলাই মনুষ্যত্বের কার্য্য।"

মণি বলিল— 'যে আজ্ঞা!"

সরকারী হুকুমে খাজনা খানার পোদ্দার আসিয়া দরজায় দরজায় লা লাগাইয়া সিল মোহর করিয়া ফেলিল।

স্বামীজী বলিলেন "তোমার মা যখন রাগ করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার নিকট রাজস্বের অর্থ প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা সঙ্গত নহে; মতি চাঁদের কুঠিতেই রোকা দেওয়া যাউক।"

মণি—'তাহাই হউক।"

স্বামীজী এইরূপ গুরুতর কার্য্যের পর নিজকে নিরাপদ মনে করিতেছিলেন না। তথাপি যতদিন বাস, ততদিন আশ। তাঁহার মনে এইরূপ একটা আশা ও নিরাশার ভাবনা খেলা করিতে ছিল। এখন হটাৎ চলিয়া যাওয়াও নিরাপদ নহে এবং সম্ভবপরও যে নহে—সে ভাবনাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

পরদিন সিলমোহর দেওয়ার পর বড় কর্ত্রী আসিয়া তাঁহার দালানের অবস্থা দেখিয়া গেলে স্বামীজীর মন হইতে যেন একটা গুরুতর বোঝা নামিয়া গেল। ছোট হিস্যার ম্যানেজারের আফিসে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় কি না, তাঁহারা বড় কর্ত্রীকে কোন সাহায্য করিবেন কি না ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার জন্য স্বামীজী গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সিলমোহর দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া বড় কর্ত্রীর মনেও বেশ একটু আশ্বস্তির ভাবই আসিয়াছিল। সুতরাং তিনি এখন ছোট হিস্যায় যাইয়া নিশ্চিন্ত মনেই সংসার পাতিয়া বসিলেন, নূতন পরামর্শের আপাততঃ আর কোন প্রয়োজনই বোধ করিলেন না।

পুকুর পাড়ের ভিতরের দরজা এখন আর বন্ধ থাকিত না। সুতরাং বড় কর্ত্রী ইচ্ছামত আসিয়া এবং যখন তখন লোক পাঠাইয়া তাঁহার দালানের অবস্থা জানিতে লাগিলেন। তাঁহার মতে এ অবস্থাও আপাততঃ মন্দের ভাল।

স্বামীজীর উৎকণ্ঠা থামিয়া গেলে তিনি মণিকে বলিলেন "তোমার মা যখন স্বাধীন ভাবেই থাকিতে চান, তখন আর তাঁহাতে আপত্তি করা উচিত নহে। তাঁহার তালুকের আয়টা তাঁহার হাতেই দেওয়া যাউক; তিনি স্ব ইচ্ছায়ই তাহার ব্যয় বিধান করুন; নতুবা লোকে মন্দ বলিবে। বৎস, মায়ের মনে ব্যথা দেওয়া উচিত নহে—তিনিও গুরু। গুরু স্বর্গঃ, মাতা মর্ত্তঃ।"

মণি বলিল—'যে আজ্ঞা।''

( ১৬ )

যথা সময়ে মাসীমা মাখনের পত্রের উত্তর পাইলেন। মাখন মাসীমাকে লিখিয়াছে—

মাসীমা, এবারকার পত্রগুলিতে আপনাদের অবস্থা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিলাম। মণির অবস্থা যে এরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। শুনিয়াছি মণি প্রথম জীবনে দুর্দ্দমনীয় ছিল। তাহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাতের সময় আমি তাহার কতকটা অনুভব করিতেও পারিয়াছিলাম। বিলাসিতা পূর্ণ উদ্দাম দৃষ্টি তখন সম্পূর্ণই তাহার ছিল। তারপর হটাৎ তাহার ভিতর ঘোর পরিবর্ত্তন দেখা দিল—সে অবস্থা তোমরা দেখিয়াছ। যাহার ভিতর এত শীঘ্র পরিবর্ত্তন আসিতে পারে, সে জগতে অনেক দৃশ্য

দেখাইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; এই সময় দরিদ্র নারায়ণের সেবা—যাহার অর্থ আছে, তাহার পক্ষে পরম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু তোমরা যাহা লিখিয়াছ—প্রতি দিন সন্দেশ, মাংস, পায়েস, পিষ্টক, গাঁজা, মদ · ইহা বড়ই লজ্জার কথা। বড়ই পরিতাপের বিষয়।

জ্যেঠিমার জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু আমি তাঁহার কি করিতে পারি? মণি দশের পরামর্শে অনায়াসে আমাকে বিপন্ন করিতে পারে। সে মণি কি আর এখন আছে? কিন্তু আমি বিপন্ন হইয়াও যদি তাহাকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা আমি কবিতে সর্ব্বদা মুক্ত-হৃদয়। আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। বেশ ভালই লিখিয়াছি। কলিকাতায় বসন্তের ধুম পড়িয়াছে; সেজন্য নৌহাটী আছি। এম, এ, পরীক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বোধ হয় এই থানেই থাকিয়া পড়িব। নিতান্ত প্রয়োজন বুঝিলে লিখিও, আসিব। মণির জন্য সব করিতে পারিব এবং করিব।

মাসী মা, তুমি মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া আমাকে লজ্জিত করিয়া ফেলিতেছ। আমার বৃত্তিতেই প্রায় চলে; তার উপর ৫০৲ টাকা অনাবশ্যক। টাকা গুলি জমাইয়া রাখিতেছি, উহা তোমার নামে দুর্ভিক্ষে দান করিব। বড় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে; কলিকাতায় বসিয়া আমরা তাহা অনুভব করিতেছি না বটে কিন্তু গ্রামে গ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লোক অনসনে মরিতেছে, তাহার সংবাদ পাঠ করিতেছি। এই সময়ই অর্থ থাকিলে মহত্ব ও মনুষ্যত্ব দেখানের সময়।

আমি পরীক্ষা দিয়াই জ্যেঠা মহাশয়ের অনুসন্ধানে ঘুরিব। এই সময় কনকের জন্যও পাত্র দেখিব। এবং আমার পছন্দ মত যে কয়েকটী আছে, তাহাদের পারিবারিক অবস্থাদির অনুন্ধান করিব। মণির বিবাহের কি হইল?

মণিকে পূর্ব্বে বিবাহ করাইলেই ভাল হইত। হয়ত বা জ্যেঠিমাকে বালিকা বধু লইয়া এখন বিপদেও পড়িতে হইত। ভগবানের রাজ্যে সবই সম্ভব এবং সকলি মঙ্গলময়। ইতি

স্নেহের—মাখন।

কনকের পত্রের উত্তরে কনকের নিকট মাখন লিখিয়াছে—

স্নেহের বোন, তোমার চিঠি যখনি পাই, প্রাণ ভরিয়া আনন্দ উথলিয়া উঠে; পত্র পড়িতে থাকি, আর তার প্রতি ছত্রে, প্রতি কথায় তোমার প্রেম ও প্রীতির অনাবিল উৎসের ধারা অনুভব করি। যত বার পড়ি, চিরনূতন। কিন্তু দিদি, তুমি যেন আমাকে একটু ভিন্ন ধারায় টানিয়া নিতেছ। সেদিকে তোমার টানিয়া নিবার চেষ্টা, আমার মনে হয়—তোমার পক্ষে ঠিক নয়। আমার পক্ষেও সেরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করা বিশ্বাস ঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। আমাকে যদি তুমি তোমার আপন মার পেটের ভাইটীর মত দেখ তবেই আমি নিজকে পরম গৌরবান্বিত মনে করিব। তোমারও সহোদর নাই, আমারও সহোদরা নাই; আমি তোমাকে প্রাণের সহোদরা বলিয়া নিঃসঙ্কোচে আলিঙ্গন করিতে পারিলে যতটা সুখী হইব, নিজকে যত দুর নিরাপদ মনে করিতে পারিব, অন্য কিছুতেই বুঝি তাহা পারিব না। অন্য ভাব কল্পনা করিতেই আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। তোমার আমার মধ্যে একটা ভয়ানক ব্যবধান যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। ভয় এবং দুরাশা এই ব্যবধান টাকে সত্যে এবং বিপুলতায় পরিণত করিয়া এই পথের ভিকারীটীকে যেন সত্যই পথ হইতেও টানিয়া নিয়া মরুভূমিতে ফেলিয়া দেয়।

তুমি আমার নিকট অনেক কথাই নিঃসঙ্কোচে লিখিতেছ। কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষেও যদি সে গুলি সেইরূপ নিঃসঙ্কোচে পড়িবার সামগ্রী হইত, তবে এগুলি আমার আনন্দের ধারা আরও বৃদ্ধি করিতে, পারিত। কেন না আনন্দ গোপন রাখাই আনন্দ উপভোগ নহে, বন্ধু বান্ধবকে বিলাইয়াই তাহার পূর্ণতা।

তুমি যখন এত কথা আমাকে লিখিতে পার, তখন আমিও সঙ্কোচ শূন্য হইয়া লিখিতেছি, বোনটী আমার, কিরূপ বরটী তোমার মনের মত হইবে, আমাকে তাহার একটী আভাস দিও। আমি তোমার ঠিক মনের মত কার্য্য করিতে যে একটুও কৃপণতা করিব না, বরং সপুর্ণ রূপে তাহা করিব, এ জ্ঞান, এ বিশ্বাস, তোমার আছে। সৌন্দর্য্যে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, চরিত্রে তোমার বরটী যে তোমার কল্পনার চেয়েও অনেক উপরে হইবে, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকিও। সে ব্যক্তি পথের কাঙ্গাল, দরিদ্র ভিকারী হইবে—এ কল্পনা আমার প্রাণে কোন দিন সুখ দিবে না। ঘর জামাই রাখিয়া

পদার্থ কে অপদার্থ করিবার কল্পনার আমি ঘোর বিরোধী। শক্তিকে কর্ম্মে রাখিয়া শক্তিশালী রাখিতে হইবে। নতুবা স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, শিক্ষা ও চরিত্রের স্বার্থকতা কি ?

আমার চিঠির ভাব তোমার প্রাণে কোন রূপেও আঘাত না করিয়া আমার মনের নির্ম্মল গূঢ় ভাবই প্রকাশ করে ও তাহা তোমার নিকট পরম প্রীতির সহিত গৃহীত হয়, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। আশা করি, ভগবান আমার এই শুভ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবেন।

তোমার দাদার কার্য্যাবলীর প্রতি তোমরি মনোযোগ দেওয়া বা তাহা শুনিতে যাওয়া আমি তোমার পক্ষে সঙ্গত মনে করি না। এ সকল বিষয় হইতে নিজকে খুব সাবধানে দূরে রাখিবে। পূজার পূর্ব্বে আমি নিশ্চয় আসিব। আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রাণ খুলিয়া উত্তর লিখিবা ; আমি বেশ মনের সুখে আছি। কোন বিষয় চিন্তা করিও না। আমি যে রামায়ণ ও মহাভারত দুখানা পাঠাইয়াছি, তাহা সময় সময় পড়িও। আরও সুন্দর সুন্দর পুস্তক আনিব। বাজে পুস্তক পড়িও না। অতিরিক্ত কল্পনাও করিও না। পবিত্র প্রেম ও প্রীতির চিত্রই কল্পনা করিও। ইহাই উন্নত জীবন গঠনের সহায়। আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হইবে।

তোমার স্নেহ-ভালবাসার—দাদা।

মণির মায়ের নিকট মাখন লিখিয়াছে—

আপনার চিঠি পাইলাম। মণির উপকারের জন্য আমাকে যখনই লিখিবেন, আমি আসিয়া আমার যথা সাধ্য তাহার জন্য করিতে চেষ্টা করিব। মাতা পুত্রের মধ্যে বিরোধ জমিদার পরিবারে যত দিন না ঘটিতে দেওয়া হয়, ততদিনই আমাদের মতে ঘরটী নিরাপদ রাখিবার চেষ্টা হয়। আশা করি, নিজের চেষ্টায় কোনরূপ সুফল লাভ করিতে পারা যায় কি না আপনি তাহাই অগ্রে দেখিবেন। পরের সাহায্যে অনিষ্টেরই আশঙ্কা অধিক। আমাকে যখন আদেশ করিবেন, শ্রীচরণে পঁহুছিব। আমার পরীক্ষার জন্য পত্রের উত্তর দিতে গৌন হইল ; সে জন্য লজ্জিত আছি। ভগবান মণির সুমতি প্রদান করুন। ইতি

সেবক—শ্রীমাখনলাল ভট্টাচার্য্য।

মাখন তিন খানা চিঠির এক দিনেই উত্তর দিয়াছিল। এখানেও এক দিনেই চিঠিগুলি আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

# পাষাণ দেবতা।

স্বর্গ চাহিনি, স্বস্তি চাহিনি, হইনি শক্তি সুযশকামী ;
সাধন লভ্য অক্ষয়পদ মোক্ষ, তাওত চাহিনি আমি।
চাহিয়াছি, এই ত্রিতাপ দগ্ধ জীবনের জ্বালা জুড়াতে শুধু,
একটু তোমার করুণ দৃষ্টি, হে মোর দয়াল দেবতা বঁধু !

কত ঘুরিয়াছি তীর্থে তীর্থে ; তুলসী তলায় জ্বালিয়া বাতি,
করেছি তোমার ব্যর্থ সাধন ব্যর্থ ভজন দিবস রাতি !
সন্ন্যাসী সেজে কতদিক দেশে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া হয়েছি সারা—
বক্ষে করিয়া বেদনা বহ্নি চক্ষে তপ্ত সলিল ধারা।

কবে নাকি সেই বৃন্দাবনের কুঞ্জকাননে বাজায়ে বেনু,
রাখাল সাজিয়া রাখালের সনে গোষ্ঠবিহারী চরাতে ধেনু
সেখানে গিয়েও বহুদিন ধরে ব্রজ গোপিণীর প্রসাদ চাহি
খুজিয়া দেখেছি—"সব আছে সেথা দেবতা গো শুধু তুমিই নাহি !

শান্তিপুরের শান্তি কাননে বহুদিন ভরে আপনা ভুলি,
নেচেছি গেয়েছি সংকীর্ত্তনে মহা আনন্দে দুবাহু তুলি।
জগন্নাথের অঙ্গনতলে ধূলায় কাঁদায় লুটায়ে দেহ,
ডেকেছি তোমারে ; কইগো দেবতা ? দেখাতো দিলেনা ২ স্নেহ !

শাস্ত্র বচন মাথায় করিয়া দীক্ষা গুরুর আদেশে শেষে,
বুঝিয়া "ব্যর্থ তীর্থ ভ্রমণ" বহুদিন পরে আসিয়া দেশে
এইখানে এই মন্দিরে তব পূজায় সঁপেছি জীবন-দেহ ;
কিন্তু কোথায় ? দেবতা কোথায়, কোথায় তোমার করুণা স্নেহ ?

বারোটী বছর গত হয়ে যায়, তোমার পূজার বিরাম নাহি,
উপবাসে দেহ ক্লিষ্ট করিয়া সন্ধ্যা দুপুর প্রভাতে নাহি
করেছি তোমার ভজন পূজন জপ আরাধনা কিন্তু তবু
একটি দিনও যে মুখতুলে তুমি অধমের পানে চাহনি প্রভু ?

ফিরিয়া এসেছে স্তোত্র আমার পাষাণ প্রাচীরে আঘাত লাগি'
ফুলগুলি সব বাসি হয়ে গেছে, ব্যর্থ আশায় রজনী জাগি !
পড়িয়া রয়েছে নৈবেদ্য তব সেবার লাগিয়া দিয়েছি যাহা,
ওগো নিষ্ঠুর পাষাণ দেবতা, কিছুই যে তুমি ছুঁলেনা আহা !

এত তপ জপ, এত আরাধনা, কোন কাজে মোর যদি না এল,
দুঃখ যাতনা দৈন্য দহনে জীবনই যদি বিফলে গেল—
কে রোধিবে মোরে উচ্চকণ্ঠে এইবার আমি যদিগো গাই—
"দেবতা যে শুধু পাষাণ মূর্ত্তি—দেবতা মিথ্যা—দেবতা নাই।"

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর।

# মাণিক সরদার।

পুকাই সর্দ্দারের নাম সিংহনাদের চতুর্দ্দিকস্থ ৮।১০ খানি গ্রামের ভিতর কে না জানে? তাহার নাম করিলে সেকালে দুষ্ট শিশুরা পর্য্যন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘুমাইবার ভান করিত। নাছিমপুরের চৌধুরীরা একসময় পুকাই সর্দ্দারের বলে বলীয়ান হইয়া জিলার নীলকুঠির সাহেবদের সঙ্গে পর্য্যন্ত কত কিছু-না করিয়াছে? পুকাই যখন কোন লাঠি খেলায় বা কোন হাঙ্গামায় উপস্থিত হইত, তখনি সকলে যেন মন্ত্র মুগ্ধের মত তাহাকে উস্তাদ্ মানিয়া মাথা হেট্ করিত। পুকাইকে আর লাঠি মারিতে হইত না। বিজয়ী হইয়া পুকাই সর্দ্দার হাস্য মুখে প্রভুর কাছে পৌছিত। সে সময় ক্ষুদ্র নাছিমপুরের চৌধুরীদের জন্য অনেক বড় বড় জমিদার পর্য্যন্ত তাঁহাদের জমি বেদখল রাখিতে পারিত না।

সেই পুকাই সর্দ্দারের বংশধর মাণিক আজ নাছিমপুরের চৌধুরী বাড়ীতে তলপে হাজির আসিয়াছে। পুকাইর বংশধরের আর সে অবস্থা নাই, চৌধুরী গৃহের লক্ষীও আর নিবিষ্টভাবে থাকিতে চাহিতেছেন না। আর কতদিনই বা লাঠির জোড়ে চঞ্চলা অচলা হইয়া থাকিবে?

নাছিমপুরের চৌধুরীদের এক বৃহৎ জমিদারীর অধিকাংশ প্রসন্ন চৌধুরীর আমলেই হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। এখন সুধু ভদ্রাসন বাড়ীখানা ও তৎসংলগ্ন ৭।৮ খানা গ্রামের উপস্বত্বের উপরই চৌধুরীদের জীবিকা ও জমিদারীর মান-মর্য্যাদা নির্ভর করিতেছ। এই সামান্য টাকাতেই বংশের মানমর্য্যাদা ও ক্রিয়া কলাপ যথাসাধ্য বজায় রাখিতে হইতেছে। কাজেই প্রাচীন জমিদারী চাল আর এখন নাই।

চৌধুরী মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপের রাণার উপর একখানা জল চৌকী ফেলিয়া বসিয়া নিবিষ্ট মনে তামাকু টানিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন—সংসার চলিবে কি ভাবে? যে দুর্দ্দিন পড়িয়াছে! ভাদ্র মাস! অথচ আজ পর্য্যন্ত এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই। আউস ধান তো গিয়াছেই, অগ্রহায়ণী ফসলেরও যে আর আশা নাই। নালিতা একেবারে হইলনা, উপায়কি?

এই সময় মাণিক আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দূরে দাঁড়াইল।

চৌধুরী মহাশয় তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়াই গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"মাণিক তোমার খাজানা অনেক বাকী। গত কিস্তিতেও তুমি কিছুই দেও নাই। এবার সম্পূর্ণটা না মিটাইলে আমাদের চলে কেমন করিয়া?"

মাণিক করজোড়ে বলিল—"মহারাজ, সাত আটটা প্রাণী আজ দুদিন কিছু খাইতে পাই নাই। কর্ত্তা, এবার চাষের যা অবস্থা,—রাজা আপনি, নিজের চক্ষেই তাহা দেখিতেছেন। এক মুটা ধানও এ চাষে পাইবার আশা নাই; খাজনা দিব কেমন করিয়া, মহারাজা? তা ছাড়া সব জিনিসের দামই চড়া। এই দেখুন, পরণের কাপড়খানা পর্য্যন্ত নাই; বাড়ীর মেয়েরা .

বলিতে বলিতে মাণিকের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। প্রৌঢ়ের শীর্ণ গণ্ড বহিয়া দুই ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

চৌধুরী মহাশয় দেখিলেন সত্যই মাণিকের শতচ্ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডের সাহায্যেও লজ্জা নিবারিত হইতে পারিতেছেনা। হাজার হইলেও বনিয়াদ বংশের বংশধর। মাণিকের অবস্থা দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় নিজ অভাবের কথা বিস্মৃত হইলেন। বাস্তবিক তাহার মুখে আর কথা বাহির হইলনা। সম্মুখে দারিদ্র্যের কঠোর মূর্ত্তি! এ অবস্থায় টাকার জন্য মানুষ কি তাগাদা করিতে পারে? কিন্তু চুপ করিয়াও তো থাকা যায় না। চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন— "তাতো বুঝিলাম বাপু কিন্তু আমাদেরই বা চলে কি করিয়া বল! তোমরা দিলেতো আমরা খাইয়া বাঁচি।"

যুক্ত করে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাণিক বলিল "মহারাজ, এখন দিবারতো কোন উপায়ই দেখিনা।"

মাণিকের উক্তিতে বিন্দু মাত্রও অতিরঞ্জন নাই,— চৌধুরী মহাশয় তাহা বুঝিলেন। কিন্তু কি করিবেন? কিয়ৎক্ষণ—চিন্তার পর চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—"মাণিক এইত আমাদের ব্যবসা! তোমাদের দশ জনের কাছ হইতে লইয়াই আমাদের দিন পাত করিতে হয়। তা এভাবে যদি সকলেই জবাব দেয়, তবে আমাদের দিন চলিবে কি করিয়া? একটা ব্যবস্থাতো করা চাই?"

অনেকক্ষণ চুপকরিয়া থাকিয়া মাণিক বলিল "মহারাজ আপনার দয়ার শরীর, যার আমরাও আপনার খাইয়াই মানুষ; এখন যদি বাঁচান, আর যদি সুদিন হয়, তবে ঋণ পরিশোধ করিতে পারি।"

চৌধুরী মহাশয় মাণিকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন – "সে কেমন মাণিক ?"

মাণিক বড় সঙ্কোচিত হইয়া পড়িল। বলি বলি করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুখে আসিতেছিলনা। বার বার চেষ্টা করিল, তবু পারিল না। ভাব দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন "কি বলিতে চাও তুমি!"

মাণিক যেন তখন একটা কূল পাইল। সাহসে ভর করিয়া মাণিক বলিল—"হুজুর যদি দয়া করিয়া আমাকে এই সময় পঁচিশ টী টাকা ধার দেন, তবে ছয় মাসের ভিতর আমি আপনার টাকা শোধ দিতে পারি ; অদৃষ্টেরও একটা পরীক্ষা করিতে পারি।"

মাণিকের আননের দৃঢ়তা ও কণ্ঠস্বরের সরলতার আভাস পাইয়া চৌধুরী মহাশয় কৌতুহলী হইয়া বলিলেন "বল কি মাণিক! পঁচিশ টাকা মূলধনে সংসার চালাইয়া আমার দেনা ও খাজনার টাকা শোধ করিবে ? পাগল!"

মাণিক তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল "মহারাজ—একবার বিশ্বাস করিয়া দেখুন। আমরাতো আপনাদেরই মানুষ। না যদি পারি, যে শাস্তি দিতে চান, যখন তখন দিতে পারিবেন। আমরা চারি পুরুষ এই চৌধুরী বাড়ীর মাটি খুড়িয়াই মানুষ হইয়াছি।"

চৌধুরী মহাশয় একবার সিংহনাদের বিস্তৃত জল রাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সম্মুখে শারদীয় পূজা। আনন্দময়ীর আগমন আসন্ন। এমন আনন্দ সম্মিলনের পূর্ব্বক্ষণে এই দরিদ্র বিশ্বাসী প্রজাকে সামান্য অর্থ ঋণ স্বরূপ দিয়া যদি তাহার সংসারে স্বচ্ছলতার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে তাহাতে কোন ভূম্যধিকারী পশ্চাৎপদ হয়। কথাটা মনে মনে বুঝিয়াও চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"টাকা তোমরা না দিলে আমাদের আসিবে কোথা হইতে ? তা দিবে দূরে থাক্ চাহিতেছ। আচ্ছা, তুমি টাকা দিয়া কি করিবে মাণিক ?"

মাণিক যুক্ত করে সেইভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়াই বিনীত ভাবে বলিল—"ব্যবসা করিব কর্ত্তা ?"

"পঁচিশ টাকার ব্যবসা ?"

"পঁচিশ টাকাই পাই কোথায় কর্ত্তা ? পঁচিশ টাকার ব্যবসা কি কম ? খাটাইতে পারিলে এক হাটে পঁচিশ টাকায় পঞ্চাশ টাকা হয়।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন – "বটে!"

"আজ্ঞা হয়, কর্ত্তা।" শরীর খাটাইতে পারিলে, হয় বৈ কি ?"

"বেশ! বাণিজ্য কর, আমি সাহায্য করিব।"

মাণিক ভূমিতে পড়িয়া চৌধুরী মহাশয়ের পদধূলি লইল।

( খ )

আশ্বিন মাস। সন্ধ্যার পর হইতেই অল্পবৃষ্টি হইতেছিল। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির তাণ্ডাব নৃত্য আরম্ভ হইল। ঝটিকার ভীষণ চীৎকার, বিদ্যুতের নিষ্ঠুর হাস্য, বজ্রের ভীম গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে প্লাবনের ধারা নামিয়া আসিল ; মেদিনী যেন ভয়ে ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সেকি ভীষণ দৃশ্য! তার সঙ্গে সঙ্গে বায়ু ভীম বেগে উদ্যত মুষ্টি উত্তোলন করিয়া মানবের নিরাশ ক্ষুব্ধ দীর্ণ চিত্তে যেন কালো মৃত্যুর ছায়া আঁকিয়া যাইতেছিল। উঃ! কি ভীষণ দৃশ্যই পূর্ব্ববঙ্গের উপর দিয়া সেদিন বহিয়া গিয়াছে!

কিন্তু মা আনন্দময়ীর কৃপায় চৌধুরী বাড়ীর একখানা রচনা ঘর ব্যতীত আর সকল গুলি ঘরই কোন প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। না থাকিলে, হয়তো মায়ের আগমনে-ই এবার বাধা পড়িত। চৌধুরী বাড়ীর ঘর-বাড়ী পুরাতন নিয়মে প্রচলিত উলুখড়ের দ্বারাই নির্ম্মিত। এ পর্যন্ত তাহাকে উন্নত প্রণালীতে পরিবর্ত্তিত করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। লক্ষ্মী যখন দুই হাতে আপন ঝাঁপি উজার করিয়া আশীর্ব্বাদের স্বর্ণ বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছিলেন, সেই সুসময়েই যখন বসত বাড়ীর কোন উন্নতির সূচনা দেখা যায় নাই, তখন আর এই ভাটার দিনে, ভাগ্য নদীতে যখন খর স্রোত তখন কি আর তাহা চালিয়া নূতন সাজ সরঞ্জামে সুশোভিত করা সম্ভবপর। তাই প্রসন্নচৌধুরী বসিয়া ভাবিতে ছিলেন, কি প্রকারে লোকজনের বসিবার সুবিধা করিবেন ; মায়ের রচনা কোথায় হইবে ? একখানা নূতন "রচনা ঘর" না করিলেই বা কেমন হইবে ? এমন সময় মাণিক ও তাহার পুত্র আসিয়া মূর্ত্তিমান বিপন্নের মত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

তাহাদিগকে নির্ব্বাক ও নিষ্কম্প প্রতিমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন "কিহে মাণিক, খবর কি ?"

"সর্ব্বনাশ হইয়াছে কর্ত্তা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি

একেবারে সারা হইয়াছি........বলিয়াই মাণিক কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পুত্রের নয়নও ছল ছল করিতেছিল; সেও অধোবদনে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

ঝড়ের পর দিন চৌধুরী মহাশয় রায়ত দিগের বাড়ী বাড়ী যাইয়া অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছিলেন। মাণিকের দুই খানা ঘরই পড়িয়া গিয়াছিল; তাহাতে বাড়ীর ছেলে মেয়ে যে কোন আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা তিনি জানিতেন, সুতরাং মাণিকের ঘর পতন ব্যতীত আর যে কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে তাহা তিনি জানিতেন না। মাণিকের কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন—"তাতো দেখিয়াছি মাণিক। কি করা, দৈবের ইচ্ছা, দৈবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষের কোন হাত নাই। ঘর দুখানা গিয়া বাপ পুতে খাটিয়া কোন মতে তুলিয়া ফেল! সরকার হইতে কিছু সাহায্য সকলকেই দেওয়া হইতেছে তোমাকেও দিব......"

মাণিক অশ্রু কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"কর্ত্তা মাঝ গাঙ্গে আমাদের বোঝাই নাও ২খানাও ভরাডুবি হইয়াছে। যথা সর্ব্বস্ব গিয়াছে! আমার উপায় কি হইবে? মাথা রাখিবার স্থান নাই, পেটে দিবারও কিছু রইল না।...

চৌধুরী মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন—"কোন চিন্তা নাই বাপু, বিপদ ভগবানেরই দান। তোমার যে ছেলে পেলে গুলি প্রাণে বাঁচিয়াছে, সেই যথেষ্ট। আমার ঋণের জন্য কোন চিন্তা এখন কারবার তোমার প্রয়োজন নাই। এখন যাহাতে বাঁচিতে পার, তাহার চেষ্টা কর। বাঁচিলে তারপর ঋণ পরিশোধ, তখন তুমিও আছ, আমিও আছি।"

পিতা পুত্র নীরবে দাঁড়াইয়া রইল। চৌধুরী মহাশয় বুঝিলেন দুটা কাজের লোক বিপদের তাড়নায় একেবারে দামিয়া যাইতে বসিয়াছে। তিনি এই সময় তাহাদিগকে প্রচুর উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া সাহস দিয়া বলিলেন—"মাণিক ভাবিয়া কোন কূল কিনারা করিতে পারিবে না। যখন ব্যবসায় পা দিয়াছ, তখন মা দুর্গার নামে আবার বুক বাঁধিয়া চেষ্টা কর। আমি তোমার মূলধন যোগাইব। কোন চিন্তা নাই। দেখা যাক্ অদৃষ্টে কি আছে? সংসার দপার মার; কোন সময় কি হয়, বলা যায় না। ব্যবসা করিতে হইলে, লাভ ক্ষতি গণনা করিলে চলিবে না। কাজ করিতেই হইবে, নিরাশ হইও না।"

পিতা পুত্র চমকিয়া উঠিল। অপ্রত্যাশিত উৎসাহ বাক্যে মুগ্ধ হইয়া গেল। তারপর উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মাণিক বলিল—"কর্ত্তা আপনাদের দয়া, আপনাদের ঋণ, আমার বংশে কেও ভুলতে পারিবে না, যদি কখনও মা দিন দেন......

বাধা দিয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—"আজ দুই প্রহরে তোমরা বাপ বেটায় এখানেই প্রসাদ লইও।"

( গ )

আজ কালের চক্রে এক যুগ ঘুরিয়া আর এক যুগ আসিয়াছে। এখন আর মাণিক সরদার, সেই মাণিক সরদার নহে। ভৈরববাজার, নারায়ণগঞ্জ ও কলিকাতায়, তাহার বড় বড় আড়ত। মাণিক ব্যাপারীর বড় পুত্র কলিকাতা পাটের আড়তের কাজ কর্ম্ম দেখে, কনিষ্ঠ পুত্র কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেছে।

ইন্দিরার কৃপা দৃষ্টিতে মাণিকের সংসার এখন আর অভাব দৈন্যের তীব্র তাড়নায় নিপীড়িত নহে। সৌভাগ্যের ঐন্দ্রজালিক দণ্ড স্পর্শে লৌহ আজ সুবর্ণে পরিণত হইয়াছে। পরিশ্রম, যত্ন ও সাধুতার দ্বারা অদৃষ্ট চক্রের যে রূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব, মাণিকের জীবনে তাহা আজ প্রত্যক্ষীভূত।

ভাগ্যচক্রের এই রূপ পরিবর্ত্তনেও সেই পরিবারের ব্যবহারের কিন্তু বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহাদের চাল চলন সাদাসিধে আড়ম্বর বর্জ্জিত। এত ধন রত্ন ও ঐশ্বর্য্য-বিভব সত্বেও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই, দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। জেলার ভিতর মাণিক ব্যাপারীর নাম যার তার মুখে শুনা যায়। জেলার বেঙ্ক গুলি, আজ ব্যাপারীর অর্থে পরিপুষ্ট। কারবারে প্রতিদিন হাজার হাজার টাকার বিনিময় চলিতেছে; শত শত লোক খাটিতেছে।

* * * *

আজ ২৮ শে জুন। বাকী খাজনার নীলামের দিন। কাহারও সর্ব্বনাশ কাহারও ভাদ্র মাস জেলা কালেক্টরের খাস কামড়ায় আজ লোকে লোকারণ্য। কেহ অর্থের পুটলি কোমরে বাঁধিয়া সম্পত্তি কিনিবার প্রলোভনে

আসিয়াছে; কেহ আপন সর্ব্বস্ব যাইতেছে দেখিয়া তাহা রক্ষা করিতে আসিয়াছে। কেহ কিনিয়া বড় হইবে ভাবিতেছে কেহ পথের ভিক্ষারী সাজিবে ভাবিয়া মাথা খুঁটিয়া কাঁদিতেছে। এক দিকে বিপদের করাল ছায়া, অন্য দিকে বিভব বিত্তের স্বপ্ন। কত লোক মনশ্চাঞ্চল্যে এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিতেছে, কেহ স্থির ভাবে টাকার পুটুলি আকড়াইয়া ধরিয়া পান চিবাইতেছে। মোক্তারের দল যে দিকে অর্থের প্রলোভন দেখিতেছে, সেই দিকে দৌড়াইতেছে।

কালেক্টর সাহেব নুতন লোক, বড় কড়া মেজাজের। গত কিস্তিতে আধ আনা বাকীর জন্য একটা বড় সম্পত্তি নীলামে চড়াইয়াছিলেন। এক জন তাঁহার পায়ে পড়িয়া বাকী টাকা দিতে চাইয়াছিল, তিনি তাহাকে পদ প্রহারে বিতাড়িত করিয়াছিলেন! তাই যাঁহাদের বাকী পড়িয়াছে, তাঁহারা হতাশ হইয়াছেন। আর যাঁহারা কিনিতে আসিয়াছেন, তাহাদের মুখে আশার উজ্জ্বল দীপ্তি। এবারও দুইটা বড় জমিদারী নীলামে আছে। একটা নাছিমপুর দিগর, আর একটা ১৭ নং জমিদারী। অনেক বড় লোকের মোক্তার এই দুইটাই কিনিবার জন্য চেষ্টিত আছেন।

নীলাম আরম্ভ হইল। ২।৩ খানা তালুক নীলামের পর নাছিমপুর দিগর ডাক হইল। চৌধুরীদের পক্ষে ও অন্য দুই জমিদারের পক্ষে ডাক হইতেছিল। কালেক্টর সাহেব নীলাম খতম করিবার ইঙ্গিতে হাঁকিলেন—এক—দুই—। এমন সময় ব্যাঙ্কের সাহেব একেবারে হাজার টাকা ডাক বাড়াইয়া দিলেন। অপর পক্ষ-ত্রয় একে অন্যের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। কালেক্টর সাহেব এক—দুই—তিন গণিয়া হামারে আঘাত করিলেন। নাছিমপুরদিগর নীলাম হইয়া গেল।

* * *

নাছিমপুরের চৌধুরী দিগের দুই হিস্যাই আজ পথের কাঙ্গাল। তাহাদের বাড়ী জমি যথাসর্ব্বস্ব এই নীলামে বিক্রয় হইয়া গেল।

বৃদ্ধ প্রসন্ন চৌধুরী কয়েক মাস যাবত চলৎ শক্তি হীন। দীর্ঘ ছয়মাস ধরিয়া ভীষণ জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম—যম ও মানবের বল পরীক্ষা চলিতেছে। এ অবস্থায় সদর খাজানা প্রেরণের ব্যবস্থা কেহই করেন নাই। দুই হিস্যার কলহে এইরূপ অবস্থা সদর খাজানার কিস্তিতে ইহাদের সর্ব্বদাই হইয়া থাকে; আজ নুতন নহে। এবার প্রসন্ন চৌধুরীর এ অবস্থায় অপর হিস্যা ষোলআনা তালুক নীলামে চড়াইয়া ডাকিবার মতলব আটিয়াছিলেন। এপক্ষেরও যে এক সময় এ ইচ্ছা না ছিল, তাহা নহে; কিন্তু এবার প্রসন্ন চৌধুরীর অবস্থা শোচনীয়। যাহা হউক বরাবর যাহা হয় এবারও তাহাই হইবে—শেষ তারিখে দুই পক্ষেই টাকা দিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। নির্দ্দয় হুজুর শেষটায় habitual defaulter বলিয়া এবার কোন পক্ষেরই আবদার রক্ষা করিলেন না। এইরূপে উভয় পক্ষেরই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

( ঘ )

মাস্তলে সাপ উড়াইয়া যখন প্রকাণ্ড বজরা আঁকিয়া বাঁকিয়া উজান বহিয়া সিংহনাদ পাড়ি দিতে ছিল। সাপের অঙ্গ ভঙ্গি ও লেজ নাড়া দেখিবার জন্য তখন গ্রামের কৌতুহলী দর্শকবৃন্দ নদীর তীরে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে বলিতে লাগিল—"এ সর্দ্দারের বজরা—"।

প্রকাণ্ড বজরা। পশ্চিম দেশীয় দ্বারবান সতর্ক-পাহারার নিদর্শন স্বরূপ দাড়াইয়া থাকিয়া তাহার গুরুত্ব বাড়াইয়া দিতে ছিল। তখন ডুবন্ত রবির লোহিত কিরণ পশ্চিম আকাশের পাটে—সন্ধ্যা দেবীর সীমন্ত রাঙ্গাইয়া সিংহনাদের জলে ঢেউ খেলিতেছিল।

বজরা নাছিমপুরের চৌধুরী বাড়ীর ঘাটে আসিয়া নোঙ্গর করিল। তারপর বজরার ভিতর হইতে, মাণিক ও তাহার পুত্র বাহির হইয়া আসিল।

উভয়েই নিঃশব্দ চরণে রোগীর কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। চৌধুরী মহাশয়ের জরাজীর্ণ দেহ শয্যায় বিস্তৃত। দুই মাস পূর্ব্বে মাণিক একদা রাত্রিকালে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছে; তখন স্বভাব-প্রসন্ন প্রসন্ন চৌধুরীর বার্দ্ধক্য গ্রস্ত দেহ এমন জীর্ণ ছিলনা; এত অল্প দিন মধ্যে এমন ঘোর পরিবর্ত্তন মাণিক কল্পনায় ও আনিতে পারে নাই।

একটা চেয়ারে কবিরাজ মহাশয় উপবিষ্ট। মাণিক প্রাণ ভরিয়া সেই অনন্ত পথ যাত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিল। তখন তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে বেদনার পাহাড় গলিয়া নয়ন পথে নিঃশব্দে ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের নিয়ন্তা, তাহার সমস্ত সুখ সৌভাগ্যের পথ প্রদর্শক, পরম ভক্তিভাজন মুনিব আজ মৃত্যু শয্যায় শায়িত। শেষ সময় তাঁহার উপস্থিত।

মাণিক উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"কর্ত্তা, আমি মাণিক।"

"কে?" অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর হইল।

মাণিক সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যুক্তকরে বলিল—"আপনার মাণিক।

"মাণিক!"

"আজ্ঞা হাঁ কর্ত্তা, আপনার শরীর এখন কেমন বোধ হইতেছে?"

"মাণিক! চলিলাম…আর কেমন……"

"কোন চিন্তা নাই কর্ত্তা, আপনি শীঘ্রই সারিয়া উঠিবেন।"

"সারিতেই বসিয়াছি মাণিক, নিজেও চলিলাম, আর সকলকেও নষ্ট করিয়া গেলাম।"

"কোন চিন্তা নাই কর্ত্তা, আপনার এই নিমক হালাল কিঙ্কর থাকিতে কোন চিন্তার বিষয় নাই।……"

মাণিক জাননা! সব গিয়াছে; আমি সকলকে পথের কাঙ্গাল করিয়া যাইতেছি; মাথা রাখিবার স্থানটী পর্য্যন্ত না। সব নিলাম সব গিয়াছে…।"

মাণিক বলিল "কিছুই যায় নাই কর্ত্তা, বরং ষোল আনা তালুক আমি খোকাবাবুর জন্য রাখিয়াছি। নিলাম আমিই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিয়া ডাকিতে লিখিয়াছিলাম এখন আপনার ঋণেও তাহা নিলাম হইবে না। আপনার বহু নিমক মাণিক খাইয়াছে, মাণিক থাকিতে এই চৌধুরী পরিবারের কোন চিন্তা নাই কর্ত্তা।"

চৌধুরী মহাশয় মাণিকের দিকে আকৃষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মৃত্যু-ছায়া-শীর্ণ ম্লান মুখে যেন তৃপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

মাণিক পদধূলি লইতে অগ্রসর হইল।

কবিরাজ মহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন "আরে—ধর ধর—বাহির কর—বাহির কর।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে সব শেষ হইল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

---

# সাগর তরঙ্গ।

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের কথা আমরা পুস্তকে পড়িয়া থাকি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা যে কি, সে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণা নাই। সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ মালার প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে মনে হয় যেন বহুদূর হইতে, একটী সুউচ্চ জলের প্রাচীর গড়াইতে ২ কূলের দিকে আসিতেছে। প্রকৃত পক্ষে তরঙ্গের সহিত জলের কোন গতি হয়না; যেথাকার জল সেই খানেই স্থির থাকে, কেবল চক্ষের ভ্রান্তির দরুণ ঐরূপ একটা গতি অনুভব হয়। ঐ ঢেউয়ের উপরে একটুকরা কর্ক ছাড়িয়া দিলে, উহা এক বার ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং পুনরায় নিম্নে পড়িয়া যাইবে মাত্র; কিন্তু উহা ঢেউয়ের সঙ্গে চলিয়া যাইবে না। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে তরঙ্গের কোনরূপ গতি নাই। নবজাত শ্যামল ধান্য ক্ষেত্রে বায়ু সঞ্চালনে যে একরূপ তরঙ্গের সঞ্চার হয়, ঐ সমুদ্র তরঙ্গও ঠিক এইরূপ।

জল রাশির বিস্তৃতির অনুপাতে উহা যতই গভীরতর হইবে, তরঙ্গও সেই অনুপাতে বৃহৎ হইবে। লবনাক্ত জলে এই তরঙ্গ অধিক হইয়া থাকে।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের নিকটে সমুদ্র অগভীর বিধায় তথায় তরঙ্গের উচ্চতা ১৫ হইতে ২০ ফুটের ঊর্দ্ধে উঠে না, ভূমধ্য সাগরের তরঙ্গের পরিমাণ ১৩ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ১৮৪৭ সনে স্কর্জবি (Scoreslby) লিবারপুল হইতে বোষ্টন যাইবার সময়ে তরঙ্গের যে পরিমাপ করিয়াছিলেন, তাহা ২৬ হইতে ২৯½ ফিট পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পর বৎসর ঐ পথে ফিরিবার সময়ে ঝড়ের মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগরে ৩০ হইতে ৪৩ ফিট উচ্চ তরঙ্গ দেখিয়াছিলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের একটী তরঙ্গ ৩৩ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছিল। সার জেমস্ রস্ (Sir James Ross) উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে ৩৯ ফিট উচ্চ একটী তরঙ্গ দেখিয়াছিলেন যে বিস্কে উপসাগর ঝড়ের জন্য বিখ্যাত, তথায় ৩৬ ফিটের ঊর্দ্ধে তরঙ্গ দেখা যায়না। কেহ কেহ অবশ্য বলেন, তথায় ১০০ ফুট উচ্চ তরঙ্গও হইয়া থাকে।

উন্মুক্ত সমুদ্রে ৫০।৬০ ফুটের ঊর্দ্ধে তরঙ্গ না হওয়াই সম্ভব। বিশাল তরঙ্গ, প্রবল ঝড়ের সময়ে উত্থিত হয় না; যখন এক দিকে দীর্ঘ কাল প্রবল বাতাস চলিতে থাকে,

উহাদের সমবেত ফলে বিশাল তরঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে। কখন কখন যেস্থানে ঝড় হয়, তাহা হইতে বহুদূর তরঙ্গ বিস্তারিত হইয়া থাকে সে জন্য পুরীতে অনেক সময়ে নির্ব্বাত অবস্থায়ও প্রবল তরঙ্গ দেখাযায়। ঐ সমস্ত তরঙ্গ তটভূমীর সংঘর্ষে আসিয়া অনেক সময় ফাটিয়া যায়। তরঙ্গ, যখন অগভীর জলে আসিয়া পড়ে এবং বাঁধা প্রাপ্ত হয় তখনই উহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উম্মুক্ত বারিধি বক্ষে তরঙ্গ সাধারণতঃ কখন ৫০।৬০ ফিটের উর্দ্ধে উঠে না। নস্‌হেড্ (Noss head) লাইট হাউসে বাধা প্রাপ্ত হইয়া কখন কখন তরঙ্গ ১৭৫ ফিট্ উর্দ্ধেও উত্থিত হইয়া থাকে। ডানেটহেড্ (Dunnethead) লাইট্ হাউসের ৩০০ ফিট্ উর্দ্ধে যে কাচ নির্ম্মিত সারসি বর্ত্তমান আছে উহা কখন কখন উত্তাল তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত উপলখণ্ডের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। এই উত্তাল তরঙ্গের দ্বারা বারিধির কতদূর গভীর দেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত হয় এখন তাহাই দেখিব।

হিসাব মতে দেখিতে গেলে তরঙ্গ যত ফিট্ উচ্চ হইবে, সমুদ্র গর্ভে তাহার ৩৫০ গুণ নিম্নে প্রতিঘাত হওয়া উচিত। যদি একটী তরঙ্গের উচ্চতা ৩৩ ফিট্ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিঘাত সমুদ্রের ১$\frac{১}{৪}$ মাইল নিম্নে পৌছিবার কথা। ইহাই হইল গণিত শাস্ত্রের হিসাব। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে উহা গভীরতার সহিত Geometrical proportionএ কমিয়া থাকে। কখন কখন ৬০০ ফিট্ নিম্নেও পৌছিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ঘটনা অত্যন্ত বিরল। সাধারণতঃ ৩০০ ফিটের নিম্নে প্রতিঘাত পৌছায় না; সে জন্যই প্রবল ঝড়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ডুবুরী জাহাজ দ্বারা উত্তাল তরঙ্গাকুল সমুদ্র পার হইবার কথা চলিতেছে।

এই তরঙ্গ যত উর্দ্ধ হয়, সাধারণতঃ উহা তাহার ১৫ গুণ দীর্ঘ হইয়া থাকে। যদি একটী তরঙ্গ ৫ ফুট্ উচ্চ হয়, তাহা হইলে তাহা ৭৫ ফুট্ দীর্ঘ হইবে-ইহাই রীতি। সেই রূপ ৫০ ফুট্ উচ্চ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ৭৫০ ফুটের অধিক হয় না।

তরঙ্গের গতি উহার উচ্চতা এবং জলের গভীরতার উপরে নির্ভর করে। তরঙ্গ দীর্ঘ হইলে এবং সমুদ্র গভীর হইলে উহার উচ্চতাও অধিক হইবে। অগভীর সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গ মালার গতি ঘণ্টায় ২০ মাইলের অধিক হয় না। আমরা তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং গতির পরিমাণ জানিতে পারিলে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করিতে পারি। অন্য দিকে আমরা তরঙ্গের উচ্চতা এবং জলের গভীরতা জানিলে তরঙ্গের বেগ নির্দ্ধারণ করিতে পারি। ভূমিকম্পের দ্বারা যে তরঙ্গ উদ্ভূত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ও বেগ উভয়ই অধিক হইয়া থাকে। ১৮৫৪ সনের ২৩শে ডিশেম্বর সেগুর জাপানে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার ফলে যে তরঙ্গের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার দৈর্ঘ্য ২১০ মাইল এবং তাহা মিনিটে প্রায় ৮ মাইল বেগে চলিয়াছিল।

তৈলের দ্বারা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গমালা প্রশমিত করা যায় এজন্য পারস্য উপসাগরের ধীবরগণ সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ হইলে জলের উপরে তৈল ছড়াইয়া দেয়। লেপ্টেনেণ্ট্ বেচ্‌লার (Lieutenant Bechler) এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন। তৈল তরঙ্গের আকৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া উহার তীব্রতা কমাইয়া দেয়। উহা দ্বারা জলের উপরে পাতলা রবারের আবরণের মত একটী আবরণ পড়িয়া যায়। সে জন্য বায়ু উহা ভেদ করিয়া উচ্চ তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে পারেনা, কেবল বিস্তৃত জলরাশি একবার স্ফীত হইয়া উঠে এবং পুনরায় নিম্ন গামী হয় মাত্র। এই রূপ উত্থানপতনে জল যানের বিশেষ ভয় থাকে না।

জল ভারি বস্তু বলিয়াই এই তরঙ্গের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হয়। যে ইঞ্জিনিয়ার এডেষ্টোন আলোকগৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি ঝঞ্ঝাবাতের সময় হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন—প্রতিবর্গফুটে তরঙ্গের আঘাত ৩২ মনের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে লাগিয়া থাকে; কিন্তু স্কেরিভোর আলোকগৃহ ঐ আঘাতের পরিমাণ প্রায় ৬৪ মন হিসাব করা হইয়াছিল। শীত ঋতুতে আটলাণ্টিক মহাসাগরে কোন কোন তরঙ্গ প্রতি বর্গফুটে ৮০ হইতে ১০০ মন চাপও দিয়া থাকে। এই প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিশাল প্রস্তর খণ্ডকে ক্ষুদ্র মার্বেলের মত ছুড়িয়া ফেলে। যখন হাটকে আলোক গৃহ প্রস্তুত হইতেছিল, তখন এক প্রবল ঝড়ে ৫৪ মন ওজনের ১৪ খানা প্রস্তর পত্রের মত দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল। তরঙ্গের ইহা অপেক্ষা অধিক শক্তির কথা লিপি বদ্ধ আছে। রিইউনিয়ন্ দ্বীপ পুঞ্জে তরঙ্গে ৫২০ বর্গ গজ একটি প্রস্তর খণ্ডকে সরাইয়া দিয়াছিল। যখন উইকবেতে সমুদ্র-জাহাজ রাখিবার এক নিরাপদ স্থান প্রস্তুত হইতেছিল, তখন

কঙ্কটের ২০০০০ মন এক বিশাল খণ্ডকে শীত ঋতুর প্রথম ঝড়েই বহুদূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল!

এই ভীষণ তরঙ্গাঘাতে সমুদ্রের তীরদেশ কিছু কিছু ক্ষয় হইতেছে। ক্ষয়ের পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান নহে। ক্ষুদ্র উপল খণ্ড বা নুড়ি দ্বারা তীরদেশ অনেকটা রক্ষা হইয়া থাকে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

---

# স্মৃতির আরতি।

## কবি মনোমোহনের একটী গান।

অল্পদিনের—পঁচিশ বৎসরের কথা বলিতেছি।

স্বর্গীয় কবি মনোমোহন সেন কবিবর রবীন্দ্রনাথের এক-জন ভক্ত শিষ্য ছিলেন। অবশ্য তখনও তিনি কবিকে দেখেন নাই। তাঁহার কবিতা পড়িয়াই মুগ্ধ-ভক্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময় প্রাচীন 'ভারতীতে' ও সদ্য নবীন 'প্রদীপে' কবিতা লিখিতেন। 'সাধনা' তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

প্রদীপে ও ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের যখন যে কবিতাটী বাহির হইত আমরা একত্রে মিলিয়া তাহা পাঠ করিতে, অর্থ করিতে ও মুখস্থ করিতে চেষ্টা করিতাম। অর্থ বুঝিতে পারিলে, অথবা না পারিলেও নিজ নিজ ভাব লইয়া অনুরূপ ছন্দে সেই কবিতার ন্যায় কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম। এইরূপ চেষ্টায় মনোমোহনের প্রয়াস যেমন সফল হইত, আমাদের তেমন হইত না। যাহা হউক, উভয়ের লেখা শেষ হইল আফিসের পর উভয়ে বাধা ঘাটলায় বসিয়া একে অন্যের বিচার করিতাম।

মনোমোহন খুব স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাবেই আমাকে আমার দোষ গুলি ধরিয়া দিতেন, এবং হাতে কলমে সংশোধন করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন।

কবিবরের অনেক কবিতারই ভাব ও অর্থ লইয়া আমাদের মধ্যে মতভেদ হইত। মতভেদ হইলে আমরা বাজি রাখিয়া শালিস মান্য করিতাম। বাবু অমরচন্দ্র দত্ত এবং কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ছিলেন আমাদের মতভেদের মীমাংসক।

কোন কোন স্থলে আবার এমনও হইত যে কাহারও সহিত কাহারও মত মিলিত না। কবিবরের কবিতা এক এক জনে এক এক রকম বুঝিয়া বসিতাম।

১৩০৫ সালের বৈশাখ সংখ্যার প্রদীপের প্রথম পৃষ্ঠাতে রবীন্দ্রনাথের "এবার চলিনুতবে" এই বিদায় গানটী বাহির হয়। যথাসময়ে কবিতাটীর ভাব লইয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। আমরা যে যে রকম বুঝিলাম, কবিকে উদ্দেশ করিয়া সে সেই রকমে উত্তর রচনা করিলাম। মনোমোহন তাহার কবিতাটী আমাকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন; কবিতাটী আমার নিকট এত সুন্দর বোধ হইল যে আমি আমার কবিতা লেখার বাতিককে সেই দিনই অক্ষমের অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। কবিতা যে অক্ষর গণিয়া ও কছরৎ করিয়া হয় না, তাহা বুঝিলাম। এই প্রৌঢ় বয়সে আজ তাহা মনে করিতে ও হাসি পায়, লজ্জায় যেন মরিয়া যাই।

কবিতাটীর অমর বাবু এবং দাস-কবি খুব সুখ্যাতি করিয়াছিলেন বটে কিন্তু আমার মনে হয় কবিবরের 'এবার চলিনু তবে' এই বিদায় গানের অর্থ করিতে আমরা চারিজনেরই চারিমত হইয়াছিল।

সেই বৎসরই রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেম এবং ১ম সংখ্যা ভারতীতে "দুঃসময়" কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেম। আমাদের কেহ কেহ বলিয়াছিলেন 'বিদায়' সঙ্গীতের উত্তর কবি নিজেই 'দুঃসময়' কবিতায় দিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের এ ধারণাও ঠিক কি না বলিতে পারি না।

মনোমোহন সকলের উৎসাহ পাইয়া কবিতাটী সুন্দর অক্ষরে লিখিয়া ও পুষ্প পল্লবে চিত্রিত করিয়া শিলাইদহে কবিবরের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আজ বহু দিন পরে বহু পুরাণো কলেজের খাতার ভিতর হইতে সেই অপ্রকাশিত কবিতাটী বাহির হইয়া পড়ায় তাহা উপলক্ষ করিয়াই এই কয়টী কথা লিখিলাম কবিতাটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রী :—

# কেন এ বিদায় গান ?

কেন এ বিদায় গান ?
সূর্য্য উজ্জল এ তীব্র মধ্যাহ্নে
কে চাহে পূরবী তান ?
জ্বলিছে আলোক ব্যাপিয়া আকাশ
সাগরে শেখরে সম পরকাশ
সে দীপক রাগে বিশ্ববাসী জাগে
পুলক আকুল প্রাণ।
দূর—দূর অতি সন্ধ্যা আরতি
দিবসের অবসান !
সূর্য্য উজ্জল এ তীব্র মধ্যাহ্নে
কে শোনে পূরবী গান ?

সবে হেরিয়াছি প্রভাতের রবি
তরুণ অরুণ করুণার ছবি,
সবে শুনিয়াছি ভোরের ভৈরবী
বলকণ্ঠ বহমান।
ওই যেন তার রয়েছে ঝঙ্কার
অমর অন্তিম তান।
সূর্য্য উজ্জল এ তীব্র মধ্যাহ্নে
কে শোনে সন্ধ্যার গান ?

এই ত প্রভাতী গেয়ে গেছে পাখী
ফুলে ফুলে ফুলে ভরেছিল শাখী
অমিয়া চুমিয়া মুদে মুদে আঁখি
মধুপ ধরেছে তান।
ললিত তরঙ্গে সুললিত অঙ্গে
সখীরা দিয়েছে মান।
কে গায় পূরবী ভোরের ভৈরবী
না হইতে সমাধান ?

ধীরে বেজে গেছে মধুর বিভাস
ধীরে রবিকর ভরেছে আকাশ
করিবে অচিরে অনল উচ্ছ্বাস
ভুবন দেদীপ্যমান।
এ পূর্ণ যৌবনে কে সথে ওখানে
অবসন্ন ম্রিয়মান ?

সবে বিন্দু বিন্দু সলিলের কণা
গোমুখীর মুখে এসেছে দেখনা
করিতে পৃথি, প্লাবন মগনা
এখনো রয়েছে বাকী
শুষ্ক ধরণী করিতে শীতল
চির শ্যামলতা মাখি'।

পতিত সগর রয়েছে চাহিয়ে
কবে সে অমৃত আনিবে বহিয়ে
ভস্মে অনল উঠিবে জ্বলিয়ে
তুমি যে ভরসা তার।
থাম থাম সখা বিষাদের সুরে
বাজায়োনা বাঁশী আর।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ভেদি নীলাকাশ
শুনিয়াছি তব গায়ত্রী সম্ভাষ
প্রাণপূর্ণ "ওম্" "বন্দেমাতরম্"
সৃজন কারিণী নামে
এ মধ্যাহ্নে তপ কর মহাতপ
ঝলসিছে যবে প্রবল আতপ
তেজোময়ী যিনি বৈষ্ণব রূপিণী
পালয়িত্রী ধরাধামে।

আজও বহুদূর আছে সন্ধ্যারাণী
ভীম শূলপাণি ভীমা সে রুদ্রাণী
চরণে যাহার অঙ্কিত সংহার
নিপতিত পতি প্রেমে।
শতযুগ পরে সে সন্ধ্যা আসুক
তাবৎ জগৎ কিরণে ভাসুক
ভোল অবসাদ বীরোদাত্ত নাদ
সাধ সাধ মতিমান্
সূর্য্য উজ্জল এ তীব্র মধ্যাহ্নে
গেয়োনা পূরবী গান।

শ্রীমনোমোহন সেন।

---

# সংবাদ।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় প্রণীত কবিতা পুস্তক "ফুলরেণু" বাহির হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবন-কথা—"স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস" বাহির হইয়াছে। মূল্য দুইটাকা।
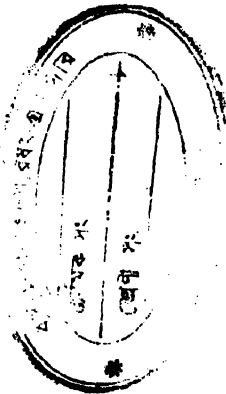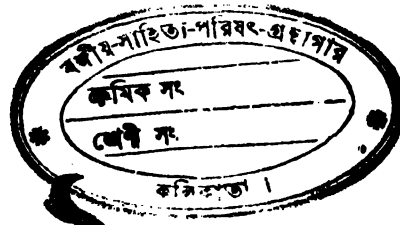
# সৌরভ

একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০। | একাদশ সংখ্যা।

## উপন্যাস ও লোকশিক্ষা।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে একমাত্র কলা সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাব্য ও উপন্যাসের উদ্দেশ্য নহে ; লোক-শিক্ষা প্রদানই কাব্য ও উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। কাব্য ও উপন্যাসের সাহায্যে যেরূপ সহজে লোকের চিত্তাকর্ষণ করা যায় তেমন আর কিছুতেই পারা যায় না। এই জন্য কাব্য ও উপন্যাস লোকের চিত্তশুদ্ধি সাধনের প্রধান সহায়। সাহিত্য জীবনের অভিব্যক্তি। জাতীয় জীবন সাহিত্যের প্রভাবেই গঠিত হয়। কোন্ জাতির কোন্ বিষয় বৈশিষ্ট তাহা সেই জাতির সাহিত্য আলোচনা করিলেই জানিতে পারা যায়। সাহিত্যের ভিতর দিয়াই জাতির ক্রম বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস পরিস্ফুট হয়। সাহিত্য ভাবের সৃষ্টি করে, ভাব জন সাধারণকে অনুপ্রাণিত করে এবং কর্ম্মের প্রেরণা দেয়। সুতরাং ভাবস্রষ্টা মহাকবিরাই জাতীয় জীবনের পথ প্রদর্শক। মহা কবিরাই জাতীয় জীবন গঠন করেন, জাতিকে বিশিষ্টতা প্রদান করেন।

কবি কাহাকেও ডাকিয়া উপদেশ দেন না। কবি মন্দ কার্য্যের জন্য কাহাকে তিরস্কার করেন না, আবার ভাল কার্য্যের জন্য কাহাকে প্রশংসাও করেন না। কিন্তু তাঁহার কলা সৌন্দর্য্যের এমনি মোহিনী শক্তি, তাঁহার ভাব ও ভাষার এমনি অসাধারণ মাদকতা যে, যে তাঁহার কাব্য পাঠ করে সে-ই মুগ্ধ হইয়া যায়। কবির আদর্শানুসারে নিজ জীবন গঠিত করিবার জন্য তাহার প্রাণে বলবতী ইচ্ছার উদ্রেক হয়। এই আদর্শ জীবন লাভের উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষাই জনসাধারণকে মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যায়। কবির ন্যায় শক্তিশালী শিক্ষক আর দ্বিতীয় নাই। জাতীয় জীবনের উপর কবির অসামান্য প্রভাব। সুতরাং কবির আদর্শ উচ্চ ও মহান না হইলে জাতীয় জীবনও উন্নত এবং মহিমামণ্ডিত হইতে পারে না। যে সাহিত্য সমাজে ধর্ম্ম ও পুণ্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস করে না, যে সাহিত্য মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়তা করে না, সেই সাহিত্য কলার হিসাবে উৎকৃষ্ট হইলেও সমাজের স্থিতি ও উন্নতির গুরুতর পরিপন্থী। সমাজের হিত বর্জ্জন করিলে সাহিত্য স্থায়ী হইবে কেন? সমাজের হিতের জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি। মানুষের জন্যই সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে, সাহিত্যের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। যে দিন সুগঠিত সমাজ কবিকে তন্ময় চিত্তে সাধনার সুযোগ প্রদান করিয়াছিল, সেই দিনই কবির মানস পদ্মে বীণাপাণী বাণীর প্রথম অধিষ্ঠান হইল। সমাজের উন্নতি ও প্রসারের সহিত সাহিত্য দিন দিন স্ফুর্ত্তি ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, পাপ-পুণ্য, উন্নতি-অবনতি—এই সকলই সাহিত্যের উপাদান। সমাজই সাহিত্যের জন্মদান করিয়াছে, সমাজই সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতেছে। আবার সাহিত্য সমাজের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়া এবং সমাজ দেহে নবশক্তি সঞ্চার করিয়া উহাকে উন্নত ও শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে। এইরূপে সমাজ ও সাহিত্য পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে। সুতরাং সাহিত্যের যে আদর্শ সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর ? তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষের উপকারের জন্যই সমাজ গঠিত হইয়াছে। যে দিন হইতে মানুষ সমাজ বদ্ধ

হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল সেই দিন হইতেই মানব জাতির উন্নতির সূত্রপাত হইল। মানুষ যদি পশু পক্ষীর ন্যায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিত তবে আজও উহারা গরিলা এবং শিম্পাঞ্জির ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিত। আজ যে মানুষ সাহিত্য ও কলায় শিল্পে ও বিজ্ঞানে এত উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা সামাজিক জীবনেরই ফল। সুতরাং সমাজের কল্যাণই সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। সমাজের হিতকে বিসর্জ্জন করিয়া যাহারা কলা সৌন্দর্য্যকে সাহিত্যের পবিত্র সিংহাসনে স্থাপন করিতে প্রয়াস করে তাহারা নিতান্তই অদূরদর্শী। তাহাদের চেষ্টা কখনও সফল হয় নাই এবং হইবে না। একমাত্র কলা সৌন্দর্য্যই যে সাহিত্যের প্রাণ সেই সাহিত্য ক্ষণিক আনন্দ দান করিতে পারে বটে কিন্তু মনের আত্মাকে উন্নত করিতে পারে না। ইন্দ্রজালের ন্যায় উহা সম্মোহন জন্মাইতে পারে বটে কিন্তু কোন জাতিকে মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয়া দিতে অসমর্থ। ইংলণ্ডের যুগ প্রবর্ত্তক কবি টেনিসন তাঁহার কলা-ভবন ( The palace of Art ) নামক কবিতায় দেখাইয়াছেন যে, যে বিলাসী ব্যক্তি সংসারের সুখ-দুঃখ, কাজ-কর্ম্ম হইতে দূরে থাকিয়া কেবল কলা সৌন্দর্য্য সম্ভোগেই নিবিষ্ট থাকে, তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর দ্বিতীয় নাই। টেনিসনের কল্পনা সৃষ্ট নয়নাভিরাম কলাভবনে মানব আত্মা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিল; কিন্তু দীর্ঘকাল কলার মাধুর্য্য মানব আত্মার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিল না। বিলাসিতার মধ্যে মানুষ আর কত দিন ডুবিয়া থাকিতে পারে? চারি বৎসর না যাইতেই কলা সৌন্দর্য্যে মানব আত্মার অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণা জন্মিল।

আধুনিক সময়ে ইয়ুরোপের জন কয়েক লেখক আর্টের 'দোহাই' দিয়া ভোগ লালসাপূর্ণ নিকৃষ্ট উপন্যাস লিখিয়া সমাজের গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের অনুকরণে এ দেশেও কেহ কেহ সেই বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিতেছেন। আমাদের দেশের লোকের এমনই অন্ধবিশ্বাস যে ইয়ুরোপ হইতে যাহা আইসে, তাহা সকলই ভাল। আমরা Anatole France এর কলা-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। Anatole France এর প্রশংসা আর আমাদের মুখে ধরিত না। অল্প কয়েক মাস হইল ফরাসী গবর্ণমেণ্ট Anatole Franceএর লেখার বিষময় ফল লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন এবং উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। Anatole France এর ধর্ম্মহীন, দুর্নীতিপূর্ণ পুস্তক সকল ফরাসী সমাজে ভোগ তৃষ্ণা ও উশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করিতে ছিল। যে আর্টের প্রভাবে সমাজে এইরূপ পাপের স্রোত বৃদ্ধি পায়, তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। এই শ্রেণীর নিকৃষ্ট নাটক ও উপন্যাস সকল নর নারীর হৃদয়ে উদ্দাম কামস্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়া সমাজকে নরকে পরিণত করিতেছে।

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ যেমন কলা-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তেমনি তাহার প্রভাবে সমাজে ধর্ম্ম এবং নীতির মহিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতিভাবান লেখকগণ কখনও কলা সৌন্দর্য্য বিকাশ করিবার উদ্দেশ্যে পাপকে লোভনীয় করিয়া চিত্রিত করেন নাই; তাঁহারা পুণ্যের প্রভাব কখনও খর্ব্ব করেন নাই। কাহারও সংযমের বাঁধ ভঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে, কখনও আপন কাব্যে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করেন নাই। ক্ষমতাশালী সাহিত্যিকগণ সর্ব্বদাই দুই দিক রক্ষা করিয়াছেন, কলা-কৌশল এবং ধর্ম্ম ও নীতির প্রভাব—যুগপৎ উভয়ই তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন। ক্ষুদ্র লেখকগণ আপনাদিগের অক্ষমতা হেতু অথবা রুচি ও প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনার বশে কেবল উদ্দাম ইন্দ্রিয় লালসা জনিত অবৈধ প্রণয়ের উৎকট চিত্র অঙ্কিত করিয়া সমাজের ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিতেছে। Monteqeu বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"Since we cannot attain to greatness let us have our revenge by railing at it" যখন আমরা মহত্ব লাভ করিতে অসমর্থ তখন চল আমরা উহার দোষ কীর্ত্তন করিয়া প্রতিশোধ লই।' কলা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার ধর্ম্ম এবং নীতির মহাত্ম প্রদর্শন করিবার প্রতিভা হইতে যাহারা বঞ্চিত তাহাদের পক্ষে ধর্ম্ম এবং নীতির বিরোধী হওয়াই স্বাভাবিক।

আধুনিক কলানুরাগিগণও এই কথা স্বীকার করিবেন যে সমাজই মানুষের উন্নতির মূল। সমাজ ধ্বংস হইয়া গেলে আমাদের সাহিত্য ও কলা, শিল্প ও বিজ্ঞান এই সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। সমাজের বন্ধন ছিন্ন হইলে

মানুষকে উদর পূরণের চেষ্টায় সেকালের মত আবার ইতর প্রাণীর ন্যায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইবে। সুতরাং আমাদের সুখ-শান্তি ও শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির জন্য সমাজের স্থায়িত্ব একান্ত আবশ্যক। সমাজের অধিবাসীরা প্রত্যেকেই যদি স্বেচ্ছাচারী হয়, তবে সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতার লীলা ভূমিতে পরিণত হইবে। রাজা, প্রজার বিষয় সম্পত্তি ও শরীর রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। কেহ সেই আইন ভঙ্গ করিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হয়। কিন্তু কয়জন অপরাধী ধরা পড়ে? আর ধরাপড়িলেও কয় জনের শাস্তি হয়? দোষী ব্যক্তি দণ্ড ভোগ করিয়া ও পুনঃ পুনঃ কুকার্য্য করিতে বিরত হয় না। আবার রাজার আইনের গণ্ডির বাহিরেও মানুষের এমন কতগুলি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে যাহা প্রতিপালন না করিলে সমাজে বাস করা অসম্ভব। ইন্দ্রিয় সংযম, মিতাচার, পিতৃ ও মাতৃ ভক্তি দাম্পত্য ভালবাসা, ভ্রাতৃ প্রেম, স্বজন প্রীতি, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি কতগুলি সদগুণ মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান এবং সমাজের স্থায়ীত্বের ভিত্তি স্বরূপ। কিন্তু আইনের সাহায্যে এই সকল সদ্গুণের অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও বাধ্য করা যায় না। এই জন্য মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণের জন্য এবং সমাজের স্থায়িত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে সকল দেশেরই দূরদর্শী মনীষিগণ কতগুলি নিয়ম ও বিধি-ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল নিয়ম ও বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিলেই মানুষ পূর্ণতা লাভ করিয়া সুখী হইতে পারে। এই বিধি নিষেধ হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পাপ ও পুণ্য সুনীতি ও দুর্নীতি জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। ধর্ম্ম ও নীতিই মানুষের চিত্তশুদ্ধি সাধন করে। যে সকল কবি এবং শিল্পী হিতকর সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বিরোধী আদর্শের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম ও নীতির অনুশাসন উপেক্ষা করিবার জন্য মানুষকে উত্তেজিত করে, সাহিত্যের অতি নিম্নস্তরে তাহাদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

আদি কবি বাল্মীকি লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যেই আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্রের চরিত্র তাঁহার মহাকাব্যে কীর্ত্তিত করিয়াছিলেন। রামায়ণ রচনার পূর্ব্বে মহাকবি বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের আদর্শের জন্য মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যিনি গুণবান, ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানেরত, বিদ্বান্ ও সত্যবাদী? নারদ তখন নরোত্তম রামচন্দ্রের চরিত্র কথা বাল্মীকির নিকট বিবৃত করিলেন। বাল্মীকি তদনুসারে সেই আদর্শ চরিত্র রামচন্দ্রের পুণ্য কাহিনী বিবৃত করিতে সংকল্প করিলেন। ইহার পর তমসার তীরে বিরহবিহ্বল ক্রৌঞ্চের মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দন শ্রবণে বাল্মীকির প্রাণের বীণা করুণ ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিল। তাঁহার কোমল হৃদয় ভেদ করিয়া কাব্যের উৎস উচ্ছ্বসিত হইল। সে-ই প্রথম ছন্দের বিকাশ। বাণীর রত্নসিংহাসন সেই শুভ মুহূর্ত্তে মহাকবির হৃদয় পদ্মে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল। বাল্মীকি তাঁহার মহাকাব্যে অভিনব মনোহর ছন্দে রাম চরিত্র বর্ণনা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বাল্মীকির আদর্শ যেমন মহান্ তাঁহার কলা কৌশলও তেমনি অতুলনীয়। রামায়ণে পুণ্য-প্রভার সহিত কলা-মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন হওয়ায় মণি কাঞ্চন সংযোগ হইয়াছে। ভারতবর্ষে রামায়ণের প্রভাব অসামান্য। হিন্দুর জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য রামায়ণের আদর্শেই গড়িয়া উঠিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইতেছে, তবুও রামায়ণের অমৃতের উৎস বিন্দুমাত্র শুষ্ক হয় নাই। প্রতিদিন পল্লীতে পল্লীতে ঘরে ঘরে রামায়ণ পঠিত ও শ্রুত হইতেছে। ধনী ও দরিদ্র, জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকলের নিকট রামায়ণের সমান সমাদর। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের এমন উচ্চ আদর্শ জগতে আর কোন কবিই অঙ্কিত করিতে সমর্থ হন নাই। কালিদাস-ভবভূতি হইতে কৃত্তিবাস-মধুসূদন পর্য্যন্ত কত কবি রামায়ণ হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া বিচিত্র মালা রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গলার গার্হস্থ্য জীবনে এখনও কৃত্তিবাসের রামায়ণের অসামান্য প্রভাব। এখনও মুদীর দোকান হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসের সমান আদর। কৃত্তিবাস এখনও বাঙ্গালার নরনারীর হৃদয়ে অজস্র শান্তির অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেছেন। ব্যাসের মহাকাব্য মহাভারতের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী জয় এবং পাপের অনিবার্য্য পতন ও প্রায়শ্চিত্ত এমন জ্বলন্ত ভাষায় আর কোন কবিই চিত্রিত করিতে পারেন নাই।

কোন কোন আধুনিক কলাবিৎ লেখক বলিয়া থাকেন যে কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি। তিনি কেবল কলা কৌশল

দেখাইবার জন্যই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কলার সাহায্যে লোকশিক্ষা দেওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কাব্যে কালিদাস অসামান্য কলা সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ইয়ুরোপের শ্রেষ্ঠ কবি 'গেটে,' জোন্স সাহেবের শকুন্তলার অনুবাদ পাঠ করিয়া এমন মুগ্ধ হইয়া ছিলেন যে তিনি শকুন্তলা সম্বন্ধে একটী কবিতা লিখিয়া স্বীয় প্রাণের আবেগ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত দুইটা পংক্তি পাঠ করিলেই গেটের মত সুস্পষ্ট বোধগম্য হইবে

"Wouldst thou the earth and heaven itself
in one Sole name combine ?
I name thee, o Sakuntala ! and all
at once is said"

এই শকুন্তলা নাটকও কলিদাস লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যেই যে রচনা করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে অধিক গবেষণার প্রয়োজন হয় না। যুবক-যুবতীর হৃদয়ে পরস্পরের দর্শন মাত্রেই যে অদম্য আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়, উহা প্রেম নয়; কামাতুরের রূপজ মোহ। ভোগায়তন দেহের রক্ত মাংসের ক্ষুধা চরিতার্থ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতেই এই মোহের উৎপত্তি। এই রূপজ মোহ অতি ক্ষণস্থায়ী। বন্যার জলের ন্যায় ইহা সহসা মানুষের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া অচিরে তিরোহিত হইয়া যায়। এই রূপজ মোহই গান্ধর্ব্ব বিবাহের ভিত্তি। গান্ধর্ব্ব বিবাহ সমাজের পক্ষে অতিশয় অকল্যাণ কর। এই সত্য প্রতিপাদন করাই "শকুন্তলার" উদ্দেশ্য। রূপমুগ্ধ রাজা দুষ্মন্ত ও তপোবন ব্যাসিনী আত্মহারা শকুন্তলার গোপন বিবাহের ফল কিরূপ বিষময় হইয়াছিল তাহা কালিদাস কি অপূর্ব্ব কৌশলে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। দুর্ব্বাসার শাপ একটী রূপক মাত্র

কালিদাস কলা সৌন্দর্য্য বিকাশে জগতে অতুলনীয়। এমন শিল্পী আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তিনি কখনও অসংযম এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতার চিত্র অঙ্কিত করিয়া অবৈধ প্রণয়ের উন্মাদনার সৃষ্টি করেন নাই। তিনি সংযমের সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত সমাজের কেন্দ্রস্থান প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'কুমারসম্ভব' কাব্যে কালিদাস দেখাইয়াছেন যে শুধু নিষ্কাম ত্যাগের ও কঠোর সাধনা দ্বারা প্রেম লাভ করিতে হয়; ভোগের পঙ্কিলময় পথে প্রেম লাভের আশা দুরাশা মাত্র। কবি দেখাইয়াছেন যে দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা প্রাণের সৌন্দর্য্যের প্রভাবই প্রবলতর ও কামের পরিণাম ধ্বংস, আর প্রেমের পরিণতি চির মঙ্গল ও চির শান্তি। কুসুমভারাবনতা নব লতিকার ন্যায় অতুলনীয় লাবণ্যবতী পার্ব্বতী স্বয়ং মদনের সহায়তা লাভ করিয়াও মহাদেবের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন না। হর কোপানলে মদন ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন পার্ব্বতী বুঝিলেন দেহের রূপ কিছুই নয়। তাই তিনি নিজের রূপকে মনে মনে নিজেই নিন্দা করিলেন। অতঃপর পার্ব্বতী প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার জন্য উগ্র তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। মূল্যবান্ বস্ত্রালঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া তিনি বল্কল পরিধান করিলেন। ব্রত চর্য্যার দুঃসহ কঠোরতায় পার্ব্বতীর কমনীয় দেহ দিবাভাগের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বিবর্ণ হইতে লাগিল। শৈবালের ন্যায় সুদীর্ঘ কুন্তল রাজি পিঙ্গল জটাজালে পরিণত হইল। তপঃক্ষীণা, নিরাভরণা ব্রহ্মচারিণী পার্ব্বতী এইবার যখন কেবল হৃদয়ের মাধুর্য্যে প্রদীপ্ত হইয়া মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন তখন তিনি তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। হরগৌরীর শুভ মিলনে প্রেম পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিল। যেখানে সংযম সেইখানেই শান্তি ও মঙ্গল; আর যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা সেইখানেই অশান্তি ও অমঙ্গল। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পরিণয়ের ঘটক ছিল মদন, তাই সেই মিলনের পরিণাম অশুভ হইল। হরগৌরীর মিলন হইল মদনের চিতা ভস্মের উপর, তাই সেই পরিণয়ে জগতের কল্যাণ হইল।

মেঘদূতে কালিদাস অসামান্য কলা সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যও লোক শিক্ষা। মেঘদূতে কবি দেখাইয়াছেন—অসংযমী কামুক ব্যক্তি স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে অসমর্থ; আর ভোগের পথে সুখের আকাঙ্ক্ষা দুরাশা মাত্র। কামুক যক্ষ কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া রামগিরিতে নির্ব্বাসিত হইল। রাম গিরিতে ইন্দ্রিয়াসক্ত যক্ষ প্রাণে নির্ম্মম দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল অল্পদিনের মধ্যেই যক্ষ বিরহে এমন শীর্ণ হইল যে তাহার হাতের বলয় খুলিয়া পড়িল।

লালসার অনল দিবারাত্রি তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। কালিদাস দেখাইয়াছেন—সামঞ্জস্যেই সুখ, আতিশয্যে দুঃখ। প্রেম যে পবিত্র বস্তু তাহাও সমতার সীমা অতিক্রম করিলে অশান্তি ও অমঙ্গলের কারণ হয়। আপন পত্নীর প্রতি অত্যধিক আসক্তিও পাপ। ভারতের বাল্মীকি ও ব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতি এবং ইয়ুরোপের হোমার ও দান্তে সেকসপিয়ার ও মিল্টন্ প্রভৃতি কালবিজয়ী কবিগণ লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যেই কাব্য রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল মনীষীর শিক্ষার প্রভাবেই আজ পর্য্যন্তও সমাজে ধর্ম্ম ও পুণ্যের প্রতি লোকের স্বাভাবিক অনুরাগ কিয়ৎ পরিমাণে অক্ষুন্ন রহিয়াছে। তাই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"উদ্দেশ্য ও সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে রাজা, রাজনীতি বেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজ তত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্ব্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবির পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং উপকার কর্ত্তা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তি সম্পন্ন।"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

## বধূ।

যে দিন হেরেছি তারে
　　পরাণ সঁপেছি তায়।
অনিমেষ আঁখি দুটো
　　মাখা স্নেহ মমতায়।
তাহার রূপের কাছে, জোছনা নিবিয়ে আছে
　　মধুর পরশে তার
　　　　মলয় মুরছা যায়।
বসন্ত হইতে বধূ আমার সে প্রাণ বধূ,
　　আকুল পিয়াসা মম
　　　　লুটিয়ে পড়িব পায়।
যে দিন হেরেছি তারে,
　　পরাণ সঁপেছি তায়।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়।

## বঙ্গবাণী।

"বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ পাঠ করিতেছে"—এই বাক্যের সংস্কৃত অনুবাদ করিবার কালে প্রথম শিক্ষার্থী বালকেরা "বিদ্যালয়ে ছাত্রাঃ পঠন্তি" ইহাই গুরু মহাশয়ের নিকট হইতে শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া "বাগানে ফুল ফোটে" এই বাক্যের অনুবাদ কালেও পূর্ব্ব নজির অনুসারে যদি "বাগানে ফুলানি ফুটন্তি" এই প্রকারের অনুবাদ পরীক্ষার কাগজে লিখিয়া ফুল মার্কস্ পাইবার আশা করে, তবে প্রমোশনের বেলায় তাহার ভাগ্যাকাশে যে আর একটা শূন্যাকাশ (বা Zero=o) আসিয়া যোগ দিবে না, তাহা কোন গুরু মহাশয়ই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বাগান শব্দটি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা, প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত, অথবা আরবি বা ফার্সী ততদূর শব্দ তত্ত্ব (Phylology) বিচার করিবার ক্ষমতা লইয়া ছেলেরা সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করে নাই। ফুল শব্দটি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ফুল ও বাগান উভয়েই অর্থচোরা শব্দ, একটিও বিশুদ্ধ সংস্কৃত নহে। কাজেই উহারা অশুদ্ধ দেহ লইয়া বিশুদ্ধ শ্রেণীর সঙ্গে বহু কাল যাবৎই অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া আসিতেছে।

তবে যদি আধুনিক কোনও ব্যবস্থাপক পণ্ডিত দয়া করিয়া একটা প্রায়শ্চিত্তের পাতি টাতি বিধান করেন, তাহা হইলে অন্ততঃ পূর্ব্বোক্ত "বহুকাল" বিশেষণটা উল্টাইয়া দিয়া উহারা হয়ত সময় সময় গা ঢাকা দিয়া সাধু সমাজেও চলিয়া যাইতে পারে। তবে ভাবনার কথা এই—ফোর্ট উইলিয়মের পক্ষপাতী ভাটপাড়া, নবদ্বীপ বা বিক্রমপুর প্রভৃতির পণ্ডিতগণ ঐ প্রায়শ্চিত্তের পাতিতে না দিবেন স্বাক্ষর, না দিবেন সায়। নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় কতকটা উদার স্বভাবাপন্ন। কাজেই 'নব বিধানের' মতে হিন্দুদের সঙ্গে অহিন্দুর আচারগত সাহায্যে যেমন কোনও আপত্তির কারণ নাই, বিশুদ্ধের সঙ্গে অশুদ্ধের প্রচলনেও তেমন কোনও বান্ধাবান্ধি প্রতিবন্ধক থাকা উচিত নহে। সাধারণ একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ থাকাতেই নাকি ভারতীর অমৃতভাষা (দেবভাষা) ক্রমে মৃত ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিশুদ্ধ বৈদেশিক শব্দকে বিশুদ্ধা দেবভাষা (সংস্কৃতভাষা) নিজের অঙ্গের সহিত ঘেষাঘেষি করিতে আজ পর্য্যন্তও
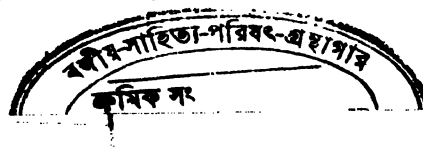
অংশল দিতে চান নাই, ইহাই নাকি অমরভাষার অকাল মরণের একটী অন্যতম প্রধান হেতু। সেই মৃতের জন্য তিল মাত্র অনুশোচনা না করিয়া দরদীর ন্যায় যতই সহৃদয়তা প্রকাশ করি না, কেন সেই মৃতকে বাঁচাইয়া তুলিবার উপযোগী কোন সঞ্জীবনী শক্তিই আর আমাদের মুঠার মধ্যে আসিবে না।

পূর্ব্বে যে ‘বাগানে ফুলানি ফুটন্তি’র কথা বলিয়াছি; শিশু বয়সের সেই অভ্যাস বশতঃ বি, এ ক্লাসের সংস্কৃত অনার্সের ছাত্রও যদি পরীক্ষিতব্য কাগজে “উত্তম-পোষাক পরিহিত্তো নরপতী রাগান্বিতঃ সন্ বিচারস্য তস্য তদন্তং কর্ত্তুং হঠাৎ সভা গৃহমাগতবান্” ইত্যাকার সংস্কৃত বাক্যাবলীর দ্বারা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া যথাকালে ফলের কাগজে নাম দেখিবার আশা পোষণ করে, চাই কি—একজামিনার লিবারেল হইলে ফার্ষ্টক্লাসের ভরসাটাও একবারে তাড়াইয়া দেয় না; তবে ইহা বলিতেই হইবে যে একজামিনার লিবারেল হওয়া সম্বন্ধে ছাত্রের অভিজ্ঞতার দৌড় মোটেই বেশী নহে। পোষাক শব্দটি যে হেম, অমর, মেদিনী, ধরণি, বিশ্বকোষ ও বাচস্পতি প্রভৃতি কোন মহাত্মাই নিজের গ্রন্থাঙ্গে ছাপ মারিয়া রাখিয়া যান নাই, ইহা তাহার অজ্ঞাত। বিশেষতঃ “উত্তমপোষাকপরিহিতঃ” এই প্রকার সমাস বদ্ধ পদ ব্যাকারণ শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অননুমোদিত। “পরিহিতোত্তম পরিচ্ছদঃ” এই প্রকার লিখিয়া বহুব্রীহি সমাসের মর্য্যাদা রক্ষা যেমন একদিকে নিতান্ত প্রয়োজন, অপরদিকে ভাষার রীতি বা ইডিয়ম ( Idiom ) রক্ষা করিয়া চলাও—অন্ততঃ অনার্স লাভ কারীদের পক্ষে—একান্তই সঙ্গত। পূর্ব্বোল্লিখিত সমগ্র পদটিতে শুধু যে ব্যাকারণ দুষ্টতা ও ভাষাগত রীতির অঙ্গহীনতাই পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহা নহে। পোষাক, হঠাৎ রাগান্বিত, তদন্ত প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে উহাতে গুরুচাণ্ডালী দোষ সম্পূর্ণ রকমেই উপলব্ধ হইতেছে। রাগ শব্দের অর্থ নব্য বাঙ্গালাতে যে ভাবে প্রচলিত পূর্ব্বে তেমন ছিল না। ইহার প্রকৃত অর্থ অনুরাগ বা আসক্তি, কিন্তু বাঙ্গালাতে ক্রোধ অর্থে প্রচলন। তবে বাঙ্গালার কোন কোনও পল্লী গ্রামের অশিক্ষিত প্রজাকে ক্রোধোদ্দীপ্ত মনিবের নিকট সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে শুনা যায় “কর্ত্তা কি আমাগর প্রতি অনুরাগ কল্লেন নাহি?” নিজেদের গ্রাম্যতাদোষ গোপনের উদ্দেশ্যে রাগ স্থানে অনুরাগ ব্যবহার। তদন্ত শব্দের অনুসন্ধান ( enquiry বা investigation ) অর্থে ব্যবহার সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় না।

ভাষাবিদ প্রথম চৌধুরী মহাশয় একদা তাঁহার আলোচনা মূলক কোন প্রবন্ধে বর্ত্তমান কালের বি, এল পরীক্ষার্থী ভাবী উকিলদের আইনের শেষ পরীক্ষার কাগজে তাঁহাদের লিখিত ইংরেজী ভাষার নমুনা দেখিয়া বড়ই আক্ষেপ করিয়া ছিলেন এবং ইংরেজের অনুকরণ করিতে গিয়া বাঙ্গালীরা যে অধিকাংশ স্থলেই কিম্ভুত কিমাকার হইয়া দাঁড়ায় তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদানচ্ছলে ঐ সমস্ত ভাবী বি, এলদের ( কেহ কেহ আবার এম, এ, বি, এল ) ইংরেজী ভাষার রীতিকে না-পছন্দ করিয়া সেই না-পছন্দটাকে সর্বজন সমক্ষে বিবৃত করিবার নিমিত্ত পত্রিকার গায়ে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই জল জীয়ন্ত ইংরেজী ভাষার যুগে ডিগ্রীধারীদের ভাষা সাধনাই যখন অপরিসমাপ্ত সেই অনুপাতে বহুকাল মৃতা সংস্কৃতবাণীর সাধনা করিতে যাইয়া অ-ডিগ্রীধারীরা যে স্বভাবতই কথঞ্চিত বিফল প্রয়াস হইয়া পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সংস্কৃত সরস্বতীর সম্মান যে চারিদিক হইতেই লঘু হইয়া আসিতেছে! হায় সরস্বতী!!

যে কারণে এত বড় একটা ভণিতা নিয়া দুচারিটি কথা উত্থাপন করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে তদুদ্দেশ্যে বক্তব্য এই যে গুরু চাণ্ডালী দোষটি শুধু সংস্কৃত ভাষাতেই অশোভন নহে। সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বঙ্গবাণীতেও তাহা অশ্রাব্যই শুনায়। খুব গাঢ় বদ্ধ ওজস্বী বাগ্‌বিন্যাসের সহিত হাল্‌কা গোছের ছেবলামো হেংলা ভাষা যে কিছুতেই খাপ খাইতে পারেনা এই তথ্যটি ভাষাজ্ঞান বিহীন একটা চাষার কাণেও খাসা প্রমাণ বলিয়াই পরিগৃহীত হইবে। বিগত অগ্রহায়ণ মাসের ‘মানসী ও মর্ম্মবাণীতে’ নদীয়ার সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুরের একটী সুললিত সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তৎপূর্ব্বে ১৩২৬ সনের ফাল্গুন সংখ্যা মানসীও মর্ম্মবাণীতে এবং ১৩২৭ সনের পৌষ সংখ্যা অর্চ্চনায় আমাদের ন্যায় অভাজন ব্যক্তিরও যৎসামান্য আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের জিজ্ঞাসা কৌতূহল

এবং পরবর্ত্তী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম,এ ভাষাতত্ত্বনিধি ও রাধাচরণ দাস মহাশয়দ্বয়ের মীমাংসা গবেষণা পাঠে শুষ্ক কাষ্ঠের ভিতরেও কণ্ডুয়নবৃত্তি জ্বালাময়ী হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় এমন কতগুলি অজ্ঞাতজন্মা শব্দ কুলীন শ্রেণীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গা-ঢাকা দিয়া চলিয়া আসিতেছে যে দূর হইতে উহাদের স্বরূপ নির্ণয় করাই প্রথমতঃ কঠিন হইয়া উঠে। অথচ স্বরূপ নির্ণয়ের পরে ময়ূর পুচ্ছধারী কাকের মত উহাদিগকে একেবারে দলবর্জ্জিত করাটাও অসমীচীন বা অসামাজিক বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালার এই সর্ব্বব্যপকতার দিনে অ-বাঙ্গালীও যখন বাঙ্গালী পর্য্যায় ভূক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে, সেই অবস্থায় অবঙ্গজ কতিপয় শব্দ বঙ্গভাষার অঙ্গে সংলগ্ন হইলেই যে উহার শোভা সৌষ্ঠব কিছু কমিয়া যাইবে তেমন মনে করিলে ভুল হইবে। হীরা মুক্তা চুনী পান্নার মত বাছা বাছা শব্দরাজি বিদেশের ভাষা ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া নিপুন শিল্পীর ন্যায় বঙ্গবাণীর অঙ্গে যথা স্থানে বসাইয়া দিলে রূপে গুণে, ওজস্বিতা, সরলতা ও অলঙ্কারে আমাদের মায়ের শোভা যে শতগুণ বাড়িবে বৈ কমিবেনা, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। পক্ষান্তরে যদি সেই বঙ্গবাণীরই সন্তান, কামার হইয়া কুমারের কাজ ধরিয়া বসে, মাটি ফেলিয়া লোহা পিটাইতে আরম্ভ করে, কিংবা কুমার হইয়া কাপড় বুনিতে প্রয়াস পায়, তবে যে "অঙ্গুলোকে লাঠি বাজিবেই বাজিবে।"

পরন্তু কানের দুল নাকে. পড়িয়া, হাতের বালা পায়ে জড়াইয়া, গলার হার কোমরে দুলাইয়া মা আমাদের চন্দ্রাপীড় দর্শন লালসায় কৌতূহলাক্রান্তা ব্যস্তালঙ্কারা জনপদ বধূর ন্যায়, অথবা লঙ্কা-প্রত্যাগত সীতাপতির পুনর্দর্শন লালসায় অযোধ্যাবাসিনী অস্থান সম্বন্ধ বসন ভূষণা উদ্‌ভ্রান্তা রমণীর ন্যায় অথবা বসন্তকালের অপরাহ্নে শ্রীকৃষ্ণেরমোহন মুরলী ধ্বনি শ্রবণানন্তর বৃন্দাবন বিলাসিনী গোপ কামিনীদের ন্যায়—অদর্শনীয়া ও উপহাসাস্পদা হইয়া যাইবেন।

বাঙ্গালা ভাষার প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে ইহাকে সংস্কৃত ভাষার মত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ রাখিয়া জাতীয় সাহিত্যের ভাবী উন্নতি পরিকল্পনা চলিতে পারেনা। কেননা জাতীয় জাগরণের প্রচেষ্টা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যকে অবজ্ঞা করিয়া কোন জাতিই পৃথিবীতে স্বাধীনতার সুকোমল (?) অঙ্গ খুজিয়া পায় নাই। এই নিমিত্ত সমগ্র ভারতবর্ষের ভিতরেও একটা সাধারণ ভাষার প্রচলন প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালার মুসলমান ভ্রাতৃগণ যখন বাঙ্গালা মায়েরই ফলে-জলে শস্যে দুগ্ধে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত তখন তাহাদের মাতৃভাষাও যে প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া পুরাতনের দোহাইকেই আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারেনা এই ভাবনাটিও তাহাদের উদার অন্তঃকরণে থাকা উচিত। কি হিন্দু কি মুসলমান কি জৈন কি খৃষ্টান সকল বঙ্গবাসীরই ভাষা যদি বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়ায়, অথচ ফৌজদারী আদালতেও প্রাদেশিক ভাষাই চলিতে থাকে তবে এককালে মহীয়সী বঙ্গভাষার প্রসারের প্রতি অপরদেশীয় ভাষার ঈর্ষ্যার কারণ হইয়া উঠিবে।

গণিতে. দর্শনে, আইনে, ভেষজে (মেডিসিনে) আমরা যদি বৈদেশিক শব্দ স্থানে বঙ্গভাষার প্রয়োগ করিয়া দেশীয় শিক্ষা প্রচলনে পক্ষপাতী হই, তবে সর্ব্বসাধারণের সেই পক্ষপাতীত্ব সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয় কিছুতেই তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেনা—যদিও উহা সময় এবং সাধনা সাপেক্ষ।

তবে সেই সাধনার ফল যদি স্থান বিশেষের প্রীত্যর্থে প্রযুক্ত হয়, সমগ্র বঙ্গদেশের সন্তান যদি তাদৃশ অনুবাদ সম্বলিত বাঙ্গালা ভাষার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে না পারে, তবে সেই পরিশ্রম পণ্ডশ্রম বলিয়া অবজ্ঞাত হইবে। দেশ বিশেষে প্রচলিত কথ্যভাষা যদি নিজের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত অপরাপর দেশের সন্তানদিগকেও সেই মাহাত্ম্যেরই পূজা করিতে আহ্বান করে তবে অপরাপর দেশ বাসিগণ নিজেদের কথ্যভাষা পরিত্যাগ করিয়া অপরের আহ্বানে সাড়া দিবে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। সার্ব্বজনীন সাহিত্যের ভাষা সমানগঠনের না হইলে মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম বিভক্ত হইয়া পড়িবে; লর্ডকার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গে যে সমস্ত কাল্পনিক আশঙ্কা মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা আপনা হইতেই মাথা নাড়া দিয়া উঠিবে। চাটিগাঁর ভাষা তখন বীরভূম বাঁকুড়া বাসীরা বুঝিতে পারিবে না। vice versa। চাই কি—যে কতিপয় মুসলমান—আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা নহে "উর্দ্দু"—এই বলিয়া স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যৎকিঞ্চিৎ

প্রয়াস পাইতেছেন তাহারাও নিজেদের জন্য একটা ভিন্ন রকমের বাঙ্গালা ভাষা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। এই সমস্যার সন্ধিক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে এখন স্থান বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব পরিহার পূর্ব্বক, এবং হিন্দু মুসলমান ভেদ ভুলিয়া যাইয়া—সকলের পক্ষে সাধারণ মাতৃভাষার মন্দিরে সমবেত হওয়াই সঙ্গত।

কাছারী ঘরের পেছনে মস্ত বড় একটা ময়দান। তাহাতে আজ মিটিং বসিবে। খুব বড় একটা সামিয়ানা টানানো হইয়াছে। গ্রামের মুন্সী মোল্লা মৌলভীগণ হাজির হইয়াছেন চৌকিদার পাহাড়ায় নিযুক্ত, পঞ্চায়েৎ ও তহশীলদারগণ দোয়াত, কলম, কালী, কাগজ লইয়া ব্যস্ত। মাঝখানে সারি সারি টুল, টেবিল, চেয়ার সাজানো রহিয়াছে। সদর হইতে খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, দারোগা ও পুলিস সমভিব্যাহারে একটী জরুরী মোকদ্দমার তদন্তে আসিবেন। মোকর্দ্দমাটা ফৌজদারী। ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। মটরকারে চড়িয়া সপারিষদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া বৈঠকে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ও একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। চাপরাশী, আর্দ্দালী ও বেয়ারাগণ পেছনে আসিতেছে। বাবুদের জুতা, মোজা, হ্যাট্ কোট্ কলার নেকটাই, ঘড়ী, ছড়ী চেইন, চসমা প্রভৃতি পোষাকের রকমারি বাহার দেখিয়া চক্ষুতে তাক লাগিয়া যায়। চৈত্র মাসের গরম; হরদম পাখা চলিতে লাগিল, ইত্যাদি।

উল্লিখিত ভাষায় দেশী শব্দ কয়টা এবং বিদেশী শব্দইবা কয়টা—হিসাব করিয়া দেখিলে চমক্ লাগিয়া যাইবে। অথচ এরূপ ভাষা এখন আমাদের দৈনিক, সপ্তাহিক, দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক প্রভৃতি সংবাদপত্রে এমন কি বিখ্যাত মাসিক পত্রাদিতে ও অহরহঃ চলিয়া আসিতেছে। ঐ প্রকারের ভাষাকে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে হইলে হুকার মালা ও নৈচা উভয়ই বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু প্রয়োগ অনুসারে ঐ প্রকারের ভাষাকেও বাঙ্গালা সাহিত্যে আমল দিতে হইবেই। চতুষ্পাঠিকা না বলিয়া চেয়ার টেবিল ব্যবহার করিলে, বাষ্পীয়পোত বা লৌহশকটে আরোহন না করিয়া ষ্টীমার এবং রেলগাড়ী চালাইলে, ধর্ম্মাধিকরণের দিকে না যাইয়া আদালত বা কোর্টের আশ্রয় লইলে, বঙ্গভাষার মানহানির আশঙ্কা নাই। পরন্তু স্থান বিশেষে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া হতভম্ব বা ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া গেলে, দিকভ্রান্তি অবস্থায় দিশা হারা হইয়া পড়িলে, স্বকপোল কল্পিত চিন্তায় মনগড়া কথা কহিলে সংস্কৃত ব্যাকারণের নিকট জবাব দিহি করিবার দোষ ঘটিলেও উঠন্ত বাঙ্গালা ভাষার নিকট রেহাই পাওয়ার আশা আছে।

তাই বলিয়া—নেক্স্‌ট্ ইয়ারে এক্‌জামিনটা দিয়েই একছার চেঞ্জে বেরিয়ে পড়ব মনে করেছি। ইউ সি মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, ডিসপেপসিয়ায় আমার জলজ্যান্ত শরীরটাকে পিষে মারবার জো করে তুলেছি। তার উপর আজকে আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তার বল্‌লেন কি না কাল থেকে আমাকে ফুল ওয়ান্ আওয়ার মর্ণিং ওয়াক করতে হবে। দিন দিন যে আই সাইটটাও কমে আস্‌ছে ভায়া, তার একটা কিছু রেমেডি ট্রেমেডি খুজে পাচ্ছিনা। পুরীর ক্লাইমেট্ আমার সিষ্টেমে স্যুট করবে কিনা বল্‌তে পারো কি? সি-ব্রীজটার নাকি খুবই ডাইজেষ্টীং পাওয়ার আছে।

এই প্রকারের জগা খিচুরীর ভাষা কি বর্ষা কি শীত কোন কালেই মুখ রোচক হইবেনা। বর্ত্তমান কালের অনেক লেখকই মাতৃভাষার ভাণ্ডারে যথাসাধ্য দান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন সত্য কিন্তু সংযম ও সাধনার অভাবে কেহ কেহ গল্প ও উপন্যাসাদিতে রুচিবিরুদ্ধ চরিত্র চিত্রন করিয়া কেহ বা সাম্প্রদায়িক নিন্দা কুৎসা অঙ্কিত করিয়া স্বকীয় একদেশদর্শিতার পরিচয় দিতেছেন। শুধু ইহাই শেষ নহে, এক শ্রেণীর লেখক ভাষাতে অধিকারী না হইয়াও নিজেদের ভাষাকে খাসা মনে করিয়া জন সাধারণকে হাসাইতেছেন। শুনিতে পাই বাঙ্গলা ভাষাটাকে ব্যবসা বণিজ্যের বাজারে স্বল্প কথায় চালাইবার নিমিত্ত অনেকেই নাকি ইহার পরিমিত ব্যবহার লঘু প্রচলন ও দ্রুত প্রচলন পছন্দ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেখানে ছোট খাট একজন মহারাণকে সম্মুখে দাঁড় করাইলেই শোভন হয়, সেই স্থানে লম্বা চওড়া সুদীর্ঘ একজন বেখাপ্পা "মহারাজাকে" প্রায়শঃই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে। বুঝিবা "হোমড়া চোমড়া অজা গজার সঙ্গে মিল খাওয়াইবার নিমিত্ত "···মহারাজা" ব্যবহার করিয়া নিজেদের ব্যবসা (?) বাণিজ্যের থিওরির ব্যত্যয় করেন।

তারপর পদ্যের দেখা দেখি গদ্যের ভাষায়ও অনেক স্থানে

প্রয়ম, বরণ বরষণ, ধরণী প্রভৃতির ব্যবহার চলে। "পরন্তু" শব্দের ব্যবহারে যেখানে কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেখানে অবৈধ 'অপরন্তু' শব্দটাকে টানিয়া লইবার দুশ্চেষ্টা দেখা যায়। অগত্যা 'অপরন্তু শব্দ দ্বারাও কি কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

অন্য প্রকার নমুনা—

যে সাহস, যে বীরত্ব ও যে উচ্চ মহান শিক্ষা একদিন এই বীর প্রসবিনী ভারতবর্ষকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, আজি কৈ সে বীর্যবত্তা কৈ সে তেজোবত্তা? সবই যেন শান্তি দায়িনী মৃত্যুর কোলে এলাইয়া পড়িয়াছে।

—এই প্রকারের বাঙ্গলা রচনায় স্বভাবই আমাদিগকে চা পেয়ালার তুফানতোলা, সূর্য্যাঘাতে মৃত্যু, মুণ্ড পরীক্ষকের উষ্ণ অভ্যর্থনা প্রভৃতি ইংরাজী নবীশদের অপরিপক্ক মক্স করা তর্জ্জমার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইংরাজীতে দেশ-বাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, এইজন্যই ভারতবর্ষের বিশেষণ 'বীর প্রসবিনী (The nurse of heroes)। ভারতমাতা বা ভারতভূমি ব্যবহার করিলে অক্ষমতা ধরা পড়ে না। 'সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ' সম্বন্ধেও সেই কথা। ইংরাজীতে চন্দ্র ও মৃত্যু প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, এই কারণেই শান্তিদায়িনী মৃত্যুর কোল খানা এত কোমল ও এত আদরণীয়। তেজোরাশির দেখা দেখি তেজোবত্তাতে অবৈধ বতুপ প্রত্যয়, সুতরাংই ওকারের আবির্ভাব। তেজোস্বিতা, মনস্বিতা বা ওজস্বিতা শব্দ লিখিয়া লিখিয়া পাকা হইতে অনেক বিলম্ব।

"ইনি যে গুরুমহাশয় খোকা; দণ্ডবৎকর এঁকে, দণ্ডবৎকর।" পিতার এই সভক্তি উপদেশে একান্ত বাধ্য ভক্তিমান্ পুত্র "পেন্নাম হই গুরুমশাই" বলিয়া স্বাষ্টাঙ্গে (?) ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। ভক্তির আতিশয্য বশতই যে পিতা ও পুত্র উভয়েই উল্লিখিত বাক্যদ্বয়ে ভাষা বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন তাহা নহে, প্রকৃতপক্ষে পদের অন্তর্বর্ত্তী শব্দাদির বিশ্লেষণ পিতা ও পুত্র উভয়েই অজ্ঞাত। দণ্ড মানে লাঠি, তার ন্যায় হওয়া=দণ্ডবৎ হওয়া, অর্থাৎ দণ্ডের ন্যায় সটান মাটিতে পড়িয়া যাওয়া। কিন্তু দণ্ডবৎ করা নহে। দণ্ডবৎ করি ও প্রণাম হই, এই দুই পদে ক্রিয়াপদদ্বয়ের ব্যত্যয় করিলেই দণ্ডবৎ হই এবং প্রণাম করি এইরূপ অবিসংবাদী পদ নিষ্পন্ন হয়। সেই প্রকার, বিদায় হই, রোগী আরোগ্য হইয়াছে প্রভৃতি পদও সর্ব্বসাধারণের আদর্শস্বরূপ বঙ্গসাহিত্যে চলিতে পারেনা।

"কৃতান্ত তুল্য দুরন্ত এই বসন্তকাল, এসময়ে কান্তবিরহে অন্তঃকরণ একান্তই অশান্ত হইয়াছে, তাহাতে কিরূপে সরস বদনে মদনের বাণ সহ্য করি?"

কুলীন কুলসর্ব্বস্বের এবংবিধ ভাষায় অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি থাকিলেও বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার যুগে ততটা বাড়াবাড়ি গ্রাহ্য হইবেনা। তথা—

"কোকিলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" এবংবিধ ভাষাও বর্ত্তমানে ন অনুমোদনীয়া, ন অনুকরণীয়া।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ভাগবত শাস্ত্রী,
সাংখ্য-পুরাণ-কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ।

---

# ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত।

সৌরভে 'ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত' লিখিবার একটী আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন ধরিয়া আমার ক্ষীণ প্রাণের এককোণে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। গত পৌষ-সংখ্যা "সৌরভে" পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত "মায়ের গান" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে সাড়া পাইয়া আমার সেই সুপ্ত বাসনাটি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই অন্ন রোগে ক্লিষ্ট শোকে ভাঙ্গা দেহটা লইয়া, প্রাগুক্ত পূর্ণ বাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক "ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত" লিখিতে বসিলাম। লেখা যে কতদূর হইবে, তাহা ভগবান্ গৌর হরিই জানেন।

মেয়েলী সঙ্গীত অসংখ্য। সেই সব সংখ্যাহীন গীতাবলী আবার বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, পূজার মাল্‌সী, ব্রতের গীত, প্রাতঃ স্নানের গান, বিবাহের গীত, পুনর্ব্বিবাহের গীত, সহেলা অন্নপ্রাশন-চূড়াকরণ ও উপনয়নের গীত, স্নান কামানের গীত, বর-বধুর যাত্রার গীত, পঞ্চামৃত-সীমন্তোন্নয়ন সাধভক্ষণের গীত, বরশয্যার গীত ইত্যাদি বহু বিধ গীত মেয়েলী সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, সীতা-সাবিত্রী শ্রীরাধিকার বারমাসী, রামের বনবাস, নিমাইর সন্ন্যাস, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ।

নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এক প্রকার গায়িকা স্ত্রীলোক আছেন, তাহারা উপযুক্ত মত বেতন লইয়া বিবাহাদি উৎসব বাড়ীতে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বাৎসল্য রস সংপৃক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাই সেই কীর্ত্তনের বিষয়। ইহাকে "খেলা কীর্ত্তন" বা "গোপিনী কীর্ত্তন" বলে। এই গোপিনী বা খেলা কীর্ত্তন মেয়েলী সঙ্গীত।

ভাটি অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা "ধামালি" বা "ধামাইল" বলিয়া একপ্রকার গীত গাইয়া থাকেন। সে গুলি অধিকাংশই প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবি-রচিত রূপানু রাগের পদ। শ্রীকৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গই "ধামাইল" গীতের বিষয়।

দশ, পনর, কি বিশ-পঁচিশ জন স্ত্রীলোক মুক্ত প্রাঙ্গণে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া, তালে তালে করতাল দিয়া নাচিয়া নাচিয়া ধামালি গাইতে হয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোক দিগকে "ধামালি" গাইতে দেখা যায় না। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি "ধামাইল" লিখিয়া দিতেছি।

"গৌর বরণ, রূপের কিরণ, লাগ্‌ল নয়নে।
( লাগ্‌ল নয়নে সজনী, লাগ্‌ল নয়নে ॥ )
আমার গৌর অপরূপ, কোটি মন্মথ স্বরূপ,
সজনী, কখন চক্ষে দেখিনা এরূপ,
গোরা আড় নয়নের চাউনি দিয়ে, পরাণ ধরিয়া টানে।
যদি গৌর কুল পাই, আমার এই কুলের কাজ নাই,
সজনি, তিন কড়ার মূল কূলে দিলম ছাই,
আমি গৌর কুলে কুল মিশায়ে, সজনি, মজে রব তাঁর চরণে।
ভেবে জয় মঙ্গলে কয়, আমার গৌর রস ময়,
সজনি রসে মাখা তনু খানি হয়,
গোরায় রসে ডুবুডুবু আঁখি, একদিন চেয়েছিল আমার পানে।"

মেয়েলী সঙ্গীতে গীতি সাহিত্যের প্রায় অর্দ্ধাংশই সরস করিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত গীতাবলি কাহার রচিত, তাহার কোন নামের ভনিতা নাই। তবে যে সকল পুরুষের গান মেয়েরা আপনার করিয়া লইয়াছেন, এবং বৈষ্ণব কবি রচিত যে সকল পদাবলী মেয়েলী সঙ্গীতে মিশিয়াছে, তাহার দুই একটিতে রচকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, খাটি মেয়েলী সঙ্গীত গুলি পল্লীর স্ত্রীকবি কর্ত্তৃকই রচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলী এবং পুরুষের গান, বাছিয়া পৃথক করিয়া লইলেও, খাটি মেয়েলী সঙ্গীত সংখ্যায় অল্প হইবে না। হিন্দু ধর্ম্মের যাবতীয় শুভানুষ্ঠানেই মেয়েলী সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। কতক গুলি গীত বিধ্যুক্ত মন্ত্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। সে গুলি না গাইলে নয়; শুভ কার্য্য অঙ্গ হীন হইয়া যায়।

যদিচ মেয়েলী সঙ্গীতের অনেক স্থলে বর্ণ মৈত্রীর অভাব কি রচনা সৌন্দর্য্য শূন্য, তথাচ স্ত্রী কণ্ঠে গীত হইয়া রাগিণীর মধুরতায় গীত গুলি মধুর হইতেও সুমধুর হইয়া উঠে, ভক্ত ভাবুকের নয়নাশ্রু আকর্ষণে সমর্থ হয়, হৃদয়ের পরতে পরতে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব-বৈচিত্র্যের প্লাবন খুলিয়া দেয়, মানুষকে টানিয়া আর এক রাজ্যে লইয়া যায়।

মেয়েলী সঙ্গীতের ভাষা ও রচনা বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের ভাষা-রচনার মত উজ্জ্বল না হইলেও স্বাভাবিক কবিত্বের স্ফুরণ-শূন্য নহে। প্রাচীন পল্লীভাষায় রচিত, মেয়েলী সঙ্গীত সমূহ ভাষা দোষ দুষ্ট না হইয়া বরঞ্চ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে সমাধিক উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের একটি অঙ্গ বলিয়া এই গীত-রত্ন গুলি বাণী ভাণ্ডারে স্থান পাইবার যোগ্য।

বিবাহের গীতের মধ্যে গালি দেওয়ার এক রকম গীত আছে। সেই গালির গীতে এবং গর্ভাধান বিবাহের কোন কোন গীতে অল্পাধিক পরিমাণে অশ্লীলতার ভাঁজ আছে এই অশ্লীলতা টুকু এমন ভাবে গীতের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে গীতটি নীরস ও নির্জীব হইয়া পড়ে। বাস্তবিক ভাব রসের সমাবেশ না থাকিলে কাব্যোদ্যানের কমনীয়তা রক্ষা পায় না। রস, কাব্যের জীবনী শক্তি; ভাব, তাহার প্রাণ।

কন্যার মাকে পরিহাস পূর্ব্বক গীত দ্বারা গালি দিয়া মেয়েরা আমোদানন্দ উপভোগ করিতেছেন।

"ঘর থাক্যা কন্যার মায় কমর দেখাইছে
এরে দেখ্যা ঢুলী বেটায় গোট গড়াইছে॥" ইত্যাদি।

কন্যার মা গীত শুনিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত বদনে মৃদু মধুর হাসিতেছেন, আর কার্য্যানুরোধে ঘরে বাহিরে আসা যাওয়া করিতেছেন। উপর্য্যুক্ত দুইটি পদে এইরূপ একখানি আনন্দ-চিত্র আঁকিয়া দিতেছে।

বিবাহ বাড়ীতে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষীয় আত্মীয় স্বজনের উপরেই অল্পাধিক পরিমাণে গালি বর্ষিত হইয়া থাকে। আগন্তুক নাপিত ধোপা এমন কি, পুরোহিত ঠাকুরকে পর্যান্তও ভাগ লইতে হয়। নাপিত বর কিম্বা বধুকে কামাইতে বসিল, মেয়েরা গান ধরিলেন,—

"আমার সোণার চাঁদকে কামইতে ;—
নবদ্বীপের নাপিত আইসাছে।
হাত ভালা কামাও নাপিত, হাতের দশ নোখ রে।
পাও ভালা কামাও নাপিত, পায়ের দশ নোখ রে।
মুখ ভালা কামাও নাপিত, পূর্ণমাসীর চান্দরে।
মাথা ভালা কামাও নাপিত, ডাব নারিকলরে।
ভালা কইরা কামাইলে, পাইবে স্বর্ণী বাড়ীরে।
ভালা না হইলে নাপিত, খাইবে জুতার বাড়িরে।"

পুরোহিত নান্দী-মুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করাইতে যেই বসিলেন,—অমনি মেয়েরা গীত লইলেন,—

"বাছাই নান্দীমুখ করে,—শুভ কার্য্য করে।" ইত্যাদি। এই গীতটি গাইয়াই ধরিলেন বামুনকে,—

"উন্দ্রা বান্দ্রা বামুনরে, কত কলা লাগেরে,
যত কলা লাগেরে, দিব জামাইর মায়েরে।' ইত্যাদি।

রসজ্ঞ সাহিত্যিক লইবেন—কবিতা কুসুমের গোলাপ-গন্ধ; অশ্লীলতার পূতি গন্ধ তাঁহাদের আঘ্রাণের বিষয় নহে। ধূলার সহিত চিনি মিশ্রিত থাকিলে, পিপীলিকা ধূলা ফেলিয়া চিনিই গ্রহণ করিয়া থাকে।

পূজার মালসী গীত হইবার সময় আজকাল মধ্যে মধ্যে আমরা অন্দর মহল হইতে কবিওয়ালাদের ডাকসুর এবং স্বর্গীয় সাধক কবি রামপ্রসাদের গলা শুনিতে পাই।

"কালিকে, ওমা ভব পালিকে, বাঙ্গালীকে নিওনা আসাম।
তুমি আদ্যাশক্তি, ভগবতী,
সন্তানের প্রতি হইওনা বাম॥" ইত্যাদি।

'মা, মা, বলে আর ডাকবনা।
ছিলাম গৃহবাসী, বানাইলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ আউলাকেশী,—
দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা মৈলে কি তার ছেলে বাঁচেনা॥" ইত্যাদি।

জল ভরার গীতে বৈষ্ণব কবিদের প্রাচীন রূপানুরাগের পদই অধিক। আধুনিক পল্লী কবিদেরও রসাল রসাল অনেক পদ জল ভরায় স্থান পাইয়াছে। যথা,—

"গৌররূপ লাগিল নয়নে।
আমি কুক্ষণে চাহিয়াছিলাম গো,—
গৌরচান্দের পানে॥
কলসীতে নাইরে পাণী, আমি গিয়াছিলাম সুরধুনী,
গৌর কেবা না শুনি শ্রবণে।
একদিন জলের ঘাটে দেখে তারে, মরেছি পরাণে॥
গৌর থাকে রাজপথে,—
তোমরা কেউ যাইওনা জল আনিতে, গো
দেখলে তারে মরিবে পরাণে,
শেষে আমার মত ঠেক্‌বে তোরা,
গোপাল চান্দে ভণে॥" ইত্যাদি

এগুলি খাটি মেয়েলী সঙ্গীত নহে। খাটি মেয়েলী সঙ্গীত সকল বহুকাল পূর্ব্ব হইতে, পূজায়, ব্রতে, সহেলায় ও বিবাহাদিতে মন্ত্রবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহার কোন পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন নাই। একসুরে একটানে চলিয়াছে।

কার্ত্তিক পূজার গীতের বয়স নির্ণয় করা অসাধ্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সুরে যে ভাষায় চলিয়া আসিতেছে, এখনও সেই রূপই আছে। যথা,—

"বুলে আরে কার্ত্তিক যাইবাইন
অভিলাসে এরো, কে কে যাইবা,
সঙ্গে লো ঠমকী রাধা, কে কে যাইবা।
ঘর থাক্যা রামের পিসী বুলে—
আমি এরো আমি যাইবাম সঙ্গে লো
ঠমকি রাধা, আমি যাইবাম॥' ইত্যাদি।

সন্ধ্যা সময় হইতে আরম্ভ হইয়া পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সারা রাত্রি ভরিয়া নানারকমের গীত কার্ত্তিক পূজায় গীত হয়। নমুনা স্বরূপ একটা বাঘের গীত লিখিয়া দিতেছি—

"বাঘা কান্দেরে, বাঘুনীর লাগিয়া, বাঘা কান্দেরে।
বাঘা বুল বাঘুনী এই না পথে যাইও।
নবীনের গরু দেখ্যা ছেলাম জানাইও॥
এইরূপ হারুর গরুর দেখ্যা, রামনাথের গরু দেখ্যা ছেলাম জানাইও।' অর্থাৎ ব্রতে যতজন মেয়েলোক থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বাটীস্থ একজনের নামোল্লেখ করিতে

হইবে। নতুবা বাঘ রাগ হইয়া গরু মারিয়া ফেলিবে।

এই সকল প্রাচীন মেয়েলী সঙ্গীতের ভিতর ঐতিহাসিক তত্ত্বের অস্পষ্ট রেখা পাত আছে। প্রাচীন কালে ময়মনসিংহ যে জঙ্গলময় ছিল, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর উৎপাত ওযে বেশী ছিল, প্রাগুক্ত বাঘের গীতে তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। এখনও রাখালেরা বাড়ী বাড়ী মাগিয়া "বাঘের ব্রত" করে।

বিবাহের একটি গীতে কন্যা-পণ-প্রথার প্রমাণ দিতেছে।,

"তোর বাপে লো কন্যা বড় দুঃখু থৈছে,
বড় দুঃখু থৈছে ;—তোরে জুক্যালো কন্যা
টাকা বাটা লৈছে।
তোর টাকারে কুমার, তো'র সঙ্গে আইছে ;
তোর সঙ্গে আইছে।
আমার বাপেরে কুমার, দেশের বেবার লইছে॥
তোর বাপে লো কন্যা, বড় দুঃখু থৈছে,
বড় দুঃখু থৈছে।
তোরে জুক্যালো কন্যা শঙ্খ-শাড়ী লইছে।
তোর শঙ্খ-শাড়ীরে কুমার, তোর সঙ্গে আ'ই ছ।
তোর সঙ্গে আইছে।
আমার বাপেরে কুমার, দেশের বেবার ল'ছে"

ময়মনসিংহের ছোট ছোট বালিকারাও পুতুল বিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের অনেক গীত শিখিয়া ফেলে। এবং মধুর কণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় গাইয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলে। বধূ পুতুলটিকে পাল্কীতে তুলিয়া উলুধ্বনি পূর্ব্বক বালিকারা গলাগলি দাঁড়াইয়া গাইতেছে,—

"পুতলা যাওগো জামাইর ঘরে।
তিনদিন ধইরা আইছুইন জামাই,
রইছুইন ফুলের তলে॥
ফুলের তলে ঝামুর ঝুমুর, কলার তলে বিয়া,
কইত্যা অ ইছুইন, ছাওয়াল জামাই,
মড়ুক মাথাত দিয়া॥
আদরে আদরে বাবা,—আগে দিছ বিয়া।
এখন কেনে কান্দ বাবা, গামছা মুখ দিয়া॥"

বসন্তকালে স্ত্রীলোকেরা বসন্ত রায়ের ব্রতের পূর্ব্বে, সপ্তাহ কাল "উত্তম" পূজা করিয়া থাকেন। আমাদের নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণই "উত্তম।" তাঁহারই আর এক নাম "বসন্তরায়"।

বসন্তকালের অপরাহ্ন বেলায় কুমারী কন্যাগণ দ্রোণ ধুস্তুর, পলাশ, মন্দার, ভাণ্ডীর প্রভৃতি নানাজাতীয় বাসন্তী কুসুমে ডালা সাজাইয়া লইয়া বিল্ব, কদম্ব, নিম্ব অভাবে অন্য কোন বৃক্ষ মূলে সন্ধ্যাকালে উত্তমের পূজা করেন। ফুলের ডালায় ছোট ছোট মাটীর ঢেলা এবং ধান্য দূর্ব্বাও থাকে। কুমারীরা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক, ফুল, ঢেলা এবং ধান্যদূর্ব্বা উত্তমোদ্দেশ্যে বৃক্ষমূলে দিয়া দিয়া প্রণাম করেন। উত্তম পূজার মন্ত্র। যথা,—

"উত্তম ঠাকুর ভালা। আমি কালা।
উত্তম ঠাকুর ভালা। ঠাকুর দাদা কালা॥
উত্তম ঠাকুর ভালা। আমার বাবা কালা।
উত্তম ঠাকুর ভালা। আমার মা কালা॥" ইত্যাদি।

বাটীস্থ ভাই, ভগিনী পিতা, মাতা সকলকেই 'কালা' বলিতে হয়। কেবল উত্তম ঠাকুর কাল হইয়াও ভাল।

আহা কি সুন্দর দেবতার প্রাণ স্পর্শীমন্ত্র! এমন মন্ত্র বোধ হয় তন্ত্র, পুরাণ কি বেদেও নাই। কুমারীগণের কোমল হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উচ্চারিত এই সিদ্ধমন্ত্রের দিব্যধ্বনিতে দেবতার আসন না টলিয়া পারে কি?

পূজা সমাপন করিয়া মেয়েরা সেই পূজিত বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া গীত ধরেন,—

১। "কে তুলরে ফুল রাজবাড়ীর মাঝে।
ঠাকুর বাড়ীর ঝী গো আমি ফুলের অধিকারী।
(কে তুলরে ফুল,)
আগা ধইরা তুল ফুল, মাঝে ভ্যাঙ্গা পড়ে।
(কে তুলরে ফুল,)
সাজি ভইরা তুলে ফুল, খোপা ভইরা পরে।
(কে তুলরে ফুল.)
সাত ভাইয়ের বইনগো আমি,
ফুলের অধিকারী। (কে তুলরে ফুল,)

২ " কুঞ্জের মাঝে কেরে, কুঞ্জের মাঝে কে?
নন্দের ছাইলা কালাচান কৃষ্ণ এসেছে॥
এক দেউরী দুই দেউরী, তিন দেউরীর পরে।
তিন দেউরীর পরে গিয়া, পাইলাম ঠাকুরের লাগরে॥
(কুঞ্জের মাঝে কে?)
কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইলাইন একটুক পান।

রাধিকারে দেখইন ঠাউকরে, পূর্ণ মাসীর চান ॥

( কুঞ্জের মাঝেকে ?।

কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইল একটুক্ গুয়া।

রাধিকারে দেখইন্ ঠাউকরে, পিঞ্জরের সুয়া ॥

( কুঞ্জের মাঝে, )

বসন্ত রায়ের ব্রতের গীত আর অতিসার ব্রতের গীত প্রায় একই রকম। ঠাকুরের নিকট দৈন্যোক্তিই অধিক।

"খোপের কৈতর, উয়াপে খাইল,—
ঠাকুর অতিসার,—কি দিয়া পূজিব ?
গাছের কলা,—বাদুড়ে খাইল,—
ও ঠাকুর অতিসার, কি দিয়া পূজিব ?
আউটার দুধ বিলাইয়ে খাইল,—
ঠাকুর অতিসার, কি দিয়া পূজিব ?।" ইত্যাদি।

( সহেলা বা সই পাতার গীত। )

১। চলিলা কমলা গো —সহেলা পাতিবারে ;
চিড়া গুঁড়া নৈল কমলা,—ডাইলারে ভরিয়া ॥
কলা চিনি নৈল কমলা, পাইলারে ভরিয়া।
পান গুবারী নৈল কমলা,—বাটারে ভরিয়া ॥
পুষ্প দুর্ব্বা নৈল কমলা,—সাজিরে ভরিয়া।"

২। 'লঙ্গ ফুলের মালারে বেদনী সইয়ের গলে।
সীথার সিন্দুর বদল করে,—তানা দুইয়ে সইয়ে।
হাতের শঙ্খ বদল করে,—তানা দুইয়ে সইয়ে।
আয়না কাকই বদল কয়ে, তানা দুইয়ে সইয়ে॥"

( বন দুর্গা পূজার গীত। )

"ভক্তিভাবে পূজিবাম তোমারে গো,—
বন দুর্গা,—( ভক্তিভাবে,— )
হংস কৈতর দিবাম, জুলুঙ্গা ভরিয়া গো
বন দুর্গা,—( ভক্তিভাবে,— ) ইত্যাদি।"

মেয়েলী সঙ্গীত লিখিতে গেলে বৃহৎ একখান পুস্তক হইয়া পড়ে। সংগ্রহ করাও সহজ নহে। নিম্নে কয়েকটি গীত লিখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

১। ( পূজার মালসী। )

"কহে শম্ভু সেনাপতি,
রণে ভঙ্গ দিও না —
বধিলেত ব্রহ্মময়ী, —
ভবে জন্ম আর হবে না।

( দেবীর প্রতি। )

দুর্গে দুর্গে, ওমা দুর্গে, তারিণী দুঃখ হারিণি !।
বনের মধ্যে কর যুদ্ধ, আউলাইয়া মাথার বেণী ॥
কৈ যাও গো মা কৈলাসেশ্বরী —
ত্যজ্য কইরে কৈলাসপুরী,
কি ভাইবে মা ভবরাণী,
চলেছ গো, একাকিনী।
জানি জানি ওমা তারা,
তুমি শিবের নয়ন তারা,—
তোমাকে হইয়ে হারা,—
বাঁচবে না গো শূলপাণি।"

এই গীতটি অতি সুন্দর। নাগ মুক্তারামের দুর্গা পুরাণ হইতে পদভঙ্গাবস্থায় আসিয়া মেয়েলী সঙ্গীতে মিশিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তবে যে "শুম্ভ" স্থলে 'শম্ভু' হইয়াছে, সে জন্য মাতৃগণ দোষী নহেন।

২। ওমা বসন পৈর। ধ্রু
বসন পৈর, বসন পৈর মাগো, বসন পৈর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা পদে দিব আমি ॥
পাতালে আছিলা মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
মহীরাবণ কর্ত্তো পূজা, দিয়া নরবলী ॥
মাথায় সোনার মকুট ঠেক্যাছে গগনে।
মা হইয়া উলঙ্গ কেন --বালকের সনে ॥
বাম হস্তে রুধির ভাণ্ড---ডাইন হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড, কর্চ্চ রাশি রাশি ॥
জিহ্বায় রুধির ধারা, গলে মুণ্ডমালা।
হেট্‌মুখে, চাইয়া দেখ্ মা পদতলে ভোলা ॥"

এই গীতটিতে রণস্থলস্থিতা, হরহৃদাসীনা রণোন্মত্তা কালীকে, ভক্ত ভাবুকের বুকে সুন্দর করিয়া আঁকিয়া দিতেছে। আহা ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর !!

"জিহ্বায় রুধির ধারা গলে মুণ্ডমালা।
হেট্‌মুখে চাইয়া দেখ্ মা, পদতলে ভোলা ॥"

৩। "দুর্গা আমার বিপদ্ বিনাশিনী।
জয়তারা তারিণী মাগো, হিমালয় নন্দিনী।
মাগো তোমার পদে করে স্তুতি, রাম রঘুমণি ॥

ব্রহ্মা হৈলেন পুরোহিত, রাম হৈলেন যজমান।
কও ব্রহ্মা ভগবতীর পূজার বিধান ॥
শঙ্খ লাগে সিন্দুর লাগে, রজত কাঞ্চন।
কুম্‌কুম্‌ কস্তুরী লাগে,—আগর চন্দন ॥
সপ্তমী পূজিলেন ব্রহ্মা, সপ্ত উপচারে।
ভোগ নৈবিদ্যি দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে ॥
অষ্টমী পূজিলেন ব্রহ্মা, অষ্ট উপচারে।
বিল্বপত্র দিলেন ব্রহ্মা,—হাজারে হাজারে ॥
নবমী পূজিলেন ব্রহ্মা, নব উপচারে।
মেষ-মৈষ দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে ॥"

রামের দুর্গোৎসবে মেষ-মহিষ বলি পড়িয়াছিল কি না,—তাহা রাম আর রামের আরাধ্যা দেবী মা দুর্গাই জানেন। এ সম্বন্ধে রামায়ণ রচক মহাকবি বাল্মীকি কোন সাক্ষ্য দান করিয়া যান নাই।

ময়মনসিংহ শাক্ত প্রধান স্থান! মা ভগবতীর দুয়ারে মহিষ-পাঁঠা বলি দিলে তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন, এই নিখুত খাটি বিশ্বাসের বশীভূতা আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ সর্ব্বদাই কাহিলে কাতরে, দেবীর দুয়ারে যোড় পাঁঠা, যোড় মহিষ মানসিক করেন। মেয়েদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া, ব্রহ্মাও রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবে হাজারে হাজারে মেষ মহিষ বলি দিতে বাধ্য হইলেন।

"নবমী পূজেন ব্রহ্মা, নব উপচারে।
মেষ মৈষ দিলেন ব্রহ্মা হাজারে হাজারে ॥"

৪নং বিবাহের গীত।

"শুভ ক্ষণে আনিল গৌরীরে ও কি ওরে,
ইন্দ্র ধরিল ছাতি, বেদপড়ে প্রজাপতি,
নটেতে মঙ্গল ধ্বনি করে ॥
ওকি ওরে, অস্তম্পট করিদূর, দশ বাহু করি যোড়,
প্রণাম যে করিল বিশেষে।
ওকি ওরে, তুলাতুলি সপ্তবার, জয় ধ্বনি জোকার,
মশাল জ্বলিছে চাইরে পাশে ॥
ওকি ওরে, শিবের মুকুট মাথে, ফুল ছিটায়
বাম হাতে, নামাইল, ছাঁয়া মণ্ডপ ঘরে।
কি ওরে, দেখিয়া গৌরীর মুখ, শিবের মনে
কৌতুক, পঞ্চমুখে হাসে মহেশ্বরে ॥
ওকি ওরে, তবে সাত পাক ফিরি, পার্ব্বতী আর
ত্রিপুরারি, রৈল পূর্ব্ব পশ্চিম মুখে।
ওকি ওরে, জিনিয়া সে কোটি ভানু' দোঁহার
সুন্দর তনু, হেন রূপ দেব গণে দেখে ॥"

৫নং বিবাহের গীত।

"পুষ্কুণীর চাইর পারে,
চাম্পা নাগেশ্বর,
ডাল ভাঙ্গ, ফুল্প তুল,
বিদেশী নাগর।
দেখা দেলো, রায়ের ভগ্নী,
দেখা দে আমারে,
কত টেকার অলঙ্কারে শোভিব তোমারে?।
লক্ষ টেকার গয়না হৈলে, না শোভে আমারে।
তোমার হাতের বাজু হৈলে, শোভিবে আমারে।"

৬নং—বর বধূর যাত্রা সময়ের গীত।

"চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
মা রৈছেন্ বৌ ঘরা পাতিয়া।
চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
ভগ্নী রৈছে ময়ুর পাখা লৈয়া।
চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
পিসী রৈছেন্ ধান্য দুর্ব্বা লৈয়া।
চল কন্যা দেশে যাই আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
(আমার) মামী রৈছেন্ ঘৃতের বাত্তি লৈয়া।"

৭নং বর বধু বাড়ীতে পঁহুছিলে গীত।

"তুমি যে গেছলা রে বাছাই, নবীন শ্বশুর দেশে,
নবীন শ্বশুর দেশে।
তোমার শ্বশুর শাশুড়ীয়ে কি কি দান কর্চ্ছে?।
দিছিল একটা শালের গো যোড়া,
তারে থৈয়া আইছি, তারে থৈয়া আইছি,
তোমার বধুরে লৈয়া দেশে চল্যা আইছি ॥" ইত্যাদি।

কন্যাকে জামাতার সঙ্গে যাত্রা করাইয়া দিবার সময় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এক কূল কিনারা শূন্য করুণ রসের সমুদ্রে ডুবিয়া পড়েন। তখন মেয়েরা পদ্মা পুরাণের কবি নারায়ণদেবের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক, সাহে রাজার স্ত্রী

সুমিত্রার কথায় বাৎসল্যের উচ্ছ্বাস নিবৃত্তি করেন।

৮নং "ও ঝীগো, কেমনে বঞ্চিবা জামাইর ঘর।
বিপুলাকে কোলে করি, সুমিত্রা সে সুন্দরী,
সকরুণে কান্দয়ে বিস্তর॥
সদায় ঘুমের ভুলা, ভাল মন্দ না বুঝিলা,
( ও ঝীগো, ) জামাই তোমারে যাবে লইয়া।
সাত পুত্র আছে মোর, রূপেগুণে বিম্বাধর,
তাতে মোর নাহি এত দয়া॥
পদ্মা সনে যার বাদ, জীবনের নাহি সাধ,
কেমনে রব বুকে পাষাণ দিয়া।
নিশি কালে নিদ্রা যাইও সকালে মা জাগিও
গুরুজনে সেবিও মন দিয়া॥
শতেক বৎসর জীও, সাত পুত্রের মা হইও,
পাকা চুলে পরিও সিন্দুর।
মানিও স্বামীর কথা, না করিও অন্যথা,
কইও কথা অতি সুমধুর॥
( বিপুলার উক্তি। )
(মাগো) সাত ভাই কুশলে রউক, বাপের কল্যান হউক,
( মাগো ) তুমি থাকো জন্মের আয়োরাণী।
যদি সে কান্দহ মাও, আমার মস্তক খাও,
( মাগো ) কন্যা হৈলে হয় পরাধিনী॥,,

এই গীতটি গাইবার সময় গায়িকা স্ত্রীগণের এবং অপরাপর স্ত্রী পুরুষ সকলের মুখই বাৎসল্যের অশ্রু ধারায় সিক্ত হইয়া পড়ে

৯নং বর বধুর পাশা খেলার গীত।
আজু কি আনন্দ! ধ্রু
কি আনন্দ হৈল আজ্ রস বৃন্দাবনে।
মদনমোহন খেলে পাশা, মনমোহিনীর সনে॥
শ্রীকৃষ্ণ হারিলে দিবেন, বহু মুল্য ধন।
শ্রীমতী হারিলে দিবেন, এ নব যৌবন॥
শ্রীকৃষ্ণ হারিলে দিবেন, হাতের মোহন বাঁশী।
শ্রীমতী হারিলে হবেন শ্রীচরণের দাসী॥,,

১০নং একটি জল ভরা গীত।
তোমরা দেখ্‌ছনি সজনী সই জলে।
মদন মোহন, বংশীবদন, কদম্বেরী তলে॥
কুক্ষেণে জল ভর্‌তে আইলাম, কালীন্দীর কোলে।
মন হরিণী বান্ধা রৈল কৃষ্ণ রূপের জালে॥
যোড়া ভুরু, তেড়া আঁখি এমন কে দেখছে গকুলে।
হাসি হাসি কয় কথা, মন ভুলাইবার ছলে॥
ভুলি ভুলি করি মনে, অন্তরে না ভুলে।
অন্তরে পশিল রূপ, ভুলিব কোন ছলে॥
ভঙ্গী ধরে দাঁড়ায় কালা, কালী দিতে সতীর কুলে।
কুল বধুর কুল মজাইতে, কে আনল গোকুলে॥
মাথে চুড়া পীত ধরা, কর্ণে মকর কুণ্ডল দোলে।
লবঙ্গ মালতী মালা শ্যাম গলেতে ঝুলে॥
সাজনী কাচনী শ্যামের সবই বন ফুলে।
নারী কেমনে ধৈর্য্য ধরে, পুরুষের মন ভুলে॥
শুন শুন বিধু মুখী, হরকিশোরে বলে।
সকল জ্বালা দূরে যাবে—বন্ধুরে পাইলে॥"

এই গীতটীতে ভক্তের হৃদয় পটে যমুনা পুলিন সহ মদন মোহন রূপের ছাপ তুলিয়া দেয়।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

# স্নেহের দান।

১৭

মাখনকে তাড়াতাড়ি আসিবার জন্য অনুরোধ করিবার আর কোন প্রয়োজন রহিল না। কনক অবশ্য তাহার মাকে পুনঃ পুনঃই অনুরোধ করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল---"লিখ না মা, দাদাকে, আসিয়া এই উপদ্রব দূর করিয়া যাউক। এখনতো পরীক্ষা হইয়াই গিয়াছে, একবার কি আসিয়া দেখিয়া গেলে হয় না? নৈহাটী না থাকিয়া এখানেই থাকিলেন..."

উত্তরে মা বলিয়াছিলেন—"না মা, উপদ্রব দূর করা খুব সহজ নয়, অনর্থক আসিয়া কেলেঙ্কারী হইবে; মণির সহিত শত্রুতা জন্মিবে। এদিকে পরীক্ষা নিকট, পড়া শোনারও ব্যাঘাত হইবে।"

কনক তথাপি বলিয়াছিল "দু'দিনের জন্যই না হয় আসিয়া যাইতেন।"

মা মেয়ের মনের আগ্রহ বুঝিয়া বলিলেন "আম কাঁঠাল পাকিলে আসিতে লিখিব, যাক্ এই কটা দিন।"

বড় কর্ত্রীর প্রতি স্বামীজী সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মানসিক ক্লেশের অনেকটা লাঘবতা ঘটিয়াছিল। সুতরাং তিনিও আর অতিরিক্ত অনুরোধ প্রয়োজন মনে করিলেন না।

দ্বিপ্রহরে কনক তাহার নীরব কক্ষের নিভৃত শয্যায় শুইয়া খুব মনোযোগের সহিত মাখনের চিঠি পাঠ করিল। পত্র পাঠ করিয়া কনক চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। একবার—দুইবার—তিনবার পড়িল। কিছুতেই তাহার মনে শান্তি আসিল না। সে অনেকভাবে চিঠির অর্থ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেভাব ও যেন ঠিক একই রহিল।

কনক মাখনকে যেভাবে মনের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করিয়া কল্পনায় তাহাদের সংসার চিত্র রচনা করিয়া লইয়াছিল—মাখনের এই চিঠি নিতান্ত নির্ম্মম ভাষায় তাহার সেই কল্পনার খেলার ঘর ভাঙ্গিয়া দিবার ইঙ্গিত করিয়াছে। কি নিষ্ঠুর সে চিঠি!

চৈত্রের দীর্ঘ অলস দিন, শুইলে চক্ষুর পাতা অলসভাবে বুঁজিয়া আসে, মনকে আরামের দিকে টানিয়া নেয়। চিঠিখানা হাতে লইয়া কনক শুইয়াছিল; চিন্তার পর যখন তাহার মনে হইল—মা যখন মনে মনে সঙ্কল্পই করিয়াছেন, তখন এ নিশ্চয় হইবে। এই অনুকূল চিন্তার আশ্বস্তি ও আরামে কনকের মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল; তাহার চক্ষুর পাতা ধীরে ধীরে বুজিয়া গেল।

কনকের মা কনকের কোঠায় আসিয়া দেখিলেন; চিঠিখানা মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে; কনক নিদ্রিত। মাখন কনককে যে চিঠি লিখিত তাহাতে কোন গোপন সঙ্কোচভাব থাকিত না; কনকের মা তাহা জানিতেন, তাই কনক ও প্রায় সকল চিঠিই তাঁহাকে দেখাইত। এ চিঠিতেও তেমন কোন কথা নাই ভাবিয়া কনকের মা তাহা দেখিতে কোন শঙ্কা বোধ করিলেন না। তিনি চিঠিখানা নিঃসঙ্কোচে পড়িয়া ফেলিলেন।

চিঠি পড়িয়া মাখনের প্রতি তাঁহার অনাবিল ভালবাসা, স্নেহ ও বিশ্বাস—সম্ভ্রম ও ভক্তির সহিত যেন বাড়িয়া উঠিল। তিনি তাহা গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। গোপন রাখিবার অভ্যাসটীও তাঁহার নাই। সেই কারণে কনকও তাঁহার সঙ্কল্প জানিয়াছিল মাখনও যে না বুঝিয়াছিল তাহা নয়।

মা চিঠিখানা হাতে রাখিয়াই কনককে ডাকিয়া তুলিয়া ফেলিলেন।

কনক মার হাতে চিঠি দেখিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। মা বিছানার উপর চিঠিখানা রাখিয়া বলিলেন—'বেলা নাই, কত ঘুমাস?'

১৮

বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে একদিন ঘটক ঠাকুর আসিয়া এক পা কাদা লইয়া ছোট হিস্যার ফরাস আগলাইয়া বসিলেন। বিস্তর কর্ত্তা বার্ত্তা ও উত্তর প্রত্যুত্তর লইয়া লোকজন বাহির বাড়ী ও বাড়ীর ভিতরে যাতায়াত করিতে লাগিল। তিনি বিস্তর সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাত্র পাত্রীর কতকগুলি ফটোও লইয়া আসিয়াছেন।

পাত্রীর ফটোগ্রাফগুলি বড় কর্ত্রীর হাত হইতে ছোট কর্ত্রীর হাতে, ছোট কর্ত্রীর হাত হইতে কনকের হাতে, তারপর ক্ষেমী, উমা প্রভৃতির হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল।

ছোটকর্ত্রী কর্ম্মচারীকে বলিলেন—'ঘটক ঠাকুরকে বলুন স্নান আহার করিতে, তারপর যাহা হয়, বিকালে পরামর্শ করা যাইবে।"

বড়কর্ত্রী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কিবা বিবাহ করাইব বোন্? ছেলেই ছেলে নয়।"

কনক বলিল—একটা ফটোও সুন্দর নয়। সুন্দর হইলেও দাদাকে কোনমতে দেখান যাইত।"

বিকাল বেলায় ঘটক ঠাকুর মধ্যের দালানে আসিয়া মা ঠাকুরাণীদিগের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বড়কর্ত্রী, ছোটকর্ত্রী, কনক ও দাসীরা সব ভিতরের বারান্দায় বসিয়া পরামর্শ করিতেছিলেন। বড়কর্ত্রী উমাকে দিয়া বলাইলেন—"ইদিলপুরের সম্বন্ধ স্বর্গীয় কর্ত্তাই যখন ঠিক করিয়া গিয়াছিলেন, তখন ছেলের মত হইলে সে স্থানে সম্বন্ধ করাই আমারও মত; এখন আপনি চেষ্টা করিয়া দেখুন ছেলের মত করাইতে পারেন কি না?"

ঘটক সম্মতির আভাস পাইয়া সে পাত্রীরই পঞ্চমুখে তারিফ করিতে আরম্ভ করিলেন—"সে কি মেয়ে মা, যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী, যেমন তার রূপ, তেমন তার গুণ, ডানাকাটা পৈরী বলিলেও হয়। তা..."

কনক উমাকে বলিল—'ঝি, ফটোগ্রাফ তাঁর আছে কিনা জিজ্ঞাসা কর।"

ঘটক ঠাকুর উত্তর করিলেন—'তা'র ফটো কোথা পাব মা? সে যে দেশ! না আছে সেখানে তা'র, না আছে রেল, না আছে ফটোগ্রাফ। কিন্তু মা মেয়ে কি? সম্বন্ধ হোক, তারপর দেখিবেন। স্বর্গীয় কর্ত্তা কি না জানিয়া আমাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন? সে সম্বন্ধ সুখের ও গৌরবের হইবে; তাহা না হইলে—আমিতো আপনাদের দ্বারে চিরদিনই আছি···"

"সম্বন্ধে সুখ না হইলে তিনি থাকিলে কেবল কি হইবে?" বলিয়া কনক মুখে কাপড় দিয়া হাসিল।

বড় কর্ত্রী উমাকে মধ্যে রাখিয়া একটু জোড়ে বলিলেন—"সেতো কথাই; তবে আপনি ছেলের মন বুঝুন; ছেলে স্বীকার হইলে, আমার কোন আপত্তি নাই। এই মাসেই আমি বিবাহ করাইতে স্বীকার।"

ঘটক বলিলেন—"তবে রাণী মা, একবার কুমার বাবুকে ডাকাইয়া আলাপ প্রলাপ করুন। আমার উপস্থিত ক্ষেত্রেই হউক, অন্যান্য ফটোগ্রাফগুলিও যদি বাবু দেখিতে চান, দেখুন বিবির বিধানই হউক।"

বড়কর্ত্রী বলাইলেন—"আমি অনেকবার ডাকাইয়াছি, ছেলে আমার বশ না, কামাখ্যার ডাইনির হাতে পড়িয়াছে—" বলিয়া চক্ষু মুছিলেন। পাছে কথা রাষ্ট্র হয়, সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়—ভয়ে তিনি অধিক কথা বলিলেন না।

"আচ্ছা তবে আমিই দেখিব।" বলিয়া ঘটকঠাকুর আরো কতগুলি ফটো, ছোকরা চাকর গোপালের হাতে দিয়া সেগুলি ভিতরে দিতে ইঙ্গিত করিলেন।

এগুলি পাত্রের ফটো।

ঘটক বলিলেন "পাত্রেরও কতকগুলি ফটো সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি; দেখুন।"

শুনিয়াই কনক ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করিল।

ফটোগুলি দেখিবার কৌতূহল কাহারও কম ছিল না। সুতরাং সকলেই হাত ঘুরাইয়া ফটোগুলি দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে পারিল না, কেবল কনক।

একখানা ফটো হাতে রাখিয়া ছোটকর্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বড়কর্ত্রী বলিলেন—"এ ছেলেটী বড় ভাল ছোট বউ, যদি তোমার মন উঠে,' এ সম্বন্ধ করাইতে পার। কি স্বভাব ছেলের, আর কি পণ্ডিত ছেলে..."

"তুমি এ কার কথা বলিতেছ দিদি, ছবিতে কি স্বভাব আর পাণ্ডিত্যের কথা লেখা থাকে?" ঈষৎ হাসিয়া ছোট কর্ত্রী বলিলেন।

ছোটকর্ত্রীর কথায় বড়কর্ত্রী একটু বিচলিত হইয়া গোপালের হাতে ফটোখানা দিয়া ঘটকঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করাইলেন - "এই ফটো কার?"

ঘটক নম্বর মিলাইয়া বলিলেন "ক'লয়ার যদুনাথ রায়ের ছেলে। বড় হিস্তার আত্মীয়, নাম রমেশচন্দ্র রায়, এম, এ, পাশ করিয়াছে। এখন হাইকোর্টের উকীল হইবে। খুব পসার করিতে পারিবে—পণ্ডিত হইয়াছে।"

বড়কর্ত্রী বলিলেন—"আমিও তো তাই বলি। গত সন পরীক্ষার টাকা নিতে আসিয়াছিল। স্বামীজী দিলেন না, মণি তাহার সহিত কথাই বলিল না। আমার নিকট কাঁদিয়া বলিল—"এই শেষ ভিক্ষা পিসি মা"—সুন্দর স্বভাব আমি নিজ হইতে তার টাকাটা দিয়া পরীক্ষা দেওয়াইয়া ছিলাম। আমার ভাইপো সম্পর্ক—দূর সম্পর্ক। যদি গরীবে মেয়ে দেওয়ায় তোমার আপত্তি না থাকে—বাড়ী ঘর আছে, পিতা মাতা বর্ত্তমান, আপনার বলিবাও এ সংসারে দু'দশ জন দাঁড়াইবার মত আত্মীয় স্বজন লোক আছে। আমি অমন্দ বলি না। এমন যে ন অন্নং ন বস্ত্রং, তাও নয়—" বলিয়া ফটোখানা খুব ভালো নজরে দেখিয়া এবং নিজ বস্ত্রে মুছিয়া ছোটকর্ত্রীর হাতে দিলেন।

ঘটক বলিল—"জমিদারের ছেলে যদি চান, বেশ; গড়গড়ির জমিদার রাজেন্দ্র বাবুর ছেলে ঠিক করিতে পারি। সমকক্ষ ঘর, বাড়ীও কাছে। আত্মীয়তায় আত্মীয়তা, অভিভাবকে অভিভাবক, গার্জ্জিয়ান-আসন্নবন্ধু তাঁহার মত কে আছে? ক্ষমতায় তিনি অসামান্য—লাটসাহেবকেও এক কলমের খোঁচায় বরখাস্ত করিতে পারেন। দেখুন তেমন হইলে সেখানেই কথা পারিতে পারি...

বড় কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"লেখা পড়া কি পর্য্যন্ত করিয়াছে?"

ঘটক বলিল—"জমিদার ঘর করিতে হইলে লেখা পড়ার প্রশ্ন তুলিতে নাই। রাজেন্দ্র বাবুর ছেলে—এই যথেষ্ট।

তবে এ ছেলে যে নেহাৎ মূর্খ তাহা নহে। লেখা পড়া জানে এণ্টেন্স পর্য্যন্ত ফেল করিয়াছে।"

ছোট কর্ত্রী স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বলিলন—"না আমার আপাততঃ ছেলের দরকার হইবে না। মণির বিবাহই হউক। তারপর মণিই কনকের বিবাহ ঠিক করিবে। তখন ঘটক ঠাকুরকে আমি পুনরায় খবর দিব।"

ঘটক এখান হইতে বিদায় হইয়া মণি বাবুর উদ্দেশ্যে গেলেন।

বড় কর্ত্রী বলিলেন—"মেয়ের কি বয়স আসিতেছে, না যাইতেছে, ছোট বউ? তুমি কেমন নিশ্চিন্ত?"

ছোট কর্ত্রী বলিলেন—"কি করিব দিদি? তাই বলিয়া যারতার হাতে তো তুলিয়া দিতে পারি না।"

বড় কর্ত্রী—"তবে তুমি মাখনকেই ঠিক করিয়াছ বুঝি?" এবার বড় কর্ত্রীর স্বর ঘৃণা মিশ্রিত নহে।

ছোট কর্ত্রী বলিলেন—"একেবারে কিছুই ঠিক করি নাই; তোমাদের পরামর্শ ছাড়া কি কিছু করিতে পারি দিদি?"

বড় কর্ত্রী সহানুভূতির স্বরে বলিলেন—'অমন্দ কি? তবে কিছুই নাই—কেহ নাই—এই আর কি?'

ছোট কর্ত্রী খুব সাবধানতার সহিত বলিলেন—"দিদি ভগবান সহায় থাকিলেই সব আছে।"

## রমণী।

জগতের মাঝে তুমি নারী অতি ধন্যা;
ধরণীর বরণীয়া সুন্দরী কন্যা।
প্রকৃতির শোভা তুমি রমণীয়া রমণী;
সৃষ্টিতে নারী তুমি জগতের জননী।
স্বরগের ঝড়া-ফুল নেমে এস মর্ত্তে;
মানবের মন টানো নানা মোহাবর্ত্তে।
রূপে গুণে ভরে' আছো মানবের চিত্ত;
প্রেমিকেরে ঘিরে আছো নিয়ে প্রেম-বিত্ত।
তুমি দাও ধরণীরে নিতি নব শিক্ষা;
সন্তানে দাও নীতি, ভালোবাসা দীক্ষা।
অক্ষমে দাও তুমি উৎসাহ ক্ষমতা;
লাঞ্ছিতে দাও সদা স্নেহ ও মমতা।
আনো প্রীতি-ভাব কভু হানো বিষ দৃষ্টি;
স্বরগের শোভা তুমি প্রলয়ের সৃষ্টি।
কভু তব রমণীয়া সুন্দর কান্তি;
ভ্রান্তিতে ডুবাইয়া দূর করে শ্রান্তি।
বিধির বিধান কভু করিয়া বিচূর্ণ;
সৃষ্টি ও প্রেমে ভরা ধরা যার জন্যে।
প্রণমি তোমারে নারী আলো-করা অসনী;
চুম্বি চরণে তব স্নেহময়ী জননী।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

## প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

বিগত ভাদ্রের সৌরভে "জ্যোতিষে অয়ন সিদ্ধান্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত মহাশয় আশ্বিন সংখ্যায় উহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহার লেখা অনুসারে যদি "পূর্ব্ব পক্ষ নিরসন পূর্ব্বক যথার্থ পক্ষের স্থাপনকেও সিদ্ধান্ত বলা হয়" তবে আমার লিখিত সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থেও কোন দোষ হয় নাই। Theory অর্থে যাহা বুঝায়, উহাও তাহাই। Final conclusion অথবা decision হইল গণিতের formula অথবা Æsoph's Fableএর, কিম্বা বিষ্ণুশর্ম্মার moral সিদ্ধান্ত বা Theory শব্দের পাছে স্বতই যুক্তি সূচীত হয়। যেমন theory of light, theory of heat, theory of evolution etc. মোট কথা, এক কথায় কোন Theory বা সিদ্ধান্ত হয় না। বলিতে কি প্রাচীন "সংহিতায়" বা "সিদ্ধান্তে" বা 'তন্ত্রে" ঐ সকল বিষয় থাকিলেও ঐরূপ কোন গ্রন্থ বঙ্গভাষায় নাই। আর ঐ সকল শব্দে প্রয়োগ বা গ্রন্থের নামাকরণ শিথিলভাবেই (loosely) করা হইয়াছিল। এত শিথিল যে এগুলি বুঝিবার জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় ব্যাখ্যা, টীকা ও ভাষ্যের দরকার হইয়াছিল। সুধু তাহাই নহে, ভাষ্যের ও ভাষ্য করিবার দরকার হইয়াছিল। সিদ্ধান্ত শিরোমণির ভাষ্য 'বাসনা'। আবার বাসনার ভাষ্য "বার্ত্তিক"। মূল গ্রন্থের লিখিত বিষয় পর্য্যাপ্ত হইলে টীকার টীকা বা তস্য টীকার দরকার হইত না। Theory ও Theorem শব্দের মূল এক। আর উপপত্তি শব্দ

হইতেই উপপাত্ত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। একখানা সাধারণ জ্যামিতিতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। বঙ্গভাষার পাঠকবর্গের উপযোগী কোন জ্যোতিষগ্রন্থ না থাকায় অনেকেই জ্যোতিষের দোষ গুণ সম্বন্ধে বিচার করিতে পারেন না। এবং তজ্জন্যই নানা পঞ্জিকায় নানা মত দেখা যায়। যাহা হউক সিদ্ধান্ত কোন কোন স্থলে conclusion অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারিলেও বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ে ইহার পাছে Theory স্বতই ইঙ্গিত হয়। সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে Theory আছে বলিয়াই ইহা শিরোমণি। কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত (comprehensive) নহে। আর ইহাতে বিস্তৃত tables থাকাও উচিত ছিল।

যাহা হউক আমি যে শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছি সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে বার্ষিক অয়ন গতি ৫৪ বিকলা হইলে ঐ ব্যাখ্যা কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না। প্রতিবাদী মহোদয় তাহা খণ্ডন করিয়া দেখাইতে পারিলে সুখী হইতাম। মূলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সুধুই শাখায় পাতায় নাড়াচাড়া দেওয়া বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। বাহিরের বাহবা শুধু অস্মাদৃশ অজ্ঞলোকদিগকেই আকৃষ্ট করিবে, বিজ্ঞদিগকে নহে।

সিদ্ধান্ত রহস্যে বাস্তবিকই সিদ্ধান্ত নাই রহস্য আছে। ইহাতে এক তিলও মিথ্যা কথা বলা হয় নাই। ইহা প্রকৃত সত্য আর "কোন সিদ্ধান্ত অবলম্বন না করিয়া কোন করণ গ্রন্থ হইতে পারে না।" কিন্তু মাধবানন্দ কোন সিদ্ধান্ত বা Theory পূর্ব্বে লিখিয়া তৎপর সিদ্ধান্ত রহস্য গ্রন্থ লিখেন নাই। এই জন্যই তাঁহার গ্রন্থের নামকরণ রহস্য না রাখিয়া সিদ্ধান্ত রহস্য রাখিয়াছেন। কারণ ইহাতে সিদ্ধান্ত প্রচ্ছন্নভাবে আছে। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে একস্থলে লিখিয়াছেন যে "সিদ্ধান্ত রহস্যের আধার প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত ছিল, এবং উহাই বঙ্গদেশীয় কোন কোন পঞ্জিকার সিদ্ধান্ত স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।" আধার সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইলেও ক্ষেপ, দেশান্তর অক্ষান্তর প্রভৃতির অবতারণাকালে টীকা টিপ্পনীর (ব্যাখ্যার বা ভাষ্যের) দরকার ছিল।

ইংলণ্ড, জর্ম্মণী ও ফরাসী দেশের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ গণও ভারতবর্ষ হইতে অনেক জ্যোতিষ গ্রন্থ এবং সারণী ইউরোপে লইয়া গিয়া তাহাদের গণিত শাস্ত্র সম্মত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেক স্থলে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। সিদ্ধান্তের সঙ্গে করণের (অর্থাৎ theoryর সঙ্গে tablesএর) মিল থাকিলে তাহা অতি সহজেই আয়ত্ত হইত।

নাবিক পঞ্জিকাতে অনেক জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও চিত্র দেওয়া থাকে। যেমন James Brown's Nautical Almanacএ আছে। আমাদের দেশেও বিতর্ক স্থলে সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা এই প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকেন। সিদ্ধান্ত মহাশয় এখন বোধ করি বুঝিতে পারিবেন যে পঞ্জিকাকারের উপপত্তি দেখাইবার দরকার কি? যদি দরকারই না থাকিল, তবে জ্যোতিষ বচনে এই বিষয়ের (অয়নাংশের) অবতারণা করিবার দরকারই বা কি ছিল? পঞ্জিকাতে সূর্য্যসিদ্ধান্তের অয়নাংশের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াথাকে তাহা এক এক পঞ্জিকাতে এক এক প্রকারের (বিপরীত অর্থ বিশিষ্ট)। এগুলি পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তবে এগুলি লিখিবার তাৎপর্য্য কি? আশা করি আমাদের জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত মহাশয় সূর্য্য সিদ্ধান্তের অয়নাংশ সম্বন্ধীয় ঐ শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়া (চিত্রসহ) কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন। তাহা হইলে আমাদের সন্দেহ সম্যক অপনোদিত হইবে।

প্রচ্ছন্ন সত্য উদ্ঘাটিত হউক, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। কেবল গ্রন্থের বহ্বাস্ফোটে অপরিচিতকে পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে ফল ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন দিলেই চলে না। ফল ব্যবসায়ে আমাদের শাস্ত্রী মহাশয় অয়নের সঙ্গে নিরয়ন গোলাইয়া দিয়া প্রতিবর্ষে শুভ দিন নির্ণয় ব্যাপারে কয়টা যে ভুল করিয়া থাকেন, তাহার কি খবর রাখেন?

গণিত জ্যোতিষের সিদ্ধান্তের সঙ্গে করণের মিল রাখিয়া সংস্কৃতের পেচ হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্র উদ্ধার করা ও তাহা বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার সৌষ্ঠব সম্পাদন করা করা আমাদের দেশের সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী ও জ্যোতিঃসিদ্ধান্তদের কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সাধারণে ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, এবং লোকে আমাদের জ্যোতিষের প্রতি বীতরাগ হইবে না। আর পঞ্জিকাকারদের মধ্যেও মতামত নিয়া এত গোলযোগ হইবে না। এই উদ্দেশ্যে আমরা আপাততঃ

কয়েকটি শ্লোক সর্ব্বসমক্ষে তথা প্রতিবাদকারীর সমক্ষে এই সঙ্গে স্থাপিত করিতেছি। তিনি অনেকগুলি 'কেন'র অনুসন্ধান পাইয়াছেন। উক্ত 'কেন' সমূহের ভাণ্ড খুলিয়া তিনি উক্ত শ্লোক কয়টীতে নিহিত সত্য পত্রিকায় প্রকাশ করুন।

মার্জ্জিত ভাষায় আলোচনা করাই মার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচায়ক স্বয়ং বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও অজ্ঞের ভাষা প্রয়োগ করিয়া নিজের রসনাও রচনাকে কলুষিত করেন না। অথচ পুনঃ পুনঃ "উপহাস্যাস্পদ" প্রভৃতি চুটপদ্ম ব্যবহারে উপাধিদুষ্টতার পরিচয় দিয়া পাণিনি পাঠের অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

১। দিনং ন খগুং রস নিঘ্ন ঘস্রাৎ নবাঙ্ক গোঙ্কাংশ যুগংশকাপ্তম্। অব্দাৎ খতিথ্যংশ বিলিপ্তিকাঢ্যং ক্ষেপাচ্যুতং স্যাৎ স্ফুটপাত এষঃ। ক্ষেপ্যো গৃহাস্থো দহনো হুতাশো রবির্দ্বিবাণৌ গ্রহণে রবীন্দোঃ॥

২। দ্বি নিঘ্ন ঘস্রাত্রিখসপ্ত লব্ধ হীনাদ্দিনাৎ দ্বাদশ লব্ধ মিজ্যঃ অংশাদিরব্ধা ন্নিগমেন নিঘ্নাৎ খাগাভ্র নেত্রাপ্ত কলান্বিতশ্চ॥

৩। যে যে মাসের যে যে রাশি।
তার সপ্তমে থাকে শশী॥
সে দিন হয় পৌর্ণমাসী।
অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী॥

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

# "প্রতিবাদের প্রতিবাদের" উত্তর।

সুরেশ বাবুর উল্লেখিত জবাব পড়িয়া মনে হয় তিনি আমার প্রতিবাদে "অজ্ঞ" শব্দ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং শুধু আমাকে গালিদিবার জন্যই প্রতিবাদের প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। নচেৎ এত অবান্তর বিষয়ের অবতারণার কোনই হেতু নাই।

তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন যে তিনি যে শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু ইহা সত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার কৃত শ্লোক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বাদানুবাদের কোনও বিষয়ই নাই। কিন্তু তিনি মাত্র শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; ঐ শ্লোক ব্যাখ্যার হেতু স্বরূপে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের এক ভ্রমাত্মক সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং তাহা মূলভিত্তি করিয়া তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমি আমার প্রতিবাদে শুধু তাহাই প্রদর্শন করিয়াছি। তিনি এসম্বন্ধে একটী কথাও লিখেন নাই। তিনি সিদ্ধান্ত—শিরোমণি সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত রহস্যকে একশ্রেণী ভুক্ত করিয়া "ঐ সকল গ্রন্থে সিদ্ধান্ত নাই।" বলিয়া প্রথমে লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল আমি তাহাও লিখিয়াছি। সুরেশ বাবু এসম্বন্ধেও একটী কথা প্রতিবাদে লিখেন নাই। "ঐ সকল গ্রন্থ" এরূপ লিখাতে সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থেও সিদ্ধান্ত নাই ইহা বুঝা যায়। সুরেশ বাবু এত বড় একটী ভ্রমকে কি ভাবে ঢাকিতে চান তাহা আমরা বুঝিনা। তিনি ভাষ্য বলিতে বাঙ্গালা ভাষ্য বুঝেন, কিন্তু শুধু সিদ্ধান্ত-রহস্য কেন এ যাবৎ কোনও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষেরই বাঙ্গালা ভাষ্য হয় নাই। "বাসনার ভাষ্যকার্ত্তিক" ইত্যাদি কথা অতিঅসতর্ক ভাবে লিখিয়াছেন। তিনি টীকা, ভাষ্য প্রভৃতির পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই; উহার প্রত্যেক শব্দ বিশেষ ২ অর্থে ব্যবহৃত হয়। দেশীয় পঞ্জিকা নাবিক পঞ্জিকা নহে। ঐ দুইয়ের তফাৎ চিরকাল থাকিবে। দেশীয় পঞ্জিকাকে সিদ্ধান্তজ্যোতিষ করার চেষ্টা বৃথা।

সিদ্ধান্ত রহস্যের নাম লইয়া তাঁহার এত আপত্তি কেন বুঝিতে পারিনা। করণ গ্রন্থের নামে সিদ্ধান্ত শব্দ থাকিলেই কি তাহা সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের অন্তর্ভূক্ত হইবে? সিদ্ধান্তের বা সিদ্ধান্ত বিষয়ের রহস্য বা গূঢ়মর্ম্ম অর্থ করিয়া কি করণ গ্রন্থের নাম দেওয়া যায়না? সেজন্য কি ভাষ্যের ভাষ্য টীকার টীকা আবশ্যক হয়?

কোনও বিশেষজ্ঞ মধ্যবর্ত্তী না হইলে আমাদের তর্কের সুমীমাংসা হইবে না মনে করিয়া সৌরভসম্পাদকের পরামর্শ মতে আমি প্রবীন অধ্যাপক শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত রায় যোগেশ চন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম,এ মহোদয়ের নিকট সুরেশ বাবুর মূল প্রবন্ধ, আমার প্রতিবাদ এবং সুরেশ বাবুর প্রতিবাদের প্রতিবাদ একত্রে রেজেষ্ট্রি করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনিও তাঁহার উত্তরে মাত্র সিদ্ধান্ত

শব্দের অর্থ ও সিদ্ধান্ত-রহস্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থ কিনা তাহাই আলোচনা করিয়াছেন, এবং অন্যান্য বিষয় উহার আনুষাঙ্গিক বলিয়া উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক লিখিয়াছেন। সুরেশ বাবু যে theory অর্থে সিদ্ধান্ত ধরিয়া তাঁহার প্রবন্ধের গোড়া পত্তন করিয়াছেন, শ্রদ্ধেয় যোগেশ বাবু theory অর্থে সিদ্ধান্তের প্রয়োগ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। নিম্নে যোগেশ বাবুর পত্র অবিকল উদ্ধৃত হইল:—

"সবিনয় নিবেদন—আমি এখন বাঁকুড়ায় থাকি, অসুস্থ হইয়া এখানে আসিয়াছি, আপনার পত্র পাইয়াছি। অমরকোষে সিদ্ধান্ত শব্দের যে অর্থ আছে সেই অর্থেই সংস্কৃতে ও বাংলায় প্রয়োগ হইয়া থাকে। theory অর্থে পাইনা। মূল প্রবন্ধে লেখক উপপত্তি বা পরিদর্শনিকা লিখিলে তাঁহার তর্ক সুবোধ্য হইত। রাঘবানন্দের সিদ্ধান্ত রহস্যের প্রকৃত নাম "সূর্য্য সিদ্ধান্ত-রহস্য।" এখানি ক্ষুদ্র করণ, সিদ্ধান্ত নহে। আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকাতে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ দেওয়া হয় না আমার মতে এইটী দোষের। এ বিষয়ে পূর্ব্বে আমি প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম। আপনি অন্যান্য যে সব প্রশ্ন করিয়াছেন সে সবের উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। ইতি—

বিনীত—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সুরেশ বাবু কতকগুলি শ্লোক লিখিয়া আমাকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে আহ্বান করিয়াছেন মূল বিষয়ের সহিত উহার সম্বন্ধ নাই। উহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। কবির লড়াইতে ঐরূপ অবান্তর প্রশ্ন করিয়া প্রতিপক্ষকে জব্দ করার চেষ্টা দেখা যায় কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা এরূপ তর্ক প্রণালী আর দেখি নাই। যদি আমি তাঁহার প্রদত্ত নূতন ও অপ্রাসঙ্গিক শ্লোকাবলীর উত্তর দিতে না পারি তবে কি তাঁহার কৃত সিদ্ধান্তের সংজ্ঞা ঠিক হইবে? না সিদ্ধান্ত-রহস্য করণ না হইয়া সিদ্ধান্ত হইবে? যদি হয় তবে আমি নাচার। ইতি—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

---

এ সম্বন্ধে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ গৃহীত হইবে না। সৌঃ সঃ

# শুভ দৃষ্টি।

১

প্রিয়ার শ্মশানের শ্মশানাগ্নি নির্ব্বাপণ না হইতেই শ্মশানবন্ধুগণ প্রেত কার্য্য সম্পাদনান্তর আমাকে সত্বর দার সংগ্রহে ব্রতী হইতে বলিলেন।

আমি কি করিব, না করিব, স্পষ্ট কিছুই বলিলাম না; কেবল এইমাত্র মন্তব্য প্রকাশ করিলাম যে মনের সঙ্গে বুঝা পাড়া না করিয়া আমি এখনও এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিতেছিনা।

আপাততঃ এ উত্তরে তাহারা প্রীত হইলেন এবং আগ্রহ ব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন—'তাইতো তাইতো' এখনতো বুদ্ধি শুদ্ধিই একরকম লোপের মধ্যে; আচ্ছা বেশ, দুইদিন পরেই না হয় ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবে'।

মুহূর্ত্ত কালের জন্য শ্মশান বৈরাগ্য সকলকেই অভিভূত করে, তাই সমাজ বিগ্রহদের হস্তে আজি অল্প কথায় নিস্তার পাইলাম। শ্মশান না হইয়া বাড়ী হইলে এই ন্যাকামীর পুরস্কার হাতে হাতে লাভ হইত। সন্ন্যাস সংসারী মানবের এমনই চক্ষু-শূল স্বরূপ।

স্ত্রী বিয়োগ কি জিনিষ ভুক্তভোগীকে বুঝাইতে হয়না। ভোরে শব সৎকার করিয়া গৃহে ফিরিতেই, মা আনিয়া শিশু দুইটীকে সম্মুখে দিলেন। তাহারা তখনও অভুক্ত। আমাকে দেখিয়া আমার গলা ধরিয়া 'বাবাগো, আজ ভাত কে দিবে?" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আঘাতের উপর আঘাত! চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। মাতৃঠাকুরাণীও "আমি পূর্ণলক্ষ্মীরে হারাইলাম" বলিয়া রোদন জুড়িলেন। আমি নীরবে দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

বাড়ী ঘর শুদ্ধ হইলে মধ্যাহ্নে প্রতিবাসিনী একজন আত্মীয়া আসিয়া চারিটা অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। দাস দাসীতে মিলিয়া তাহাই ভক্ষণ করিলাম। খোকা খুকীকে মা তাঁহার ঘরেই খাইতে দিলেন। তাহারা আব্দারের স্থান না হইলে তৃপ্তি মত ভোজন করিতে পারে না।

বিকালে প্রধান অপ্রধান সমবেত হইয়া আমাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে বিশু খুড়ার মন্তব্য প্রকাশের অবস্থাটা একটু পৃথক। খুড়া বলিলেন —"বাপ দাদা চৌদ্দ

পুরুষ ধরিয়াইত স্ত্রী বিয়োগ হইয়া আসিতেছে? না মিথ্যা? কিহে? কেমন?"

তিনি বলিতে লাগিলেন "আচ্ছা, পরে আবার বিবাহতো সকলেই করিতেছে? না করিতেছে না? কি কথা বলনা যে?"

মোট কথা তিনি শ্রোতাকে নিজ সিদ্ধান্তের অনুগামী না করাইয়া কথা বলিতে পারেন না। সুতরাং আপত্তি স্থানে কৌশলে উত্তর করিয়া তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে লাগিলাম।

ক্রমে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা হইয়া পরস্পর বাগ বিতণ্ডা, তর্জ্জন গর্জ্জন, করসে হাত চাপড়া চাপড়ি গ্রাম্য বৈঠকের ষোল কলাই পূর্ণ হইয়া গেলে, ন্যায়ভূষণ কাকা "পতি পুত্রবতী নারী মৃয়তে ভর্ত্তুরগ্রতঃ" বচন আওরাইয়া আমাকে চন্দন ধেনু দান ও বৃষোৎসর্গ উভয়টারই উদ্যোগ করিতে বলিলেন। এবং বৈদেশিকদের নিমন্ত্রণ পত্রগুলি সেই দিনই ডাকে দিতে বলিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

আজ অশৌচ, সন্ধ্যা নাই। কয়েকবার গায়ত্রী জপিবার জন্য ঠাকুরের আঙ্গিনায় গিয়াছি,—দেখি তুলসীর গুড়ি অন্ধকার! অমনি অধীর আবেগে মন গাহিয়া উঠিল—

প্রভু, তোমার তুলসী তলায় কে দিবে আজ বাতি?

২

সাহিত্যিকের স্ত্রী বিয়োগ সাহিত্য কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির ও একটা পথ হইয়া দাঁড়ায়। সে পথে সিদ্ধিলাভও অনেককে করিতে দেখা যায়। 'সারদা মঙ্গল, 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' হইতে প্রেম ও ফুল, 'এষা' পর্য্যন্ত যতগুলি পুস্তক আমরা দেখিতে পাই, তাহা কেবল কাব্যাংশের দিক দিয়াই নহে, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও একটা বিশেষত্বের দাবী রাখে।

আমাতে তাদৃশী প্রতিভা না থাকিলেও স্ত্রী বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সংসারে যে সকল অভাব অভিযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সব লক্ষ্য করিয়াই আমি পরের দিন একটা কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। যথা—

ক্ষুধায় কাতর শিশু দুটী কাঁদছে প্রভু, ভোরে উঠি,
জানেত না ঘুমে ছিল কাল্‌কে সারা রাতি।
প্রভাতে তাই নয়ন মেলে, রোদন শুনেই বুঝতে পেলে
কাল্ যে মোদের হ'য়ে গেছে গৃহেতে ডাকাতি।
'বাবা গো'—আর কয় না কথা, কণ্ঠ চে'পে ধরছে ব্যথা
শিথিল দেহে স্কন্ধে দিল শির দুজনে পাতি।
সুস্থ হয়ে খানিক পরে, কইছে কথা কোমল স্বরে
'বাবা গো, আজ ভাত কে দিবে?' শুনে ফাটে ছাতি।
বুঝলাম প্রভু, ব্যাপারখানা একেবারে খুব সোজা না,
এ সংসারে গৃহীর ওটা নয় শুধু অরাতি।
যত দিন সে প্রাণে বাঁচে অনেক কথার আসান্ আছে
ম'লে পরে বুক ভাসানটা নয় কিছু অখ্যাতি।
গৃহ ধর্ম্মে থাকতে হ'লে, ওরে ছাড়া কাম কি চলে?
থাক্‌না কেন পাড়াপরশী খুব নৈকট্য জ্ঞাতি।
পুত্র কন্যা ভাতে মরে, আরো বিপদ দেখছি পরে
প্রভু, তোমার তুলসী তলায় কে দিবে আজ বাতি?

এই কবিতার ভাবে আমার মতলবের কথা কাহারও অজ্ঞাত রহিল না। বিশু কাকা আসিয়া হাসি মুখে 'এইত চাই, এইত চাই' বলিয়া আমার মাথায় আশীর্ব্বাদ বুলাইয়া গেলেন। তাহার এতখানি স্ফূর্ত্তির কারণ—তিনি সম্প্রতি চতুর্থদারে উপনীত হইয়াছেন, সুতরাং সমরুচির সংখ্যা বাহুল্যেই তাঁহার আনন্দ।

যা হউক অনতিকাল পরেই চারিদিক হইতে সম্বন্ধের তত্ত্ব আসিতে লাগিল। আমি কাহাকেও কোন সদুত্তর দানে সমর্থ হইলাম না। তখন—কি হয় কি হয় রণে জয় পরাজয়—মত আমার মনে কেবল আন্দোলনই চলিতে লাগিল।

৩

শ্রাদ্ধ হইয়া গেল প্রিয়ার অস্থিখানিও গঙ্গাতে নিক্ষিপ্ত হইল। মনে ভাবিলাম—প্রিয়াও মুক্ত, আমিও মুক্ত। পুত্র কন্যার ভার মা লইলেন। আমি বৈষ্ণব সাহিত্যের শরণ লইলাম।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে আপনাকে প্রকৃতি ভাবাপন্ন করিতে হইবে। বৈষ্ণব সাহিত্যে সে পথ অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, পুরুষ একমাত্র ভগবান, জীব মাত্রেই তাঁহার প্রকৃতি।

আমি দেখিলাম, এ অতি উত্তম সুযোগ। গোচন-নরহরি-বাসু ঘোষ প্রভৃতির চরিত্রানুধ্যানে আমি উত্তর উত্তর

উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিলাম। কিছু দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইলে মনের মলা-মাটি দুর হইয়া আমার চক্ষে যেন জগৎ জুড়িয়া এক আনন্দের বাজার খুলিয়া গেল। আমি তখন নাম সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত।

কিন্তু মা'র ভাবনার বিরাম নাই। তিনি সর্ব্বদা কেবল এই কথাই ভাবেন, আমার দুর্গাচরণ না কি শেষকালে আমাকে ফাঁকি দিয়া পালায়। আমি পুনঃ বিবাহ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সংসার পাতি, আমার মায়ের ইহাই ঐকান্তিক ইচ্ছা। আমি বলি—'মা, আর এই যন্ত্রণার আবশ্যক কি? আমি নাম কীর্ত্তন করিয়াই বেশ সুখে আছি।'

কিন্তু মা এ কথা কানেই তুলেন না।

আমার প্রেম বিকার দর্শনে মা এতই উতলা হইয়া পড়িলেন যে আমাকে একা কোথাও যাইতে দেন না, আমি যেখানে কীর্ত্তন গাহিতে যাই, মাও সেখানে গমন করেন।

বলিলে পাপ হয়, মা যেন সেই ন'দের নিমাইর অবস্থাটাই আমাতে পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন। শচী যেমন শ্রীবাস-মুরারি-গদাধরকে পাইলেই—"নিমাই যেন তার সন্ন্যাসী হইয়া না যায়' অনুরোধ করিতেন, আমার মাও আমার সঙ্গী সাথীদিগকে সেইরূপ মাথার দিব্য দিয়া বলিতেন "তোমরা দেখিও আমার দুর্গাচরণ যেন সন্ন্যাসী হইয়া না যায়।"

আমার ভক্তি রাজ্যের কোন কোন বন্ধু মা'র কষ্ট দেখিয়া আমাকে যখন বিবাহ করিতে বলিতেন, আমি বলিতাম :—

করিয়াছি হরি পদে মতি সমর্পণ,
আর কেন ভাই, আপদ বালাইর করবো আয়োজন?
ম'রে গেছে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হৈছে দেশ,
বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে বাড়াই কেন আর ক্লেশ?

একবার চব্বিশ প্রহরিয়া কীর্ত্তনোৎসবে বিশেষ রূপে অনুরুদ্ধ হইয়া পুরালিয়া গিয়াছি। মাও সঙ্গে আছেন।

মা কীর্ত্তনস্থলীর এক পাশে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন। ভক্তেরা মনে করেন, নিমাই নীলাচলে যাওয়ার প্রাক্কালে নদীয়ার ভক্ত মণ্ডলী শান্তিপুর নাথের ভবনে যে দৃশ্য দর্শনে ধন্য হইয়াছিলেন, বুঝি তাহাদের সম্মুখেও আজ সেই দৃশ্য। তাহারা দৌড়িয়া গিয়া মা'র চরণ ধূলি গ্রহণ করেন। তাহা দেখিয়া আমার আনন্দের মাত্রাও শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠে।

কিন্তু পুরালিয়ার কীর্ত্তনই আমার কাল হইল। ভক্ত হরিপ্রসাদ পূর্ব্বেই মা'র সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া প্রকাশ্যে কীর্ত্তনানুষ্ঠান ও গোপনে আমার জন্য মৃত্যুবাণ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল।

যেদিন কীর্ত্তন শেষ হইল, সেই দিন বিবাহের ঢোল বাজিয়া উঠিল। হাঁড়ি হাঁড়ি হলুদ গুলিয়া ভক্তেরা কৌতুকানন্দ জুড়িয়া দিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদা, একি?"

হরিপ্রসাদ বলিল—"ভাই দুর্গাচরণ, মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন কলিতে সন্ন্যাস মিথ্যা। এই বাড়াতেই এক কুলীন বিধবা তাহার বয়স্থা কন্যাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। পাল্টা ঘর নাই। অকুলীনে দিলেও কুল ভঙ্গ হয়। আমি তোমার সঙ্গে সেই মেয়ের বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ করিয়াছি। তোমার মা পূর্ব্বেই আমাকে সম্মতি দিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই জন্যই তোমার পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তিনি আমাদের এখানে আসিয়াছেন। আমার এই চব্বিশ প্রহরিয়া সঙ্কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যই এই বিপন্ন কুলীন পরিবারকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করা। ভাই, তুমি কি আমাকে নিরাশ করিবে?"…ইত্যাদি

ইহার পর হরিপ্রসাদ ভক্তদিগের মাঝখানেই একটী কিশোরীকে লইয়া আসিয়া তাহার মুখখানি উন্মুক্ত করিয়া ধরিল, মা বলিলেন "দুর্গারে, লক্ষ্মী না থাকিলে ঘর যে লক্ষ্মী ছাড়া হয়…"

মার সম্ভাষণে আমার দৃষ্টি হরিপ্রসাদের দিকে আকৃষ্ট হইল। ঘন ঘন হরিধ্বনির মাঝে—আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই শুভদৃষ্টি হইয়া গেল।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

---

# রামায়ণে রত্নের ব্যবহার।

মণি-মরকত প্রভৃতি মূল্যবান পার্ব্বত্য প্রস্তর ও প্রবাল-মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য জলজ দ্রব্যাদিকেই সাধারণত রত্ন বলা

হইয়া থাকে। রামায়ণে রাজগৃহাদির, পোষাক পরিচ্ছদের, তৈজস পত্রের ও অন্যান্য বর্ণনায় নানা প্রকারের রত্নাদির উল্লেখ আছে। আমরা বিভিন্ন শিল্পের আলোচনায় সে সকলের মোটামুটি উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। এস্থলে বিশেষ ভাবে পুনরায় তাহার উল্লেখ ও ব্যবহারের আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষে এই সকল জিনিস অতি প্রাচীন কাল হইতেই খুব সহজ লভ্য ছিল, এই কারণে ভারতীয় শিল্পীরা বিলাস প্রসাধণের বিশেষ উপকরণ রূপে মণিমুক্তার এত অধিক ব্যবহারে আনয়ন করিতে পারিয়াছিল।

রামায়ণে নিম্ন লিখিত রত্নগুলির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহা নীলমণি, ইন্দ্রনীল, বারিসম্ভব মণি, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, বিক্রম ( প্রবাল ) বৈদূর্য্য, মরকত, মুক্তা, স্ফটিক, বজ্রমণি বা হীরক, শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ শিলা ইত্যাদি।

তখন ইন্দ্রনীল নামক মূল্যবান প্রস্তর খোদিয়া শিল্পীরা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিত। অযোধ্যার রাজ পথের পার্শ্বে পার্শ্বে ইন্দ্রনীল প্রস্তরের মূর্ত্তি ( Statue ) স্থাপিত ছিল।

তত্রেন্দ্রনীল প্রতিমা প্রতোলীবর শোভিতাঃ॥ ১৮।২।১৮

রাবণের পুষ্পক রথে মূল্যবান ইন্দ্রনীল ও মহানীল নির্ম্মিত বেদিকা ছিল।

ইন্দ্রনীল মহানীল মণি প্রবর বেদিকাম্। ১৬।৫।৯

সীতা রামের যে চূড়ামণি সযত্নে অভিজ্ঞান স্বরূপে রাখিয়াছিলেন, সেই চূড়ামণিটী ছিল—'বারিসম্ভবঃ' অর্থাৎ সমুদ্র রত্ন ( সু ৪০-৮ শ্লোক )

বিদ্রোম বা প্রবালের উল্লেখ অযোধ্যায় রাম ভবনের বর্ণনায় আমরা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। সে ভবনের দ্বার সমূহ ছিল—প্রবাল ও মণি মুক্তা খচিত।

* মণি বিক্রম তোরণম্ .. .. মুক্তামণির্ভিরাকীর্ণং

রাবণের রথ খানাও ছিল—

হেমজাল বিততং মণি বিক্রম ভূষিতম্। ৩।৬।১১

রাবণের সিংহাসনগুলির কোন কোনটী ছিল বৈদূর্য্যমণি খচিত, কোনটী বা ছিল মরকতময়। ( ল ১১ )

রাবণের সিংহাসনগুলির কোন কোনটী ছিল বৈদূর্য্যমণি খচিত, কোনটী বা ছিল মরকতময়। ( ল ১১ )

রাবণের শয্যাগৃহের পর্য্যঙ্কটী বৈদূর্য্য মণির সহিত হস্তী দন্তের সমাবেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাস্ত কাঞ্চন চিত্রাঙ্গৈ বৈদূর্য্যশ্চ বরাসনৈঃ। ২।৫।১০

আজ কাল যেমন হীরক অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয় রামায়ণের যুগেও তাহা সেইরূপে ব্যবহৃত হইত। হীরক খচিত অলঙ্কার, ( সু ১০ ) হীরক খচিত বর্ম্ম ( ল ৭০ ) প্রভৃতির উল্লেখ রামায়ণে আছে। লঙ্কার রাজ প্রাসাদগুলিও বজ্র মণিতে বা হীরক খণ্ডে শোভিত ছিল।

বজ্র বৈদূর্য্য চিত্রৈশ্চ স্তম্ভৈর্দৃষ্টি মনোরমৈঃ। ৮।৪.৫৫

লঙ্কার চতুর্দ্দিকে যে স্বর্ণ প্রাচীর ছিল, সেই স্বর্ণ প্রাচীরও ছিল—

মণি বিদ্রুম বৈদূর্য্য মুক্তা বিরচিতান্তর। ১৪।৬.৩

স্ফটিকের ব্যবহার লঙ্কায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। স্ফটিক যে কাঁচ নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। প্রাচীন কালে কৈলাশ পর্ব্বতে, বিন্ধ্য পর্ব্বতে ও লঙ্কাদ্বীপে স্ফটিক উৎপন্ন হইত। কৈলাশ পর্ব্বতে শুভ্রস্ফটিক ছিল, দুই নামে পরিচিত। সূর্য্যকান্ত মণি ও চন্দ্রকান্ত মণি। সূর্য্যকিরণ সম্পাতে যে প্রস্তর-মণি হইতে অগ্নি নির্গত হইত, তাহার নাম ছিল সূর্য্যকান্ত মণি; আর চন্দ্রকিরণ সম্পাতে যাহা হইতে বারি নিস্সৃত হইত তাহার নাম ছিল—চন্দ্রকান্ত মণি। কৈলাশ পর্ব্বত এইরূপ মূল্যবান স্ফটিকের জন্ম স্থান হেতু এখনও তাহা স্ফটিকাচল বলিয়া পরিচিত।

লঙ্কার প্রাসাদ, চৈত্য, দেবায়তন—সমস্তই ছিল স্ফটিক প্রভাবে প্রভাবিত। লঙ্কার অনেক তৈজস পত্রও স্ফটিক নির্ম্মিত ছিল। মণিময় স্ফটিক পান পাত্রের উল্লেখ লঙ্কার বর্ণনায় আছে। ( সু ১০ ) স্ফটিক খোদিয়াই বোধ হয় এই সকল পাত্র প্রস্তুত করা হইত এবং তাহাতে মণিমুক্তা বসান হইত।

আমরা বর্ত্তমানে যে সকল পাত্রকে স্ফটিক পাত্র বলিয়া অভিহিত করি, তাহা কাঁচ ঢালাই পাত্র। স্ফটিকনিভ স্বচ্ছ ও শুভ্র হেতু স্ফটিক পাত্র বলিয়া পরিচিত। স্ফটিক এখন সাহিত্য ও প্রচলিত প্রবাদের আশ্রয়ে কোন রূপে নিজ নামের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে মাত্র।
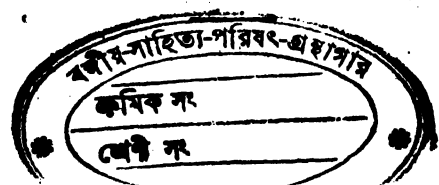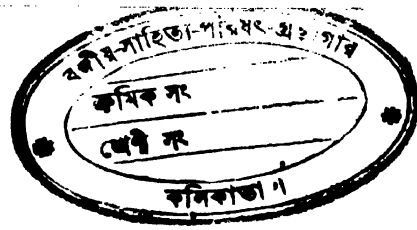
# সৌরভ

একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩৩০। | দ্বাদশ সংখ্যা।

## জীবন ও বিবর্ত্তনবাদ।

আমরা ইন্দ্রিয় সাহায্যে যাহা অনুভব করিতে সমর্থ হই তাহা আমাদের প্রত্যক্ষানুভূতি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রত্যক্ষানুভূতির বাহিরে কিছু স্বীকার করিতে চায় না; ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান সম্ভবপর নহে। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বাহিরে যদি কিছু থাকে তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই, কারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয় সমূহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (১) পদার্থ ও (২) শক্তি। তাঁহারা পদার্থ ও শক্তির কারণ এখনও জ্ঞাত হইতে পারেন নাই; কিন্তু ইহা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে পদার্থ ও শক্তি কখনও ধ্বংস হইতে পারে না, সুতরাং ইহাদের আদি ও নাই অন্ত ও নাই। এই শ্রেণীর জড়বাদীকে প্রত্যক্ষবাদী বলা হয়।

অপর এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি রহিয়াছেন যাহারা অতীন্দ্রীয় বিষয় ও আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন; ইহারা আত্মতত্ত্ববাদী বা প্রজ্ঞানবাদী নামে অভিহিত। প্রজ্ঞানবাদ বিজ্ঞানের অন্তর্গত নহে, কারণ প্রজ্ঞানবাদের তত্ত্বসমূহ প্রমাণ ও করা যায় না, অগ্রাহ্য ও করা চলে না; ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি দ্বারা উহাদের মীমাংসা করিতে হয়।

বিবর্ত্তনবাদ বিজ্ঞানের অন্তর্গত, কিন্তু কোন কোন দার্শনিক ইহাকে তাঁহাদের দর্শনের ভিতর টানিয়া লইয়াছেন। বিবর্ত্তনবাদ দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে যাবতীয় চেতন পদার্থ,—উদ্ভিদ, জন্তু, মানব ও অন্যান্য প্রাণী,—কয়েকটী ক্ষুদ্র, সরল, অবিশিষ্ট অবয়ব বা একটী মৌলিক জীব-বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে দেখিতে পাই যে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র ও আমাদের এই পৃথিবী এক উপাদানে গঠিত; চন্দ্র সূর্য্যাদির ভিতর এমন কোন উপাদান দেখা যায় না যাহা আমাদের পৃথিবীর উপাদানে অবিদ্যমান। একটী অবিশিষ্ট অবয়ব হইতে নানাশ্রেণীর বিশিষ্ট অবয়বের বিকাশ বা একটী জীববীজের নবনবরূপের আবির্ভাব দুই চারি পুরুষে ঘটে নাই, এই বিবর্ত্তন লক্ষ-লক্ষ, কোটী-কোটী বৎসরের পরিণতি। ভূতত্ত্ব বিদ্যায় স্যার চার্লস লায়েল (Sir Cherles Lyell) একজন প্রথিত নামা বিশেষজ্ঞ, তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন পৃথিবীর বয়স অন্যূন বিশকোটী বৎসর। এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ তাহাদের স্বীয় প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। বিবর্ত্তনবাদ একথা বলে না যে বিশ্বের পদার্থ মাত্রই অবিরাম পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নততর পদার্থ সমূহে পরিণত হইতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিলে পদার্থটী যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া এক অবস্থায় রহিয়া যাইতে পারে। ডারউইন (Darwin) ও স্পেনসার (Spencer) এই বিষয়টী বিশদভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন।

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে:—(১) চেতন ও (২) অচেতন। চেতন পদার্থ সমূহকে পুনরায় দুই শাখা শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে:—(ক) প্রাণী ও (খ) উদ্ভিদ। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে অনেক বিষয়ের সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু অচেতন পদার্থের সহিত উহাদের অনৈক্য যথেষ্ট। আহার গ্রহণ করা, বৃদ্ধি হওয়া, বংশ রক্ষা করা ও উত্তেজনা প্রবণতা এইগুলি

চেতন পদার্থের ধর্ম্ম। চেতন পদার্থের গঠন উপাদান অচেতন পদার্থের গঠন উপাদান হইতে অতিশয় জটিল। চেতন পদার্থের গঠন উপাদান সাধারণতঃ ত্রিবিধ ;—(১) শর্করা জাতীয় (২) তৈল জাতীয় ও (৩) ছানা জাতীয়। শেষোক্ত ছানা জাতীয় উপাদানের রাসায়নিক বিশ্লেষণ অতি জটিল; রাসয়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা ইহার প্রকৃত স্বরূপ এখনও অবগত হওয়া যায় নাই। চেতন পদার্থের আর একটী বিশেষ ধর্ম্ম হইয়াছে ইহাদের নিত্য পরিবর্ত্তন-শীলতা। এই পরিবর্ত্তন কেবল উপাদানের নহে শক্তির ও নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। চেতন পদার্থের উপাদান ও শক্তির নিত্য পরিবর্ত্তনকে বৈজ্ঞানিকগণ উহার গঠন-ভঞ্জন ( metabolism ) প্রকৃতি বলে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভিতর একটা প্রধান পার্থক্য এই যে উদ্ভিদ সোজাসুজি অচেতন পদার্থ খাইয়া বাঁচে, কিন্তু প্রাণী উহা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে। অচেতন পদার্থ খাইয়া, উদ্ভিদ যখন তরিতরকারী বা ফলে পরিণত হয় তখন প্রাণী উহা আহার করিয়া পরোক্ষভাবে অচেতন পদার্থ আহার করে। প্রাণী শুধু জল বায়ু লবণ ইত্যাদি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। উদ্ভিদ প্রধানতঃ বায়ু হইতে কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়। উহার সবুজ পত্রের উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল হইতে কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প বিশ্লেষণ করিয়া উহা গ্রহণ করিবার ও অক্সিজেন মুক্ত করিবার দিগার ক্ষমতা লাভ করে। অপরদিকে প্রাণীগণ বায়ু হইতে শ্বাসের সহিত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং ভুক্ত, কার্ব্বন দ্বারা গঠিত, উদ্ভিজ্জ পদার্থ অক্সিজনের সংস্পর্শে আসিয়া দগ্ধ হয় এবং অতিরিক্ত কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প প্রাণীগণ নিঃশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দেয়। এই দ্বিবিধ বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা বায়ুর সমতা রক্ষা হয়। এই সমতার ফল উদ্ভিজ্জ ও মৎস্যে পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র জলাশয়ে বেশ লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ জলাশয়ের জল বিশুদ্ধ থাকে; কিন্তু দ্বিবিধ সজীব পদার্থের কোন একটীকে সম্পূর্ণ দূর রূপে করিলে জল শীঘ্রই অবিশুদ্ধ ও বিষাক্ত হইয়া পড়ে।

আমরা অনবরত বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিতেছি ও দেহ রক্ষার জন্য খাদ্য ও আহার করিতেছি। ভুক্তদ্রব্য-গুলি শর্করা, তৈল ও ছানা জাতীয় জটিল পদার্থে পরিণত হয় এবং দেহ রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য যাহা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত পদার্থগুলি, যাহা হইতে শক্তি সঞ্চয় হয় না, তাহা ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত সরল অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া ঘর্ম্ম, ও মলমূত্রাদিরূপে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। জীব এইরূপে অনবরত জটিল ও সরল পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তাহার শক্তি ব্যয় করিতেছে। জীব অনবরত শ্বাসের সহিত যে অক্সিজেন বায়ু গ্রহণ করে, ভুক্তদ্রব্যের সহিত উহা মিলিত হইয়া দেহে শক্তির সঞ্চার ও তাপ বর্দ্ধিত করে; এই সঞ্চিত শক্তিদ্বারা জীব প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছে ও দেহ হইতে তাপ বাহির করিতেছে। ইহা অনেকটা ইঞ্জিনে কয়লার সাহায্যে তাপ উৎপাদনের মত; প্রভেদ এই যে খাদ্যের ( কয়লার ) মত দেহ—ইঞ্জিনটী ও অনবরত ক্ষয় পাইতেছে। কিন্তু ভুক্তদ্রব্যের উপাদান দ্বারা দেহের ক্ষয় পূরণ হইতেছে। এই ভাঙ্গা-গড়ার বিরাম নাই, জীবদেহে অবিশ্রান্ত কার্য্য চলিতেছে; ইহার বিরাম আর মৃত্যু এক কথা।

### জীব-বীজ।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে জীবদেহে দ্বিবিধ মিশ্র পদার্থ রহিয়াছে. একটীর সাহায্যে ভুক্তদ্রব্যগুলি জটিল পদার্থে পরিণত হইয়া দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধিত হইতেছে অপরটীর সাহায্যে জটিল পদার্থ হইতে কতকগুলি সরল অসার পদার্থ দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। এই দুই পদার্থের মিশ্রণ, যাহাদ্বারা জীবদেহে অবিরাম গঠন-ভঞ্জনের কার্য্য চলিতেছে তাহাকে জীব-বীজ ( protoplosm ) বলে; ইহাই জীবনের ভিত্তি। জীব-বীজ দেখিতে বর্ণহীন, অর্দ্ধতরল বা চট্‌চটে, সকল সজীব পদার্থেই জীববীজ বর্ত্তমান আছে, জীববীজ ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে।

জীব-বীজ বিবিধ সরল ও জটিল উপাদানের মিশ্রণ; ইহার সাহায্যে জীবের নানাবিধ রাসয়নিক ও দৈহিক কার্য্য চলিতে থাকে। অচেতন পদার্থ কোথায় শেষ হইল এবং চেতন পদার্থই বা কোথায় আরম্ভ হইল, উহা নির্দ্দেশ করিয়া একটা সীমা রেখা অঙ্কন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। চেতন পদার্থের উপাদান সমূহকে

বিশ্লেষণ করিলে, উহারা অচেতন পদার্থে পরিণত হয়। চেতন পদার্থের উত্তেজনা প্রবণতা, প্রতিক্রিয়া ও কার্য্য অনেকটা রাসয়াণিক। এই শক্তির কারণ মানুষ এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই, জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত উহার সন্ধান বাহির হইবে আশা করা যায়। অজ্ঞান মানব বাহিরের একটা শক্তি কল্পনা করিয়া জীবের প্রাণ বুঝাইতে চায়। বালক বা কোন অসভ্য লোককে যাদু (ম্যাজিক) দেখাইলে যেমন সে মনে করে যে যাদু-বাক্সের অভ্যন্তরে প্রেত বা অন্য কোন জন্তু লুক্কায়িত রহিয়াছে, অজ্ঞান মানব ও তদ্রূপ চেতন পদার্থের একটা অবধ্যাত্মিক ব্যাখা দিয়া বলে যে প্রাণ দেহাতিরিক্ত একটা অচেনা শক্তি। জীববীজের গঠন প্রকৃতি মানব সম্পূর্ণরূপে অবগত না হওয়াতে, মানুষ নিজে রসায়নাগারে চেতন পদার্থ প্রস্তুত করিতে অসমর্থ। কিন্তু ইহা অবগত হইলেও জীববীজ প্রস্তুত করা মানবের সাধ্যায়ত্ব হইবে না, কারণ পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের অন্ধকার কক্ষে কল্পনার বর্ত্তিসাহায্যে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে পৃথিবীর এমন একটা অবস্থা ছিল, যখন উহার উত্তাপ, আদ্রতা, বায়ুর চাপ ইত্যাদি জীববীজ উৎপাদনের অনুকূল ছিল এবং সেই সময়ে কতকগুলি জীববীজের উৎপত্তিও হইয়াছিল। পৃথিবীর সেই অবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং নূতন জীববীজের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। তৎকালে কতকগুলি জীববীজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় জন্মিয়াছিল, বাহিরের প্রতিকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে অসমর্থ হইয়া তাহারা নষ্ট হইয়া গেল, এবং কতকগুলি জীব-বীজ পূর্ণ অবস্থায় জন্মিয়াছিল তাহারা বাহিরের অনুকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইহা জীব বিবর্ত্তনের প্রথম সোপান।

## জীব কোষ।

সকল চেতন পদার্থে জীববীজ বর্ত্তমান। অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে জীববীজ জীবকোষের আকারে চেতন পদার্থে বর্ত্তমান আছে। জীব কোষের দুইটী অংশ:—(১) কোষকেন্দ্র ও (২) কোষদেহ। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ কোষদ্বারা গঠিত; কোষগুলি আয়তনে ও সংখ্যায় বেশী হইয়া চেতন পদার্থের বৃদ্ধি সম্পাদন করে। কোষগুলি পুষ্ট হইয়া দ্বিখণ্ডিত হয়, দ্বিখণ্ডিত কোষগুলি পুষ্ট হইয়া প্রত্যেকটী পুনরায় দ্বিখণ্ডিত হয়, এইরূপে ক্রমশঃ ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেহীর সমস্ত কোষগুলি একটী মূল কোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বহুকোষবিশিষ্ট দেহীর কোষগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট, ক্রমে ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বা বৃত্তি পরিচালনের জন্য বিভিন্ন কোষদল ব্যাপৃত থাকে। মানব সমাজে যেমন কামার, কুমার, কৃষক, যোদ্ধা, পুরোহিত ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদ্বারা সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া সমাজ রক্ষা পায়। তদ্রূপ দেহীর বিভিন্ন শ্রেণীর কোষদ্বারা দেহের বিভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া দেহরক্ষা হইতেছে। দেহীর কার্য্যাবলী প্রকৃত-পক্ষে দেহীর কোষ সমূহের সমবেত কার্য্যের সমষ্টি।

উপরে বলা হইয়াছে জীব-কোষের দুইটী অংশ (১) কোষদেহ ও (২) কোষকেন্দ্র। উহাদের গঠন উপাদান এক নহে; যে শ্রেণীর জীববীজ দ্বারা কোষদেহ গঠিত, ঠিক সেই শ্রেণীর জীববীজ দ্বারা কোষকেন্দ্র গঠিত হয় নাই। জীবন ধারণের জন্য বা জীবিত কোষের জন্য দেহ ও কেন্দ্র উভয়ই আবশ্যক; একটী ছাড়া অপরটী বাঁচিতে পারে না। কোষটী দ্বিখণ্ডিত হইলে যে খণ্ডে কেন্দ্র থাকে তাহা জীবিত থাকে, কেন্দ্রহীন কোষ বাঁচিতে পারে না।

জীবাণুর (Bacteria) ভিতর আমরা সুস্পষ্ট কোষ-কেন্দ্র লক্ষ্য করিতে পারি না বটে, খুব সম্ভবতঃ জীবাণু জীবকোষ গঠনের পূর্ব্বাবস্থা।

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের কোন কোন প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে একটী মাত্র জীবকোষ দেখিতে পাওয়া যায়॥ এক-কোষবিশিষ্ট দেহীর জীবন ধারণের সকল কার্য্য একটী কোষ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে, কোষটী দৈহিক কার্য্য (আহার, চলাফেরা, মল নিঃসরণ ইত্যাদি) করিবার জন্য বিশিষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

বহুকোষবিশিষ্ট প্রাণী ও উদ্ভিদ একটী মূল, অবিশিষ্ট, প্রচুর, সতেজ, জীববীজে পরিপূর্ণ কোষ হইতে উৎপন্ন হয়। মূল কোষটী বিভক্ত হইয়া ক্রমে বহু কোষে পরিণত হইয়া দেহীর বৃদ্ধি সম্পাদন করে ও বিশিষ্টতা লাভ করে।

কোষগুলি বিশিষ্টতা লাভ করিয়া নানাশ্রেণীতে পরিণত হয় এবং উহাদের কাজের ও পার্থক্য ঘটে; মূল কোষটীর মত ইহারা সতেজ, প্রচুর, জীববীজ পূর্ণ অবিশিষ্ট নহে, সুতরাং জীবনধারণের জন্য যাবতীয় কাজ করিবার উপযোগী ও নহে। বিশিষ্ট প্রকৃতি লাভ করিয়া ইহাদের একদল আহার গ্রহণ, একদল চলাফেরা করা একদল দূষিত পদার্থ নিঃসরণ ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন কার্য্যের উপযোগী হইয়া পড়ে।

আমরা দেখিতে পাই সাধারণতঃ নিম্নস্তরের দেহীর কোষের বিশিষ্টতা অল্প, কিন্তু ইহাদের পুনর্জননের শক্তি অধিক। অনেক গাছের ডাল কাটিলে বা কোন কোন পোকা বা মাকরের দেহ কর্ত্তন করিলে কর্ত্তিত অংশটী পুনরায় গঠিত হয়। যতকাল জীববীজ সতেজ থাকে ও উহার গঠন-ভঞ্জনের শক্তি থাকে, ততকাল পুনর্জনন সহজ সাধ্য, কিন্তু উহা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইলে পুনর্জনন শক্তির ও সঙ্কোচ হয়।

### পুনর্জ্জনন।

এক কোষ দেহীর কোষের আয়তন একটী নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; পূর্ণ-বয়স্ক দেহীর স্বাভাবিক আয়তন লাভ করিবার পরে কোষটী দ্বিখণ্ডিত হয়। প্রথমতঃ কোষ-কেন্দ্রটী দুইভাগে বিভক্ত হয়, তৎপর কোষদেহ বিভক্ত হইয়া দুইটী পৃথক কোষে পরিণত হয়, প্রত্যেক কোষেরই একটী কেন্দ্র থাকে। এইরূপে দুইটী কোষের জন্ম হইয়া দুইটী পৃথক এককোষদেহীর সৃষ্টি হয় এবং উহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে। বহু-কোষদেহাও মূল একটী কোষ হইতে জন্মগ্রহণ করে, উহা আয়তনে বর্দ্ধিত হইয়া দ্বিখণ্ডিত হয় এবং নবজাত কোষগুলি বর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় বিভক্ত হয় ও বহু কোষের সৃষ্টি করে; কিন্তু এই স্থলে কোষগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও দেহীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত; কোষ সমূহের সমবেত কার্য্যদ্বারা দেহীর বৃদ্ধি সাধন হয়। এক কোষদেহীর ন্যায় এই স্থলে কোষটী বিশ্লিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক জীবন যাপন করে না।

চেতন পদার্থ এইরূপে বর্দ্ধিত হইয়া বংশ রক্ষা করিতেছে। কতকগুলি দেহীর লিঙ্গ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাদের কোষ, দ্বিখণ্ডিত হইয়া বিচ্ছিন্ন হয় ও বংশ রক্ষা করে। কিন্তু কতকগুলি প্রাণী ও উদ্ভিদের দ্বিবিধ কোষ রহিয়াছে:—(১) পুং কোষ ও (২) স্ত্রীকোষ। পুং কোষের জীববীজ স্ত্রী-কোষের জীববীজের সহিত মিলিত হইয়া একটী নূতন কোষের সৃষ্টি হয়; দুইটী পৃথক কোষের কেন্দ্র ও দেহ মিলিত হইয়া একটী নূতন কোষদেহের সৃষ্টি হয়; এই নবজাত কোষটী বর্দ্ধিত হইয়া একটী ব্যক্তি বা দেহীতে পরিণত হয়। দেহের পরিবর্ত্তনকেই আমরা মৃত্যু বলিয়া থাকি, (Weismann) উইসম্যানের মতে আদি জীববীজ (Germ plasm) অমর, ইহা পুরুষানুক্রমে পিতামাতা হইতে সন্তানে সঞ্চারিত হইতেছে। সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত উহার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, আরও কতকাল চলিবে কে বলিতে পারে? জীবজীবের প্রথম সৃষ্টি কিরূপে হইল ও উহার উপাদানের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা এখনও জানা যায় নাই। বিজ্ঞান এখনও উহার উত্তর দিতে সমর্থ হয় নাই; এখানে আমাদের জ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড অভাব রহিয়াছে। বিবর্ত্তনবাদী আশা করেন জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে উত্তরকালে উহা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ দাসগুপ্ত।

---

## স্নেহের দান।

১৯

বৈশাখ হইতে প্রবলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া আষাঢ় পর্য্যন্ত বৃষ্টির ধারা অবিরাম চলিয়াছে। এই তিন মাসে তিন সপ্তাহের বেশী সূর্য্যের মুখ দেখা যায় নাই। বৈশাখের বৈশাখী বা বোড় ফসল নষ্ট হইয়াছে; কৃষক আউস ফসল বুনিবার অবসর পায় নাই। নদী, নালা, ঘাট, পথ প্লাবনের জলে থৈ থৈ! দেশে হাহাকার চরমে উঠিয়াছে।

বাহিরে আষাঢ়ের প্রবল বর্ষণ। স্বামীজী শিষ্য রামকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ধর্ম্ম পথ হইতে অনেকটা স্খলিত হইয়া পড়া যাইতেছে। আমাদের ব্যবসায় জমিদারীর ম্যানেজারী নয়, এখন নিজের পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে; তাহার কি পরামর্শ? একটা আশ্রয় হইতে তো জমিদারী চিন্তা ছাড়িয়া প্রেমানন্দে ডুবিয়া নিশ্চিন্তে কেবল গৌর হরির নাম-রস পান করিতাম।

রামকৃষ্ণ বলিল—"নিশ্চয়। জীবানন্দাশ্রমে যে ক্ষুদ্র ডিহি কাছারী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই যদি বাবু মহারাজ, প্রভুর নামে দানপত্র করিয়া উৎসর্গ করেন, তবেইতো আমাদের এই আশ্রমটীর কাজ স্থায়ী রকমে চলিতে পারে। সে দান, বাবু মহারাজের লক্ষ টাকার জমিদারীর পক্ষে কিছুই না—হাজার পাঁচেক টাকা আয়ের ক্ষুদ্র ডিহি মাত্র। অথচ কাজ—একটা কাজের মত কাজ—হয়। জীবন অনিত্য, কীর্ত্তি অবিনশ্বরী। আজ চক্ষু বুঁজিলে কে থাইবে বাবু মহারাজের এই বিপুলা জমিদারী? কিন্তু জীবনন্দাশ্রম—বাবু মহারাজ মণিমোহনের নাম যাবচ্চন্দ্র দিবাকর ঘোষিত থাকিবে। কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি। আমার মেয়েদায় উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন—কৃতজ্ঞতায় আমার বুক ভরিয়া আছে, ইহারই নাম—পরোপকার; ইহারই নাম—সদাসয়তা..."

স্বামীজী বলিলেন—"মণির ন্যায় সৎকর্ম্মান্বিত যুবক জমিদার বাঙ্গলা দেশে দু'টী নাই না; হইলে, আমার কি আর কার্য্য ছিল না? ধর্ম্ম-কর্ম্ম ফেলিয়া এখন তার ষ্টেট দেখিবার কি আমার সময়? কি করি, এমন একটী সৎকর্ম্মান্বিত সংবুদ্ধি যুবকের অনিষ্ট হয়; এখন আমাকে কিন্তু তোমার ছাড়িতে হইবে বৎস! আর কত? রামকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছে, একার্য্য সম্পাদন করা তোমার পক্ষে কিছুই না; তবু আমি বলি, একটু চিন্তা করিয়া সম্মতি দাও! এদিকে যখন তোমার ও ভাবভক্তি প্রচুরই দেখা যায়, হউক, তোমারও স্নেহেতেই কীর্ত্তি হউক, আমাদেরও আশ্রয় হউক। রাম একটা মুসাবিদা প্রস্তুত করাইয়া আনুক, তুমিও এই সময় মধ্যে বিষয়টা মনে মনে পর্য্যালোচনা কর। মোট কথা—তোমার গৃহে, তোমার বিষয় আগলাইয়া বসিয়া থাকা আর আমার বিধেয় নহে, অথচ তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াও আমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।"

কথা শেষ করিয়া স্বামীজী নিকটে উপবিষ্ট মণির মস্তকে মন্ত্র পড়িয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহার মাথা গাল মুখও পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।"

মণি মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় বলিল—"যে আজ্ঞা।"

সেই দিনই বৃষ্ট বাদলের বিরাম অপেক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্য পরায়ণ শিষ্য রামকৃষ্ণ উকীলের ফিস ও ব্যয় বিধান লইয়া মুসাবিদা প্রস্তুত করিবার জন্য জেলায় চলিয়া গেল।

রামকৃষ্ণ জমিদার সরকারের কোন বেতনভোগী উকীলের নিকট না গিয়া নগদ টাকায় সহরের শ্রেষ্ঠ মুসাবিদা কারক উকীল কুঞ্জ ঘোষ দ্বারা মুসাবিদা প্রস্তুত করাইতে গেলেন।

কুঞ্জ বাবু এখন ওকালতি করেন না। মুসাবিদা করিয়া এবং পরামর্শ দিয়াই তাঁহার যথেষ্ট আয়। রামকৃষ্ণ তিন দিন, তিন রাত্রি হাটিয়া ঘোষ মহাশয় দ্বারা অতি সঙ্গোপনে মুসাবিদা প্রস্তুত করাইলেন এবং সেই মুসাবিদা নিজ হস্তে নকল করিয়া, নাম গুলি বাদ দিয়া—যেন কেহ তার ছিদ্রাংশও জানিতে না পারে—এমন করিয়া সহরের সকল শ্রেষ্ঠ উকীলদিগকে দেখাইয়া, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি দ্বারা তাহা যথা সম্ভব নির্দ্দোষ করিয়া লইতে লাগিল।

২০

রামকৃষ্ণ যখন এইরূপে উকীল গৃহে যাতায়াত করিতেছিল, গড়গড়ীর স্বদেশ হিতৈষী জমিদার রাজেন্দ্র বাবু তখন, তাঁহার 'উদ্দেশ্য মহৎ' পত্রিকায় বিভাগীয় কমিসনারের মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিয়া দেশের দৃষ্টি সেই বিরুদ্ধ মন্তব্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছিলেন।

দেশে দুর্ভিক্ষের ঘোর আহাকার উঠিয়াছে; সহৃদয় জেলা মাজিষ্ট্রেট বলিতেছেন—"উপায় নাই, সরকার হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা রিলিফ দেওয়া উচিত।" আর কঠোর হৃদয় কমিসনার তাঁহার দ্বিতলোপরি আরাম কক্ষে বসিয়া চসমার সাহায্যে কাগজ পড়িয়া বলিতেছেন—"দেশের পথ-ঘাট এখনও কচু শূন্য হয় নাই, কেমন করিয়া বলিব, দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে?

রাজেন্দ্র বাবু গৃহে গৃহে যাইয়া কমিসনারের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে সহরবাসীদিগকে উদ্বোধিত করিতেছিলেন।

রাজেন্দ্র বাবুকে আগত দেখিয়া কুঞ্জ বাবু বলিলেন—"আসুন,রাজেন্দ্র বাবু, আসুন! আপনার "উদ্দেশ্য মহৎ" কিন্তু বেশ সুখ-পাঠ্য হইতেছে .."

"দেখুন দেখি, মহাশয়—দেশ কচু শূন্য হইল না—ইহাই হইল কি না দুর্ভিক্ষ হয় নাই বলিবার অছিলাত! আজ কিন্তু সভাতে নিশ্চয় যাইতে হইবে। আর এক দিন আপনার নিকট আসিয়াছিলাম—ভিতরে ছিলেন। আপনারা এরূপ ভিতরে থাকিলে কি চলে? একটু বাহিরে থাকিতে হয়।"

খাইয়া রাজেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ভিজা জুতা জামার দিকে চাহিয়া তাহা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

কুঞ্জ বাবু সৌজন্যের সহিত হাত কচ্লাইতে কচ্লাইতে বলিলেন "আপনাদের ডহরের মণিমোহন বাবুর একটা মুসাবিদা করিতে কিছু ব্যস্ত ছিলাম; বিষয় জরুরী ছিল, তাই রাত্রিতেও খাটিতে হইয়াছিল; পরে শুনিলাম, আপনি আসিয়াছিলেন; ক্ষমা করিবেন—নাম করিয়া খবর দিলেই হইত, আপনি আসিয়াছিলেন জানিলে কি আর..."

মণিমোহনের নাম শুনিয়া রাজেন্দ্র বাবু ঘৃণার সহিত বলিলেন—"ও অপদার্থটার কথা বলিবেন না; ওটা একেবারে মেগনেটাইজ্ড্ হইয়া গিয়াছে। কোথাকার এক দীনানন্দ স্বামী ওটাকে জাহন্নামে দিতে বসিয়াছে। এ দুই বৎসরে দুইলক্ষ টাকা হারামজাদা ঋণ করিয়াছে, কেবল চুথা লিখিয়া—কুকাণ্ডের একশেষ—শুনিলে অবাক্ হইবেন—মোহন্ত মাধবগিরি ইহার নিকট হার মানিয়াছে..."

"তাই নাকি? বড় অন্যায় হইয়াছে তাহা হইলে আমার রাজেনবাবু! মণি বাবুর যে দলিলের মুসাবিদা করিয়া দিয়াছি, তাহাতে তিনি পাঁচ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের এক সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন—দেখুন, বড় গোপনে যেন কার্য্যটা হইতেছে। আপনি দেশ হিতৈষী, জন হিতৈষী, আপনি দেখুন, যাহাতে ছেলেটা নষ্ট না হয়। এই মুসাবিদা করিয়া আমি নিতান্ত অন্যায় করিয়াছি। পূর্ব্বে জানিলে আমি এরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় কখনও দিতাম না—কি ভয়ানক কথা! এই দেখুন না—সেই মুসাবিদা।"

এই বলিয়া কুঞ্জ বাবু হাত বাক্স হইতে মুসাবিদার খসরাটা লইয়া রাজেন্দ্র বাবুর সম্মুখে রাখিলেন।

রাজেন্দ্র বাবু একটু চকিত ভাবে বলিলেন—"আপনি কবে এই মুসাবিদা করিয়া দিলেন?"

কুঞ্জ বাবু—"আজ চারদিন। তারপরও লোকটা এখানে অনেককে সে মুসাবিদা দেখাইয়াছে। কাল বোধ হয় লোকটা বাড়ী গিয়াছে। লেখা পড়া হইলেও—যে দুর্য্যোগ এই দিনে রেজেষ্টরী হয় নাই বোধ হয়। আপনি একটু বিশেষ চেষ্টা করুন। এরূপ ধুকা দিয়া যেন কাজ ফতে করিতে না পারে। উহাতে আমাদের সকলেরই বদনাম—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আজকার সভাটা Successful করা চাই কিন্তু। Sub Divisional officer টাও নেহাৎ পাজি, উহার সম্বন্ধে যাহা হয়, পরে করিব। আমি যাই, বাসায় বাসায় ঘুরিতে হইবে।" বৃষ্টির অজুহাতে যেন সভাটা পণ্ড না হয়।"

(২০)

রাজেন্দ্র বাবু দুর্ভিক্ষ সভায় বক্তৃতা করিয়া রাত্রিতেই গড়গড়ি চলিয়া আসিয়াছিলেন। পরদিন বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারার মধ্যেই পাল্কী আরোহণে ডহর চলিয়া আসলেন। ডহর গড়গড়ি হইতে ৭ মাইল ব্যবধান মাত্র।

রাজেন্দ্র বাবু আসিয়া শুনিলেন, স্বামীজী ও মণিমোহন বাবু বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, দিনের দুর্যোগে যাইতে পারেন নাই। কি জন্য, কোথায় যাইবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

তিনি এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং নিজ হইতেই ছোট হিস্যায় আসিয়া অতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া ম্যানেজার আসিয়া সেই দুর্য্যোগেই তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিলেন।

রাজেন্দ্র বাবু সে দিকে মনোনিবেশ না করিয়া সত্বর বড় কর্ত্রী ও ছোট কর্ত্রীকে তাঁহার আগমন সংবাদ প্রদান করিতে ও তিনি যে তাঁহাদেরই বিশেষ জরুরী কার্য্যে এই দুর্য্যোগ অবহেলা করিয়াও আসিয়াছেন, তাহা জানাইতে আদেশ করিলেন।

রাজেন্দ্র চৌধুরী ডহরের জমিদারদের অপেক্ষা বড় জমিদার না হইলেও ডহরের জমিদার গৃহে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি। রাজেন্দ্র বাবুর নগদ ধন অপর্য্যাপ্ত। বড় হিস্যার অনেক সম্পত্তিই পূর্ব্বে রাজেন্দ্র বাবুর ঋণে আবদ্ধ ছিল। প্রতিবেশী জমিদারের নিকট সম্মানে খাটো থাকা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া মণিমোহনের পিতা সরকারের উকীল বাঁশরী বাবুর নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারে ও অন্যান্য বহু ব্যাপারে ডহর জমিদার পরিবারের উপর রাজেন্দ্র বাবুর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। স্বর্গীয় কর্ত্তাদের স্বর্গ প্রাপ্তির পর সে প্রভাব বরং আরো বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সুতরাং ম্যানেজার বাবু রাজেন্দ্র বাবুর আদেশ, আদেশরূপেই গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিতে ব্যস্ত হইয়া

পড়িলেন। যথা সময়েই পরামর্শ সভা বসিল।

ছোট হিস্তার সেই ভিতর কক্ষে রাজেন্দ্র বাবু ও ম্যানেজার একত্র হইলেন। বারান্দার আড়ালে কর্ত্রীদ্বয় উপবিষ্ট হইলেন। রাজেন্দ্র বাবু নিঃশব্দে নিজ পকেট হইতে কৃষ্ণ ঘোষের প্রদত্ত সেই মুসাবিদার খসরা বাহির করিয়া ম্যানেজারের হাতে দিয়া বলিলেন—"পড়ুন, পড়িয়া যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন, অতি সত্বর করুন।"

ম্যানেজার পকেট হইতে খাপ খুলিয়া চসমা লইয়া সেই মুসাবিদা পড়িতে লাগিলেন। ম্যানেজার কিছু দূর পড়িয়াই বলিলেন—"তাইতো আজ কোথায় যাওয়ার যোগাড় চলিতেছে. আমি একটা লোক তাড়াতাড়ি নিযুক্ত করিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পরামর্শ করি—কেমন? মহাশয় কি বলেন—?"

রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন—"সত্বর।"

ম্যানেজার বাবু উঠিয়া পর্দ্দার নিকট গিয়া সংক্ষেপে কর্ত্রীদিগকে মুশাবিদার মূল বিষয় জ্ঞাত করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শুনিয়া বড়কর্ত্রী ছোটকর্ত্রীরদিকে চাহিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"ও ছোট বউ, উপায় কি?"

ছোটকর্ত্রী বলিলেন—"উপায় নাই দিদি; পেটের ছেলে শত্রু হইলে উপায় নাই। এখন উপায় ভগবান। এখনও যখন ক্ষয় নাই, ভগবান যখন সময়ের মুখে উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন এত নিরুপায়ও মনে করিও না। দিদি, নিশ্চয় মণিকে সন্ন্যাসী ওষুদ করিয়াছে..."

বড়কর্ত্রী—"কি হবে গো আমার"! বলিয়া চক্ষু মুছিলেন।

ম্যানেজার ত্বরিত ফির্‌লু। কর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া আসিয়া কর্ত্রীদ্বয়ের নিকটে যাইয়া একখানা ছোট চৌকিতে বসিলেন এবং তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"জীবানন্দাশ্রমে যে ডিহি কাছারী স্থাপিত হইয়াছে, সেই ডিহির স্থান দুই হিস্তার এজমালী, বাবু তাহাতে ঘর তুলিয়া পুকুর কাটাইয়া স্থান দখলে আনিলে ছোট হিস্তা হইতে আপত্তি হইয়াছিল, বাবু ছোট কর্ত্তকে অনুরোধ করায় সে সম্বন্ধে তখন আর কোন প্রতিকার ছোট হিস্তা হইতে হয় নাই। এখন সেই সম্পূর্ণ ভূমি সহ বড় হিস্তার অর্দ্ধাংশ হিস্তা স্বামীজীকে নিব্যূঢ় সত্ত্বে দান করা হইতেছে। সম্পত্তি খানা বাড়ীর সংলগ্ন; কোন চিন্তাশীল মানুষই এইরূপ প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন না। গড়গড়ির কর্ত্তা কাল সত্বর হইতে এই গুপ্ত পরামর্শের কথা জানিয়া নিতান্ত আত্মজনের ন্যায় এই দুর্য্যোগ উপেক্ষা করিয়া এই কার্য্যের উদ্যোগে বাধা দিতে আসিয়াছেন।.."

রাজেন্দ্র বাবু এই স্থলে বলিলেন—"আমি আমার কর্ত্তব্যই করিয়াছি—একটা প্রতিবেশী ঘরকে নষ্ট হইতে দেওয়া আমি কোন মতেই সঙ্গত মনে করিতেছি না। এখন আপনারা যদি এই আত্ম-হত্যায় সায় দেন—আমার কর্ত্তব্য শেষ হইবে..."

ম্যানেজার বলিতে লাগিলেন..."তিনি এই কার্য্যে বাধা দিতে আসিয়াছেন—এখন আপনাদের কি অভিপ্রায়—আপনারা যে কর্ত্তব্য অবধারণ করেন—তদনুসারেই তিনি তাঁহার কার্য্যের গতি নির্দ্ধারণ করিবেন।"

বড় কর্ত্রী—"বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—দলিল যাহাতে রেজেষ্টরী না হইতে পারে তাহাই করুন।"

ম্যানেজার—"তাহা করিতে হইলে শত্রুতা ব্যতীত উপায় নাই। সেরূপ পন্থা কেবল আপনিই গ্রহণ করিতে পারেন; আমরা আপনাকে সাহায্য করিতে পারি মাত্র। গড়গড়ির বাবুও তাহাই পারেন। প্রকাশ্য ভাবে আমরা কি তিনি বিরোধী হইলে—অনধিকার প্রবেশ হইবে—ফৌজদারী হইবে—তাহাতে ফল ভাল হইবে না।"

রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন—"আমরা লোকজন দিতেছি, আপনি নিজে দাঁড়াইয়া হুকুম দিন, গুণ্ডের দলকে আমরা লাঠি মারিবার ব্যবস্থা করি। ভয় পাইবেন না! এইরূপ অর্দ্ধ চন্দ্রের ব্যবস্থা না হইলে, এরূপ শত্রুকে সহজে দমন করিতে পারিবেন না। ইহাদিগকে আজই তাড়াইয়া মণিকে তালা বন্ধ করি। কাল মাজিষ্ট্রেট আনিয়া অযোগ্য ভূম্যাধিকারীর যে অবস্থা—সেই ব্যবস্থা করিব।"

রাজেন্দ্রবাবু রাগে কাঁপিতেছিলেন।

ম্যানেজার বাবু বলিলেন—"কার্য্যটা খুব সহজে শেষ হইবে, মনে হয় না। ফৌজদারী একটা হইবেই। তারপর মাতা পুত্রের বিবাদে ঘরটা একেবারে নষ্টের পথে যাইবে। লোকে নিন্দা করিবে আমাদিগের। জমিদারের কর্ম্মচারী হিসাবে বিবাদ ঘটিতে দেওয়া প্রচুর লাভের হইলেও

সেরূপ হীন পন্থা মোটেই আমি পছন্দ করি না। সব রেজেষ্ট্ররকে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর নিকট দরখাস্ত দিয়া কলে কৌশলে কার্য্য পণ্ড করা যায় কি না...”

রাজেন্দ্র বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“লাভ লোকসান আপনাদের; আপনারা সে সকল বিষয় দেখুন। আমরা নিজের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে আসিয়াছি মাত্র।”

রাজেন্দ্র বাবুর কথার মর্ম্ম সকলেই মর্ম্মের সহিত অনুভব করিলেন। অবস্থা বুঝিয়া বড় কর্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর চক্ষু মুছিয়া ছোট কর্ত্রীকে জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—“আজই মাখনকে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দাও দিদি, সে কালই আসিয়া উপস্থিত হউক। আর মণিকে চৌধুরী মহাশয় ডাকাইয়া আনিয়া একদিন আটক করিয়া রাখুন বা অন্য কোন স্থানে লইয়া যাউন।”

ম্যানেজার বড় কর্ত্রীর প্রস্তাবে সায় দিয়া বলিলেন “মাখন বাবু যদি আসিয়া একটা কিছু ব্যবস্থা করেন তবে বাবু হটাৎ তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না, তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী করিতেও একটু ইতস্ততঃ করিতে হইবে। আমরাও তখন দুই হাতে লাঠি মারিয়া ভণ্ডের দলকে দেশ ছাড়া করিতে পারিব। ইহাতে খরচের প্রয়োজন। তা কিছু অর্থ অপব্যয় হইবে; করা কি?”

রাজেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“মাখন বাবুটী কে?”

ম্যানেজার—“আমাদের ছোট তরফের কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আত্মীয়—মণি বাবুর বিশিষ্ট বন্ধু—এক রকম পাঠ্য জীবনের পরিচালক। তাঁর প্রভাব এর উপর খুব বেশী। এবার তিনি বি, এ, অনার্স ফার্ষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট হইয়াছেন, প্রিন্সিপাল রো সাহেব ইহাকে সার্ভিসের জন্য নমিনেশন দিয়াছেন।”

রাজেন বাবু বলিলেন—“বেশ, তাহাই হউক; করুন এখনই তাঁহাকে টেলি।”

বড় কর্ত্রী ছোটকর্ত্রীকে বলিলেন—“কি বল দিদি, মাখনকে আসিতে লিখা হউক।”

ছোট কর্ত্রী লাঠি মারার কথায় একটু চিন্তিত হইয়াছিল, অবশেষে সকল অবস্থা ভাবিয়া বলিলেন—“হউক।”

রাজেন্দ্র বাবু তখনি মুসাবিদা করিলেন—মণি তাহার সম্পত্তি স্বামীজীকে দান করিতেছে। দলিল কাল রেজেষ্টরী হইবে। তুমি অদ্যকার ডাক গাড়ীতে অবশ্য চলিয়া আসিবা।

ফারম পূরণ করিয়া লইয়া তখনই লোক চলিয়া গেল।

রাজেন্দ্র বাবু সে দিন তথায় রহিয়া গেলেন। বৃষ্টির দুর্য্যোগে তাঁহার আগমন কথা কেহই জানিতে পারিল না।

---

# আর একদিনের কথা।

( ১ )

কানপুরের প্রধান মাড়োয়ারী রঞ্জনলাল চুনীয়ার পুত্র ছকুলালের মোকদ্দমা লইয়া তখন দেশে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। প্রতিদিনের “পাইওনিয়ার” ও “এড্‌ভোকেট” বড় বড় অক্ষরে—Sensational Outrage on a European Lady by a native Gunda in the running train” হেডিং দিয়া যা তা লিখিয়া দেশীয় লোকের বিরুদ্ধে ঘৃণা, হিংসা ও দ্বেষ প্রচার করিতেছিল।

ঘটনাটী পড়িয়াছিলাম। ছকুলালের প্রতি প্রবল ঘৃণাই হইয়াছিল। যে পাপিষ্ট মাতৃ জাতির প্রতি সম্মান করিতে পারে না বরং এরূপ ব্যভিচার করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তাহার প্রতি কি কাহারও সহানুভূতি আসিতে পারে—সে যত বড় ধনীই হউক না কেন?

এলাহাবাদ হাইকোর্টও ছকুলালের জামিন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সে দিনের “পাইও- নিয়ারে” এই সংবাদটী ছিল। মিস্ এমিলিয়ার সাহায্যের জন্য “এডভোকেট্” একটা fund সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সাহায্য প্রেরণ জন্য ভিক্ষা পাত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

দুইখানা পত্রিকাই পড়িয়া তাহা একধারে রাখিয়া দিয়া, একটা কমিশনের কাজ করিতেছিলাম।

এলাহাবাদের উকীল পণ্ডিত কিষণলালের সাহায্যে গত বৎসরটা আমার বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে একটী ষোড়শীকে জীবন সঙ্গিনী করিয়া দুস্তর ভবসমুদ্র পারি দিবার আয়জনও করিয়াছি।

বয়স এখন ও ২৫ হয় নাই। একজিকিউটিব সার্ভিসের আশা ছাড়িয়াছি বটে—না ছাড়িয়াই বা উপায় কি? ওকালতির আয় বিশেষ কিছুই নাই। কমিশনে যাহা কিছু পাইতেছি মাত্র।

মৈনপুরের যে মোকদ্দমায় নিম্ন আদালতে জমিদার পক্ষে স্থানীয় কোন উকীল পাওয়া যায় নাই, যাহার জন্য আমাকে ফয়জাবাদ হইতে নেওয়া হইয়াছিল, সে মোকদ্দমা গবর্ণমেণ্ট পক্ষে নিম্ন আদালতে জয় হইয়াছিল। সুতরাং তাহা এখন হাইকোর্টে আছে।

আমাকে তদ্বিরের জন্য হাইকোর্টেও যাইতে হইবে কি না, তাহা জানিতে পারি নাই। সেই একমাত্র মোকদ্দমা ব্যতীত ফৈজাবাদ কোর্টে এ পর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমা পাই নাই। মাঝে মাঝে কমিশন পাইতেছি মাত্র।

বার লাইব্রেরীর একটা গোপন কক্ষে বসিয়া কমিশনের কাজই করিতেছিলাম, এমন সময় উকীল রঘুবীর বাবু একটী মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন—"ইনিই বাবু সুশীলকুমার বানার্জ্জি এম, এ বি, এল—গৌণী ষ্টেটের উকীল।"

গৌণী ষ্টেটের উকীল বলিতেই আমি বুঝিলাম, ইনি গৌণী ষ্টেটের কোন কর্ম্মচারী, সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধেই পুনরায় যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে অত্যধিক আদর অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম। তারপর পূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তারপর কি মনে করিয়া, আপনাদের মামলা কত দূর ?"...

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটী—"বলিলেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেই আসিয়াছি, আপনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই, কেননা আমি আর কখন এই ফৈজাবাদে আসি নাই—"

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম—'আপনি গৌণী ষ্টেটের কেহ নহেন ?'

"আজ্ঞে না।"

"ও, আমি ত ই মনে করিয়াছিলাম ....

আমি লজ্জিত হইয়াছি বুঝিয়া ভদ্রলোকটী আমাকে বলিলেন "আমি কেবল আপনার নিকট আসিয়াছি আমার প্রয়োজনও গুরুতর।"

প্রয়োজনের কথা শুনিয়া লজ্জার ভিতরও আমি যেন মহা আনন্দ লাভ করিলাম। আমি ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলাম—"আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন ?"

"কানপুর হইতে।"

অতঃপর আমি কি প্রশ্ন করিব, একটু চিন্তা করিয়া লইবার জন্য ছক্কু লালের মোকদ্দমার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম "ছক্কু লালকে তো হাইকোর্ট ও জামিন দিলে না।"

তিনি অন্য মনস্কভাবে যেন, বলিলেন - 'না' ?

তিনি উকীল রঘু বাবুর দিকে চাহিয়া সঙ্কোচভাবে ইতঃস্তত করিতেছিলেন বুঝিয় রঘু বাবু চলিয়া গেলেন। গৃহ নীরব হইলে ভদ্রলোকটী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি গত ভাদ্রে মৈনপুরে যাওয়া আসা করিতেন ?"

"হাঁ; গৌণী ষ্টেটের দিয়াড়া মোকদ্দমায় আমি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে, জমিদারের পক্ষে উকীল ছিলাম; সুতরাং কেবল ভাদ্র মাসে নয়—বৎসরের প্রায় অধিকাংশ কালই মৈনপুরে ও ফয়জাবাদে যাতায়াত করিয়াছি—"

"রেলে গত ভাদ্র মাসের কোন বিশেষ ঘটনা আপনার মনে পড়ে কি ?"

"কি ঘটনা ? আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমার নিকট কি জন্য আসিয়াছেন, শুনিতে পারি কি ?"

ভদ্রলোকটী আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন—"আপনার সময় নষ্ট করিতেছি, সেজন্য কোন চিন্তা নাই। আমি তাহার ক্ষতি পূরণ করিতেছি।"

এই বলিয়া ভদ্রলোকটী তাহার ক্ষুদ্র হাত ব্যাগটী হইতে খুলিয়া একশত টাকার একখানা নোট আমার হাতে গুজিয়া দিয়া বলিলেন "অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। মিস এমিলি নামে কোন বিবির সহিত আপনি মৈনপুরী হইতে আসিতে রেলে সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি ?"

আমি পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া বলিলাম—"একটা যুবতী মেমের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তার নাম এমিলি কি না এবং সে কুমারী কিনা, তাহা আমি জানি না।"

"আপনি তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কি ?"

"নিশ্চয় পারি। সেটা একটা মেয়ে বোম্বেটে.....

আমাকে কথা বলিতে না দিয়া ভদ্রলোকটী প্রশ্ন করিলেন—"আপনার সহিত তাহার কিরূপ ব্যবহার চলিয়াছিল ?"

আমি সংক্ষেপে আমার বিপদের কথা খুলিয়া বলিলাম—"আমি আমার মক্কেলি পাওনা ৭৫০৲ টাকা লইয়া আসিতে

ছিলাম। টাকাটার সন্ধান পাইয়াই মেয়েটা আমার গাড়ীতে বোধ হয় উঠিয়া পড়িয়াছিল। গাড়ী চলতির সময় সেই যুবতী হটাৎ গাড়ীর মেঝেতে শুইয়া পড়িয়া তাহার কাল গাউনটা ধূলায় ধূসরিত করিয়া আমাকে বলিল—তুমি এই '৫০৲ টাকা আমাকে এখনি দাও, নতুবা আমি শিকল টানিয়া, তোমায় বিপদ ঘটাইব। তুমি যে ইজ্জত করিয়া আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছ। আমি তখন একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, হটাৎ আমার মাথায় এক বুদ্ধি খেলিল—আমি তাড়াতাড়ি এক খানা টুকরা কাগজে লিখিলাম—'আমি কালা ও বোবা তুমি কি বলিতেছ এখানে লিখিয়া জানাও।" আমাকে কালা ও বোবা ভাবিয়া সে মেয়েটাও লিখিল—"তোমার নিকট যাহা আছে, সব আমাকে দাও, নতুবা এখনই সিকল টানিয়া বিপদ ঘটাইব। আমি সেই দলিল সযত্নে পকেটে পুরিয়া সামলা মাথায় চড়াইয়া উকিল হইয়া বসিলাম। মেয়েটা উপায় না দেখিয়া নিজ হাতেই গাউনের ধূলা ঝাড়িয়া আমাকে অভিবাদন করিতে করিতে পরের ষ্টেসনে নামিয়া গেল।"

আমার কথা শেষ হইলে ভদ্রলোকটী ব্যাগ হইতে এক খানা ফটো খুলিয়া লইয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল—"দেখুন দেখি চিনিতে পারেন কি না?"

আমি ফটোখানা হাতে লইয়াই বলিলাম "—হাঁ ঠিক, এই মেয়েটাই—আপনি কেন এ সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন —কেমন করিয়াই বা ফটো সংগ্রহ করিলেন—আমি যে একে চিনি তাইবা কে আপনাকে বলিল ?"

"নিশ্চয় এই প্রশ্ন তিনটীর উত্তর আপনাকে আমি দিব। তবে এখন নহে—বিকালে আপনার বাসায় যাইয়া, আরো কোন সংবাদ জানিয়া তারপর বলিব। আর আজ যদি নাই যাইতে পারি, আর এক দিন নিশ্চয় আসিব।"

ভদ্রলোকটী আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; সুতরাং অকুণ্ঠিত ভাবে আমি তাঁহার কথায় সায় দিলাম।

তিনি উঠিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন "এখন তবে আসি; সাক্ষাৎ হইবে।"

( ২ )

আমি বুঝিয়াছিলাম ভদ্রলোকটী পুলিসের লোক, সেই মেয়ে বোম্বেটেকেই ধরিয়া দিবার জন্য অন্দিসন্দি খুঁজিতেছে। আমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে নিশ্চয়।

ভদ্রলোকটীর সহিত পরে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। সাক্ষাতের আমার কোন প্রয়োজনও ছিলনা। তথাপি রঘুবীর বাবুর নিকট অনুসন্ধান লইয়াছিলাম, তিনিও তাহার কোন খবর বলিতে পারিলেন না।

এই ঘটনার ১৫।২০ দিন পরে আমার উপর সাক্ষীর সমন জারী হইল। জানিতে পারিলাম—আমি কানপুরের সেই লোমহর্ষণ ঘটনায় আসামীর পক্ষে সাক্ষী মান্য হইয়াছি। ঘটনার বাদী মিস এমিলি, বিবাদী ছক্কুলাল চুনীয়া।

মোঃ দঃ বিঃ ৩৫৪।৩৭৬ ধারা।

এজলাস জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ কানপুর।

আমি বুঝিতে পারিলাম, যে মেয়ে বোম্বেটের হাতে আমি এক দিন পড়িয়াছিলাম, তাহারই নাম মিস এমিলি; কিন্তু পুলিশ কর্ম্মচারীটী বিবাদীর পক্ষে আমাকে সাক্ষী মান্য করিয়া তদ্বির করিতেছেন কেন ?

ছক্কুলালের কোন পরিচয়ই তখন জানিতাম না। সুতরাং সে প্রকৃতই দোষী কি আমারই মত নিরীহ অবস্থায় এই মেয়ে বোম্বেটের হাতে পড়িয়া এখন নিগ্রহ ভোগ করিতেছে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক ভদ্রলোকটীর নিকট এবং বন্ধু বান্ধবের নিকট যেমন রেলের ঘটনাটী বলিয়াছি, তেমনি সাক্ষ্য দিব বলিয়া স্থির করিলাম।

( ৩ )

সাক্ষ্য দিতে কানপুর যাইব। যাইবার ২ দিন পূর্ব্বে মক্কেল হীন ফরাসে বসিয়া আলবোলায় তামুক টানিতেছিলাম—আর মক্কেলের পদশব্দের ভরশায় ক্ষণে ক্ষণে উৎগ্রীব হইয়া সময় কাটাইতেছিলাম।

এমন সময় সরকারী আরদালী আসিয়া সেলাম দিয়া On His Majesty's Service লেপাফায় এক খানা চিঠি দিল। নল মুখে রাখিয়াই তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া দেখিলাম—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠি, তিনি বেলা ২ টায় তাঁহার কুঠিতে যাইয়া সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

চিঠি পড়িয়া নিজের মেজাজকে একটুখানি বেশ গম্ভীর করিয়া লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আরদালীকে বলিলাম—

"সাহেবকে সেলাম জানাইও; আমার একটা আপিল আছে, ডিষ্ট্রিক্ট জজের এজলাসে—থাক্, সেটা কোনরূপে করিয়া অথবা সময় লইয়া আমি তোমাদের সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিব।"

আরদালী সেলামের উপর সেলাম দিয়া বিদায় হইল। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠির উদ্দেশ্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার কোন মোকদ্দমাই জজের এজলাসে ছিলনা, তথাপি মিথ্যা কথা বলিলাম। কেন বলিলাম, তাহা দ্বারা আমার কি উপকার হইবে? সে সম্বন্ধে একটুও চিন্তা করিলাম না। এই আরদালীর নিকট একটা মোকদ্দমা আছে, বলিলে এমন যে কি সম্মান বৃদ্ধি হইবে, মোটেই সে দিকে লক্ষ্য করিলাম না। শিক্ষার শেষ কি শোচনীয় পরিণাম!

ম্যাজিষ্ট্রেট কেন সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তবে কি দেড় বৎসর পরে আমার এক্সিকিউটিব সার্ভিস গ্রহণের এপ্লিকেসন কনসিডার্ড হইল? না দিয়ারী মোকদ্দমায় গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যাওয়ায়...কোন অনুমানই মনে সান্ত্বনা দান করিতে পারিল না। দুই একজন বন্ধুকে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধ চিঠি দেখাইবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাহাদিগের নিকট বিষয়টীকে একটী "কনফিডেনসিয়াল মেটার" বলিয়াই উল্লেখ করিলাম জানিনা একথা বলিতে ইচ্ছা হইল না।

( ৪ )

ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট উঠিয়া জোড়ে কর মর্দ্দন করিয়া আসন দিলেন।

আমি বসিলে তিনি বসিলেন। সম্মানের বহর দেখিয়া আমি একে বারে আত্মহারা হইলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন "আপনি সার্ব্বিসে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক।"

আমি বলিলাম "হাঁ মহাশয়, ইচ্ছুক ছিলাম বৈ কি?"

"এখনও ইচ্ছুক আছেন কি?"

"পাইলে আপত্তি নাই, আমার বয়স এখনও আছে।"

"আপনি প্রস্তুত থাকিলে, আমি রিকমেণ্ড করিতে পারি।"

"আপনাকে ধন্যবাদ"।

ইহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট এমন একটী কথা বলিলেন, যাহা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। আমার মুখ হইতে কোন উত্তর বাহির হইল না। ম্যাজিষ্ট্রেট সে সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলিলেন। আমিও বাধ্য হইয়া তাঁহার উত্তর দিলাম। কিন্তু আমার মুখ হইতে তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার মত কোন ইঙ্গিত বাহির হইল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে মনে মনে বিবেচনা করিতে বলিয়া দশ মিনিট সময় দিলেন। তিনি উঠিয়া ভিতরে গেলেন। তারপর আসিয়া অন্য কথা ধরিলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে কাটাইয়া বাসায় আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার বুদ্ধি লোপ পাইল।

আসিয়া দেখি আমার বৈঠকখানার এক খানা চেয়ারে বসিয়া আছেন—সেই বোম্বেটে মেয়ে যে দেড়বৎসর পূর্ব্বে চলন্ত গাড়ীতে আমার টাকার তোড়াটী লইবার জন্য মিথ্যা ভান করিয়া আমাকে বিপন্ন করিতে চাহিয়াছিল। আর তার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন—আমার কিশোরী পত্নী 'সুধা"।

আমি সুধাকে চক্ষে ইঙ্গিত করিলে সে চলিয়া গেল। সুধাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিবার কারণ, এ মেয়ে না করিতে পারে, এমন কাজ নাই; কি জানি পুনরায় কোন ফেসাদে ফেলিয়া গৃহস্থ হিন্দু ঘরের কুল বধূকে পর্য্যন্ত নিয়া প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষীর বাক্সে না দাঁড়া করে।

আমি গৃহে আসিতেই মেয়েটা (মিস এমিলি) আমার হাত ধরিয়া ফেলিল। আমি হাত টানিয়া লইয়া ঘৃণার সহিত বলিলাম—"তুমি এখানে কেন? এখনও তোমার শিক্ষা হয় নাই, এবার যথেষ্ট শিক্ষা পাইবে। মেয়েটা কোমল হাসি হাসিয়া বলিল—"তুমি শিক্ষা দিবে নাকি? বল ভাই, বল।"

তাহার কথার মাধুর্য্যে ও হাসির সৌন্দর্য্যে আমি একটু নরম হইয়া পড়িলাম। আমি বলিলাম—"দেখ, আমি তোমাকে পরিস্কার বলিতেছি, আমি যাহা জানি, তাহা না বলিয়া আমার উপায় নাই। আমি শত শত লোকের নিকট একথা গল্প করিয়াছি। শত শত লোক তোমার নাম না জানিলেও আমার এই "এক দিনের কথা" জানে। আমি মাসিক পত্রে গল্প লিখিয়া পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশ করিয়াছি। এখন কেমন করিয়া বলিব .

"তবে কি আমার প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছ, তাহা তোমার বিশ্বাস হয় না ?"

"হইতে পারে। সে সম্বন্ধে তোমার প্রমাণ আদালতে বিচার হইবে। আমি তাহার সাক্ষী নহি, আমার নিকট আদালত কি প্রমাণ পাইবে, আমি তাহা এখন কেমন করিয়া বলিব ?"

"তুমি সাক্ষ্য দিতে যাইতে পারিবে না।"

"এরূপ ইচ্ছা করিলেই কি আমি ত্রাণ পাইতে পারিব ?"

"সে বন্দোবস্ত আমার"

আমি বলিলাম "ইহা অপেক্ষা—শুনিয়াছি আসামী পক্ষে তোমাকে দশ হাজার টাকা ক্ষতি পূরণ করিতে স্বীকৃত, তাহা লইয়া তোমার গা ঢাকা দেওয়া শ্রেয়......নিরর্থক একটা নিরপরাধকে দণ্ডিত করিয়া হিংসা দ্বেষ বৃদ্ধি করা অপেক্ষা...

"তুমি সেই বদমাহেশকে নিরপরাধ বল...?'

আমি কাহাকেও ভাল বা মন্দ বলি না। মোটকথা আমা দ্বারা তোমার উপকার হইবে না। আমার পরামর্শই তোমার মহৎ আশ্রয়।"

মিস এমিলির হাতে পড়িয়াছিলাম—সেই এক দিন। * আর আজ বলিলাম, এই আর এক দিনের কথা। স্বাধীন নারী শক্তি কি ভয়ানক হইতে পারে আমাদের পুরুষ শক্তিও তাহার বিচার করিতে অক্ষম।

মোকদ্দমার সুনানির তারিখে কানপুরে উপস্থিত হইলাম। যে ভদ্রলোকটী আমার সহিত সাক্ষাত করিয়া সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন ষ্টেশনে তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখানে আসিয়া জানিলাম, তিনি ছকুলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মগন লাল। মগন আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আতিথ্য সৎকারে মুগ্ধ হইলাম।

আদালতে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, বাদিনী অনুপস্থিত হেতু মোকদ্দমার তারিখ পড়িয়াছে। বাদিনী কেন অনুপস্থিত—সরকারী উকিল তাহার কোন কৈফিয়ত দেন নাই। আমি আমার প্রাপ্য রাহাখরচ লইয়া রাত্রির গাড়ীতেই চলিয়া আসিলাম।

* "সৌরভ" অগ্রহায়ণ ১৩২৯ "এক দিনের কথা" দ্রষ্টব্য।

* *

ইহার পরের সপ্তাহে "Star' পত্রিকার সংবাদ স্তম্ভে দেখিলাম "আউদ রোহিলখণ্ড রেলের চলন্ত ট্রেণে যে মিস্ এমিলির উপর ছকুলালের অত্যাচারের লোমহর্ষণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল সেই মোকদ্দমার বাদিনী কুমারী এমিলি ছকুলালের বিরুদ্ধে কোন চার্য্য প্রমাণ করিতে পারিবেন না বুঝিয়া গা ঢাকা দিয়াছেন। অবস্থা বুঝিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটও ছকুলালকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিয়া মুক্ত দিয়াছেন। ইত্যাদি।

আমার কপাল পাথর চাপাই রহিল। এখন ভাবিতেছি কি chance টাই হস্তচ্যুত হইল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

---

# রামায়ণে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

রোগের সহিত চিকিৎসার সম্বন্ধ। রোগের প্রকার আধুনিক কালে যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রাচীন কালে তত ছিল না। প্রাচীন সাহিত্যে অকাল মৃত্যুর কথা খুব অল্প পাওয়া যায়। রামায়ণে মাত্র একটী স্থানে অকাল মৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে, তাহা রাজা দশরথের বাণে অন্ধ মুণির পুত্রের ঘটিয়াছিল।

"রাজার দোষেই অকাল মৃত্যু ঘটে" দশরথের এই কৃত ঘটনাটী হইতেই—এই প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি কিনা ভাবিবার, দেখিবার বিষয় বটে; কেননা ইহাই প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম অকাল মৃত্যুর দৃষ্টান্ত এবং তাহা রাজা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এবং একটু অদূর দর্শিত্বেরও পরিচায়ক। *

*উত্তর কাণ্ডে শূদ্র (ক) মুনির তপস্যা জন্য এক ব্রাহ্মণের পুত্রের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছিল। রামের নিকট এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংবাদ পঁহুছিলে রাম তাঁহার নিজের কি অপরাধ ঘটিয়াছে অনুসন্ধান করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন। ফলে অবগত হওয়া যায়—তপস্যায় অনধিকারী শূদ্র হইয়া এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়ই রাজ্যে অনাচার হইয়াছে এবং তাহাতেই ব্রাহ্মণ কুমার অকাল মৃত্যুর অধীন হইয়াছেন। রাম তখন শূদ্রের বধ সাধন করিয়া ব্রাহ্মণ কুমারকে জীবিত করেন। এই গল্পটী রাম চরিত্রের বিরোধি ও শূদ্র-দমনযুগে রচিত হইলেও এই গল্পে এই সত্যটুকু আছে যে এই গল্প রচনা কালেও রাজার পাপে যে অকাল মৃত্যু হয়। এই প্রবাদটী প্রচলিত ছিল।

সে কালে যে লোক দীর্ঘজীবী হইত এবং সমাজ যে রোগ শোক প্রপীড়িত ছিল না, তাহা রামায়ণের নানা বিষয়ের বর্ণনায়ই অবগত হওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালে মানুষের পরম আয়ুর পরিমাণ কত ছিল, এসম্বন্ধে অনেক আজগুবী কথা জনশ্রুতিতে যেমন আছে ধর্ম্ম গ্রন্থাদিতেও তেমন প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত আছে।

আমাদের পাঞ্জিকা সমূহে লিখিত আছে, ত্রেতা যুগে মানব দেহের আকার ছিল—চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত, আর সেই দেহের আয়ুর পরিমাণ ছিল—দশ সহস্রবর্ষ। রামায়ণেরও বহু স্থলেই এরূপ সহস্র সহস্র বর্ষের উল্লেখ আছে। বাইবেলের আদি পুস্তকেও এইরূপ আছে। আমাদের পুরাণ সমূহেও আছে।

বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় এবং রামায়ণের আদি স্তরের আলোচনায় কিন্তু সাধারণ মানব যে এক দেহে এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে তাহা অবগত হওয়া যায়না।

চতুর্দ্দশ হস্ত দীর্ঘও যে মানব দেহ থাকিতে পারে, তাহাও শোনা যায়না। রাম খুব দীর্ঘ পুরুষ ছিলেন, তাহার বাহু 'অজানুলম্বিত' ছিল এবং পরিমিত হস্তে তিনি চার হাত দীর্ঘ ছিলেন। হনুমান অশোক বনে সীতার নিকট তাঁহার শরীর বিভাগের যে পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতেই তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা "চতুষ্কল শ্চতুর্লেখ শ্চতুষ্কিষ্কুশ্চতুঃ সমঃ। ১৮।৫।৩৫

বেদ, ব্রাহ্মণ উপনিষদ, রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে শত বৎসরই দীর্ঘ জীবনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ঋক্ বেদে হিম, শরদ্, বসন্ত প্রভৃতিকে বর্ষ অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এবং মনুষ্যের দীর্ঘ জীবনের আভাস এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে:—

তোকম্ পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ ১।৬৪।১৪

আমরা যেন শতবর্ষ-জীবী পুত্র পোষণ করি।

ধত্তেশতাক্ষা ভবন্তি শতায়ু পুরুষঃ।

"জীবেমঃ শরদঃ শতম্"।

"দাতা শতং জীবেতু"। ইত্যাদি।'

রামায়ণেও এইরূপ শতবর্ষ পরমায়ু নির্দ্দেশের আভাস আছে। রামকে দশরথ রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন, এই সংবাদ মন্থরা নিতান্ত ভগ্ন হৃদয়ে কৈকেয়ীকে প্রদান করিলে কৈকেয়ী বলিয়াছিলেন—

সন্তপ্যসে কথং কুব্জে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্। ১৫
ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবম্ বর্ষ শতাৎ পরম।
পিতৃ-পৈতা মহং রাজ্যমবাপ্স্যতি নরর্ষভঃ॥ ১৬.
সা ত্বমভ্যুদয়ে প্রাপ্তে দহ্যমানেব মন্থরে।
ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কি মিদং পরিতপ্যসে॥ ১৭।২।৮

কুব্জে তুমি দুঃখিত কেন! ভরতও যে শত বর্ষ পরে পিতৃ পিতামহ গণের রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন. ভাবি কল্যানের নিদান স্বরূপ এই সুখকর ব্যপার উপস্থিত; তুমি পরিতাপ করিতেছ কেন?

অন্যত্র, সীতা রামের সংবাদ অবগত হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে হনুমানকে বলিয়াছিলেন:—

"এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষ শতাদপি॥ ৬" সু ৩৪

মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে শত বর্ষের পরেও আনন্দ অনুভব করে।

রামায়ণের পরিবর্ত্তী ছান্দগ্য উপনিষ দেখিতে পাওয়া যায়—ইতরার পুত্র মহিদাস মৃত্যুকে ধিক্কার দিয়া ১১৬ বৎসর কেই খুব দীর্ঘ য় বলিয়া মনে করিতেছেন। ৩।১৬।৭

রামায়ণে যে দশসহস্র বর্ষ কাল রাম জীবিত থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক যুগের প্রক্ষিপ্ত। শত বর্ষে মৃত্যু হওয়াই তখন কাল-মৃত্যু ছিল।

সাধনা দ্বারা এখনও যেমন লোক দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, তখনও তাহা পারিত। সাধক জীবনের সহিত সাধারণ জীবনের পার্থক্য সকল কালেই আছে, সকল দেশেই আছে।

শত বৎসরের পুর্ব্বে মৃত্যুকে সেকালে অকাল মৃত্যু বলিত। যুদ্ধাদি ব্যতীত বা দৈব ঘটনা ব্যতীত তখন অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বোধ হয় খুব অল্প ছিল।

সেকালে যে ব্যধি ছিল না, তাহা নহে; সামান্য সামান্য ব্যধিও ছিল সামান্য সামান্য বৈদ্যও ছিল। জ্বর একটী এমন সাধারণ শারীর উপসর্গ যাহা শারীর ধর্ম্মের ব্যত্যয় হই লই প্রকাশ পাইতে পারে। এই শব্দটীর উল্লেখ রামায়ণে

আছে। যদিও যে স্থানে আছে, তাহা মানুষের শারিরীক অবস্থার উপর ব্যবহৃত হয় নাই। যথা :—

"জরাতুরা নাগইব ব্যথাতুর॥" ২৭।০।৫১

তাহা না থাকিলেও মানুষের তাহা হইত, তাহা অনুমান করিয়াই লইতে হইবে। "কামজ্বরের" উল্লেখ ও রামায়ণে আছে।

ব্যধিও বৈদ্যের উল্লেখ রামায়ণে এই রূপভাবে আছে। কৈকেয়ী ক্রোধাগারে আশ্রয় লইলে রাজা দশরথ তাহাকে ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া বলিতেছেন—

ভূমৌশেষে কিমর্থং ত্বং ময়ী কল্যাণ চেতসি।
ভূতোপহত চিত্তেব মম চিত্ত প্রমাথিনী॥ ২৯
সান্তমে কুশলা বৈদ্যাস্ত্বভিতুষ্টাশ্চ সর্ব্বশঃ।
সুখীতাং ত্বাং করিষ্যন্তি ব্যধমাচক্ষ্ব ভামিনি॥ ৩০ ২১১০

অর্থ :— কেন তুমি ভূতাবিষ্টের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া আছ? যদি তোমার কোন ব্যধি হইয় থাকে, বল, আমার গৃহে অনেক সুদক্ষ বৈদ্য আছে, তাহারা তোমাকে আরোগ্য করিবেন।

ভূতাবেশের বিশ্বাস যে অতি প্রাচীন রাজা দশরথের এই উক্তি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া জায়।

লঙ্কা বাসিরাও সন্ধার পর একটা পিঙ্গল বর্ণ বিকটাকার পুরুষের ছায়া দেখিয়া ভয় পাইত। ( ল ৩৫ )

রামায়ণে অস্ত্র চিকিৎসা প্রচলনের যে সামান্য আভাস আছে তাহা এইরূপ; সীতা অশোক বনে বন্দিনী অবস্থায় বলিতেছেন—

তস্মিন্ননা গচ্ছতি লোকনাথে গর্ভস্থ জন্তোরিব শল্যকৃন্তঃ।
নূনং মমাঙ্গান্য চিরাদনার্য্যঃ শরৈঃশিতৈচ্ছেৎস্যতি রাক্ষসেন্দ্রঃ॥ ৬। ৫। ২৮

রাবণ আমাকে যে সময় দিয়াছেন, যদি এই সময় মধ্যে লোকনাথ রাম আসিয়া আমাকে উদ্ধার না করেন, তবে প্রসূতিকে রক্ষা করিবার জন্য শানিত অস্ত্র দ্বারা যেরূপ গর্ভস্থ জ্রূণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করা হয়, রাক্ষস জীবিতাবস্থায় আমার সেই অবস্থা করিবে।

সীতার এই উক্তি হইতে গর্ভস্থ শিশুকে অস্ত্র সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিয়া যে প্রসূতিকে রক্ষা করিবার বিধান অতি প্রাচীন সমাজে ও প্রচলিত ছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ প্রাচীন অস্ত্র চিকিৎসার উল্লেখ আমরা সুশ্রুতেও দেখিতে পাই। সুশ্রুত ও গ্রীক আক্রমণের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সুশ্রুত অপেক্ষা চরক প্রাচীন। কিন্তু এই দুই খানা গ্রন্থের কোন খানারই আভাস রামায়ণে নাই।

যাঁহারা মনে করেন, সুশ্রুতের শল্য সাস্ত্রের আলোচনা গ্রীক প্রভাবের ফল, তাঁহারা রামায়ণের এই উল্লেখটীর বিষয়ও একটু লক্ষ করিবেন!

শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধেও যে সে কালে কোন আলোচনা হইত না তাহা মনে হয়না।

যকৃৎ প্লীহং মহৎ ক্রোড়ং হৃদয়ঞ্চ সবন্ধনম্। ৪০।৫।২৪

ইত্যাদি উক্তি দ্বারা দেহাভ্যন্তরে কোথায় কোন্‌টীর স্থান তাহা নির্দ্দেশ করা তখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের অঙ্গিভূত ছিল বলিয়াই মনে হয়।

কোন ব্যধির নাম ও তাহার কোন ঔষধের উল্লেখ রামায়ণে বিশেষ নাই। ঔষধির মধ্যে মৃত সঞ্জীবনী, বিষল্যকরণী সুবর্ণকরণী অমৃত ইত্যাদি কয়েকটী ঔষধের নাম পাপ্ত হওয়া যায়। অমৃত পানে মানুষ দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিত। বিষল্যকরণী দ্বারা বোধ হয় রক্তশ্রাব বন্ধ করা ও ঘা শুষ্ক করাণ হইত। লক্ষণের শক্তিশেলাঘাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছিল।

নরকের কথা উপমাস্থলে এক স্থানে রামায়ণের আছে। ( অ ৪৮ )

রামায়ণে ধাতু হইতে কোন ঔষধ ব্যবহারের উল্লেখ একেবারেই নাই।

রামায়ণে সৌপর্ণ বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই সৌপর্ণ সাধনায় চক্ষুর দিব্য জ্যোতি লাভ হইত। সম্পাতি এই সাধনা প্রভাবে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। ( কি ৫৯ )

আত্মহত্যার চিন্তা তখনও সমাজে ছিল। শোক দুঃখে ইহা স্বাভাবিক চিন্তা এবং অতি প্রাচীন চিন্তা।

স্বর্ণ মৃগের পশ্চাৎ ধাবনকারী রামের আর্ত্তস্বর শুনিয়া সীতা লক্ষণকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিয়া শেষ বলিয়াছিলেন :—

গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামেন লক্ষ্মণ।
আবন্ধিষ্যেহথ বা ত্যক্ষ্যে বিষমেদেহ মাত্মনঃ॥ ৩৭

পিবামি বা বিষং তীক্ষ্ণ প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম। আ—৪৫

জল, অনল উদবন্ধন ও বিষ এই কয়টীই আত্মহত্যা সাধনের উপায় বলিয়া সীতার মুখে কবি দেখাইয়াছেন হনুমান ও সীতা অন্বেষণে নিরাশ হইয়া এইরূপ চিন্তাই করিয়াছিল। যথা --

বিষমুদ্বন্ধনং বাপি প্রবেশং জ্বলনস্য বা

উপবাস মথো শস্ত্রং প্রচরিষ্যন্তি বানরাঃ॥ ৩৬৫।১৩

এখানে উপবাস এবং শস্ত্র প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায়। জল অগ্নি ও অনসন আশ্রয়ে ঋষিরাও যে দেহ ত্যাগ করিতেন, তাহা আমাদের শাস্ত্রে আছে। উহাকে শাস্ত্রে আত্মহত্যা বলা হয় নাই; ইচ্ছা মৃত্যু বলা হইয়াছে। সরভঙ্গ ও মাতঙ্গশিষ্য গণের অগ্নিতে প্রবেশের কথা রামায়ণে আছে তাহা এইরূপ—ইচ্ছা মৃত্যু। এইরূপ ইচ্ছা মৃত্যুর উপদেশ এক বিধ। গৃহস্থ বধুকেও পদ্ম পুরাণকার দিয়াছেন। (পদ্মপুরাণ পাতাল ৬৫।৬৯ শ্লোক)।

রামায়ণে "আয়ুর্ব্বেদ" শব্দের উল্লেখ আদি কাণ্ডের ৪৫ সর্গে আছে। ইহাপৌরাণিক সাগর মন্থন সম্বন্ধীয় একটা পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়। ইহার আলোচনা প্রক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

# অপরাধীর দায়িত্ব।

মানব মাত্রেই আপন আপন কার্য্যের জন্য দায়ী। পাপী বা অপরাধী যখন মানুষ, তখন তাহার কাজের জন্য তাহার নিজের অবশ্যই একটা দায়িত্ব আছে। দস্যু তস্কর নরহন্তা প্রভৃতি উৎকট অপরাধীর ঘাড়ে কতটুক দায়িত্ব চাপান যাইতে পারে, তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

সমাজ বিধি, রাজবিধি, ও ধর্ম্মবিধি, ইহাদের যে কোন একটা লঙ্ঘন করিলেই মানুষ অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু সকল বধিই নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য অনেকের বিশ্বাস যে অপরাধ জনক কার্য্য একটা নৈতিক রোগ বিশেষ। অপরাধীর প্রতি সদয় ও সযত্ন ব্যবহার করিলেই এরোগের হাত হইতে মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে।

কেহ কেহ বলেন, অন্যায় কার্য্য মস্তিষ্ক রোগেরই এক প্রকার বিকাশ মাত্র। দুষ্কর্ম্মের জন্য অপরাধীর নিজের কোন দায়িত্ব নাই। তাঁহাদের মতে অপরাধীদিগকে কারাগারে না পাঠাইয়া এমন জায়গায় রাখা কর্ত্তব্য যেখানে তাহাদের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হইতে পারে। আবার আর এক দল লোক বলেন যে দস্যু তস্কর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অপরাধিগণ দেশের ও সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। সুতরাং তাহাদিগের হয়, চিরনির্ব্বাসন, নাহয়, যাবজ্জীবন কারাবাসের বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

ইটালিয়ান অপরাধ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কারাগারে বহু সংখ্যক কয়েদীর পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন; তাহারা কয়েদীদিগের চুল, নাক, কান চোখ মুখ প্রভৃতির দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপিয়া কতক গুলি বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই পরীক্ষার ফলেও মত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। লোম ব্রোসোর (Lombroso) অভিমত এই যে উৎকট অপরাধীরা ওজনে খুব ভারী ও স্থূলকায় হয়। ভারর্জিলিও (Vargilio) বলেন যে একথা সত্য নহে।

তাঁহার মতে কৃষ্ণবর্ণ লোকই অধিক সংখ্যায় অপরাধী। গৌর বর্ণ অপরাধীর সংখ্যা খুব কম। এসম্বন্ধে জার্ম্মানদের ধারণা অন্য রূপ। যে সমস্ত ফরাসী কয়েদী কারাগারে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে, তাহাদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে কারাবাসীদের মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। তাহাদের মস্তিস্কের কোন অংশ খুব বড়, কোন অংশ খুব ছোট, কোন অংশ উন্নত কোন অংশ অনুন্নত। মস্তিস্কের এই অসামঞ্জস্যের দরুণই নাকি এই হতভাগ্যেরা গুরুতর অপরাধ করিয়া ছিল।

যাঁহারা আদর্শ জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাদের মস্তিস্কের পরীক্ষাও পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে তাঁহাদের মাথায় যে দুইটি গোলার্দ্ধ (two cerebral hemispheres) আছে তাহাও সমান নহে। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে অপরাধীর চেয়ে যাহারা কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া শাস্তিভোগ করে নাই, তাহাদের মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশের অসামঞ্জস্য আরও অনেক বেশী। কাজেই মস্তিস্কের অসামঞ্জস্য হেতুই মানুষ অন্যায় কার্য্য করিয়

নিদারুণ কারাযন্ত্রণা ভোগ করে—এ সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

লোমব্রোসো অপরাধীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—চোরের নাক মোচড়ান (twisted) উপরের দিকটা একটু বাঁকান (up-turned) অথবা একটু পেটা। যাহারা খুনী আসামী তাহাদের নাক গরুড়ের নাকের ন্যায় বক্র ইত্যাদি ইটালীর অপরাধীদিগের পক্ষে ইহা সত্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু বাঙ্গালী তস্কর ও নরহন্তার যে দুই একজনের কথা আমরা জানি তাহাদের মধ্যে এসব লক্ষণ দেখিতে পাই নাই।

লোমব্রোসোর মতে উৎকট অপরাধীরা নিতান্ত অলস তাহারা অনাহারে মরিবে তথাপি যথারীতি পরিশ্রম করিতে রাজী হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালী অপরাধীর স্বভাব ইহার বিপরীত। সে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পায়। যখন দেশে অজন্মা হয়, অথবা অর্থাভাব দূর করিবার অন্য কোন সুযোগ না পায় তখন বাঙ্গালী সিঁদ কাটিয়া কিংবা ছলে বলে কৌশলে পরের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া অপরাধী সাজিয়া বসে।

লোমব্রোসো যখন পেভিয়ায় (Pavia) ডাক্তার ছিলেন তখন তাঁহাকে একটি কয়েদীর মৃত দেহ পরীক্ষা করিতে দেওয়া হইল। তিনি লোকটিকে দেখিবামাত্রই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন—তাহার মগজের গঠন মাংসাশী প্রাণীদের মস্তিষ্কের ন্যায়। পরে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলেও তিনি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলেন। এখন দেখা যাইতেছে তিনি যে সিদ্ধান্তের জন্য পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, ইতঃপূর্ব্বেই তাহা মনে মনে কল্পনা করিয়া লইতেন। এরূপ সিদ্ধান্তের মূল্য কতটুকু তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

আবার বাঙ্গালী অপরাধীর সহিত ইটালিয়ান অপরাধীর প্রকৃতি গত অনেক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চোর, ডাকাত ইংরেজ হউক, আমেরিকান্ হউক, ইটালিয়ান হউক, ভারতীয় হউক, সকলেরই উদ্দেশ্য এক; সকলই অন্যায় ভাবে পরের দ্রব্য অধিকার করিয়া লইতে চায়। সকল দেশেই তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও মস্তিষ্কের গঠন একই প্রকার হওয়া দরকার। কিন্তু ইটালিয়ান্ অপরাধ তত্ত্ব-বিদ্গণের মতে তাহা সম্ভবপর নহে. কারণ ইটালীর সহিত অন্যদেশের অপরাধীর আকৃতি প্রকৃতির সামঞ্জস্য হইতেছে না। সুতাং এসম্বন্ধে তাহাদের সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

কাহারও মতে মানুষ উত্তরাধিকারী সূত্রেই দস্যুবৃত্তি বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্ব্ব পুরুষদের দোষ গুণ পরবর্ত্তী বংশধরগণের মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারে; ইহা স্বাভাবিক। কাজেই দস্যু তস্করের পুত্র বা পৌত্র দস্যু তস্কর হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু এই সকল লোক উন্নত এবং অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাঝখানে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইলে পৌত্রিক কুপ্রবৃত্তি ভুলিয়া ভদ্রভাবে আদর্শ জীবন ও যাপন করিতে পারে। আবার সৎ পিতা মাতার সন্তানও প্রয়োজন বসে বা সংসর্গ দোষে ভয়ঙ্কর লোক হইয়া উঠিতে পরে। সুতরাং অপরাধের দায়িত্ব সকল স্থলেই পিতামাতা কিংবা পূর্ব্বপুরুষের ঘাড়ে চাপান সঙ্গত নহে। অপরাধীই অপরাধের জন্য দায়ী।

ডাক্তার মারসিয়ার (Mercier) বলেন—উৎকট অপরাধের সহিত বাতুলতার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান। দুই চারিজন বিকৃত মস্তিষ্ক লোক সমাজ বিধি বা রাজবিধি লঙ্ঘন করিয়া দণ্ডনীয় হয় বটে, কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। মারসিয়ার (Mercier) লিখিয়াছেন,—"যদি কোন পাগল অন্যায় কার্য্য করে তবে ইহা পাগলামির ফল বলিয়া মনে করা যায় না। কোন্ অন্যায় কার্য্যের জন্য পাগলকে ক্ষমা করা যে কথা, তজ্জন্য একজন প্রকৃতিস্থ লোককে ক্ষমা করাও সেই কথা।" মারসিয়ারের এই উক্তির ভিতর যে গুরুতর অসঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিজেই নিজের মত খণ্ডন করিয়াছেন। কাজেই তাহার মতে আমর সায় দিতে পারি না।

এখানে আরও একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। কপর্দ্দক শূন্য জননী দেখিলেন, শিশুপুত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া আকুল কণ্ঠে রোদন করিতেছে; তখন স্নেহময়ী জননী স্নেহের আবেগে একখণ্ড রুটী চুরি করিয়া ছেলের মুখে তুলিয়া দিলেন। চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া গৃহস্বামী তাহাকে গুরুতররূপে আঘাত করিয়া তাহাকে খুন করিল। যুবক যুবতীর মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু যুবকের

হাতে টাকা নাই। সে যাহার অধীনে কাজ করে, তাহাকে প্রতারিত করিয়া বিবাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিল। ইহাদের সকলই অপরাধী সন্দেহ নাই। কিন্তু কাহাকেও বাতুল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ আছে কি? বাতুলতার সহিত উৎকট অপরাধের সর্ব্বত্র ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই—এই সিদ্ধান্তই আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

এখন আমরা পুনরালোচনাচ্ছলে বলিতে পারি, যাহারা উৎকট অপরাধ করিয়া দণ্ডনীয় হয়, তাহারা ভগবানের সৃষ্ট অদ্ভুত জীব নহে। তাহারাও আমাদের ন্যায় মানুষ। কোন বিশেষ আকৃতি প্রকৃতির দরুন অন্যায় কার্য্যের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক আসক্তি হয়, এমন কথাও বলা যায় না। পূর্ব্ব পুরুষদের দোষে মানুষের দস্যু তস্কর হওয়া সর্ব্বত্র সম্ভবপর নহে। বাতুলতার সহিতও অপরাধের নৈকট্য সম্বন্ধ নাই। তবে মানুষ অপরাধজনক কার্য্য করে কেন? এই প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে কোথা হইতে আসিল? আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব—অলসতা, বিলাসিতা, হিংসা, প্রতিহিংসা; ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, স্বার্থপরতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ও দরিদ্রতা মানুষের উৎকট অপরাধের মূল কারণ।

একজন অতিরিক্ত মাত্রায় মদিরা পান করিয়া নেশার ঝোঁকে আর এক জনকে গুরুতররূপে প্রহার করিল। এই অপরাধের জন্য মাতালের শাস্তি কম হইবে কেন? তাহার মদিরা সেবনের জন্য দায়ী কে? কাহারও প্রতিবেশীর একটা সুন্দর জিনিষ দেখিয়া লোভ হইল, সে উহা চুরি করিল; এই জন্য কি তাহার বৃদ্ধ বা প্রবৃদ্ধ পিতামহ দায়ী? জায়গা জমি লইয়া সহসা একের সহিত অপরের বিবাদ বাঁধিল, ইহার ফলে একজন অপরকে খুন করিল, মোকদ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ হইল। আসামী পক্ষের উকীল বলিল, "আসামীর উদ্ধতন পঞ্চম পুরুষ উন্মাদ ছিল, উত্তরাধিকারী সূত্রে আসামীও পাগল, অতএব তাহাকে মুক্তি দেওয়া হউক।" এ যুক্তির কোন মূল্য আছে কি? বাস্তবিক খুনী আসামীর অপরাধের জন্য তাহার উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ দায়ী হইতে পারে কি? আমাদের বিশ্বাস, আসামী ব্যতীত আর কেহই তজ্জন্য দায়ী নহে। মানুষ আপন কৃত দুষ্কৃতির জন্য নিজেই দায়ী।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই—ভগবান পাপীদিগকে যে চক্ষে দেখেন, বিচারকও অপরাধী দিগকে সেই চক্ষে দেখিবেন। মুনি ঋষিদেরও মতিভ্রম হইতে পারে। কাজেই মানুষের মতিভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। আবার প্রত্যেক মানবের ভিতর সুমতি কুমতি আছে। কুশিক্ষা কুসংসর্গ, উন্নতির পরীপন্থী মূলক। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ঘটনা বিপর্য্যয়েও কাহারও ভিতর কুমতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তখন সে কুমতির তাড়নায় কুপথে পরিচালিত হইয়া গুরুতর অপরাধ করিয়া বসে। মানুষ হিসাবে এই হতভাগা অপরাধীদিগের প্রতি সকলের যেমন সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য, তেমনি তাহাদের যথাযোগ্য শাস্তি হওয়াও বাঞ্ছনীয়। নতুবা মনুষ্য সমাজে ন্যায় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না। *

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

---

## সুসং পাহাড়।

( ১ )

সুসং পাহাড়! কর্‌লে তুমি চিত্ত চমৎকার!
শ্যামল শোভায় মন কেড়েছ, তোমায় নমস্কার!
স্বচ্ছ শীতল 'সোমেশ্বরী' তোমার চপল মেয়ে,
নদ নদীতে 'হাওড়' বিলে বেড়ায় নেচে ধেয়ে!
পাহাড়ের ঢেউ রইছে জমে' নীল আকাশের গায়!
স্বর্গে ওঠার বিশাল সিঁড়ি দৃষ্টি-সীমানায়!
আঁকা বাঁকা রাস্তা আঁকা আর তো দেখি নাই!
বসুন্ধরার সিঁথি ওটা, আকুল চোখে চাই!
পূর্ব্ব বঙ্গের দার্জ্জিলিং তুই! স্বাস্থ্য নিবাস বটে!
কোন্ পটুয়া আঁক্‌লো তোরে গগন-চিত্রপটে! ১০

( ২ )

আমের যখন মুকুল ফোটে কোকিল পাগল করে;
দখিন হাওয়ায় দম্পতীরা মাতে পরস্পরে;
তখন ওগো, ঠিক তখনি ঐ পাহাড়ের শিরে,

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় *Calcutta Review* এ প্রকাশিত *"The personel Responsibility of the criminal"* হইতে অনেক সাহায্য গৃহীত হইয়াছে।

রূপের নেশায় পৌঁছে গেলাম্' পুলকাশ্রুনীরে !
'ঠ্যাং-ভাঙা' ঐ পাহাড়'পরে ঠ্যাংটি ভেঙে শেষে,
হাঁপিয়ে খানিক জিরিয়ে খানিক গেলাম নতুন দেশে
কম্-সে-কম্ এক ক্রোশ পথ উর্দ্ধে উঠে দেখি—
কি মনোরম ; কি চমৎকার ! মধুর দৃশ্য একি !

( ৩ )

দারুণ রোদে দর্ দরিয়ে ঝর্‌তেছিল ঘাম ;
ভুলেই গেলাম জল্-পিপাসা, পূরলো মনস্কাম ! ২০
মনের মাঝে এঁকে নিলাম না-দেখা সব ছবি !
উর্দ্ধে তখন ফাল্গুন মাসের আগুন-ঝরা রবি !
উত্তরে তার তুরা পাহাড়, মধ্যে উপত্যকা !
এই খানে মোর ডেরা বেঁধে খুঁজ্‌বো প্রাণের সখা।
একটা নিঝুম নির্জ্জনতার রাজ্য এটাই বটে !
বাঘ ভালুক আর হরিণ চরে ঝর্ণাগুলার তটে !

( ৪ )

বন্য এসব পশুর মাঝে গারো পুরুষ নারী
মনের সুখে কর্‌ছে বসৎ বেঁধে টংয়ের বাড়ী !
সেমিজ কামিজ জুতো জামার ধার ধারেনা কেউ !
জোয়ান পুরুষ নারীর দেহে মাংস পেশীর ঢেউ। ৩০
সব যুবতী বুড়ী ছুঁড়ীর গলায় শাঁখের মালা ;
নগ্ন রূপে মগ্ন তারা, নাই লজ্জার জ্বালা !
তাদের বোনা 'গ্যানা' কাপড় রঙ্গীন্ চমৎকার !
জঙ্ঘা দুটি ঢাকার বেশী আয় থাকেনা তার !
নাভির নীচে হাটুর ওপর একটা প্যাঁচে পরে,
বাংলা দেশের নারীর মত রয়না বসে ঘরে !
খুব সাহসী অল্প ভাষী, অলসে কেহ নয় ;
নিজেই নিজের দ্বার্ পাহারা, এম্‌নি সুনির্ভয় !

( ৫ )

আদম এবং ঈভের মত গারো পুরুষ নারী,
নিষিদ্ধ সেই ফলটি খেয়ে বংশ বাড়ায় ভারী ! ৪০
আম্‌রা হিন্দু মরণ-সিন্ধু ভর্‌ছি ভীষণ বেগে ;
কে জাগাবে ঘুমায় যারা সদাই জেগে জেগে .
হিন্দু মরে' হচ্ছে উজার, কে বাঁচাবে তারে !
সমাজ শুয়ে ল্যাজটি নাড়ুক্-কে কি বল্‌তে পারে ?
বিপত্নিকের সয়না সবুর, সংসারে খুব ঠ্যাকা !
বিধ্‌বা ছুঁড়ী ব্রহ্মচর্য্য কর্‌বে একা একা !
মাথা মুণ্ডু কর্‌ছো কি সব, চণ্ডুখোরের জাত্ ?
আর কত কাল বাস্‌বে ভাল অমাবস্যার রাত ?
আজ্‌কে নেহাৎ পড়ে' গেছি আম্‌রা বহুৎ নীচে !
'সভ্য' জাতি মার্‌ছে লাথি, খ্যাদায় পিছে পিছে ! ৫০
বল্‌ছে সবাই 'ভাগ্ ইহাঁছে,' তাড়ায় গোরুর মত ;
কিল্ খেয়ে কিল কর্‌ছি চুরি, খাচ্ছি থতমত !

( ৬ )

সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে সাহেব মেম,
হর্ হপ্তায় খুব সস্তায় হেথায় বিলায় প্রেম !
কপ্‌চাবে ঢের ইঙ্গ বুলি গারো দু'চার দিন ;
'বল' নাচে বেশ উঠ্‌বে মেতে, নাচ্‌বে তাধিন্ ধিন্ !
তারপরে সেই মোদের মত রোগা পট্‌কা রূপ !
চক্ষু-বসা, চশ্‌মা আটা সাত-চড়ে-রয়-চুপ !
দেড়শো. দু'শো বছর পরে ভুগে ভুগে ভুগে,
হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌বে যখন, জাগ্‌বে নতুন যুগে ! ৬০
হয়তো কোনো 'গান্ধী' তখন জাগ্‌বে এদের মাঝে ;
গর্‌তে বিরাট্ গারো জাতি খাট্‌বে দেশের কাজে।

( ৭ )

আসল কথাই যাচ্ছি ভুলে, দোষ ধোরোনা কেউ !
প্রাণের মাঝে জোর্ তুলছে সাত সাগরের ঢেউ !
জংলী মোরগ কোকিল ঘুঘু আরো নানান্ পাখী,
দিন দুপুরে গহন বনে কর্‌ছে ডাকা ডাকি !
পাহাড় শিরে আম্‌লকি গাছ, খুব ফলেছে ফল ;
যেম্‌নি দেখা অম্‌নি তৃষায় জিভের এল জল !
পথ্-প্রদর্শক গারো ছোঁড়া একটু অনুনয়ে,
আম্‌লকি ঢের আন্‌লে গিয়ে কাঁটার খোঁচা সয়ে। ৭
কি চেহারা ! মস্ত জোয়ান ! মাংসে ভরা বুক !
পা'র দাপটে পাহাড় কাঁপে ! হাস্য মাখা মুখ !
সভ্যতার সব গুপ্ত রোগের মাড়ায় না সে ছায়া ;
চা চুরুট সে খায়না মোটেই, বিশাল নধর কায়া ;
উদ্‌লা দেহে ছুটে বেড়ায় শীত বাদ্‌লা রাতে !
জ্যোৎস্নাতে সে জড়িয়ে গলা গায় তরুণীর সাথে !
আমোদ করে, প্রমোদ করে শাল সেগুনের তলে !
চুমো খেয়ে প্রায়্ পরিয়ে ফুলের মালা গলে !

এদের সরল জীবন যাপন বড়ই লোভনীয় !
হা ভগবান্, এদের মত সরল হোতে দিয়ো । ৮০

( ৮ )

বল্‌লো ছোঁড়া, ঘর্-র্ জামাই সে এই পাহাড়ের বুকে
দিন গুলি তার কাটছে নাকি একটানা এক সুখে !
উত্তরের ঐ দূর্—পাহাড়ে ছিল তাহার বাড়ী,
বাপ মা সেথায় আজো আছে, হয়নি ছাড়া ছাড়ি !
বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়ী থাকাই যুবার রীতি,
ছ'চার কথায় জেনে নিলাম গারোর সমাজ-নীতি !
আদি কালের আর্য্যের মত ইচ্ছা করে আমি,
অনার্য্য এই গারোর সাথে কাটাই দিবা যামি !
ইচ্ছা করে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে,
বন্য জীবন যাপন করি এদের মাঝে গিয়ে ! ৯০
দিন রজনী হৃদয় খুলে' আলাপ-সালাপ করি,
বনের ফলে ঝর্ণা জলে জীবনটাকে গড়ি !
বাঘের গলা সাপ্‌টে ধোরে ছোরা বিঁধাই বুকে !
সিং-ও'লা সব হরিণ শিকার করি মনের সুখে !
জ্যোৎস্না রাতে পরীর সাথে পাহাড় বেড়াই ঘুরে !
বাঁশের বাঁশি বাজাই একা ব্যাকুল-করা সুরে !
সভ্য করি আর্য্যপ্রথায়, ছড়াই জ্ঞানের আলো !
হিন্দু সমাজ বাড়িয়ে তুলি, সেইতো হবে ভালো ।

( ৯ )

আমরা নাকি 'সভ্য' জাতি, আইন কানুন মানি !
বিদ্যা মোদের কচুপোড়া; দাম্ভিকতাই জানি ! ১০০
কথার চটক, বেশের বাহার, চসমা ঢাকা আঁখি,
হাড়্-বেরুনো রুগ্ন শরীর সদাই ঢেকে রাখি !
ফুল্‌কো লুচির চোঁচা পেলে না খেলে পেট ফাঁপে !
জোর্-ছে কেহ ধমক দিলে ডর্-ছে হৃদয় কাঁপে !
এখান থেকে থাব্‌ড়া মার্‌লে হাব্‌ড়া গিয়ে পড়ি,
আম্‌ড়ার আঁটি চুষে মিছাই কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি করি ।
রাগের ঝোঁকে ঘরে ঢুকে' বৌকে মারি শেষে !
তাইতো মোদের পীলে ফাটায় যেমন-তেমন যে সে !
বাঁচ্‌তে যদি চাস্ জগতে নারীর পূজো কর্ !
মূর্ত্তিমতী শক্তি এঁড়া, সাহস ভয়ঙ্কর ! ১১০
কোৎকা দেখে' 'শিব' হয়েছেন শবের চেয়ে শব !
'শক্তি' এখন জানেন বাজে কর্‌তে কলরব !
এই তো মোদের বাবু-সমাজ ! এই তো পুরুষ নারী !
কিসের তোরা বড়াই করিস্ ? কিসের বাড়াবাড়ি ?

( ১০ )

বল্‌ছিলাম কি ভুলেই গেছি ! তৃষ্ণার কথাই বুঝি !
আমলকি তাই আন্‌তে ঝোপে গেলাম সোজাসুজি !
আঁচড় খেয়ে ঝোপের মাঝে গেলাম পিছে পিছে,
গারো উঠে' গাছটা ঝাঁকায়, আমি কুড়াই নীচে ।
তুচ্ছ পেয়ে তুচ্ছ করি উচ্চ পাহাড় চড়া,
রুষ্ট মেজাজ তুষ্ট হলো, ফল কি আকুল করা ! ১২০
কুড়াই এবং বিলাই এবং চাখি মনের সুখে,
প্রাণের হাসি ফুট্‌লো তখন সবার চোখে মুখে !

( ১১ )

মাথার ওপর সূর্য্য দেখে' সবকে ডেকে-ডুকে,
নেমে পলাম সবার আগে, ল্যাঠাই গেল চুকে !
পাহাড়-চড়া বরং সোজা, নামাই কষ্ট কর ;
নাম্‌তে গিয়ে পায়ে পায়ে নিলাম লাঠির ভর্ ।
নেমে এলাম ঝর্ণা-ঝোরা উপত্যকার বুকে ;
বাদ্‌শা-বাহন হস্তি যেথা জিরায় পরম সুখে !
ছোট্ট পাহাড়- অার্ ডালে ছয় মস্ত জনোয়ার,
দেখ্‌তে মোটা কুমার সম লাগ্‌লো চমৎকার ! ১৩০
ঝর্ণার জল কি টলটল ! চল্‌ছে কুলু-কুলু !
আঁজলা-ভরা জল খেয়ে মোর নয়ন ঢুলু-ঢুলু !
জল যে কতই সুস্বাদু আর আরাম দায়ক চীজ্,
প্রথম সেদিন বোঝা গেল অভিজ্ঞতায় নিজ !

( ১২ )

ভীষণ রোদে অাত্ম-অবোধ হাতীর পিঠের পরে,
বেগায় ঠাঁসা ঠাঁসি কোরে বস্‌লাম পরস্পরে !
চল্‌লো হাতী শুড়গুলি ঠিক ফণার মত তুলে' !
অহঙ্কারী নারীর মত বেজায় হেলে' দুলে' !
উপত্যকার মাঝে সে কি দৃশ্য চমৎকার !
ছোট্ট সরু ঝর্ণা-মেয়ের বিজন অভিসার ! ১৪০
নানান্ রঙের ফুল ফুটেছে পাহাড়ের সব গায়,
তারা যেন মোদের পানে হাস্য মুখে চায় !
ঢল-গড়ানো পাহাড়ের গায় শাল-সেগুনের তলে,

ন্যাংটা গারো ছেলে মেয়ে তাকায় কুতূহলে!
বাপ মা তাদের মুখোমুখি গল্প গুজব করে;
বলছে ধীরে খুব স্বাভাবিক প্রাণের পুলক ভরে!
কোথাও আবার উপত্যকায় টংয়ের ঘরের মাঝে,
দেখ্যান গারো পুরুষ নারী ব্যস্ত কি সব কাজে;
কত কি সব দেখে' এলাম চোঁকি কপালে তুলে'!
পারবো নারে পঞ্চ মুখে বলতে সে সব খুলে'! ১৫০
রূপ-কানা সব দেখে আসুক্ এমন শোভা রাশি!
সুসং পাহাড়! আমি তোমায় বড্ড ভালবাসি! ১৫২

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

## সাহিত্য সংবাদ।

### সৌরভ সাহিত্য সঙ্ঘ।

গত ২০ শে অগ্রহায়ণ রবিবার স্থানীয় দুর্গা বাড়ীতে উক্ত সাহিত্য সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় এই নগরের বহু সাহিত্যসেবী ও শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সরকারী উকিল রায় শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ঘোষ এম, এ, বি, এল, বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সৌরভ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার জগতের প্রাচীনতম সভ্য সমাজ ও রামায়ণের সমাজ" সম্বন্ধে একটী তুলনা মূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। লেখক এই প্রবন্ধে রামায়ণের যুগ বা রামায়ণ রচনার কাল নির্দ্ধারিত করিতে যাইয়া মিসরীয় এসিরীয়, বাবিলনীয় ইব্রীয়, ও গ্রীক সমাজের প্রাচীন অবস্থা, সভ্যতার প্রকৃতি, আদান প্রদানের ধারা ইত্যাদি আলোচনা করিয়া কোন সমাজ কত প্রাচীন ও সেই প্রাচীনতা নির্ণয়ের কতগুলি উপায় আলোচনা করেন। অতপর বেদ, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, উপনিষদ, মহাভারত প্রভৃতির রচনা কাল নির্দ্দেশ করেন।

চারুমিহির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি, এল, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী-বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিএ, বি টি ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশের আলোচনা করেন। রাত্রি ৮টার সভা ভঙ্গ হয়।

এবার প্রয়াগধামে ১০ ই ও ১১ ই পৌষ উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীর অধিবেশন হইবে। প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে চাঁদা দিতে হইবে ন্যূনপক্ষে পাঁচ টাকা।

---

এবার ভারতের জাতীয় মহা সমিতির অধিবেশন মাদ্রাজের অন্তর্গত কোকনদে হইবে। ঐ সময় ২৩ শে, ২৪ শে, ও ২৫ শে ডিসেম্বর কোকনদে নিখিল ভারতীয় সাধারণ লাইব্রেরী সম্মিলন ও সাময়িক পত্র প্রদর্শনী হইবে ২৩ শে ডিসেম্বর সাময়িক পত্রাদির প্রদর্শনী দ্বারা উদ্ঘাটিত হইবে। বোম্বাইর ব্যারিষ্টার মি এম, আর, জয়াকর সম্মিলনের ও প্রদর্শনীর সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

---

সুকবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যঙ্গ কবিতা গুলি "হাসি ও হল্লা" নামে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। মূল্য বার আনা।

## শোক সংবাদ।

বঙ্গসাহিত্যের শক্তিশালী লেখক স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বরিশালের জন নেতা স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের মৃত্যু বাঙ্গালা দেশে ইন্দ্র-চন্দ্র পাত ঘটাইয়াছে। ইঁহাদের অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।

---

আগামী সংখ্যায় "সৌরভ" দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিবে। এই এগার বৎসর আমরা সৌরভ নিয়মিত রূপে চালাইয়াছি। মফস্বল হইতে যেরূপ ভাবে ছবি চিত্র দিয়া বাহির করা সম্ভব, তাহা করিতে ত্রুটী করি নাই। দ্বাদশ বর্ষে যাহাতে সৌরভ আরও উৎকৃষ্ট হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

---

ঢাকা, ৭৫নং পাটুয়াটুলী, বীণা প্রেসে—শ্রীশশীভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।